চিত্রবীক্ষণ

সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র



মাসিক চলচ্চিত্র পত্রিকা
সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র

ত্রয়োদশ বর্ষ
প্রথম সংখ্যা
অক্টোবর, '৭৯

চিত্রবীক্ষণ



সম্পাদক : অনিল সেন

বিষয়সূচী

প্রচ্ছদচিত্র : প্রমথেশ বড়ুয়ার 'দেবদাস' ছবির একটি দৃশ্য
প্রচ্ছদশিল্পী : দীপক দে

শিলিগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সুনীল চক্রবর্তী
প্রযত্নে, বেবিজ স্টোর
হিলকার্ট রোড
পোঃ শিলিগুড়ি
জেলা : দার্জিলিং-৭৩৪৪০১

আসানসোলে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সঞ্জীব সোম
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জি. টি. রোড ব্রাঞ্চ
পোঃ আসানসোল
জেলা : বর্ধমান-৭১৩৩০১

বর্ধমানে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
শৈবাল রাউত
টিকারহাট
পোঃ লাকুরদি
বর্ধমান

গিরিডিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এ, কে, চক্রবর্তী
নিউজ পেপার এজেন্ট
চন্দ্রপুরা
গিরিডি
বিহার

দুর্গাপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দুর্গাপুর ফিল্ম সোসাইটি
১/এ/২, তানসেন রোড
দুর্গাপুর-৭১৩২০৫

আগরতলায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অরিন্দ্রজিত ভট্টাচার্য
প্রযত্নে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
হেড অফিস বনমালিপুর
পোঃ অঃ আগরতলা ৭৯৯০০১

গৌহাটিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
বাণী প্রকাশ
পানবাজার, গৌহাটি
ও
কমল শর্মা
২৫, থারঘুলি রোড
উজান বাজার
গৌহাটি-৭৮১০০৪
এবং
পবিত্র কুমার ডেকা
আসাম ট্রিবিউন
গৌহাটি-৭৮১০০৩
ও
ভূপেন বরুয়া
প্রযত্নে, তপন বরুয়া
এল, আই, সি, আই, ডিভিসনাল
অফিস
ডাটা প্রসেসিং
এস, এস, রোড
গৌহাটি-৭৮১০১৩

বাঁকুড়ায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
প্রবোধ চৌধুরী
মাস মিডিয়া সেন্টার
মাচানতলা
পোঃ ও জেলা : বাঁকুড়া

জোড়হাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অ্যাপোলো বুক হাউস,
কে, বি, রোড
জোড়হাট-১

শিলচরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এম, জি, কিবরিয়া,
পুষ্পিপত্র
সদরহাট রোড
শিলচর

ডিব্রুগড়ে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সন্তোষ ব্যানার্জী,
প্রযত্নে, সুনীল ব্যানার্জী
কে, পি, রোড
ডিব্রুগড়

বালুরঘাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অন্নপূর্ণা বুক হাউস
কাছারী রোড
বালুরঘাট-৭৩৩১০১
পশ্চিম দিনাজপুর

জলপাইগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দিলীপ গাঙ্গুলী
প্রযত্নে, লোক সাহিত্য পরিষদ
ডি. বি. সি. রোড,
জলপাইগুড়ি

বোম্বাইতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সার্কল বুক স্টল
জয়েন্দ্র মহল
দাদার টি. টি.
(ব্রডওয়ে সিনেমার বিপরীত দিকে)
বোম্বাই-৪০০০০৪

মেদিনীপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটি
পোঃ ও জেলা : মেদিনীপুর
৭২১১০১

নাগপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
ধূর্জটি গাঙ্গুলী
ছোটি ধানটুলি
নাগপুর-৪৪০০১২

এজেন্সি :

* কমপক্ষে দশ কপি নিতে হবে।
* পঁচিশ পার্সেন্ট কমিশন দেওয়া হবে।
* পত্রিকা ভিঃ পিঃতে পাঠানো হবে, সে বাবদ দশ টাকা জমা (এজেন্সি ডিপোজিট) রাখতে হবে।
* উপযুক্ত কারণ ছাড়া ভিঃ পিঃ ফেরত এলে এজেন্সি বাতিল করা হবে এবং এজেন্সি ডিপোজিটও বাতিল হবে।

বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের ষাট বছর

বাংলা চলচ্চিত্রশিল্প ষাট বছর পেরিয়ে গেল। এই বছরের হিসাবটা ১৯১৯ সালে প্রথম কাহিনীচিত্র 'বিল্বমঙ্গল'-এর মুক্তিলাভের সময়টিকে ধরে। এর আগে অবশ্যই কিছু কিছু খণ্ড বা স্বল্পদৈর্ঘের ছবি তৈরী হয়েছে, হীরালাল সেন প্রমুখ পুরোধারা নিশ্চয়ই চলচ্চিত্রের প্রাথমিক যুগে কিছু কিছু কাজ করেছেন যদিও সেগুলির বেশীরভাগই ছিল আধা সংবাদচিত্র বা নাটকের সিনেমাটোগ্রাফ। কাজেই ১৯১৯ সালের প্রথম কাহিনী চিত্র নির্মাণের প্রসঙ্গটি নিঃসন্দেহে স্মরণীয়।

বয়সের হিসাবে বাংলা ছবি যথেস্ট প্রাচীনতার দাবী রাখলেও, আজ ষাট বছর পরে আমরা যদি সেই নির্বাক যুগের মূল্যায়ন করতে যাই তাহলে দেখা যাবে চলচ্চিত্রের শুরু নিঃসন্দেহে এক technological advancement (অবশ্য যা এখানে বিদেশ থেকে সম্পূর্ণভাবে নেওয়া প্রযুক্তিবিদ্যা ছাড়া আর কিছু নয়) এবং সেটিই একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যদিও কলকাতায় তৈরী নির্বাক যুগের বিশেষ কোন ছবি আজ আর অবশিস্ট নেই তবুও একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায় সেযুগে যা ছবি হয়েছে তা মনে রাখার মত নয়। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক মানের জার্মান বা সোভিয়েত নির্বাক ছবির সঙ্গে তুলনা করলে এই দৈন্য একান্তই প্রকট হয়ে ওঠে।

নিছক ব্যবসায়িক প্রয়োজনেই এখানে চলচ্চিত্রশিল্পের শুরু, এর বিকাশপর্বও সেই ভাবেই হয়েছে, বিক্ষিপ্তভাবে হয়তো কখনো দু-একটি ভালো ছবির চেষ্টা হয়েছে কিন্তু সামগ্রিকভাবে শিল্পভাবনার লক্ষণ এখানকার নির্বাক ছবিতে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত।

১৯৩১ সালে প্রথম সবাক ছবি 'জামাইষষ্ঠী' মুক্তিলাভ করলো। শব্দ সংযোজন চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে শিল্পসংস্কৃতিসংক্রান্ত কোনো পরিবর্তন সূচিত করলোনা। সেই পৌরাণিক বা আধা সামাজিক ছবিই তৈরী হয়ে চললো। সমকালীন সমাজ রাজনীতি বর্জিত বাংলা চলচ্চিত্রে তিরিশ দশকে কিছু ইতস্তত প্রচেষ্টা অবশ্যই শুরু হল—প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া, দেবকী বসু, মধু বোস, হেমচন্দ্র, নীতিন বোস প্রমুখ পরিচালক কিছু কিছু ভালো ছবি তৈরী করতে উদ্যোগী হলেন—নিউ থিয়েটার্সে'র ব্যানারে বাংলা এবং হিন্দী ছবি সারাভারত জুড়ে বক্স অফিস সফল হয়ে উঠলো।

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বাংলা চলচ্চিত্র কখনোই জীবনধর্মী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের শরিক হয়ে উঠলোনা, সমকালীন জীবন, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম, আন্দোলন কোনো কিছুই চলচ্চিত্রের বিষয় হয়ে উঠলোনা। অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সেন্সরের কঠোর বিধিনিষেধ এব্যাপারে বিরাট প্রতিবন্ধক ছিলো তবুও সমকালীন বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করলে বাংলা চলচ্চিত্রের বিষয়গত দীনতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই নিউ থিয়েটার্স' ইত্যাদি প্রযোজক প্রতিষ্ঠানের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠলো, যুদ্ধের বাজারে দুহাতে পয়সা লোটা কালোবাজারী নয়া মালিকদের চলচ্চিত্র-ক্ষমতার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ালো বোম্বাই। কলকাতার প্রযোজকরা অসম প্রতিযোগিতায় পিছু হটতে লাগলেন। দেশবিভাগ বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পকে ক্রমশঃই দুর্বল করে তুললো।

এই রাজনৈতিক-সামাজিক অস্থিরতা কিন্তু চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও এক নতুন সংস্কৃতিমনস্কতাকে সংঘবদ্ধ করে তুলছিলো। ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হল—শুরু হল ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন। নিমাই ঘোষ তুললেন 'ছিন্নমূল', ঋত্বিক ঘটক 'নাগরিক' (অবশ্য সেই সময়ে নানা কারণে ছবিটি মুক্তি পায়নি)।

১৯৫৫ সালে মুক্তিলাভ করলো ষাট বছরের বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠ সম্পদ 'পথের পাঁচালী'। সত্যজিৎ রায় পৃথিবী কে পরিচয় করিয়ে দিলেন এক অসাধারণ বাংলা ছবির সঙ্গে। ঋত্বিক ঘটক এবং মৃণাল সেন যুক্ত হলেন সৎ চলচ্চিত্রের আন্দোলনে।

এক নতুন সম্ভাবনায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো বাংলা চলচ্চিত্র মূলত সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক এবং মৃণাল সেনের শিল্পসৃষ্টিতে। এছাড়াও অংশতঃ তপন সিংহ, রাজেন তরফদার, হরিসাধন দাশগুপ্ত প্রমুখ পরিচালকও এই সৃজনশীল চলচ্চিত্রে গতিবেগ সঞ্চারিত করছিলেন।

ষাটদশকের শেষাশেষি এই উজ্জ্বল সম্ভাবনা ক্রমশঃই নিষ্প্রভ হয়ে গেলো। বাংলা ছবি শিল্প ও বাণিজ্য উভয়ক্ষেত্রেই পিছু হঠতে শুরু করলো। নিজ প্রদেশেও বাংলা ছবি পরবাসী হয়ে উঠলো। সংখ্যাগত ও গুণগত এই দুই বিচারেই অন্যান্য অনেক ভারতীয় ভাষার ছবির চেয়ে বাংলা ছবি পেছিয়ে গেলো।

এই পেছিয়ে যাওয়া এখনো চলেছে, চলেছে অপ্রতিহতভাবে। ষাট বছরেও নাবালক বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প আজ পঙ্গু, মুমূর্ষু।

এই মুখ থোবড়ানো বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে বাঁচাতে আজ জরুরী কার্যক্রম নিতে হবে। আনন্দের কথা পশ্চিমবঙ্গ সরকার এব্যাপারে কিছু নির্দিষ্ট কর্মসূচী নিয়েছেন। সুস্থ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের যথার্থ ভূমিকায় বাংলা চলচ্চিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টায় সকল চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে সক্রিয়ভাবে। বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের ষাট বছর আমাদের এই প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে দিচ্ছে।

সিনে ক্লাব, আসানসোলের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশনা

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের

চলচ্চিত্র • সমাজ ও সত্যজিৎ রায় (১ম খণ্ড)

আসানসোল সিনে ক্লাবের আবেদন—

"ফিল্ম সোসাইটিগুলির গঠনতন্ত্রে অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে 'গ্রন্থ প্রকাশনা' একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেলেও, একথা বলতে দ্বিধা নেই যে কেবল দু'একটি ফিল্ম সোসাইটির পক্ষেই এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়েছে। এর মূল কারণ এই লক্ষ্য সাধনের পথটি কুসুমাস্তীর্ণ নয়, এবং এ সম্পর্কে সর্ববিধ বাধার কথা জেনেই আসানসোল সিনে ক্লাব একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছে। গ্রন্থটির নাম "চলচ্চিত্র, সমাজ ও সত্যজিৎ রায়", লেখক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, যিনি ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি মানুষের কাছে এবং সামগ্রিক ভাবে সাংস্কৃতিক জগতের অনেকের কাছেই চলচ্চিত্র আলোচক হিসাবে পরিচিত (কর্মসূত্রে শ্রীচট্টোপাধ্যায় এক দশকের কিছু বেশীকাল এ অঞ্চলের অধিবাসী এবং আমাদের ক্লাবের সদস্য)। প্রকাশিতব্য গ্রন্থটির নির্বাচনের প্রেক্ষাপট হিসাবে কয়েকটি কথা প্রাসঙ্গিক।

যে প্রতিভাধর চলচ্চিত্র স্রষ্টা অমর 'পথের পাঁচালী' সৃষ্টি করে ভারতীয় চলচ্চিত্রকে সত্যকার ভারতীয় করেছেন যাঁর ছবির ওপর বিদেশে অন্ততপক্ষে তিনটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যার একটির বিক্রয় সংখ্যা লক্ষ কপিরও বেশী— অথচ দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরেও তাঁর সুদীর্ঘ চলচ্চিত্র কর্মের কোন দেশজ বাস্তবধর্মী মূল্যায়নের সামগ্রিক চেষ্টা হয়নি (খণ্ড খণ্ড ভাবে কিছু উৎকৃষ্ট কাজ হলেও)—এটি একটি লজ্জাজনক ঘটনা। সেই অক্ষমতা অপনোদনের প্রচেষ্টা এই গ্রন্থটি। সত্যকার বাস্তবধর্মী ও নিজস্ব সাংস্কৃতিক সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কোন দেশীয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্রকারের মূল্যায়নের চেষ্টা না হলে, বিদেশী ও বিশেষ করে পশ্চিমী প্রতিষ্ঠানিক চলচ্চিত্র আলোচনার দর্পণে তাঁর যে মুখচ্ছবি প্রতিফলিত হয় তাতে যে কত ইচ্ছাকৃত ও অজ্ঞানকৃত ভুল থাকে, এবং সেই সব ভ্রান্ত প্রচার যে তাঁর চলচ্চিত্র কর্মকে ও চলচ্চিত্রের অনুরাগীদের এবং পরোক্ষভাবে জাতীয় চলচ্চিত্রবোধকে ভুল পথে চালিত করে—এ সবের নিপুণ বিশ্লেষণের জন্য এই গ্রন্থটি প্রত্যেক চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষের অবশ্য পাঠ্য।

প্রকাশিতব্য প্রথম খণ্ডটি সত্যজিৎ রায়ের প্রথম পর্বের ছবিগুলির গবেষণাধর্মী আলোচনায় সমৃদ্ধ। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মহৎ 'অপুচিত্রত্রয়ী'। এই গ্রন্থের অর্ধাংশ জুড়ে 'পথের পাঁচালী' সহ এই চিত্রত্রয়ী আলোচনায় দেখান হয়েছে পশ্চিমের 'দিকপাল' ব্যাখ্যাকারদের দৃষ্টিভঙ্গী কোথায় সীমাবদ্ধ, এবং দেশজ সাংস্কৃতিক সামাজিক ভূমিকায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এই চিত্রত্রয়ীর ব্যাখ্যা কত গভীর ও মৌলিক হতে পারে—যার ফলে ছবিগুলি আবার নতুন করে দেখার ইচ্ছে করবে। অবিস্মরণীয় 'পথের পাঁচালী'র ২৫তম বর্ষপূর্তি হিসাবে ১৯৮০ সালটি ভারতের ফিল্ম সোসাইটিগুলির দ্বারা বিশেষ মর্যাদা সহকারে পালিত হচ্ছে এই প্রেক্ষাপটে এই বৎসর এই গ্রন্থটির প্রকাশ এক তাৎপর্যমণ্ডিত ঘটনা বলে স্বীকৃত হবে বলে আমরা আশা রাখি। ভারতীয় চলচ্চিত্রের এক পবিত্র বৎসরকে আমরা উপযুক্ত কর্তব্য পালন দ্বারা চিহ্নিত করতে চাই। আশাকরি এই কাজে আমরা ক্লাব সদস্য সহ সমগ্র চলচ্চিত্রানুরাগী মানুষের সহযোগিতা পাব।

গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি আমরা প্রকাশে উদ্যোগী, তার আনুমানিক পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫০, বহু চিত্রশোভিত এবং সুদৃশ্য লাইনো হরফে ছাপান এই খণ্ডটির আনুমানিক মূল্য ২৫ টাকা। কিন্তু আমরা ঠিক করেছি চলচ্চিত্র অনুরাগী মানুষ যাঁরা অগ্রিম ২০ টাকা মূল্যের কুপন কিনবেন—তাঁদের গ্রন্থের মূল্যের শতকরা ২০ ভাগ ছাড় দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে যাঁরা উৎসাহী তাঁরা **সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটার অফিসে যোগাযোগ করুন।**

(২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৩, ফোন : ২৩-৭৯১১)

টালীগঞ্জের সেলুলয়েড বই ঃ আমাদের সকলের ভাবনা ও কর্তব্য

সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এই চরিত্রটিকে সঙ্গে নিয়ে 'নবদিগন্ত' তৈরী করেছেন। প্রসঙ্গত উপন্যাসের নাম আর এই পর্দার বুকের ছবির নামও 'নবদিগন্ত'। ক্যামেরা নিয়ে সেলুলয়েডের ফিতেতে নির্মিত দীর্ঘক্ষণ ধরে দীর্ঘপরিশ্রমে দীর্ঘ টাকা পয়সা ব্যয় করে। বস্তুতঃ তার ফলে আমরা অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে বসে কেবল দেখে গেলাম এক অবাস্তব আদিমকালের থিয়েটারের থেকেও নড়াচড়াহীন অবস্থার কিছু ছবি। আজকের নবনাট্যের সময়েও, মানে পলাশবাবু যখন এই 'নবদিগন্ত' তৈরী করছেন, তখন এই মঞ্চে চরিত্রগুলো নড়াচড়া করে, জোন এ্যাকটিং-এর তীব্রতায় গতি আসে। এবং এই থিয়েটার সীমাহীনতার লজ্জাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অসীম সীমাকে বুকে তুলে ব্যাপ্ত করে দিচ্ছে, কতো গভীর কতো ব্যাপক ব্যঞ্জনা। আজকের নাটকের উপস্থাপনায় প্রয়োগের চাতুর্য তার ডাগর সাহস সমস্ত বাস্তব অবস্থাকে এক সৃজনমূলক শিল্পময় আলোচনায় নিয়ে এসেছে। কিন্তু পলাশবাবুর এই 'নবদিগন্ত' ছবি ওই লিমিটেশনেই আক্রান্ত। ফিল্ম একটি মস্ত বড় শক্তিশালী মুক্ত এবং গভীর শিল্প মাধ্যম হওয়া সত্ত্বেও কোথাও এখানে দেখা গেল না কোনো তীব্রতা কোনো গতি। অবিশ্বাস্য রকমের শ্লথ ও মন্থর এই 'নবদিগন্ত' সেলুলয়েডের ফিতেতে। প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয়, এইটা কি ফিল্ম তৈরী করতে চেয়েছেন পলাশবাবু, না একটা বই তৈরী করতে চেয়েছেন ক্যামেরা নিয়ে? কোনো কিছু যদি ফিল্ম হতে হয়, মানে চলচ্চিত্র হতে হয় তার কতকগুলো নিজস্ব ব্যাপার তো আছেই—যেমন, চলচ্চিত্র মানে হচ্ছে একটি কম্পোজিট আর্ট ফর্ম। এর পাঁচটি উপাদান আছে, তা হলো, (১) সাহিত্য, (২) সঙ্গীত, (৩) অভিনয়, (৪) সময় পরিমিতি এবং (৫) ভিসুয়ালিটি। এখানে সাহিত্য কথাটির ব্যবহার অন্য অর্থে নয়। অর্থ হচ্ছে সাহিত্যে জীবন রস ভীষণভাবে ধরা থাকে। যেহেতু এই চলচ্চিত্র মাধ্যমটি জীবনের কথা বলতে চায়, বাস্তব অবস্থাকে নিয়ে সৃজনমূলক ব্যাখ্যা করতে চায় তাই এইখানে সাহিত্য এই চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে মাত্র একটি উপাদান। সামগ্রিক উপাদান বা একমাত্র উপাদান নয়। এই জীবনের কথাতেই এই মাধ্যমের মধ্যে এসে সেই জীবনকেই বিশ্লেষণ করে এক দারুণ প্রকাশ মাধ্যমে। তার মানে এই নয় যে, সব সময়েই সাহিত্য থেকেই চলচ্চিত্র তৈরী হবে। শুধুমাত্র চলচ্চিত্রের জন্যই চিত্রনাট্য তৈরী হয়েছে, তা নিয়ে একাধিক চলচ্চিত্র তৈরী হয়েছে ইতিমধ্যেই। আবার ব্রেঁসোর মত চলচ্চিত্রকাররা মোটেই চান না প্রচলিত অর্থের প্লট গঠন এবং তার শরীরকে নিয়ে চলচ্চিত্রে একটা নাটকীয় সংঘাতে নিয়ে এসে কিছু বলা, এটা ব্রেঁসো মোটেই চান না—তিনি বলেন—প্লট ব্যাপার যেটা সেটা কেবল একমাত্র ঔপন্যাসিকের একটা ট্রিকমাত্র। ব্রেঁসো এতখানি নির্দয় হয়েছেন এই ব্যাপারে যে এই প্লটের সঙ্গে সাব প্লট তৈরীর ব্যাপারও তিনি জীর্ণ বস্ত্রের মতোই পরিত্যাগ করেছেন। বস্তুতঃ ব্রেঁসোর চলচ্চিত্র সমস্ত নাটকীয়তা পরিত্যাগ করে কোনো প্রচলিত অর্থের চূড়ান্ত ক্লাইমেক্স না গড়ে দিয়েও এক মহান জীবনের সম্পদে চলচ্চিত্রকে ভরে দিতে পারে।

বাংলা ছবির আজ দারুণ এক সংকট সময় উপস্থিত। দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে ছবি তৈরীর কারখানা সমেত ছবি তৈরীর ব্যাপারটা। এর সঙ্গে নিযুক্ত ল্যাবরেটরির অবস্থা সাংঘাতিক রকমের শোচনীয়। প্রাচীনকালের সেই বহু ব্যবহৃত ঝরঝরে যন্ত্রপাতি। সত্যজিৎ রায়ের 'শতরঞ্জ'-এ কাজ করবার জন্য একজন বিদেশী অভিনেতা আসেন, আমাদের ইনডাস্ট্রির এই সব অবস্থা আর তার যন্ত্রপাতি দেখে স্টুডিওগুলো আস্তাবলের মতো অবস্থা দেখে তিনি বিস্ময়ে বৃক্ষের মতো নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ভাবতেই পারেননি এই সব যন্ত্রপাতিতে বা এই ধরণের স্টুডিওগুলোর অবস্থার মধ্যে পৃথিবী বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাণ হয় কেমন করে। ওদের দেশে এই সব যন্ত্রপাতি এখন মিউজিয়ামে স্থান পেয়েছে। এই ইনডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত বহু শ্রমিকের আজ ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা বলতে কিছুই থাকছে না ক্রমশঃই অত্যন্ত দ্রুত কমে যাচ্ছে এবং দর্শকের সংখ্যা। বাগনান থেকে বর্দ্ধমান পর্যন্ত এই ছবির মানে এই ইনডাস্ট্রির মোটমাট বাজার। গোটা ভারতবর্ষব্যাপী এই ছবি ব্যাপক বাজার তৈরী করতে অক্ষম। কারণ, ভারতবর্ষের মাত্র অল্প সংখ্যক মানুষই এই বাংলা ভাষা বোঝেন। অতএব প্রথম ব্যাপারটাতেই আমরা অনেকখানি পিছিয়ে আসতে বাধ্য হই। এনং অবস্থায় প্রযোজকদের এই ব্যবসায় লগ্নীকৃত টাকা ফেরৎ দিতে হবে এই ছোট্ট বাজারের মধ্যে ব্যবসা করেই। আবার এই বাজারেই নানান প্রতিযোগিতা যেমন আছে, তেমনি প্রেক্ষাগৃহের স্বল্পতাও আছে মাথাপিছু মানুষের সংখ্যা হিসাবে। এই টাকা ফেরৎ না দিলে পরবর্তী ছবিতে এই প্রযোজক টাকা লগ্নী করতে আর উৎসাহ বোধ করবেন না স্বভাবতই। এদিকে আবার এই বাংলা ছবির একটি বিশেষ ইমেজ আছে সারা দেশব্যাপী। বাংলা ছবি বলতেই সকল মানুষ মোটামুটি একটি পরিচ্ছন্ন বুদ্ধিদীপ্ত ছবিকে বোঝেন। যেখানে রসতত্ত্ব এবং সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্পর্কজনিত আকর্ষণ। একটা বিশেষ মানের ছবিকেই বোঝেন। কিন্তু সামান্য রুচির জ্ঞান এবং পরিচ্ছন্নতায় জ্ঞান বিশেষ

করে পারদর্শিতার জ্ঞান যদি ছবিতে না থাকে, দর্শক যদি তার মানসিক প্রতিফলন এই ছবিতে না পায়, যা বহুদিন ধরে সে পেয়ে এসেছে, একটা ঐতিহ্য তৈরী হয়েছে, সেখানে তার অতৃপ্তির কারণ ঘটলে স্বভাবতই তারা বিরক্ত হবে। এবং ক্রমশঃ এই বিরক্ত দর্শকের সংখ্যা বাড়তেই থাকবে।

একটা কথা আমরা এই কমার্শিয়াল বাংলা ছবি দেখে বুঝি না যে সময় সত্যই বদলাচ্ছে। মানসিক গঠন মানুষের সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই অতি দ্রুত একটি বিশেষ চোখ খুলে দিচ্ছে। যেমন সত্যজিৎ রায়ের আমলে ঋত্বিক ঘটকের আমলে, মানে সেই উনিশ শো ত্রিশ বা পঁচিশ থেকে সুরু করে প্রায় পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বা ষাট অবধি হলিউডের ছবির বাইরে খুব বেশী অন্য জায়গার ছবি এখানে আসতো না। মানে আমি কলকাতার কথা বলছি, সেখানে তার বাইরে অন্য কিছু দেখবার সুযোগ ছিলো না, কিন্তু এখন সময় পালটাচ্ছে। এখন আমরা বহু দেশের ছবি এই কলকাতাতেই ফিল্ম সোসাইটির সভ্য হয়েও যেমন দেখি, তেমনিই সম্পূর্ণ কমার্শিয়াল বাজারে খোলাখুলি বহু দেশের ছবি দেখি। তখন ফিল্ম সংক্রান্ত আলাপ আলোচনাও এত তীব্র ছিলো না এখনকার মতো। কিন্তু এখন একটা আলোচনার সময় হয়েছে—যা মোটামুটি সুস্থ ও ব্যাপক। এর ফলেই মানুষ অনেক কিছু বুঝতে পারছে, ধরতে পারছে। নিউ থিয়েটার্স-এর যুগের দর্শক এখনো খুব অল্পসংখ্যক নয় অনেকসংখ্যকই বেঁচে আছেন। যদিও তাঁরা বয়সের ভারে জীর্ণ, তবুও তাঁদের কাছ থেকে অবিরাম গল্প কথা শুনে আমরা বাংলা ছবির প্রতি একটি বিশেষ মনোভঙ্গী তৈরী করেই নিয়েছি। (আর কেনা জানে পুরানো জিনিষের প্রতি আমাদের মমতা কী অসীম!)। মানে এই কমার্শিয়াল ছবির বিষয়ে। সত্যজিৎ বাবুদের জগৎ এখানে এক সঙ্গে আমরা দেখিনা। যেমন দেখিনা শম্ভু মিত্রের থিয়েটারের সঙ্গে রাসবিহারী সরকারের বা মহেন্দ্র গুপ্তের থিয়েটার একসঙ্গে। যেমন দেখিনা বাদল সরকারের নাটকের সঙ্গে কিম্বা মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের সঙ্গে ক্ষীরোদ প্রসাদের নাটকের বা অমৃতলাল বসুর নাটকের। এরই ফাঁকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি ও সমাজনীতি, অর্থনীতি নানাভাবে বদলে বদলে একটা কিম্ভুত কিমাকার স্থানে এসে পৌঁছেছে। জীবনের নানান যাত্রাপথ গোলক ধাঁধার পথ নিচ্ছে। এর থেকে মানুষ বহু ভাবে নিজেকে শিক্ষিত করতে পারছে। তাই আজকে আর মিছিল করে আর বড়ো মিটিং করে রাজনৈতিক দলে ভোট দেবার প্রবণতা জাগানো যায় না, মানুষ নিজেই বুঝে নিয়ে সমগ্র ব্যাপারটা ভেবে নেয় সে প্রকৃত কী করবে। এবং তাই সে কাজে করেও, কোনো মিটিং আর মিছিলের বা অন্যান্য প্রচারের দ্বারা তাকে আর প্রভাবান্বিত করা যায় না। একটা কথা আমরা কিছুতেই বুঝি না এই পশ্চিমবাংলার মানুষ যে কোনো জায়গার মানুষের চাইতে অনেক বেশী রাজনীতি সচেতন এরা অনেক বেশী কথা কম সময়ের মধ্যে অত্যন্ত গভীরভাবে বুঝে নেন: এই গভীরতা তাদের সর্বত্র। শিল্প, সংস্কৃতিতেও, তাই চট করে বাজীমাৎ করে তাদের কাছ থেকে বেরিয়ে যাওয়া যাবে তা হবার নয়। এরাই যদি দিনের পর দিন বাংলার টালীগঞ্জ থেকে নির্মিত সেলুলয়েড থেকে আঘাত পান মানসিকতায়, তাদের ন্যূনতম চেতনার যদি এই সেলুলয়েড আঁচড় কাটতে না পারে, তা হলে তারা নিশ্চয় বিরক্ত হবেন। আর এই জন্যই আমরা অনেক দিন আগেই দেখেছি সত্যজিৎ রায়ের মহান চলচ্চিত্র 'পথের পাঁচালি'ও পয়সা তুলতে অক্ষম হয়েছে প্রথমে। তার কারণ, ওই একটাই। দর্শক বাজে ছবি নির্বোধ ছবি দেখে বিরক্ত হয়েই কোনো আকর্ষণ বোধ করেনি 'পথের পাঁচালির' মতো মহান চলচ্চিত্রে। সেই দুঃখ লজ্জা আমাদের সকলের, আর এখনও এই জিনিষ চলেই যাচ্ছে। এই অবস্থার বলি হয়ে যান ঋত্বিক ঘটক। 'বাবা তারকনাথ' কিম্বা 'সুনয়নী' যে হারে দর্শক দেখে, দেখেনা সেই হারে 'দৌড়' কিম্বা 'পরাজিত নায়ক' বা 'যদুবংশ'। 'মালঞ্চ'র মতো ছবি করবার জন্য এই জনসাধারণের কাছেই পূর্ণেন্দু পত্রীকে ভিক্ষার ঝুলি পাততে হয়। মৃণাল সেন ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নিয়ে চলবার চেষ্টা করেন, হালে পানি না পেয়ে চলে যেতে হয় হিন্দী ছবি জগতে। বহু তরুণ চলচ্চিত্রকার সাংঘাতিক চিত্রনাট্য নিয়ে দিনের পর দিন ঘুরে বেড়ান পাগলের মতো, কেউ আবার পুরোপুরি বিজ্ঞাপনের ছবি তৈরীর দিকে চলে যান।

অথচ টালীগঞ্জ বসে নেই, ছবি নামক বই তৈরী হয়েই যাচ্ছে আর দর্শক ভাগাচ্ছে বাংলা ছবির জগৎ থেকে। প্রসঙ্গত লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যখন হিন্দী ছবির রিলিজে রগড় বানানো নায়ক-নায়িকা বা সঙ্গীতকার নেই যা দর্শক চায়, তা নেই, ঠিক তখনকার রিলিজ বাংলা ছবি মোটামুটি চলে বা হিট্‌ও করে যায়। এই অবস্থায় যদি কোনো বাংলা সেলুলয়েড বই যদি সুবর্ণ জয়ন্তী সপ্তাহ পার করে, তখন সেই আনন্দ অথবা কীর্তি কলকাতা স্টেট বাস করপোরেশনের লাভ হবার মতোই বড়ো করে কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার মতোই হয়ে দাঁড়ায়। আবার এও আমরা দেখেছি বহু টাকা ব্যয়ে এবং ভারত এবং আমেরিকার যুগ্মভাবে প্রযোজিত 'শালিমার'-এর মতো হিন্দী ছবি কলকাতায় পাত্তা না পেয়ে গুটিয়ে নেয় অথচ এই 'শালিমার'-এর মধ্যে কি যে ছিলো না পয়সা তোলার উপকরণ সেইটাই ভাববার। রগরগে সব উপকরণের বড় আকারই সেখানে উপস্থিত থেকেও তাকে পাল গুটিয়ে সরতে হয়েছে। এইগুলো নিয়ে ভাবা প্রয়োজন। কেন হয় এইরকম। এইসব নিয়ে ভাবতে পারলেই সমস্যার উৎসে যাওয়া যাবে। এই ভাবনাতেই বোঝা যাবে কেন গ্রুপ থিয়েটারের নাটক বারবার হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। আর এই সুযোগই ব্যবসায়িক থিয়েটার নামক ন্যাকারজনক বেনিয়া বুদ্ধির নাটক একরকম পদার্থ শতশত রজনী অবলীলায় পার হয়ে যায়। কেন 'এক্ষণ' পত্রিকার

প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে যেতে থাকে। অনিয়মিত প্রকাশই নিয়মিত হয়ে দাঁড়ায়। কেন 'এক্ষণ'-এর সম্পাদককে লিখতে হয় বর্তমানে গ্রাহক করা বন্ধ। কারণ, পত্রিকা কখন এবং কবে প্রকাশ হবে, বছরে কটা সংখ্যা প্রকাশ হবে বা আদৌ প্রকাশ হবে কিনা তার ভাগ্য জানতে হলে ফুটপাতে জ্যোতিষীরই হাতের কর মেলাতে হবে। কেন 'চিত্রবীক্ষণ'-এর মতো চলচ্চিত্রের গভীর ভাবনার পত্রিকা বারবার হোঁচট খায়। 'চিত্রধ্বনি' নামক চলচ্চিত্রের ত্রৈমাসিক পত্রিকা লিখেই দেয় তার দ্বিতীয় সংখ্যায়—'চিত্রধ্বনি' অনিয়মিত হবে বলাই বাহুল্য, পরবর্তী সংখ্যা বেরুবে কি-না ভবিষ্যতই বলতে পারে'। কেন 'পরিচয়' পত্রিকার স্বাস্থ্য দিন দিন শীর্ণ হয়। বহু লিটল ম্যাগাজিন সমৃদ্ধতর ভাবনায় প্রকাশ হয়েই দুদিনেই মৃত্যুর চাদর বুকে জড়িয়ে নেয়। শীর্ণ থেকে আরও শীর্ণ হবার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান পেয়ে যায় কেন বহু লিটল ম্যাগাজিন। আর বিপরীতে স্থূলকায় থেকে আরও স্থূলকায় হয়ে নানান বর্ণে নিজেকে সাজায় 'আনন্দলোক', 'ঘরোয়া', 'উল্টোরথ' 'নবকল্লোল-'এর মতো কাগজ। যে নির্ভরতায় একটা 'পরিবর্তন'-এর মতো একেবারেই জোলো পত্রিকা বার হতে পারে, এই অসীম কাগজের দুর্মূল্যতার সময়ে, ঠিক সেই স্থির নির্ভরতায় আজ এই অবস্থায় একটা 'চিত্রবীক্ষণ' বা 'চিত্রধ্বনি', 'মুভিমনতাজ', বা 'গ্রুপ থিয়েটার' বার হতে পারে না!

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আসামীরূপে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে, বিশ্রী একধরণের মেক আপ এবং তার ততোধিক কুশ্রী দাড়ি। বয়স্ক নায়ককে বয়সের দিক থেকে কমিয়ে আনবার জন্য চড়া মেকআপ সর্বত্র লক্ষিত। আমরা জানি আন্তর্জাতিকভাবে বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার ইংগমার বেয়ারিম্যান পছন্দ করেন অনেক বেশী পরিমাণে তাঁর চলচ্চিত্রে অভিনেতারা চড়া মেক-আপ নিক। কিন্তু তার পেছনে তাঁর এক প্রচণ্ড যুক্তি যেমন আছে তেমনিই আছে তাঁর কাজ চলচ্চিত্রেও সেই সাংঘাতিক যুক্তির তীব্র প্রতিফলন যা আমরা দেখে যাচ্ছি। পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কল্পনায় হরিচরণের এই মেক-আপ-এর কোনো বিন্দুমাত্র যুক্তিও কিছু নেই যেমন, তার উদাহরণও কিছু নেই। তার উদাহরণ পাওয়া যায় পাড়ায় অল্পবয়স্করা অপরিণত মানসিকতার চেতনায় মাঝে মাঝে মাঠে মাঁচা বেঁধে যে থিয়েটার নামক খেলা করে, তাতেই। একটি কোর্টের দৃশ্য নিয়ে এই 'নবদিগন্ত' সেললুয়েড 'বইটি' সুরু (ফিল্ম বলতে কলমে বাধছে, লজ্জা হচ্ছে।)। উত্তমকুমার, সেই বিখ্যাত রূপকথার মানুষটি, যিনি আমাদের মা-বোনদের দুপুরের ভাত-ঘুম কেড়ে নিয়ে তাদের দেহে অথবা মেদ জমে যেতে দেননি, সেই সাত রাজার ধন উত্তমকুমার এই হরিচরণের ভূমিকায় ওই কুশ্রী মেকআপ নিয়েই পর্দায় প্রতিফলিত। থুড়ি—, এখন তিনি হ্যারি ব্যাণ্ডোর ভূমিকায় থেকে বলে চলেছেন কেন তিনি আত্মহত্যা করতে চেয়েছেন, কি তাঁর জ্বালা, কি তাঁর যন্ত্রণা, কি তাঁর বক্তব্য (কিছু আছে নাকি?), কি তিনি চান—(বস্তুত তাঁর চাওয়ার মতো গভীর কিছুই নেই।) এই সমাজে, এই সব ভ্যানতাড়ার ভেলপুরী বলেই চলেন,—বলেই চলেন অবিরাম বক্‌বক্ করে। মাঝে মাঝে পিছনে ফিরে যাওয়ার চেষ্টায় ঘটনা তাঁর বক্‌বক্‌কে অনুসরণ করে,—যেকথা বহু ঘটনায় (এগুলো কি কোনো ঘটনা?) সম্বলিত কাহিনী ব্যাণ্ডো বলে চলেছেন বিচারককে। (এই রকম ব্যবস্থা বোধহয় একমাত্র এই সব বিচারকের সামনে এই সব কোর্টেই হয়।) অবিচল ভাবে ক্যামেরা যেমন এই ব্যাণ্ডোকে ধরে একই ফোকাসে, আবার সেই অবিচল ভাবেই ক্যামেরা সেই পিছনের কাহিনীর একটা ছবি ক্লিক্-থ্রি ক্যামেরায় তোলা বাড়ীর বিয়ে উপনয়নের ছবির মতোই বলে চলে। আমরাও বাড়ীর এ্যালবাম্ খোলার স্মৃতি নিয়ে থাকি ওই অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে বসে। অবিশ্বাস্য অবস্থায় অবাস্তব চড়া সেন্টিমেনটের আরকে ভেজানো এক আজগুবি গল্পের ঘটনা চোখের সামনে ফুটে ওঠে, তার না আছে একটা মোটামুটি সুচারু কাহিনী বিন্যাসের ঢং, না আছে তার চরিত্র গঠনের ব্যক্তিত্ব। বোধহয় এর চাইতে অনেক বেশী একটা সুচারু রূপ পাওয়া যায় বাড়ীর সামান্য এ্যালবামে, অনেক বেশী বাস্তব রূপ। 'নবদিগন্ত' সেলুলয়েডে না আছে সমাজগত ব্যাপার, না আছে তার অর্থনৈতিক ব্যাপার। সমস্ত ব্যাপারটায় কেবল ঘটনাগুলো সাজানো অবস্থায় জীবনহীন সমাজহীন বায়ুশূন্য থেকে নিরালম্বহীন হয়ে ঝুলে থাকে, বা ঘটে যায়। সত্যি এ এক অবিশ্বাস্য আশ্চর্যরকম স্থিরতায় চিত্র-চিত্র খেলা। ক্যামেরার স্থিরতা নিয়েও কী আশ্চর্য্য রকমের প্রকৃত ফিল্ম গড়া যায়, জীবনের গভীরতম কী স্পন্দন গাঁথা যায় সেলুলয়েডের বুকে তার নিদর্শন আশ্চর্য্যরকম চলচ্চিত্রকার ওজুতে। ওজুর এই শিল্পকর্ম যেন গোটের ভাষায় গলা মিলিয়ে বলতে ইচ্ছে করবে—একটি মহান স্থাপত্য অথচ জমাট বাঁধা সঙ্গীত। 'নবদিগন্ত' বইতে পলাশবাবু সেলুলয়েডে গাঁথতে গিয়ে একবারও বিন্দুমাত্র ভাবেননি ছবিটি দর্শকের কাছে বিশ্বাস্য এবং যোগ্য করে তুলতে হলে একটা সময়সীমা দরকার। কোন সময়ের ঘটনা এই 'নবদিগন্ত'? কোন সময়ের এই বইয়ের চরিত্রগুলো? কোন বিশেষ সমাজ ব্যবস্থায় কষ্টকর অবস্থায় হরিচরণ এই রকম যন্ত্রণা ভোগ করে, তার বিশ্বাসযোগ্য কোনো সামান্য ইঙ্গিত নেই এই সেলুলয়েডের বইতে। এ এক আশ্চর্য্য রকমের ব্যাপার। কলকাতার রাস্তায় একটা গাড়ী নেই, ঘোড়া নেই, মানুষ নেই কেবল হরিচরণ ছাড়া,—অথচ আধুনিক বাড়ী আছে—হরিচরণ সেই পরিত্যক্ত মানুষের নগরী কোলকাতা দিয়ে পায়ে হেঁটে চলে আর চলে। ঘোড়ার জল খাবার চৌবাচ্চা থেকে জল নিয়ে মুখ-চোখে দেয়। এই ঘোড়ার জল খাবার চৌবাচ্চা এখনও কোলকাতার বুকে যত্রতত্র অবস্থান করছে আর তার থেকে জল নিয়ে ভবঘুরেরা ব্যবহার করছে, অথবা রিক্সাওয়ালা, ট্যাক্সিওয়ালা সেই জল নিয়ে গাড়ীও ধুচ্ছে এ্যাম্বাসাডার মার্ক থ্রি! এটা কোন সময়ের মানে কোন শতাব্দীর কলকাতা পলাশবাবু? জব চার্ণকের আগের? তারও পাঁচ হাজার বছর আগের শহর অথচ কলকাতা!

উপন্যাস থেকে নিয়ে সিনেমা তৈরীর ব্যাপারটা ভালোই। সাহিত্য শ্রীমণ্ডিত রুচিসম্মত সিনেমার গুরুত্বপূর্ণ কর্মটি ইতিমধ্যেই আমরা বাংলা ছবির এই ভাঙ্গা হাটেই এই টালীগঞ্জের থেকেই নির্মিত হতে দেখেছি প্রবীণদের মাঝেও এবং নবীনদের মাঝেও। চলচ্চিত্রের মূল শিকড় সাহিত্যের কাছে দাসত্ব গ্রহণ করবে কি করবে না, এই প্রশ্ন অবান্তর আসল কথা হলো ফিল্ম তৈরীর মালমশলা তার গভীর চরিত্রের অথবা জীবনের এলিমেণ্ট সেই কাহিনী থেকে পাওয়া যাচ্ছে কি না, তার স্পন্দ-ছন্দ দোলা লাগাচ্ছে কি-না একজন চলচ্চিত্র ভাষা জানা চলচ্চিত্র-কারকে। ছবির ভাষায় ধরা দেবে কিনা একটা অন্যতর যাত্রা ব্যঞ্জনা। এই ব্যঞ্জনার জন্যই, এই মাত্রার অন্যতর ক্ষেত্রের জন্যই একটি বহু পঠিত গল্প একজন পাঠক আবার দেখবার জন্যই প্রেক্ষাগৃহে এসে বসে টিকিট কিনে। এইটির সঙ্গে একমাত্র তুলনা বলে বোধ হয় সেই কথাটির যেমন সব কবিতাই শেষ পর্য্যন্ত গান হতে চায় এই ধ্বনি বৈচিত্র্য এই সঙ্গীতময়তাই হলো দর্শকের কাছে একটা ভীষণ অনুভূতির অনুভব, যা তাকে শেষ পর্য্যন্ত মূল ধরে নাড়া দিতে সক্ষম।

এখানে সব থেকে বড় কথা হয়ে দাঁড়ায় শিকড়ের এই ডানায় ফিল্মের নিজস্ব মেজাজে নিজস্ব চরিত্র গঠনে ব্যক্তিত্বেই লীন হয়ে যাবে কি না সেই কাহিনী, গল্প বা উপন্যাস যেভাবে পাতার পর পাতা কালি কলম দিয়ে একজন লেখক বয়ে নিয়ে যান, একজন ফিল্ম-মেকার যেভাবে ফিল্মকে বয়ে নিয়ে যান ক্যামেরায় চোখ দিয়ে। এই ক্যামেরার নিজস্ব চরিত্র বা তার গঠন এই কলমের চাইতে অনেক বেশী মাত্রায় জোরালো। ভের্টভের ভাষায়—দি ক্যামেরা ইজ দ্য সিনে-আই.—যেটাকে তিনি মনে করেছেন মানুষের বা এই কলমের চাইতে অনেক বেশী বাস্তব চোখ দিয়েই জন্মলাভ করেছে, ফলতঃ সে অনেক বেশী দেখতে ও দেখাতে সক্ষম। উপন্যাস বা গল্পের নিজস্ব একটা পরিমণ্ডল আছে সেখানে তার একটা নিজস্ব ছন্দ আছে, ভাষা আছে, ব্যাকরণ আছে যেহেতু ভাষা আছে বলেই। এইটি তার একেবারেই নিজস্ব ব্যাপার। যে ব্যাপারের সঙ্গে অন্য মাধ্যমের নিজস্ব মেজাজের ব্যাপার মিলতে কখনও পারেনা। এটা হয় না। হতে পারে না কিছুতেই। এটা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। অন্য একটা মাধ্যমের মধ্যে ফলতঃ এই গল্পকে বলতে গেলে, না—বলা ভালো বাঁধতে গেলে সেই ভাষায় সেই মাধ্যমের, সেই ব্যাকরণের মধ্যে আত্মসমর্পণ করেই সেই ভাষাকে রক্ষা করতে হয়। আর সেটা না পারলে বা না করলে অবিশ্বাস্য রকমের আজগুবি ব্যাপার স্যাপার হবেই, হোঁচট খেতে হবেই—এ কেউ বাঁচাতে পারবে না,—এটাতো সহজ কথা শরৎকালের শিউলি ফুলের মতো, অতএব কিছু স্বাধীনতা ভোগ করার কথা তার অধিকারের কথা ফিল্ম-মেকার নিয়েই যাচ্ছেন সেখানে। এই গল্পটির মূল বক্তব্য একজন ফিল্ম মেকারকে ভাবিয়েছে, তাঁর, মনে হয়েছে এই বক্তব্য একই সঙ্গে লক্ষ সহস্র মানুষকে একই সঙ্গে দেখিয়ে কমৃপ্লিট মোচড় দেওয়া প্রয়োজন। আরও বৃহত্তর বড় জায়গায় নিয়ে যাওয়া দরকার। এই স্বাধীনতায় ফিল্ম-মেকারের মন্তব্য মতবাদ তার প্রতিবাদ একটা শারীরিক গঠন নিয়ে দাঁড়ায়। এখানে সাহিত্যিকের সঙ্গে তার মিলতে নাও পারে তার মন্তব্য তার প্রতিবাদ তার মতামতের কাঠিন্য। এই শারীরিক গঠনের মধ্যে ফিল্ম-মেকার মানুষকে মানে ওই বৃহত্তর মানুষকে বোঝানোর প্রয়োজন অনুভব করেন কি ভীষণ এক কষ্টকর পরিবেশের অবস্থার জন্য মানুষ তার ব্যক্তিত্ব নিয়েও স্বধর্মে স্বকর্মে নিয়োজিত বা সম্পৃক্ত থাকতে পারছেনা। বাস্তব অবস্থাকে এইখানে বিশ্লেষণ করা, দর্শককে তীব্রভাবে বোঝানো কি ভীষণ এক অবস্থায় সে আজ দাস—এবং নতজানু, সংবেদনশীল মন নিয়ে সৃজনমূলক আলোচনার মধ্যে বাস্তব অবস্থাকে তার ব্যবস্থাকে ভীষণভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করে দেখানো। বাস্তব অবস্থাকে যতোক্ষণ পর্য্যন্ত একটা পার্স-পেকটিভে দাঁড় করাতে গভীরভাবে না পারছে, কিছুই হয়ে উঠছে না বস্তুতঃ। যা সে বলতে চাইছে তখনই হয়ে যাবে এলোমেলো-বিচ্ছিন্ন, শিকড়হীন এক অন্ধকার অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়বে। এই পার্সপেকটিভেই দর্শক বুঝে নেবে তার সংগ্রামের তার জয়ের কথা আবার তার ব্যর্থতা আছে সেটাও সে বুঝে নেবে বিপরীতে। এইটা করতে গেলে যে তাকে কোনো বিশেষ পার্টির কথা বলতেই হবে এমন কেউ মাথার দিব্যি দেয়নি, বা কোনো বিশেষ সিদ্ধান্তেই যে তাকে আসতে হবে এমনও কেউ প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয়নি তাকে। কেবল শিল্পীর হৃদয়ের মধ্যে সেই অনুভবের মধ্যে থেকে বাস্তব অবস্থাকে সৃজনমূলক আলোচনায় বা বিশ্লেষণে নিয়ে এলেই তার কাজ শেষ, বাকীটা দর্শকের। এবং ওই নিয়ে যারা লেখেন আলোচনা করে বোঝান মানুষকে, বাকীটা তাদের। ওইটা বোঝাতে গেলেই একটি দৃশ্যময়তার মাধ্যমে তার নিপুণ ছন্দে গাঁথতে গেলে তার মধ্যে অবশ্যই বাস্তব সমীকরণের প্রয়োজন হচ্ছেই হচ্ছে। বাস্তবের পরিবেশটিকে অত্যন্ত তীব্রভাবে মানুষের জীবন যাত্রার প্রবাহ না ধরতে পারলে ওই আসল অর্থাৎ বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থেকে যে সময়কে ধরবার চেষ্টা এবং তার উত্তরণের চেষ্টা হচ্ছে তাকেই নিখুঁতভাবে পাওয়া যাবে না। এবং এর সঙ্গেই যুক্ত হয়ে যাবে ক্রমশঃ বিস্তারিতভাবের ছন্দের জীবনযাত্রার দৈনন্দিন বাস্তব-অবাস্তব শব্দের সমাহার। আমরা এই প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসেবে আনতে পারি প্রয়াত ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' চলচ্চিত্রটিকে। এই চলচ্চিত্রের কাহিনী অংশ নেওয়া হয়েছে তৎকালীন 'উল্টোরথ' পত্রিকায় প্রকাশিত শক্তিপদ রাজগুরুর 'চেনা মুখ' নামক একটি অত্যন্ত অবাস্তব ও জোলো গল্প থেকে, যেখানে বুদ্ধির আর যুক্তির কোনো অংশই নেই। চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটক কিন্তু কাহিনীর সার বস্তুতে মুগ্ধ হয়ে যান। বুঝতে পারেন এই সারবস্তু কেবল সেলুলয়েডে বাঁধা পড়তে অপেক্ষা করছে তীব্র আকুলতায়। বুঝে নেন গোটা দেশের একটা পচন একটা অবক্ষয় আবার তার উত্তরণ এই সারবস্তুকে নিয়ে সেলুলয়েড বলতে পারবে বৃহত্তর মানুষের কাছে, যা শেষ পর্য্যন্ত তাকে

বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে মহৎ সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দেবে তীব্র আঘাতে। ক্যামেরা তার সিনে আই নিয়ে প্রবেশ করে যায় অবলীলায় নির্মল ভালোবাসায় আবার সেই জীবনযাত্রার বিস্তারিত ভাবের ছন্দে, জীবন যাত্রার দৈনন্দিনতার বাস্তব-অবাস্তব শব্দের সমাহারে। ক্রমশঃ ছবি দানা বাঁধতে থাকে জীবনের দারুণ টগবগে রক্তস্রোতে। ভাত ফোটার মতো অতি সামান্য এবং শ্রুত শব্দও শেষ পর্যন্ত অসীম আকুলতায় এই চলচ্চিত্রে মানুষকে বোঝায় তার স্বধর্মের কথা-তার স্বকর্মের কথা। এই ছবিটিকে নিয়েই আমরা বুঝতে পারি শিল্পে সমাজতত্ত্বের মতো আবশ্যিক প্রসঙ্গটা কোনো রকম জোর-জার চেষ্টা-কষ্ট করে আনতে হয় না। চরিত্রগুলোকে নির্দিষ্ট সময়ের দেশ-কালের মধ্যে ফেলে বলতে পারলে সঙ্গে সঙ্গেই সমাজতত্ত্বটা আপনা আপনি এসে যায়।

এই 'নবদিগন্ত' ছবিতে পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেলুলয়েডে এর কিছুমাত্র কিছুই নেই। তিনি কিছুতেই বোঝাতে পারলেন না হরিচরন বন্দ্যোপাধ্যায় ছারি ব্যাণ্ডোর জীবনের চূড়ান্ত রূপান্তর এবং উভয় ক্ষেত্রেই তার জীবনযাত্রার বিশ্বাসযোগ্য রূপ। তৎকালীন (কোনো কালকে বা সময়কে যদি ধরেই নেওয়া যায় জোর করে) মানুষের পুরোনো মূল্যবোধের মৃত্যু ঘটেছে, কিভাবে সে দাস হচ্ছে ক্রমশঃ একটা কুশ্রী কুৎসিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে, একটা রাজনীতির একটা অর্থনীতির চূড়ান্ত অসহায় অবস্থায়। যেখানে ব্যক্তির আত্মবিকাশের সকল পথ রুদ্ধ, মনুষ্যত্বের শোচনীয় দুর্গতি ও তার নিষ্করুণ অপচয় যেখানে অনিবার্যতা লাভ করতে চায়। গল্পটির মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু সেখানে মোটামুটি পৌছতে পেরেছেন, (যদিও আমার অন্ততঃ মনে হয় এই 'নবদিগন্ত'-এ উচ্চতর সাহিত্যমূল্য নেই কিছু, যেমন তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা', 'সন্দীপন পাঠশালা' উপন্যাসে আছে।) কিন্তু তবুও এই যে মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য স্থানে তিনি আনতে পারেন পাঠককে, এইটাই বড় কথা। একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের চিন্তাধারার স্রোত বয়ে তিনি বলতে পেরেছেন কিছুটা মূল্যবোধের মৃত্যুর কথা। মোটামুটি যুক্তির ধারে ও ভারে গল্পের মেজাজে তিনি বলতে পেরেছেন মানুষ কি করে তার গভীর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়, কি করে তার আত্মহত্যা ঘটে যায় নরবে স্রোতহীন অবস্থায়। একটা গ্রামীন ব্যাকগ্রাউণ্ড কিভাবে গল্পের মেজাজে আসছে তাও দেখবার মতো তারাশঙ্করে। এবং শুধু তাই নয়, গ্রাম্য মানুষের সঙ্গে এই চরিত্রের যোগাযোগ, এইসব নিখুঁত একেবারে না হলেও বেশ কিছুটা স্পষ্টভাব আছে। অসহায় পরাজিত ভাবটি হরিচরনের গল্পে ভীষণ ভালো ভাবে ফুটে উঠেছে তারাশঙ্করে—যে অবস্থায় এসে সে নিজেকেও নিজে ঘৃণা করতে পারে। পলাশবাবুর সেলুলয়েড কর্মে এই সব কথা বিন্দু-মাত্র আসেনা। তিনি ভাবতেই পারেননি তিনি কলম নয়, ক্যামেরা দিয়ে জ্যান্ত কিছু মানুষ নিয়ে জ্যান্ত মানুষের সামনেই এই ছবিটাকে রাখবেন। এমন একটাও দৃশ্য পলাশবাবুর ছবিতে নেই যা বিন্দুমাত্র পরিচালককে বা চিত্রনাট্যকারকে নিষ্ঠাবান একজন চলচ্চিত্র প্রেমী বলতে উৎসাহী করবে। এমন একটা দৃশ্য নেই যার ফাঁক-ফোঁক দিয়েও নির্ভেজাল না হোক অন্তত কিছুটা গ্রামীন ব্যাক গ্রাউণ্ডের পটভূমি বিশ্বাসযোগ্য রূপ নিতে পেরেছে। এমন একটাও চরিত্র নেই, এমন একটাও ঘটনা নেই যেখানে এই সেলুলয়েডে গ্রাম্য মানুষের জীবনযাত্রার কিছু কথা অন্তত এসে পড়েছে। একটাও শব্দ নেই—যেখানে একটাও পাখীর শব্দ না হোক (অন্তত মনে করছি পলাশবাবুর স্যুটিং এর সময় সব গ্রামীন পাখীরা ছুটি কাটাতে গেছে দূর দেশে।) একটা কাক কি ডাকতে পারতো না। গৃহস্থের আঙিনায় কাক এসে বসেও না এমনি কোনো গ্রাম আছে কি বাংলাদেশে? একটাও গরু ছাগল বা চাষী কেউই যায় না, আসেনা। গ্রাম্য পরিবেশে কি আজকাল আর কোনো গরু বা পাখী বা কাক ডাকেও না, বা উড়েও যায় না? ঠিক এই জন্যই ওই রকম একটা ব্যাপারের জন্য ওই হরিচরনের বড় মেয়ে তারা বাবাকে তার বিয়ের পণ টাকার যোগাড় না করতে দেখে, বাবার অপমানকর লজ্জাকর অবস্থায় নিজেকে দায়ী হিসেবে ভেবে (যদি এরকম ভাবনা কষ্ট করে আমরা ভেবেই নিই তবে।) অসহায় হরিচরনের সঙ্গে যন্ত্রণাকাতর হতে পারে না দর্শক। কারণ গোটা পরিবেশটিকে ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত অবহেলায় দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। চরিত্রটিকে নিয়ে পরিবেশটিকে গড়া হয়নি। এবং সামগ্রিকভাবে এই সেলুলয়েড একটা স্ট্রাকচার এবং তাও ডেভেলাপমেন্ট এবং তার স্রোত গড়তে অক্ষম হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই, তা দর্শক বুঝে নিয়েছে। আজকের দর্শক জানে আধুনিক মানসিকতায় যে শিল্পকর্ম গড়ে ওঠে তা বস্তুনিষ্ঠ, নির্মম, স্পষ্ট। তা অবশ্যই মানুষের সমগ্র সত্তাটিকে অনাবৃত করে তুলে ধরতে চায়। সমাজের অবস্থাটা আর ওই গ্রাম্য পরিবেশ, তা পরিষ্কার স্পষ্ট আকারে ধাপে ধাপে সেলুলয়েডে গাঁথার প্রয়োজন ছিলো। তবেই যে কথাটা যে বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আদায় করতে চাওয়া হচ্ছে, সেটা গিয়ে আঘাত করতে সক্ষম হতো। এবং তা হলেই তার সঙ্গে দর্শক ইনভলভড্ হয়ে যেতোই, সেই বক্তব্য থেকে একটা প্রতিবাদ ফুটে বেরুত। (সত্যজিৎ রায়ের 'জন অরণ্য' ছবিতে সোমনাথ মিডলম্যান হবেই, এটা গোড়া থেকে অত্যন্ত সুচারুভাবে ধাপে ধাপে গড়া হয়েছে। পরীক্ষার হলে তার হাত দিয়েই পার্শ্ববর্তী পরীক্ষার্থীর টোকার 'চোথা' চলে যায়, তার বাড়ীর পরিবেশ, সবকিছু মিলেমিশে একদম শেষে সে যখন সত্যিকারের মিডল ম্যান দালাল হলো, তা বিশ্বাস্য রূপ নিতে সহজেই সক্ষম হলো, তার সঙ্গেই জড়িয়ে গেল সমাজ-রাজনীতি অর্থনীতির মতো দারুন সব সতেজ প্রশ্ন যা দেশের ও দশের। সুকুমারের বাবা চরিত্রটি ওখানে উল্লেখযোগ্য। সামান্য নিম্নবিত্তের বিরক্তি তার মানসিকতা অকপটভাবে সেলুলয়েড গেঁথে নেয়। চাকরীর জন্য চেষ্টার সাংঘাতিক পর্যায়ে নেমেও একজন তরুণ শিক্ষিত যুবক, কর্মঠ যুবক যে পরিবেশে চাকরী পায় না, নির্ভরতা পায়না ভবিষ্যতের, যেখানে সামান্য ট্যাক্সি ড্রাইভার হতে হয়, যেখানে বন্ধুর বোনকে টোপ হিসেবে ব্যবহার হতে দেখেও সোমনাথ শিক্ষিত

হৃদয়ে সব মেনে নিয়ে অর্ডারটা নিয়ে নেয়। কতো অসীম বিশ্বাস নিয়ে, কতো গভীর আন্তরিকতায় নিখুঁত চোখ আর অনুভূতি নিয়ে একটা দেশের —পোড়া দেশের, গোটা ব্যাকগ্রাউণ্ড ধরে থাকে 'জন অরণ্য' ফিল্মটি যা উপন্যাসের মধ্যে শঙ্কর সাহিত্যিক হিসেবে বলতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই পারলেন চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় এই ক্যামেরায়, এই সেলুলয়েডে, এই কলকাতার টালীগঞ্জেই।) পলাশবাবুর ওই ব্যর্থতার পথ বেয়েই হরিচরনের বড় মেয়ের গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করার তীব্র গনগনে এক ঘটনা তার আবেগ নিয়েও দর্শকের কাছে সামান্য তরঙ্গ তুলতে অক্ষম হয়ে গেল। কারণ বহু আগের থেকেই অবিশ্বাস্য রকমের নড়বড়ে কাহিনী এলোমেলো চিন্তা স্থবির ক্যামেরার মধ্যে দর্শক বাসা বেঁধে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, যার জন্যই দর্শক এখন আর কিছুই বোধশক্তিতে আনতে পারে না। অথচ এই ব্যাপারটিকেই ঠিক মত করে গুছিয়ে বলতে পারলে, একটা তীব্র আবেদন রাখা যেতই, ড্রামাটিক হাইলাইটসকে বাড়িয়ে নিয়েও দরকার মতো মর্মস্পর্শী করা যেতো। তাতেই ফিজিওলজিক্যাল আর ড্রামাটিক এ্যানালিসিস করেও ঠিক জায়গায় যাওয়া যেত।

গল্পের মধ্যেই এর উপাদান ছিল। মানে, সমাজ ব্যবস্থার কুশ্রীতার রূপটা নিয়ে কিছু বলব তা হচ্ছে পলাশবাবুর 'নবদিগন্ত'-এ দেখেছি জমিদারের কাছে একদল চাষী এসেছে, চাষীর গায়ে সেই গামছা দেওয়া, এবং তা নতুন গামছা, হাঁটুর ওপর পরিষ্কার সুন্দর সাদা ধুতি পরা, চাষাগণ ওই গ্রামীন জমিদারের কাছে—গেঞ্জীপরা জমিদারের কাছে জমির নিজস্ব মালিকানা নিয়ে কথা বলতে এসেছে, জমিদার তাদের বলছে লাঠির জোর যার আছে তারই হবে জমি, আর সেই হবে জমির মালিক, জমিদার আরও বলেন, তিনি লাঠিয়াল পাঠাচ্ছেন, চাষীদের যদি লাঠির জোর থাকে তো তাদেরই হবে জমির মালিকানা। এই নতুন গামছা গায়ে দেওয়া চাষীগণ একবারও এই সেলুলয়েডের সাউণ্ড নেগেটিভে বিন্দুমাত্র কোনো শব্দ না রেখেই আগেও না পরেও না, চলে যায়। একবারও এই চাষীগণ ক্যামেরার দিকে সোজাসুজি তাকায় না। কি তাদের মানসিক ভঙ্গী হয় জমিদারের এই কথা শুনে তাও বোঝা গেল না. বুঝলো তারা, যারা পর্দার পিছনের দিকে রয়েছে। তারা পেছন ফিরে দর্শকের দিকে দাঁড়ায়, আর ওই পিছন ফিরেই চলে যায়। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হরিচরন বহুদিন পর (কতোদিন কতো বছর তা জিজ্ঞাসা করলে নিজের গালে থাপ্পড় দিতে হবে নিজেকেই।) উত্তমকুমার সেই রাত রাজার ধন এক মানিক, হয়ে ওই জমিদারের কাছে আসে— ওই ফ্রেমেই এসে তার বহুদিন আগে ফেলে রেখে যাওয়া স্ত্রীকে নিয়ে যাবার কথা জমিদারের কাছে বলে। এবং এও বলে যে জমিদার যদি তার স্ত্রীকে না নিয়ে যেতে দেয় তাকে স্বামী হিসেবে, তাহলে সে আদালতের শরণাপন্ন হবে। এবং আরও বলে হরিচরন, (না উত্তমকুমার) সে আসবার সময় থানায় একটা জরুরী ডায়েরী করে এসেছে, কারণ,তার আশঙ্কা ছিল, যদি এই জমিদার তার ওপর জোর করে হামলা বা মারধোর করে জাতীয় আর কি। সেই জন্যই অত্যন্ত চালাক লোকের মতই, আইন জানা লোকের মতই (এই চালাকি করে সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ হরিচরন আর ওই গোটা সেলুলয়েডে আর করতে পারেনি—বস্তুতঃ সে নির্বোধ থেকে নির্বোধতর হয়ে যাবার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করবার জন্য নির্বোধ হয়ে যেতে থাকে ক্রমশঃই যত এই সেলুলয়েড শেষ হতে চলেছে।) এখন কথা হলো তাহলে নিশ্চয়ই তখন একটা প্রশাসন ছিল। সেই প্রশাসনের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণভাবেই জমিদারকে মানতে হত। কারণ জমিদার এই থানার কথা শুনেই কিছু করতে পারে নি। তারপর সুমিত্রা মুখার্জী জমিদার কন্যা পায়ের কাছে এসে সব কিছু রেখে চলে আসে উত্তমকুমারের সঙ্গে জমিদারগৃহ ত্যাগ করে (ভাবা যায় উত্তমকুমারের এই বয়সের স্ত্রী কিনা সুমিত্রা মুখার্জী। এরপর যদি একটা ছবি করি এই উত্তমবাবুকে নিয়ে যেখানে পাঠশালায় অ-আ-ক-খ পড়ছেন উত্তমবাবু। তখন কিন্তু সবাইকে একসঙ্গে বৃহত্তর সংগ্রাম করে নোবেল প্রাইজের চাইতেও বড় যদি কিছু ফিল্মের পুরস্কার থাকে সেটা আমাকেই দিতে হবে, নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য অবশ্যই ছবি হবে না সেটা।) সেই প্রশাসন স্বদেশী না বিদেশী? এই প্রশ্ন আসতে পারে স্বাভাবিক ভাবেই। ১৮৯০ সাল বলে এই 'নবদিগন্ত' শুরুতেই আমাদের জানাচ্ছে। তাহলে যেখানে একজন সংস্কৃত ভাষা প্রিয় এবং অভিজ্ঞ গ্রাম্য মানুষ ভাবতে পারে (এখানে দেখানো হয়নি হরিচরন সেই রাত্রে জমিদারগৃহ ত্যাগ করার পর কোথায় ছিলো) তার নিরাপত্তার জন্য সক্রিয় থানার পুলিশ প্রশাসনকে সেখানে চাষীদের এই অপমানকর হেনস্থা, বা এই জমিদারের দোর্দণ্ড প্রতাপটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? অথচ সেই সময়টায় জমিদারের শাসনই বড় শাসন। সেখানে থানা পুলিশ কিস্যু নয়। বস্তুতঃ এইতো আমরা জানি সেই শিল্পী ই মহৎ যাঁর চরিত্রগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে সমাজতাত্ত্বিক ধাঁচে ফেলে আলাদা মন নিয়ে বসে বিচার করতে হয় না। তাঁর শিল্পের মধ্যেই সেটা চূড়ান্তভাবে প্রকাশ পায়।

বস্তুতঃ তারাশঙ্করের গল্পের মধ্যে বহু কিছু উপাদানকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতে বা দেখাতে পারলে ক্যামেরায় চোখ দিয়ে, তাহলেই চলে যাওয়া যেত কিছু মৌল সংকটের কাছে—যেখানে আছে মানুষের তীব্র লজ্জা, অসহায় জীবনযাপনের কথা, গ্রামীন অনুন্নত অবস্থার কথা। যেমন অজয়ের চরিত্রটি অনুসরণ করলে পাওয়া যেত কিছু সমকালীন প্রতিচ্ছবি। অজয়ের মুখে একটা দেশাত্মবোধক গান শুনেছি কারাগারে বন্দী অবস্থায়ে বসে। কে অজয়, কোথা থেকে এল, সে প্রকৃত কি করে, সময়টা কিরকম, এসব না জানিয়েই হঠাৎ দেখানো হল অজয় দেশাত্মবোধক গান গায় কারাগারে, আমার অন্ততঃ জানা নেই, এই রকম গান, এই রকম সুবিন্যস্ত পরিচ্ছদ পরে, এই রকমের কারাগারে কোনো-

দিন আমাদের দেশের কোনো শ্রদ্ধেয় স্বাধীনতা সংগ্রামী গেয়েছেন কি-না, এটা কি করে হয় যে অজয়ের মা অবলীলায় পুত্রের এই দেশাত্মবোধ মেনে নিচ্ছেন। এরকম ঘটনা একটাও নেই এই 'নবদিগন্ত' ছবিতে যেখানে অজয়ের মায়ের পুত্র এই ব্যাপারটায় কোনো কিছু বোধ আছে। তবুও যাই হোক, আমরা শিল্পে, মানে প্রকৃত শিল্প হলে তার মধ্যে কিছু ব্যাপার মেনে নিয়েই থাকি, এবং তা যদি সত্যি বাস্তবের বাইরের শরীরের হুবহু প্রতিরূপের সঙ্গে নাও মেলে। আমরা মেনে নিয়ে থাকি যা সে বলছে তার মধ্যে সামঞ্জস্য বা সম্পৃক্ততার চূড়ান্ত ব্যালেন্স যদি আমরা দেখি, যেখানে অন্য ধরনের একটা মাত্রা বা অন্য ধরনের একটা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছে,—তখন আমরা আপত্তি তুলিনা, কিন্তু এখানে, এক অবিশ্বাস্য দুর্বল একটি জিনিষকে তুলে ধরার চেষ্টা চলছে যুক্তিহীন অবস্থায়। অজয় আদপেই ঠিক চরিত্রগত গঠন বা ঘটনা থেকে টানটান হয়ে বেরিয়ে আসতে পারলো না কিছুতেই। এবং তাই জন্য ১৮৯০ বেরিয়ে এসে ১৯০০ সালের কি ১৯০৫ সালের (তা হলে আবার মৃণালের বয়স নিয়ে কি হবে?) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনও প্রতিষ্ঠিত হলো না। ব্যাপারটা বোঝবার আছে, অজয় একবার বলেছে, আমরা সাউণ্ড নেগেটিভ থেকে শুনেছি যে সে নিজের দেশের মাকে নিজের মা বলেছে বলেই তাকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে। অথচ এই চরিত্রটিকে ঘিরে সামান্যভাবেও সেটা ইংরেজ রাজত্ব বলা হয়নি, যেখানে একজন তরুণ ভাবে তার দেশ উদ্ধারের কথা, দেশটা স্বাধীন ছিল না পরাধীন ছিল তাও পরিষ্কার বোঝা গেলনা, অথচ এই চরিত্রটিকে ধরেই চলে যাওয়া যেত সময়ের অভ্যন্তরের শরীরে—যেখানে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক একটা তীব্র অভিজ্ঞতায় আমরা দেশের মূল ছবির একটা চালচিত্রের পটে সমস্যাটিকে বুঝতে পারতাম। এবং সেইখানেই ঢুকে পড়া যেত কৃষকদের সঙ্গে অত্যন্ত সহজভাবেই কৃষি ও ভূমি সমস্যার ওপর, তার সংকটের প্রকৃত শরীরের ওপর। এবং সেইখানেই হরিচরনের চতুস্পার্শের শিকড়হীন গভীর অন্ধকার, তার ব্যবহারিক জীবন, তার পরিপ্রেক্ষিতে তার সংস্কৃত ভাষার প্রতি সময়ের বা দেশের মধ্যে একটা অকেজো ভাব' যার দ্বারা চাকুরি পাওয়া যায় না। তার জন্যেই শিখতে হয় ইংরেজী বা বিদেশী ভাষা, শিক্ষা ব্যবস্থার শরীরটা বুঝে নেওয়া যেতো। একবারও তো দেখলাম না সংস্কৃত ভাষা প্রেমী বা পণ্ডিত হরিচরন একটাও অং-বং-জং অন্ততঃ বলেছে গোটা ছবির মধ্যে, ধুড়ি বইয়ের মধ্যে। এই পটেই হরিচরনের মতো মানুষের, স্থিতধী পণ্ডিত মানুষের ব্যক্তিত্ব তার অর্থনৈতিক বিপর্যস্ততার দারুন চেহারাটা অত্যন্ত দীনভাবে সেলুলয়েডে গেঁথে দেওয়া যেতই।

বস্তুতঃ এখানে সামাজিক দৈন্যটাও প্রকাশ হত দেশের। মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত মানুষের বস্তুতঃ চারপাশের জগৎ কি ভীষণ এক শ্রেণী সমাজে বিভক্ত, যা শেষ পর্য্যন্ত শোষণভিত্তিক, সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিস্ট শক্তির কাছে নতজানু। যেখানে হরিচরন একধরনের নির্লিপ্ততার ভূমিকা নিয়ে বসেছিল। কেবল ভাববাদী ভাবনায় নিজের দিকেই চেয়ে। অর্থাৎ আমরা দাঁড়াতে চাইতাম একটা সমাজ ব্যবস্থার অমানবিকতার গভীরতর স্তরে। তার প্রকৃত স্বরূপ বিশ্লেষণে, রাজনৈতিক লাইনের যে বিরাট সংগ্রাম, এবং সেই রাজনৈতিক কার্য্যক্রমের সঙ্গে মধ্য শ্রেণীর নেতাদের শ্রেণী অবস্থান তার বিরোধিতা, রাজনৈতিক দল সমূহের দ্বিধাবিভক্ত নেতৃত্ব, তার আভ্যন্তরীন লড়াই, যে লড়াইতে এই মধ্য শ্রেণীর মানুষেরাই দীর্ঘকাল ধরে থেকেছে, নড়েছে চড়েছে, তার ধ্যানধারণা বজায় রেখেই। যেখানে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর ডাকেও এই শ্রেণীর দেশের মানুষ, অর্থাৎ জনগণ একত্রিত হয় না। ভাবে না নিজের কর্তব্যের ব্যাপারে। হরিচরন ও অজয় এই দুইয়ের মধ্যে একটা সূত্র আবিষ্কারের সুযোগ ছিলো। তাহলে ওখানে দাঁড়াতে হত হরিচরনের বিপরীতে। অর্থাৎ তার দারিদ্রটা বড় কথা নয় ভেবে, সেই দারিদ্রের মূল উৎস সন্ধানে আমরা ভেবেই চলে যেতাম সেইখানে। সেখানে দেখানো যেত অত্যন্ত জোরের সঙ্গে মানুষের সত্যই কি ভীষণ সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে থেকে তার মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে বেঁচে থাকার নয়, মাত্র টিঁকে থাকার অভিনয় করে যেতে হয়। লুকোচুরি খেলতে হয় অবিরাম। এই অজয়ের মধ্যে আমরা আবিষ্কার করতাম সত্তরের দশকের সেই দামাল বাংলার দামাল তরুণ ছেলেগুলোকে, তাদের জীবন্ত শরীরের কথা—যারা প্রচণ্ডভাবে ভাবতে শেখাচ্ছিলো শোষণভিত্তিক সমাজকে বদলে দেবার কথা। ওই বয়সের ছেলেরাই এই সময়ে তাদের তরতাজা প্রাণ দিয়ে অকাতরে নিজের দেশকে মা বলে ভেবে তাকে প্রকৃত মায়ের রূপে সাজাতে তার পুত্রদের শোষণ থেকে, অরাজকতা থেকে দুর্নীতি থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিল, এবং তারাই শহীদের মৃত্যুকে তোয়াক্কা না করেই অকাতরে প্রাণ দেয়। রক্ত ঢেলে দেয় দেশের মায়ের চরণে যা এই সময়ের মাপে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের শহীদের সম্মানজনক শ্রদ্ধাজনক মৃত্যুর চাইতে কিছুমাত্র কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাদের কাজটা ভুল কি ঠিক ছিল, তার বিচার আমরা সকলেই জানি এই স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কার্যকলাপে। কিন্তু একই উদ্দেশ্যে প্রাণ দেওয়ার মধ্যে, কেউ অহিংসার পথে কেউ হিংসার পথে দেশকে স্বাধীন করতে চেয়েছে। তাই ভুল কি ঠিক, সেটা কোনো প্রশ্নই নয়, বস্তুতঃ পলাশবাবুর বুদ্ধি তাঁর চেতনা, তাঁর ফিল্ম তৈরীর অদক্ষতা সব মিলেমিশে 'নবদিগন্ত' বই হয়ে কেবলই সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পটভূমিতে মানুষের জীবন প্রবাহকে আড়াল থেকে আরও আড়ালে নিয়ে গেছে অবিরাম এবং ইচ্ছাকৃতভাবেই একটা বিপজ্জনক এবং লজ্জাকর প্রান্তে। অজয়দের এই সময় বা হরিচরনদের এই সময় পলাশবাবুর 'নবদিগন্ত' সেলুলয়েড বইতে বেন্থাম মিলের সময় না, অগস্ত কোঁতের পজেটিভিটির আদর্শ বলে বোঝা গেলনা কিছুতেই। মার্কসবাদ তো অনেক দূরের ব্যাপার।

এহেন অবস্থায় বাংলা সেলুলয়েড বই টালীগঞ্জ থেকে তৈরী হয়—১৯৭৮ সালেই হয়েছে বত্রিশখানা (৩২)। এর মধ্যে দশটা ছবিও বাজারের থেকে পয়সা তুলতে পারে নি। সব টাকাই সব পরিশ্রমটাই জলে গেছে। যে সামান্য দুটো একটা ছবি পয়সা এনে দিতে পেরেছে, তার মধ্যে কোথাও চেতনায় নাড়া দেবার পদার্থ নেই। যেমন খুব হিট ছবি 'লালকুঠি'। একটাও একটুও বুদ্ধির কোনো ছাপ নয়, মননশীলতার ছাপ নিয়ে নয়, যত্ন নিয়ে নয়, কোনো আধুনিক ভাবনা নিয়েও নয়। বোঝা যাবে বাংলা ছবির অবস্থা কি দারুন সংকটজনক। একটা বাংলা সেলুলয়েডের দিকে সামান্য বুদ্ধি নিয়ে চোখ মেলে তাকালেই বোঝা যাবে কি সাংঘাতিক অযত্ন, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, অপদার্থতা নিয়ে তৈরী হয় পয়সা তোলবার জন্য। ওরা না পারে ব্যবসা করতে, না পারে শিল্প করতে, এই ৭৮ সালেই কিন্তু বেশ কিছু ছবি তৈরী হয়েছে যাতে মোটামুটি শিল্পত্ব বজায় রেখে সুস্থ ও বুদ্ধির ফিল্ম বানাবার চেষ্টা দেখা গেছে। যেমন 'জটায়ু' ছবিটি কায়রো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে গিয়েছিল। একটি মোটামুটি পরিণত মানের ছবি হয়েও তা ব্যবসা করতে পারলো না। 'বারবধু' ছবিটার বিষয় এখানে তোলা যায়। এমন প্রোপাগাণ্ডা ছবিটির সম্পর্কে সুরু হয়ে গেল মঞ্চের 'বারবধূ'র সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে যে, আসল ব্যাপারটাই মার খেয়ে গেল। ছবিটা যৌন বিষয় নিয়ে কি বলেছে না বলেছে তার চেয়েও আমার কাছে বড় মনে হয়েছে ছবি করার নিছক মেজাজটির একটা সুস্থতা দেখে। কিন্তু সেও পারলো না ব্যবসা করতে। অথচ এগুলো দারুনভাবেই ব্যবসায়িক ছবি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে বৃটিশ চলচ্চিত্র শিল্পত্ব অর্জন করেনি। কিন্তু বেশ বাণিজ্যিক সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলো। এখনও বৃটিশ চলচ্চিত্রে যেমনভাবে একটি প্রমোদ চলচ্চিত্র তৈরী হয়, সেখানে যা পরিণতির রূপ আমরা দেখি বা দক্ষতা দেখি টেকনিকাল ব্যাপারে বা চিন্তায়, কাজে, তার বিন্দুমাত্র টালীগঞ্জের এইসব ছবির মধ্যে নেই। দু-একটা সাধারণ উদাহরণ টালীগঞ্জ থেকে তুলে ধরবো আমি। এর প্রথমটা একটি বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'দেশ' থেকে। এইজন্য যে এই রিভিউ কোনো ফিল্ম সোসাইটির ত্যাঁদড় ইনটেলেকচুয়াল দ্বারা কৃত নয় বলেই। সামান্য একজন ফিল্ম দর্শক তার বুদ্ধি ও মেধাই ওখানে প্রমাণ পায়—"এ কাহিনী অতীব প্রাচীন। বুঝলাম কি করে বলুনতো? পরিচালক বুদ্ধি করে পুলিশ অফিসার দিলীপ রায়ের ঘরে বিলিতি রাজা রাণীর ছবি টাঙ্গিয়ে আরো বুদ্ধি করে সেটি ফোকাসের বাইরেও রেখেছেন—যাতে জর্জ বোঝা গেলেও পঞ্চম না ষষ্ঠ বোঝার উপায় নেই। সেই সঙ্গে দিলীপ বাবুর টেবিলে একটা পুরনো গড়নের টেলিফোনও দিয়ে দিয়েছেন, আর কি চাই? তরুণকুমারের হাতে কালো ডায়েলের স্টিলের ব্যাণ্ডওয়ালা এইচ-এম-টি? নেকটাইতে অ্যামেরিকান নট্? আরে দুর, ওসব কেউ দ্যাখেনা। কিন্তু জিপ গাড়ির মডেল? রাবিশ! কিন্তু পাহাড়ি ছেলেদের চুল ছাঁটা, তখনো কি তারা রুসজির কায়দায় চুল ছাঁটতো?" এরপর অতীব সুন্দর একটা জায়গা "আরো একটি বিষয়ে আপনারা অবগত হবেন—সেটি হল কলেরা হচ্ছে একটি অতীব পরিচ্ছন্ন কাব্যিক অসুখের নাম। অসুখ না বলে সামান্য অসুস্থতা বললে ভাল হতো। উৎপল বাবুর মত অভিনেতাকে (চা বাগানের এ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার) কলেরাক্রান্ত অবস্থায় কয়েক মিনিটের জন্য দেখা যায়। এই অতীব শান্তিময়, সুন্দর দৃশ্যের আমি একটি বর্ণনা দিচ্ছি। উৎপলবাবু একটি মূল্যবান রাগ্ গায়ে দিয়ে, একটি বর্ণময় বেডকভার আচ্ছাদিত বিছানায়, চোখ বুজে, চিৎ হয়ে বড় নিশ্চিন্তে কলেরাকে উপভোগ করছেন। তাঁর মসৃণ দাড়ি কামানো গাল, ভরপুর মুখমণ্ডল, কোথাও কষ্টের চিহ্ন নেই। উত্তমকুমার পাশে বসে তাঁকে মাঝে মধ্যে চুকচুক ওষুধ খাওয়াচ্ছেন। বমি করছে না, এবং তাঁকে বারবার হয়ে করতেও হচ্ছে না। শিয়রের টেবিলে কমলালেবু ও আঙ্গুর রয়েছে—তিনি কলেরায় শুয়ে শুয়ে দু-একটা মুখে যোগাতে পারেন। এবং পরের দৃশ্যেই তিনি সোজা কলেরা থেকে উঠে ব্রেকফাস্ট খেয়ে গাড়ি চালিয়ে মেয়ে ধরতে বেরিয়ে যান। তাঁকে বেশ স্বাস্থ্যবান লাগে। আমরা বুঝতে পারি কলেরা অতি প্রয়োজনীয় ও স্বাস্থ্যকর বস্তু।" এর পাশেই মনের মধ্যে উঁকি মারছে সত্যজিৎ রায়ের লক্ষ্ণৌতে 'শতরঞ্জ'-এর স্যুটিং-এর অভিজ্ঞতা। নবাবী আমলে লক্ষ্ণৌতে নিশ্চয় আধুনিক রেনপাইপ লাগানো ছিল না জল নিকাশনের জন্য বরাবর বাড়ীর ছাদ থেকে। তাই সেই সময়ের বাড়ী পেয়েই তিনি তৃপ্ত নন। চান রেনপাইপহীন বাড়ী। এরই অন্বেষণে তাঁকে কাটাতে হয়েছে লক্ষ্ণৌ শহরে দিনের পর দিন। আর সাহেবদের আমলের গল্পে 'ধনরাজ তামাং'-এ আমরা দেখি অভিনেতা অনিল চ্যাটার্জীর পকেট এভারএডি কোম্পানীর একেবারে শেষ মডেলের টর্চ। কোথায় একটা পরাধীন অবস্থা দেশের। আর কোথায় সত্তর সালের স্বাধীন দেশ। প্রথম উদাহরণটি পীযুষ বসুর 'ধনরাজ তামাং' থেকে। দ্বিতীয় উদাহরণ ভোলা ময়রা। আমরা দেখলাম অশান্ত প্রকৃতির দারুণ এক দৃশ্য। দারুন ঝড় উঠেছে, মানে সেই ঝড় সাইক্লোনের মতোই আমরা পর্দায় দেখছি। এত তীব্র ঝড় আর তার গতি, সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকানো। বারবার এই রকম পরিবেশ তীব্রভাবে বোঝানো হচ্ছে। ঠিক ওই শটেই এই পরিবেশেই নীচুর দিকে ক্যামেরা এসে দেখাচ্ছে ছোট ভোলা এঘর থেকে ওঘরে থাকে, মাঝখানের শূন্য উঠোনের মাটি পেরিয়ে, উঠোনের শূন্যতাকে বুকে নিয়ে চারিদিকে ধানের ক্ষেত অত্যন্ত বড়োভাবেই চোখে পড়ছে। সুন্দর ধানের নধর শীষগুলো নিয়ে ধানগাছগুলো স্থিরভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। ধানগাছগুলো একটুও ওই ভীষণ ঝড়ে নড়ে না কিছুতেই। ভোলাময়রার এই পৃথিবীতে ওপরের ঝড় নীচে নামে না। তাই ধানগাছগুলো অনড় থেকে যায়। হায়রে টালীগঞ্জের পোড়া-কপাল আর বাঙালীর দুর্ভাগ্য। হায়রে কমার্শিয়াল সেলুলয়েডে বানানোর ধৃষ্টতা। এই রকম অজস্র উদাহরণ তুলে তুলে যে কেউ

দেখাতে পারেন। যার সংখ্যা এতই হবে যে একনজরে, এই লোড-শেডিং-এর তীব্রতর সময়ে, যা কাগজ উৎপাদন হবে তার সবটাই ফুরিয়ে দেওয়া যাবে। এই রকমভাবেই তাতে বারবার প্রমাণিত হবে টালীগঞ্জের সেলুলয়েড বইয়ের নানান অসঙ্গতি, নানান অপদার্থতা, এমন কি নিজের মাতৃভাষা যে ফিল্মমেকারের সেই বাংলাভাষার প্রয়োগে এবং বানানের পিতৃ মাতৃহীনতার পরিচয়। এই অপদার্থতা দায়িত্বজ্ঞান-হীনতা অবিরাম চলছে এবং চলবে।

বস্তুতঃ এরাই, এরাই আজকের বাংলা সিনেমার জগতে সর্বময়ব্যাপ্ত কর্মী। এরাই পরপর ছবি বানাবার টাকা পান. এদের তৈরী ওই সিনেমা জলছবি না চলচ্চিত্র সেটা একটা তাকের দাঁত আছে কিনা সেই জাতীয় গবেষণা হয়ে উঠবে। এদের ছবিই সব প্রেক্ষাগৃহগুলি জুড়ে বসে থাকে। আর অপেক্ষা করতে হয় বুদ্ধদেব দাশগুপ্তকে, সত্যজিৎ রায়কে। তাই দেখে দর্শক, দেখতে হয় অভিনেতা জোরে হেঁটে গেলে তার গায়ের ভারে ঘরের দেয়াল কাঁপে। একজন অভিনেতা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, গিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। তার ছায়া দীর্ঘ হয়ে ক্যামেরায় পড়ে থাকে। এখনও বাংলা ছবিতে দেখি ব্রাহ্ম হলেই হাতাওয়ালা ফুলো জামা পরবে মেয়েরা। পুরুষের গালে দাড়ি থাকবেই। এবং সেই ব্রাহ্ম গৃহে অবশ্যই পিয়ানো থাকা চাই। সব ব্রাহ্মরাই যে পিয়ানো বাজানোতে বিশেষ পারদর্শী ছিলো এইটাই প্রকাশিত। আজ পর্য্যন্ত এমন একটাও বাংলা ছবি আমরা দেখিনি যার মধ্যে একটাও পিয়ানো নেই, দাড়ি নেই, হাতা ফুলো এরকম জামা নেই। বাদশাহী আমলের কোনো চরিত্র হলেই তাকে যেই হোক না, সে অবশ্যই অহীন্দ্র চৌধুরীর কায়দায় বাঁ হাত মুড়ে পিঠে রাখবে, একটু ঝুঁকে পড়বে সামনের দিকে, ডান হাত দিয়ে গলার পুঁথির মালা চটকাবে। এমৎ অবস্থায় যদি দর্শক, বাঙ্গালী দর্শক এই অপদার্থ ছবি না দেখে, বাড়ীতে সেই সময় ঘুমিয়ে থাকে, পরিত্যাগ করে এই সব বাজে ছবি, তাহলে কি তাদের দোষ দেওয়া যাবে। আমরা কি একবারও আমাদের ছবি তৈরীর মূর্খতা আর দোষের কথা ভাববো না। আমাদের ত্রুটির কথা ভাববো না। কেবল সব দোষ হিন্দী ছবির ওপর দেবো? কেন হিন্দী ছবি দেখছে তাই নিয়ে কেবল অভিযোগ আর অভিযোগ। এবং পালিয়ে বাঁচার জন্য হিন্দী ছবির, নয়া বোম্বাই মার্কা হিন্দী ছবির চটুল ভঙ্গীতে অবাস্তব ভঙ্গীতে কোমর ভাঙ্গা হাতে, নুলো হওয়া হাতে ক্যামেরা নিয়ে মরার হাত থেকে বাংলা ছবি বাঁচার পথ আবিষ্কার করবে। এবং তার অনুকরণ হবে একেবারেই আনস্মার্ট ভঙ্গীতে অযোগ্য দৃষ্টি আর কর্মেতে। এই ফর্মুলা থেকেই সুখেন দাস নামক একজন সামান্য অভিনেতা চলচ্চিত্র বানাবার স্পর্ধা রাখেন। নিউ থিয়েটার্স এর যুগ থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্রীয় নানান রগরগে (শরৎচন্দ্রকেও যদি জোর করে ছবির সাবজেক্ট করা যায় তার অসীম শক্তি থাকতে পারে। যেরূপ 'মামলার ফল, 'পল্লীসমাজ'কে নিয়ে দুর্দান্ত ছবি তৈরী করা যায়—যা একেবারেই আধুনিক হবে সর্বদিক থেকে।) ব্যাপার-স্যাপার—যা স্থূলকায় আবেগ, এবং তা নির্বোধ আবেগ, হিন্দী ছবির মারদাঙ্গা—ঠিক সময় মত সব কিছু হাতের কাছে পাওয়া—এই সাড়ে বত্রিশ ভাজার মুখরোচক, যা কান্না—আনন্দ, দুঃখ বেদনা মেয়েদের গায়ে হাত, সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়া, বড়লোক থেকে গরীব হয়ে যাওয়া, এই সব নানান নকুলদানার মুখরোচক প্যাকেট গরম গরম হাতে গেঁথে সুখেনবাবু এখনও এই 'সুনয়নী' পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর ছেলে হয়ে ব্যবসা বুঝেছেন। নিশ্চয় প্রাচীনকালের সেই বৃদ্ধ আচার্য্য প্রফুল্লবাবু বেঁচে থাকলে সুখেন দাস নামক তরুণ চলচ্চিত্রকারকে মাদার টেরেসার বহু আগেই নোবেল প্রাইজ এনে দেবার জন্য বিদেশে গিয়ে এক বিরাট লড়াই করতেন। আর সবাই এঁটে উঠতে পারছে না, হিন্দী ছবিকে অনুকরণ করতে গিয়ে আনস্মার্ট ভঙ্গী অযোগ্য দৃষ্টি আর কর্ম বড় হয়ে উঠছে।

আমরা একবারও ভাবছি না, এই বাংলা ছবি বাঙ্গালী দর্শক দেখছে না তার মূল কারণই হলো সে তার সম্মানের আর শ্রদ্ধার বাংলা ছবি নয়। আবার আর্ট ফিল্মও নয়। যা বিদেশ থেকে বিরাট আসন নিয়ে নেবে। এই ৭৮ সালেই সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, তপন সিংহ, অগ্রগামী, তরুণ মজুমদার, পূর্ণেন্দু পত্রী, রাজেন তরফদার, পার্থপ্রতিম চৌধুরীর (বেশ কয়েক বছর অনুপস্থিত) একটাও ছবি পর্দায় আসে নি। অথচ কয়েকজন ছুটো করে ছবি পর্দায় এনেছেন। ঋত্বিক ঘটক এই অবস্থায় মরে বেঁচেছেন। —এছাড়া আর কি ভাবা যায়? নিউ থিয়েটার্স যে কর্মাশিয়াল ছবির একদা জন্ম দিয়েছিল—সেই সুস্থ ছবিও আজকে অবর্তমান। অথচ তখন সিনেমার মত কিছু আবিষ্কার আমাদের হাতে আসেনি। তবু এখনও এই-খানেই এই ছবি রিলিজ হলে তা দেখতে বেশ ভালো লাগে, তাও আজ দূর দিগন্তে। বাংলা ছবির কোনো নবদিগন্ত উন্মোচিত হয় নি। না হলে সেই সময়ের একটা গল্প রি-মেক হলেও, তাবৎ বড়োবড়ো স্টার তার মধ্যে থাকলেও,—তা আর দর্শক টানে না। এই 'দেবদাস'ই তার উদাহরণ। কেবল গাল খায়। আজকের যে দর্শক সেতো আর সেই বড়ুয়ার 'দেবদাস' দেখেনি। তাদের ভালোও লাগেনা। কেন? এইটা দিলীপ রায়কে প্রশ্ন করলেই মুখ সিঁদুরে রাঙ্গানো হবে। নানান কথার মধ্যে প্রমাণ করবেন যে এই দর্শকরা আসলে ফ্রাস্টেটেড,—দুপাতা ইংরেজী পড়ে, কফি হাউসে চার-মিনার এবং কফি খেয়ে, উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্রের নাটক দেখে বড় বড় কথাই শুধু শিখেছে—আসলে এরা কিসস্যু বোঝেন না। চেনে না ফিল্মকে বা নিজের দেশকে। ব্যাস। হয়ে গেল। তারপরই আবার একটা ছবি তৈরীর জন্য ফ্লোরে ঢুকে যান দিলীপ রায়। এরা কিছুতেই স্বীকার করবেন না, এদের গলদটা, দুর্বলতাটা, অশিক্ষাটা। সোজা করে সোজা গল্পটা বিশ্বাসযোগ্যভাবে এরা গুছিয়ে বলতে পারে না ক্যামেরা নিয়ে, যা আমি মনে করি নিউ থিয়েটার্স পারতো সাংঘাতিকভাবে। এদের কেবল পায়তাড়া, আগেই প্রশ্নকারীকে ছোট ভাবা, দীন ভাবা, অশিক্ষিত ভাবা।

নিজের দোষ না দেখে দর্শকের দোষ দেখা। আর তাই দর্শকও ক্ষোভ আর লজ্জায় এই জাতের ছবি দেখে না। হিন্দী ছবিই দেখে। যা অত্যন্ত নির্বোধ হলেও ভালো লাগে তার যৌবনের জন্য, তার স্মার্ট ভঙ্গীর জন্য।

আজকের বাংলার টালীগঞ্জ কি দিতে পারে পাঠক একবার ভাবুন। হিন্দী ছবির মানে ওই সেলুলয়েড নামক খেলা ছবিতেও দারুণ টেকনিক্যাল কাজ, এইসব কলা কৌশলের কাজে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে পলাশবাবুরা আসতে পারবে না। অথচ এদের ছবিই দাবা করছে এরাই কমার্শিয়াল বাংলা ছবি তৈরী করবেন—টাকা দাও। আরো সুযোগ দাও ব্যবসার জন্য—রঙ্গীন ছবি তৈরী করবো। ইতিমধ্যেই বাংলার টালীগঞ্জে রঙের মধ্যে চুবিয়ে যে গুটিকয়েক নিদর্শনে মহান চলচ্চিত্রকাররা আমাদের ব্যবসা দেখিয়েছেন তা দেখলে সকলেই লজ্জায় রঙ্গীন হবে। হিন্দী ছবিতেও যে রঙের একটা দারুণ প্রয়োগ দেখা গেছে কমার্শিয়াল ছবিতে তা নয়, কিন্তু তার উন্নত মানের কলা কৌশলের কাজের সঙ্গে তার স্মার্ট ভঙ্গী আমাদের মন না কাড়লেও চোখ কাড়ে। 'দেশ পর দেশ', বা 'জনী মেরা নাম,' বা 'ডন', অথবা 'শোলে'র মতো ব্যবসায়িক দারুন সব ব্যাপার নিয়ে যে সাংঘাতিক টেকনিক্যাল স্মার্ট চেহারা তা ভাবতে পারবে টালীগঞ্জের সলিলবাবু, পলাশবাবু, পীযুষবাবু! এইসব হিন্দী ছবির দারুন স্মার্ট টেকনিক্যাল কাজ আমাদের প্রলুব্ধ না করে থাকতে পারে না। আমাদের টালীগঞ্জের তীব্র দীনতাকে উৎকট রূপে প্রকাশ করে যায়। কি দারুণ এডিটিং, কি দারুণ ঝরঝরে ফটোগ্রাফ, কি চঞ্চল ক্যামেরার কাজ, যেমন দেখুন না, রাজকাপুরের 'সত্যম-শিবম-সুন্দরম' একটা ন্যক্কার জনক একটা উৎকট মানসিক রোগকেই প্রকাশ করে—যার নাম যৌনতা ছাড়া আর কিছু নয়, কিন্তু এই ছবিটায় ল্যাবরেটরির টেকনিক্যাল কাজ দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। বন্যার সময় শশীকাপুর ব্রীজের ওপর আসছে—এই সময় ক্যামেরার যে ভঙ্গী ভাবা যাবে না সেটা কি করে টেকিং করা হয়েছে। এবং ওই যে বন্যার সময়কার দৃশ্য গ্রহণের সময় ক্যামেরাকে যে ভাবে যে স্মার্ট ভঙ্গীতে ব্যবহার করা হয়েছে—হাজারটা টালীগঞ্জের কমার্শিয়াল ছবিতে এই ভাবনা আসবে না। প্যান্ট আর নানা কাপড় বানাতেই তখন আমরা ব্যস্ত থাকবো। কমার্শিয়াল এইসব হিন্দী ছবির সব কিছু কমার্শিয়াল গন্ধে ভরপুর এবং তা নানাভাবে নানা বৈচিত্র্যে। পঞ্চাশটা হিন্দী ছবির একই গল্প। সতেজ ভরপুর কমার্শিয়াল ভঙ্গী ভালো লাগাতে বাধ্য করে এইটাই তো কমার্শিয়ালিটির চরম এবং প্রধান গুণ। বাংলা ছবি এটা ভাবতেই পারবে না। চম্বলের ডাকাত নিয়ে ওরাও ছবি তৈরী করে আমরাও তৈরী করি। কিন্তু কি নিদারুণ অপরিপক্কতা আর কি সাংঘাতিক লজ্জা নিয়ে প্রেক্ষাগৃহ থেকে আমাদের বাঙ্গালী ডাকাতরা পালায়। 'মুঝে জিনে দো' ছবিটার কথা একবার ভাবুন। তার পাশে শ্রীমতি মঞ্জু দের 'অভিশপ্ত চম্বল'-এর কথা ভাবুন। দুটো ছবিরই একমাত্র উদ্দেশ্য ব্যবসা করা। একই সাবজেক্ট নিয়ে। কিন্তু দুটোর দিকে একবার তাকালেই বোঝা যায় কি নিদারুণ আলস্য আর দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতা আমাদের আক্রমণ করে আছে। তারপর দেখুন না ওদের ব্যবসা করবার জন্য 'সন্তোষী মা'-র মতো ছবি বা সেলুলয়েড গল্প তৈরী হয়। এবং তা কি প্রচণ্ড ব্যবসা এনে দেয় তা আমরা সকলেই জানি। কমার্শিয়াল হিন্দী ছবি ছবির জগতে 'সন্তোষী মা' ওয়েস্ট ইনডিজের ওয়েলেসলি হলের বাম্পারের সঙ্গেই তুলনীয়। এই পথ ধরেই আমাদের দেব দেবীদের নিয়ে আসা হয় টালীগঞ্জের ফ্লোরে, তৈরী হয় 'বাবা তারকনাথ'। 'বাবা তারকনাথ' সত্যিই মুমূর্ষু টালীগঞ্জের ব্যবসার জগতে দক্ষযজ্ঞ দেখায়, এর প্রধান কারণই এই ছবিটার ভালো গান এবং এ ছবিতে যা বলতে চাওয়া হয়েছে তার প্রসঙ্গে দ্বিমত থাকতে পারে, কিন্তু অত্যন্ত সহজভাবেই গুছিয়ে তা পরিচালক বলতে পেরেছেন। অন্যান্য ব্যবসায়ীরা ভাবলেন ব্যাস এইতো দাওয়াই পেয়েছি—তৈরী হলো 'মা লক্ষ্মী'—রত্না ঘোষাল মা লক্ষ্মী সাজলেন, বাপরে বাপ। ক্যালেণ্ডারে অহরহ দেখা লক্ষ্মীর এইরকম রূপ দেখে লক্ষ্মীর ওপর মেজাজ রইলো না বাঙ্গালী দর্শকের। এই পথ ধরে 'তারা মা' তৈরী হল। তাতে দেখা গেল মোহন চ্যাটার্জীর অসহ্য মহাদেব। সে যে কি অসহ্য অভিনয় মহাদেবের চরিত্রে তা ভাবা যাবে না। 'তারা মা'-এর এই রকম একটা সুন্দর গুছানো কাহিনীকে ধরতে পারলেন না পরিচালক সেলুলয়েডে। অথচ কাহিনী একটু অনুসরণ করলে, বুঝলে, এবং সামান্য টেকনিক্যাল জ্ঞানগম্যি থাকলে এই কাহিনীকে নিয়েই একটা ব্যবসায়িক ছবি তৈরী করা যেতই যেত—এ বিষয়ে কোনো ভুল নেই। আমরা ভাবতে পারিনা কাঁথির সমুদ্রের ধারে বালির ওপর এই রকম শিবের গড়াগড়ি। এই ছবিটাকে দেখলেই বোঝা যাবে টেকনিক্যালভাবে কলা কৌশলের দিক থেকে আমাদের কি দারুন শোচনীয় অবস্থা। বোম্বের থেকে শিল্পী এনে কাজ করা টালীগঞ্জে বহুদিন ধরে চলছে। অশোককুমার, দিলীপকুমার, সায়রা বানু, ওয়াহিদা রেহমান এইসব অভিনেতা অভিনেত্রী নিয়ে কাজ হয়েছে। এই অশোককুমার হিন্দী ছবির জগতে কি আসনে এখনও বসে আছে ভারতের সকলেই তা জানে। আর গোটা ভারতেই অশোককুমারের দর্শক বহু। ওই অশোককুমারকে নিয়ে 'হাসপাতাল' ছবিটার কথা ভাবুন, সঙ্গে বাংলার সেই ভীষণ সুচিত্রা সেন, কাহিনী আবার সেই নীহার রঞ্জন গুপ্তের, পাঠক ভাবুন কি ব্যবসা, সে এই ভীষণ ব্যবসায়িক পশরা সাজিয়ে। হালের ওয়াহিদা রেহমানকে নিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী নিয়ে তৈরী হয় 'জীবন যে রকম'। পাঠক ভাবুন কতো ব্যবসা সে করতে পেরেছে! আমরা কেবল হিন্দী ছবির সাফল্য দেখে ঈর্ষা-কাতর হই। আর ভাবি এতে যে অভিনেতারা আছেন তাদের জন্যই এই সাফল্য। কিন্তু তা আংশিক সত্য। অভিনেতাদের জন্য যেমন এই সাফল্য, তেমনিই আবার এর সঙ্গীত পরিচালক, এবং সাংঘাতিক কলাকৌশলের জন্যও। একথা তো সত্যি একটা দোকানে ঢুকে যাই

যখন দেখি, সেই দোকানটার ভীষণ সুন্দর সাজানো গোছানো একটা সপ্রতিভ ভঙ্গী। সেই দোকানেই ঢুকে আমরা কেনাকাটা করতে ভালো-বাসি। আমরা জানি সে অন্য একটা সাধারণ দোকান থেকে বেশী দাম নিচ্ছে কিন্তু তবুও আমরা সেই দোকানেই যাই।

এরই ফাঁকে হিন্দীর বোম্বাই এক শ্রেণীর মনোরঞ্জক ফিল্মী গান তৈরী করেছে। যার আয়ু মাত্র সামান্য কদিনের। তার জন্মই হয় দ্রুত দ্রুতই সে আবার ফুরিয়ে যায়—তার আপন ধর্ম অনুযায়ী। কিন্তু যতক্ষণ যে বাঁচে, সাহসেই, ডাগর সাহসে সে বেঁচে থাকে। কত রকমের ভীষণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা,—কতো যন্ত্রের ব্যবহার, কি নিপুণ ছন্দের জন্য অন্বেষণ, এইগুলো কি ফেলে দেবার! আর বাংলা ছবির গান যেন একটা চাঁদসীর ডাক্তারখানা,—যেখানে বুড়ো কতকগুলো লোক কেবল হাঁপানী নিয়ে অবিরাম কেশে যাচ্ছে, আর সমাজে কার বউ কার মেয়ে কার ছেলের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করছে, এইসব আলোচনা করছে।

সেই ভ্যাদভদে একটা ব্যাপার। সেই চর্বিত চর্বন। পপ খোঁজা নেই। চেষ্টা নেই বৈচিত্র্যের জন্য, কিস্‌স্যু নেই। আছে শুধু দর্শকের দোষ ধরা। সেই আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ো হেমন্ত মুখোপাধ্যায় শেষ পারানের কড়ি তোলবার জন্য এখনও বর্তমান। এর থেকে আর নিস্তার নেই আমাদের। ফলতঃ তরুণ বাঙ্গালী দর্শক কেন স্কুল কলেজ পালিয়ে বাংলা ছবি দেখবে? হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীতের কোনো উত্তরণ নেই। গ্রামীণ পটভূমিতেও সেই ঘ্যানর ঘ্যানর বহু ব্যবহৃত সুর—আর ছড়া কাটা, পাঁচালী পড়া। যার সবটাই ভুল। একটাও পল্লী বাংলার প্রকৃত সুর আমরা বাঙ্গালী হয়েও পাইনি। এটা দিলেও ভালো লাগে। না হলে কি করে 'বড় লোকের বেটি লো লম্বা লম্বা চুল', 'ঠাকুরঝি দুমুঠো চাল ফেলেদে হাঁড়িতে', 'সাধের লাউ', কি করে এমন ভীষণভাবে মুখে মুখে আর প্যাণ্ডেলে প্যাণ্ডেলে ঘোরে? আজ থেকে পনের বছর আগে হেমন্তবাবুর যে ব্যাপার, পনেরো বছর পরেও সেই একই ব্যাপার। সেই একই সুর, একই চরিত্র, একই গায়কী। এগুলো বোঝবার জন্যে পনেরো বছর আগে এবং পনেরো বছর পরের রেকর্ড রাখলেই বোঝা যাবে ব্যাপারটা। সময় বসে নেই। দ্রুতই পাক খাচ্ছে সময় পৃথিবীর সঙ্গে। কত কিছু বদলে যাচ্ছে দ্রুত, অথচ সেই সময়ের মধ্যে কিন্তু হিন্দী ছবির গানের সুর-ছন্দ তার প্রয়োগ সব কিছুতেই নিজেকে বদলেছে। তারা কমার্শিয়াল মার্কেট পাবে না তো কি আমরা পাবো! ছবি যখন কথা না বলতো', বোবা ছিল সে, তখনও এই সঙ্গীতের, এই গানের চরিত্র ছিল ভীষণভাবে। তখন থেকেই সঙ্গীতের ব্যাপারটা ফিল্মের সঙ্গে জড়িত। আজকে কতো পরিবর্তন হয়েছে সবদিক থেকে। আজকে সমস্ত কমার্শিয়াল ব্যাপারটাই যখন একটা বিশেষ ফর্মুলার মধ্যে যাচ্ছে তখন গানটাকে নিয়ে ভাবতে হবে বৈকি ভীষণভাবে। কি করে আরও বেশী কাজ করা যায় সেটা ভাবা প্রয়োজন। জীবনের মধ্যে যতো অস্থিরতা আসছে, জটিলতার শিকড় যতই জড়াচ্ছে, ততই বেশীক্ষণ প্যানপ্যানানি নির্বোধ মার্কা অসাড়তা আর ভালো লাগবে না। তখনই চাই ছন্দ—রিদম্—যা, অল্প সময়ের মধ্যে দোলা দেবে। ভালো লাগাতে বাধ্য করবে। এই রকম কাজ কিছু হয় নি, তা বলা যাবে না, হয়েছে,—যেমন, সলিল চৌধুরী মহাশয়, সুধীন দাশগুপ্ত মহাশয়, আরও মাত্র কয়েকজন। আমরা ভুলে যাই পুজো সংখ্যায় একটা গানে সুর দেওয়া আর সিনেমার জন্য একটা গানে সুর করা তার সিচুয়েশন অনুযায়ী, এক ব্যাপার নয় কিছুতেই। 'ছদ্মবেশী'তে—'এবার আমি লেংচে মরি', এই সব গান এই সিচুয়েশনটাকে শুধু বলছে না, বলছে আরও কিছু, সেটাই হচ্ছে কমার্শিয়াল সাকসেস। (আমি কিন্তু ছবির গান নিয়েই বলছি বা তার মিউজিক নিয়েই বলছি। গান না থেকেও কেবল ভীষণ ভাবে ব্যাকগ্রাউণ্ড ব্যবহারের মধ্যে এনে করা যায় সেটা কিন্তু অন্য ক্ষেত্র। সেটা ঠিক এই কমার্শিয়াল মতে মেলে না।) আমরা ভাবি, যেই দেখলাম ছবিতে আজকের তরুণদের অশান্ত অবস্থা অমনি চলে গেলাম বিদেশী যন্ত্রের কাছে—এটা আমার মনে হয় এই হিন্দী ছবির অনুকরণ ছাড়া আর কিছু নয়। এর মধ্যে কোনো সৃজনমূলক ব্যাপার মোটেই থাকে না। আমাদের দেশেরই সঙ্গীত যন্ত্র,—সরোদ, সেতার, তবলা, ঢাক, এই সব নিয়েই এই এফেক্টে চলে যাওয়া যায় অবলীলায়। কিন্তু তার জন্যে সিচুয়েশন স্টাডি করার, চরিত্র স্টাডি করার যে ভীষণ প্রয়োজন, সেটা কি আমাদের হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বা শ্যামল মিত্র করতে পারবে! এখানেই চরম কমার্শিয়াল হয়েও দেশের ঐতিহ্যময় কিছু খুঁড়ে দেখার একটা তীব্র প্রবণতা বা আকুলতা অথবা নিজের দেশের জন্য চূড়ান্ত ভালোবাসা প্রয়োজন। যেটা আছে সলিল চৌধুরী মহাশয়ের মধ্যে, আছে সুধীন দাশগুপ্তের মধ্যে, (কিছুটা ছিল নচিকেতা ঘোষ মহাশয়ের মধ্যে।) অবিরাম এঁরা চেষ্টা করছেন নিজস্ব সৃজন-শীলতাকে, প্রকাশ করবার। দেশীয় যন্ত্রপাতি অত্যন্ত সহজভাবে ঘরোয়া ভঙ্গী থেকে সেই ঝাড়লণ্ঠনের নীচে থেকে বার করে এনে জনগণের মধ্যে মিশিয়ে দিতে। তাই একটা গ্রামীন সুর বা সেই ছন্দটিতে সাংঘাতিক কাজ হয় যেমন, তেমনি গুরুগম্ভীর ধ্রুপদী সঙ্গীতের রাগ রাগিনী থেকে নিয়ে ব্যবহারের গুণে একটা ভীষণ কাণ্ড যে হয় তা আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি। গত পঞ্চাশ বছর ধরে আন্তর্জাতিক অর্কেস্ট্রা মিউজিক যে কাজ করেছে,—টোনাল মিউজিক ও মেলডি মিউজিক এবং তার সুরকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো অথবা একই সঙ্গে যা এ্যাটোনাল অথবা স্বরহীন সুরের ছন্দের যে কাজ তার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ আছে কি আমাদের হেমন্ত মুখোপা-ধ্যায়ের মতো সঙ্গীত পরিচালকদের। যেমন আমাদের দেশে আনন্দশঙ্কর কিছুটা এর মধ্যে থেকে বার করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এখনও তাঁর কাজ ব্যাপক হয়নি—তাই শেষ সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছুই বলা সমীচিন নয়। এই এ্যাটোনাল অথচ স্বরহীনতার তীব্র প্রভাব আমরা যেমন পড়তে

দেখেছি, সোয়েনবার্গ, ডেবুসি, স্টারভনস্কি আরও কয়েকজনের মধ্যে, তেমনি এরই মধ্যে সিনেমার মিউজিক ব্যাপারটার ইতিহাস, তার ক্রম পরিবর্তন, তার বিবর্তন সবই বাসা বেঁধে আছে। আমাদের দেশে এই টোনাল মিউজিক এবং সমগ্র ব্যাপারটায় যে বৈচিত্র্য আনা যায়, অথচ চূড়ান্ত মিউজিক্যাল স্কোর থেকেই, তার সামান্য প্রভাব অথবা সেই নিয়ে সামান্য কাজ করবার প্রবণতা আমরা ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কারুর মধ্যেই দেখিনি ! সামান্য 'বাল্মীকি প্রতিভা' খুঁজে দেখলে আমরা অনেক কিছুই পেয়ে যেতাম। পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' থেকে বিলাতি সঙ্গীত থেকে একটু উদ্ধৃতির প্রয়োজন, —"য়ুরোপের সঙ্গীত যেন মানুষের বাস্তবজীবনের সঙ্গে বিচিত্রভাবে জড়িত। তাই দেখিতে পাই, সকল রকমেরই ঘটনা ও বর্ণনা আশ্রয় করিয়া য়ুরোপে গানের সুর খাটানো চলে, আমাদের দিশি সুরে যদি সেরূপ করিতে যাই তবে অদ্ভুত হইয়া পড়ে, তাহাতে রস থাকে না।" এখানে আমি শুধুমাত্র সঙ্গীত পরিচালকেরই মানসিকতা কাজ করে না দেখেছি, তাই নয়— দেখেছি ফিল্মমেকার পলাশবাবু, পীযুষবাবু, সলিলবাবুদের মধ্যেও। তাঁরাও জানেন না কি করে সঙ্গীত চলচ্চিত্রের কাজে আসে।

ভবিষ্যতে সিনেমার মধ্যে আবহ সঙ্গীত জিনিষটা থাকবে কি থাকবে না তা ভবিষ্যতের গর্ভেই রয়েছে। কারণ নিস্তব্ধতা যে বিরাট এক সঙ্গীত এটা প্রমাণ করার জন্য বেশ কিছু গুণী জ্ঞানীজন প্রচণ্ড কাজ করে দেখাচ্ছেন। সরোদ, সেতার, তবলা, বঙ্গোর আওয়াজ নয়, এফেকট্‌-এর জন্য এই সব সঙ্গীত পরিচালক পার্শ্ববর্তী শব্দ অনুষঙ্গকেই ধরতে চাইছেন তীব্রভাবে। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে, 'কাপুরুষ-মহাপুরুষ' ফিল্মে সত্যজিৎ রায় দেখাচ্ছেন, 'কাপুরুষ' অংশে— সৌমিত্রের (সিনেমার নামটা মনে পড়ছে না) কাছে এসেছে মাধবী—এসে বলছে এই তোমার সেই তেকোনা ঘর ইত্যাদি। এরপর ওরা ওদের প্রেমের বিষয় নিয়ে এবং শেষকালে বিয়ের জন্য পাত্র দেখছে মাধবীর বাবা—এই গুলো বলছে। সৌমিত্র তখনও বিয়ের দায়িত্ব নিতে পারে না। কারণ তার অর্থনৈতিক অস্বাচ্ছল্য। এই ভাবনাটার সময়, এই কথাটার সময়তেই আমরা শুনলাম রাস্তা দিয়ে একটা দমকল ঘন্টা বাজিয়ে যাচ্ছে। চূড়ান্তভাবে সৌমিত্রের তীব্র মানসিকতার ছবিটা এই পারিপার্শ্ব আবহ অনুষঙ্গের মধ্যে থেকে বার করা হয়ে গেল। হেমন্তবাবু, শ্যামলবাবু নির্ঘাৎ এই দৃশ্যে হলপ করে বলা যায়—একটা বেহালাকে চড়াসুরে বাজিয়ে বেদনা প্রকাশ করতেন। রাত বিরেতে একটা বেড়ালের ডাক, একটা ট্রামের ঘণ্টা, লোহাপেটার শব্দ, একটা চাবুকের শব্দ, শাঁখের শব্দ, একটা কুকুরের ডাক যে কি ভীষণ কাজ দিতে পারে, একটা চলচ্চিত্রের শরীরে তার প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যেই কিছু কিছু দেখেছি। কিন্তু তাঁরা এইসব সঙ্গীত পরিচালক নন। টালীগঞ্জের আবহসঙ্গীতের সাধারণ ব্যাপারটা ভুলে থাকাই ভালো। কারণ, আবহসঙ্গীতের মধ্যে আজও এই বই নামক সেলুলয়েডে সেই দুঃখের দৃশ্যে বেহালার ক্যাঁচ-কোঁচ, ('দুর্গা মারা যাবার সময় 'পথের পাঁচালী'র ঢাকের শব্দ মনে করুন পাঠক, কিম্বা হরিহর সর্বজয়ার কাছে লক্ষ্মীর ছবি, তেঁতুল কাঠের পিঁড়ে দিচ্ছে বাইরে থেকে অনেকদিন পর এসে, দুর্গার জন্য একটা কাপড়ও এনেছে হরিহর, সে জানেনা দুর্গা ইতিমধ্যেই মারা গেছে। সর্বজয়ার হাতে কাপড়টা তুলে দিতেই তারসানাই-এর চূড়ান্ত প্রয়োগ—কিন্তু কোনো কিছু মাত্র ক্যাঁচ কোঁচ নয়, বা কোনো বিশেষ রাগ নয়, চড়াসুরে হঠাৎ সর্বজয়ার যন্ত্রণাকে সেই স্কোরের সঙ্গে হরিহরের ব্যাপারটা সব মিলিয়ে বিদীর্ণ হাহাকার ছবিতে গেঁথে দিলো।) প্রেমের দৃশ্যে সেতারের মালা। অথবা সেই ঘ্যানর ঘ্যানর। একটি ছবির আবহসঙ্গীত অন্য একটি ছবির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায়। অথচ ভালো কাজ হচ্ছে বহুদিন ধরে। এই কলকাতাতেই চিৎপুরের জোড়াসাঁকোতে বসে। বহুদিন আগে ঠাকুর বাড়ীর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'রাজকাহিনী'তে মানে এই গল্পেতেই এই আবহসঙ্গীতের চূড়ান্ত উদাহরণ রেখে গেছেন। এরা পড়েও না, তাই জানেও না পূর্বসূরীরা আমাদের হাতে কি দিয়ে গেছেন।—একজন ভাই অন্য ভাইয়ের পরিচয় জানে না। দুজনেই দুজনের কাছ থেকে পৃথক। এক ভাই ঘরে একা ঘুমোচ্ছিলো। এক ভাই ঢুকে একটা ছুরি নিয়ে তার বুকে বসিয়ে দিল। অবনীন্দ্রনাথ 'রাজকাহিনী'র মধ্যে বলছেন, ঠিক এই সময়ে বাইরে একপাল শেয়াল কেঁদে উঠলো,—হায়-হায়-হায় করে। ব্যাপারটা বোঝবার আছে। এই শিয়ালের ডাক একটা পরিবেশের জন্য তো দিলোই দারুনভাবে, সঙ্গে সঙ্গে একজন বিখ্যাত সুরকার যা করতে পারে তাঁর সৃজনমূলক উদভাবনীয় ভাবনায় তাই করলো। পলাশবাবুর দল বুঝবেন কি, হেমন্তবাবু, কালীপদবাবুর দল কি বুঝবেন—এই স্কোর বা তার কম্পোজিশন কিভাবে অত্যন্ত সাধারণভাবেই আনা যায়। পলাশবাবুরাও এই স্কোর এই কম্পোজিশনে যেতে পারবে না, আর কালীপদ সেনের দল ওই স্কোর ওই কম্পোজিশনকে আগিয়ে দেখিয়ে দেবার কথা ভাবতেও পারবে না। চরিত্রের যে পটভূমি, যে ব্যাকগ্রাউণ্ড, যে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার পরিবেশগত ভাবনা থেকে যে একটা ডাইরেকটরস্ পারসপেকটিভে গিয়ে পৌঁছনো যায়। সলিল চৌধুরী কিন্তু সুশীল মজুমদারের 'লাল পাথর'-এর মত বাজে একটা সেলুলয়েডে বাঁধা নিয়মেই, যন্ত্র নির্বাচনের চতুরতায় একটা ভিন্ন স্কোর বা কম্পোজিশনকে জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। সানাই দিয়ে যা খুবই প্রচলিত, আশাবরী আর কলাবতী কিম্বা কিছুটা পূরবী রাগের ছোঁয়া দিয়ে কি সাংঘাতিক কাজ তা ভাবা যাবে না—ছবিটা হিট করেছিল সেই সময়। আবার বিপরীতে একবার ভাবা যাক মৃণাল সেনের 'আকাশ কুসুম' নামক কমার্শিয়াল ছবিতে বা ফিল্মে (আমি এটাকে ফিল্মই বলছি এবং বলবেনও সবাই।) গান বাদ দিয়েই ছবিটা তৈরী করেছিলেন সুধীন দাশগুপ্ত। গান নেই অথচ সমস্ত ছবিটার লিরিক্যাল মেজাজ, মিউজিক্যাল টোন সবই এসেছে দারুণভাবে। ওখানে

ওই স্কোর আর কম্পোজিশনের ব্যাপারটা আছে। 'ডাক হরকরা' নামক একটা অতি সাধারণ মানের ছবিতে যা সেলুলয়েড বইতেও সুধীনবাবু একটা অন্য মেজাজ এনেছিলেন। গল্পের এবং চরিত্রের পটভূমি তার বিস্তারের রিয়ালিটিকে ধরবার জন্য প্রফেশনালভাবে করেও একটা অন্য স্তরে পৌঁছনো গিয়েছিলো, মান্না দের গলায় 'আমি তোর বিচারের আশায় বসে আছি'—গানটির কথা ভাবুন এবং ওই সঙ্গে সার্বিক আবহের কথাটাও ভাবুন। অবশ্যই স্বীকার করছি দারুন ইনটেলেকচুয়াল কিছু হয়তো নয় আবহ ব্যাপারটা এখানে তবুও একটা সাধারণ স্কোর আর তার কম্পোজিশন পটভূমিকে জড়াতে সক্ষম হয়েছিল। আমরা গ্রামীন পটভূমিতে 'ফুলেশ্বরী' নামক একটি ছবিতে দেখলাম ফুলেশ্বরী ফুলেশ্বরী করে কান্না জোড়া। সেই একই সুর সেই একই পদ্ধতি, সেই একই ভাবনায় বহুদিন ধরে কেবল ঘুরপাক আর ঘুরপাক, কোনো ডেভলাপমেণ্ট নেই, কোনো কিছু নেই।

আবহের ব্যাপারে সঙ্গীতের চরিত্র যে কি, তার অস্তিত্ব কি প্রকাশ করে, আমাদের চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র (মানুষটিকে দারুন কাজের মধ্যে ব্যস্ত রাখতে পারলে চলচ্চিত্র জগৎ, এই কমার্শিয়াল চলচ্চিত্র জগৎ অনেক কিছু বৈচিত্রপূর্ণ প্রাণ-সম্পদে ভরপুর কিছু পেত, আমাদের দুর্ভাগ্য তা হয়নি।) সলিল চৌধুরী, সুধীন দাসগুপ্ত, রবিশঙ্কর ভেবেছেন, তাঁদের একটা স্বতন্ত্র ভাবনাই ছিলো ফিল্মের মিউজিক সম্পর্কে। আর বাংলা দেশের নবনাট্যেতো এতো ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে, শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য্য, উৎপল দত্ত, শ্যামল ঘোষ, অজিতেশ ব্যানার্জী, রুদ্রপ্রসাদ, নীলকণ্ঠ, বিভাস চক্রবর্তী এবং খালেদ চৌধুরী আর ব্রাত্যসঙ্গীতকার দেবব্রত বিশ্বাসের মধ্যে তার উদাহরণ দিলে এই হেমন্তবাবুর দল আর পীযুষবাবুর দল আঁতকে উঠবেন। (প্রসঙ্গত বলতে ইচ্ছে করছে, এই দেবব্রতবাবু রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে কি নিদারুণ মনো-গ্রাহ এবং জনতার সবখানে রবীন্দ্রভাবনাকে পৌঁছে দিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন তাতে বিস্ময়ের অবধি থাকে না, বস্তুতঃ দেবব্রতবাবু জানেন পরীক্ষা নিরীক্ষা জিনিসটা কি আসলে। সেটা কি করে কোনখান থেকে কিরকম করে ভাবতে হয়, কাজ করতে হয়। এত ষড়যন্ত্রের চাপে গুঁড়িয়ে দেবার প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর রেকর্ড সবথেকে বেশী বিক্রী হয়, কে কেন সেই ডিস্ক? দেশের সাধারণ মানুষই কেনে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে আন্তরিকতার ব্যাপারটা যদি ঠিক হয়, সৎ হয়, শক্তি যদি ঠিক থাকে, তা হলে সবদিক থেকেই জয় আনতে পারে, দেবব্রতবাবুকে দেশের ইনটেলেকচুয়াল গ্রুপ যেমন মানে, তেমনি সাধারণ লোকও। এখানেই নিহিত আছে তাঁর অসীম ভাবনা, এতে কি তাঁর কমার্শিয়াল মার্কেট পেতে অসুবিধে হয়েছে কিছু?) যদি ঈশ্বর তাই দিতেন অসীম করুণাময় হয়ে, তা হলে এই হেমন্তবাবু, স্বদেশ স্বরকার, শ্যামল মিত্র, সলিল সেন, সলিল দত্ত, পলাশবাবু, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এই মানুষটি এই সেলুলয়েডে এখনও যে গুটিকয়েক কাজ করেছেন তাতে তার আবহ বিচার অত্যন্ত নিকৃষ্ট। কিন্তু সঙ্গীতের অর্থাৎ গানের সুরের মিক্সিং, স্কোর, কম্পোজিশন, প্রয়োগ, গান গাওয়ার পদ্ধতি, এইসব বেশ কিছুটা উন্নত মানের, এবং একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ধর্মী। এতেই কাজ করে এখনও পর্যন্ত তিনি যে কাজের সুযোগ করেছেন, প্রত্যেকটিই সাফল্য এনে দিয়েছে। অবশ্যই সেই কাজ হেমন্তবাবুদের মত প্রবল সংখ্যক না হয়েও।), কালীপদ সেন, অধির বাগচি, রবিন চট্টোপাধ্যায় (এই মানুষটি আমাদের ছেড়ে গেছেন কিন্তু তাঁর গানে সুর একটা সম্পদ সন্দেহ নেই। কিন্তু আবহ সঙ্গীত এতই নিকৃষ্ট মানের যে বিচার করবার দরকার হয় না।) দীর্ঘদিনের এত প্রবল সংখ্যক কাজের মধ্যেও অন্ততঃ সামান্য একটা দৃশ্যেও আমাদের কাছে তীব্রভাবে ফুটে বেরিয়ে এসে একটা স্তর-নির্মাণ করতে পারেনি। বারবার প্রমাণ হয়েছে এঁদের কাজের মধ্যে যে ভালো ব্যাটসম্যান হলেই সে ভালো ফিল্ডার বা ক্যাপ্টেন হয় না। এমন একটাও সেলুলয়েড নেই আমাদের হাতের কাছে যাতে বলা যাবে ছবির স্পন্দ ছন্দের সঙ্গে একই তালে গান বেরিয়ে এসেছে। পাঠক ভাবুন সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন' ছবিটার কথা, 'কিম্বা ঋত্বিক ঘটকের 'সুবর্ণরেখা', 'কোমলগান্ধার'।

নতুনদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোনো স্থান নেই এই টালীগঞ্জের সেলুলয়েডে। টালীগঞ্জ কমার্শিয়াল জগৎ বারবারই প্রমাণ করতে চায় নতুনেরা বন্ধ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। তাই তাদের দুচোখে দেখতে পারে না। তা হলে হৃদয় কুশারী, দরবার ভাদুড়ী, বিনয় রায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র একটাও কাজ করতে পারেন না কেন? কেন জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় একটাও কাজ পান না টালীগঞ্জে? কেন? সাংঘাতিক গায়ক অখিলবন্ধু ঘোষ, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায় দূরেই থেকে যান, আমরা তো কমার্শিয়াল সেলুলয়েড তৈরী করতেই চাইছি, তবে সেই যজ্ঞে এঁদের মতো মানুষের কাজ নেবো না কেন এটাই বোঝা যায় না। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, চিন্ময় লাহিড়ীকে দিয়েও এই কমার্শিয়াল সেলুলয়েডে অনেক কাজ করানো যায়। যেমন নৌসাদকে হিন্দী ফিল্মের কমার্শিয়াল গ্রুপই কাজে লাগায়, শচীন কর্তাকে কাজে লাগায়, জয়দেবকে কাজে লাগায়, রৌশনকে কাজে লাগাতো। টালীগঞ্জে কিন্তু এরকম কোনো প্রবণতা নেই, টালীগঞ্জ দুচোখে এদের দেখতে পারে না। অথচ নতুনদের মধ্যেই আজকের বিখ্যাত অনুপ ঘোষাল ছিলেন, সত্যজিৎ রায়ই তাঁকে আবিষ্কার করেন 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন' ছবিতে এবং তিনি বিখ্যাত হন। এই তো মাত্র কিছুদিন আগেই কলকাতার গণেশ টকিতে থাকতো আজকের হিন্দী কমার্শিয়াল ফিল্মের গানের দুনিয়ার উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক রবীন্দ্র জৈন, টালীগঞ্জ তার খোঁজ পায় নি, অথচ কত ফাংশান যত্রতত্র তিনি করেছেন। এই 'নবদিগন্ত'তেই দেখা গেছে সঙ্গীতের দারুণ ব্যর্থতা, যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি (আবহ

বিচারের ব্যাপারটা ভুলে যাচ্ছি এখানে) হরিচরণের বড় মেয়ের গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার পর তার মৃতদেহ শ্মশানে দাহ করতে আনা হয়েছে, ওইখানে নজরুলের গান—শূন্য এ বুকে পাখী মোর ফিরে আয়, গানটি ব্যবহার করা হয়েছে, উত্তমকুমার চড়া মেকআপ নিয়ে হাতে জ্বলন্ত প্যাকাটি নিয়ে মুখাগ্নি করছেন, ঠিক এই সময় থেকেই গানটি ব্যাকগ্রাউণ্ড থেকে হচ্ছে। আমাদের বোঝানো হচ্ছে যেন হরিচরণের বিবেক বা মানসিকতার এই কথাগুলো তার কন্যার ভালোবাসার স্থলে বিয়োগ ব্যথা থেকে আসছে, কি ভীষণ তিনি তাঁর মেয়েকে ভালো-বাসতেন এটা তারই নজির, (এইরকম ভাবনা আমাদের গুছিয়ে সাজিয়ে নিতে হবে, তবে,) আমরা সকলেই বাঙ্গালী দর্শক হিসেবে এই গানটিকে ভালোবাসি এবং তাকে চিনি। গানটি এখন প্রবাদ বাক্যের মতই হয়েছে যেমন—সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল। কারণ, নজরুল বড় পুত্র মারা যাবার পর দারুণ রক্তাক্ত হৃদয়ে ব্যথার শরীর ও মানসিকতা নিয়ে ওই শূন্য বুকের গানটি রচনা করেছিলেন। এবং গানটির দারুন ভয়ানক সুন্দর গায়কী ইতিমধ্যেই গ্রামাফোন ডিস্কে শুনেছি, যেটি শুনলেই কিছুক্ষণ থমকে যেতে হয়। এইখানে এই 'নবদিগন্ত'-এ এইরকম দৃশ্যময়তায়ও ওই চমৎকার গানটি সুপ্রযুক্ত বাণী নিয়েও কোনো বিশেষ মাত্রা সংযোজন করতে পারলো না, কেন? এর মূলের ব্যাপারটাই পলাশবাবু এবং সঙ্গীত পরিচালক কালীপদ সেন বুঝে উঠতে পারেন নি। এবং যিনি গেয়েছেন সম্ভবত মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় তিনিও, সেই বেদনা, সেই চাপা আর্তি, অবাক্তার শূন্যতা বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারেননি। অতএব এমন সুন্দর ও চমৎকার গানটি ইতিমধ্যেই যা জনপ্রিয়তার শিখরে, সেই গানটিও ব্যর্থ হয়ে গেল, এই সঙ্গে যোগ হবে দৃশ্য গ্রহণের চূড়ান্ত ব্যর্থতা, এরকম বহু কমার্শিয়াল সেলুলয়েড থেকে উদাহরণ দেওয়া যায়।

আমাদের টালীগঞ্জে সেলুলয়েডের বইতে কমার্শিয়ালের নাম করে দিনের পর দিন এইসব কাণ্ডকারখানা চলেই যাচ্ছে। বহু টাকাও ব্যয় হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে, আর জলেও চলে যাচ্ছে, ইনডাস্ট্রিও ধুঁকছে। এইসব ইনডাস্ট্রির মানুষ এই ইনডাস্ট্রিকে বাঁচাতে চান, অথচ এই ইনডাস্ট্রি যে বাঁচছে তাও দেখা যাচ্ছে না। ক্রমশঃই তার স্বাস্থ্য ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে, এরাই গালাগালি দেন আর্ট ফিল্মমেকারদের, বা একটু বুদ্ধি খরচ করে ছবি তৈরী করতে চান তাদের। বলে বেড়ায় ওসব বুদ্ধি-জীবিদের বানানো ব্যাপার, কেউ দেখবে না, কারণ, দেশের মানুষের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ নেই। আবার পরক্ষণেই দেখা যায় শ্লোগান তোলা হচ্ছে, পোস্টার দেওয়া হচ্ছে, বাংলা ছবি বাঁচান বলে। এই ক্ষীণদেহ জীর্ণ অসুস্থ ইনডাস্ট্রিকে বাঁচাবার জন্য অধিক পরিমাণে অর্থলগ্নী করার মতো বহু ধনী প্রযোজককে এই ইনডাস্ট্রি আগেই ফতুর করে দিয়েছে আপন প্রতিভার গুণে। আবার বলা হচ্ছে এখন রঙ্গীন ছবি তৈরী করার ল্যাবোরেটরি করে দিলে এক হাত নিতে পারতো এই ফিল্ম মেকাররা, আমার তো মনে হয়, সরকার যদি এইসব 'নবদিগন্ত' মার্কা ছবিতে, না, সেলুলয়েড বইতে বছরে ১০০ কোটি টাকা ঢালেন, তবুও বাঁচবে না এই ইনডাস্ট্রি। কারণ, গোড়াতেই তো অজস্র গলদ রয়ে গেছে। আর সেই গলদের সমুদ্রে টাকা নিয়ে নামলে নুনের পুতুলের মতই গলে যেতে হবে। আর এই গলদের বন্যাতেই শঙ্কর ভট্টাচার্য্যের 'দৌড়'-এর মত সুস্থ মানের উন্নত মানসিকতার স্পষ্ট ছবি বা ফিল্ম, যা বই নয়, তাই ভেসে যায় অবলীলায়, দর্শক নিতে পারে না। এইসব 'নবদিগন্ত' মার্কা সেলুলয়েডের বই যতক্ষণ না বন্ধ হবে, ততক্ষণ 'দৌড়'-এর মতো পরিপূর্ণ ছবিও বাঁচবে না কিছুতেই, এর আগে বাঁচেনি 'যদুবংশ', 'ছায়াসূর্য' পার্থপ্রতিমের, বাঁচেনি 'ছেঁড়া তমসুক', 'স্বপ্ন নিয়ে', 'স্ত্রীর পত্র' পূর্ণেন্দু পত্রীর, 'তের নদীর পারে' বারীন সাহার। সুস্থ কমার্শিয়াল ছবিই যে কত উন্নত মানের হতে পারে মৃণাল সেন 'নীল আকাশের নীচে' ছবিটাতে বলিষ্ঠভাবে তা প্রমাণ করতে পেরেছিলেন। অজয় কর পেরেছিলেন 'সাত পাকে বাঁধা'-তে, তপন সিংহ 'জতুগৃহতে', তরুণ মজুমদার 'শ্রীমান পৃথ্বিরাজ' ও 'বালিকা বধূ'-তে।

প্রসঙ্গত এই 'দৌড়' ছবিটার বিষয়ে কিছু বলবার প্রয়োজন আছে অল্প কথায়, যে বিষয়টি বলবার জন্য এই প্রবন্ধে বার বার চেষ্টা হচ্ছে সেইটা আরও স্পষ্টতর করার জন্য। প্রসঙ্গত 'নবদিগন্ত'-এর মতোই এই 'দৌড়' কাহিনীটাও একটি উপন্যাস থেকেই নেওয়া। শঙ্কর ভট্টাচার্য্য সমরেশ মজুমদারের 'দৌড়' উপন্যাসটি থেকে বেছে নেন সিনেমা তৈরীর এলিমেণ্ট, বা মালমশলা। মূল উপন্যাসটি থেকে কয়েকটি ঘটনা ও চরিত্রের নামগুলো ছাড়া আর তেমন কিছুই কাহিনীকে অনুসরণ করার প্রয়োজন হয়নি। কারণ, শঙ্করবাবুকে এই কাহিনী নির্বাচনের সময় ভিস্যুয়াল আর্ট ফর্মের কথাটি ভাবতে গিয়ে আক্রান্ত হতে হয়েছিল, সিনেমার মূল ভাবনা তাকে গ্রাস করছে বলেই ঘটনা ও চরিত্রের এবং তার পরিবেশ ও সময়ের গ্রোথ এবং বিশেষ ডেভেলাপমেণ্ট ক্যামেরার বিশেষ ভাষায় বলবার চেষ্টা দেখা গেছে। এখানে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, বস্তুতঃ সমরেশ মজুমদারের উপন্যাসের বক্তব্য বা চিত্রণ আর শঙ্কর ভট্টাচার্য্যের 'দৌড়'-এর বক্তব্য, মানে সিনেমার বক্তব্য অনেকটাই বিস্তারিত। উপন্যাসের মূল চরিত্র রাকেশ যে একজন সমকালীন যুবক যার জীবনে একমাত্র শ্রদ্ধেয় বস্তু তার প্রেম, এই রাকেশ বেপরোয়া সুবিধাবাদী জীবনটাকে নিতান্তই জুয়া খেলার দানেই ভাবে। কিন্তু সিনেমার রাকেশ একজন অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত আর নিম্নবিত্ত পরিবারের মানুষ। বহু স্বপ্ন বহু ইচ্ছা তাকে ঘিরে থাকে, সে কিন্তু লোভী নয়, সংসারের দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও, সে তার যোগ্যতা আর অযোগ্যতার দোলনের মাঝে থেকে চাকরী করে খেয়ে পরে কোনো রকমে

টি'কে থাকতে চায় এই সমাজ ব্যবস্থায়। কোনো ঝামেলায় যায় না। কোনো বিশেষ রাজনীতি রাকেশকে মোটেই টানে না, আকৃষ্ট করেনা কোনো বিশেষ ইজ্‌মে। এই রাকেশ রাজপথের তীব্র উত্তপ্ত মিছিলেও যায় না, আখেরে যেখানে তারই মতো চাকুরীজীবীদের দাবী আদায়ে ভালো হবে। উপন্যাসের রাকেশ ঘোড়ার পিছনে দান দেয় বহু টাকা ঢালে ও পায়। ফিল্মের রাকেশ এই পথেই যায় না, অন্যকে ঘোড়ার খবর দেয়। এই রাকেশকে সঙ্গে নিয়ে রাকেশের একেবারে বিপরীতে দাঁড়িয়ে শঙ্করবাবু ঢুকে পড়েন সমকালীন উচ্চমহলের শীততাপনিয়ন্ত্রিত গৃহ থেকে নীচের মহলের দুর্গন্ধ আর ভ্যাপসা গরমে, যেখানে রয়েছে দেশব্যাপী এক তীব্র অসুস্থতা দরজায়-দরজায়। ভীরু, দুর্বল, লোভহীন রাকেশকে সঙ্গে নিয়ে শঙ্কর ভট্টাচার্য্য প্রমাণ করেন, এই মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত মানুষের ভীরুতা কোথায় টেনে নিয়ে যায় বা যাচ্ছে। এই সমাজের মানুষের কোনো রাগ নেই, তাই সবকিছুকেই সে মেনে নেয় বিনা বাধায়। অবস্থার দাসত্ব গ্রহণ করে। তাই তাদের বৃহত্তর কোনো বিপ্লবী চরিত্র নেই, সেই বৃহত্তর লক্ষ্য, চাকরী আর বাড়ী, এই লক্ষ্যে কোনো এনার্কিস্ট রাগ তাদের আসে না, আবার বিপরীতে এই দেশের সমস্ত আন্দোলনে বিশেষ করে কমিউনিস্ট বা বামপন্থী আন্দোলনে এবং সাংস্কৃতিক জগতে এই শ্রেণীর মানুষেরাই দীর্ঘকাল ধরে নেতৃত্ব দিয়ে কাজ করছেন। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এইসবের মধ্যে তাদের শ্রেণীগত ধ্যান ধারণা তার অনুভব বজায় থেকেই যায় বা যাচ্ছে সর্ব সময়েই। তাই বড় রকমের কোনো বিপ্লবের বা সংগ্রামের টানটান ঘটনা বা চরিত্র আমরা এইখানে দেখিনা। ফলতঃ এই ধারায় কাজ করেও বিপ্লবী নামাবলী গায়ে দিয়েও ছদ্ম বিপ্লবী ছদ্ম সংগ্রামী নেতা সেজে, সে আখেরে ভেতরে ভেতরে বুর্জোয়া ও প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতায় বন্দী। এবং নিজের ক্যারিয়ার সুষ্ঠুভাবে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে আরামকেদারায় রাখবার জন্য সে কাজ করে আবার সে ছাড়তেও পারে সব কিছু। সুহাসের চরিত্রটি (অনিল চ্যাটার্জী অভিনীত) বিশ্লেষণ করলে এই প্রবণতা ধরা পড়ে স্পষ্টভাবে। একজন সরকারী কর্মচারী মিস্টার রায় (বিকাশ রায় অভিনীত) তার আচরণ, ব্যবহারিক জীবন কাজকর্ম সব কিছুতেই দুর্নীতি, অরাজকতা, অশালীনতা, ধূর্ততা সব কিছুকেই ধরা হয়, বোঝাতে চাইছেন পরিচালক বা ফিল্মমেকার, এই সরকারী কর্মচারীর মাইনের মাসিক আয়ের নির্দিষ্টতার বাইরেও নিশ্চয়ই একটা কিছু মোটা পাওনার ব্যাপার আছেই, না হলে এই বিশাল খরচের পর্বত বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এরই ফাঁকে এরই তলে রাকেশরা তাদেরকে সঙ্গে নিয়েই চাকরী বাঁচিয়ে পেটের ভাত যোগাড়ের ব্যাপারটা একদম অম্লান রাখতে চায়, আবার এই সময়েতেই, এই সমাজ ব্যবস্থায় এই রাকেশের সঙ্গে পড়ে অন্য একজন রাকেশ, যে ইউনিভার্সিটিতে পড়তো এই দুই রাকেশের সঙ্গে আজকের সুহাসদা ; সেই রাকেশ পচা-গলা সমাজ ব্যবস্থার, রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার দুর্নীতিকে মুক্ত করতে বৃদ্ধা মাকে একাকী রেখে যায় হয়ে পড়ে সার্বিক মাকে এবং তার সন্তানদের শোষণ মুক্ত করবার জন্য। চাকরীর রাকেশ ভুলে যায় অবলীলায় এই রাকেশের কথা, ঠিক এইখান থেকে জটিলতাকে কনটেন্টের মধ্যে রেখে আগাগোড়া ফিল্মটি তৈরী হয়ে যায়। কিন্তু তবুও শঙ্কর ভট্টাচার্য, আমাদের দেখান অনবরত খোঁচা খেতে খেতে এই সব রাকেশ একবার ফোঁস করে ওঠে। যদিও এই ফোঁস-এর ব্যাপারটা প্রচণ্ড ভাববাদী বিষয়। তবুও ভালো লাগে বিষয়টি সাজানোর গুণে ও নিষ্ঠার এবং যত্নের ব্যাপারে। অদ্ভুত আত্মমগ্ন নিস্তরঙ্গ জগৎকে একবারও অন্তত রাকেশ ছিঁড়তে পারছে এটাও ভালো লাগে। কিন্তু সে যদিও ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী ও ঔপনিবেশিক কাঠামোটাকে ভাঙ্‌বার চেষ্টা করেনা, তার সেই রকম প্রবল ইচ্ছাও নেই, কিন্তু তবুও ছবির পরদায় তাকে চিনে নিতে আমাদের দ্বিধা অথবা ভুল হয় না। চলচ্চিত্রকার হিসেবে শঙ্করবাবুর কোনো বিশেষ সহানুভূতি নেই রাকেশকে জিতিয়ে দেবার। ঘটনাস্রোত আর জীবন-প্রবাহ যেরকম হতে চায়, তাতেই আস্থা রাখা হয়েছে। যদি সহানুভূতি থাকতো, তাহলে তাকে সাহায্য করতে হত শ্রেণীর প্রকট একটা স্বার্থকেই, যা ভীষণ বিপজ্জনক একটা ব্যাপার এই নিরক্ষর, অর্ধশিক্ষিত, চেতনাহীন দেশে ছবি-করিয়ে হিসেবে। এই ছবিতে যে কারণে রাকেশের রাগ ফুটে উঠেছে, এবং সে কারণেই সে "শুয়োরের বাচ্ছা" বলছে এস্ট্যাবলিশমেন্টের মিস্টার রায়কে, জীবনের দীর্ঘ দৌড় লম্বা সফরে বার বার হোঁচট খাচ্ছে যেখানে জীবন, সেই পরিস্থিতিতে রাকেশ বীনাকে দেখতে পায়, যে রাকেশ একদিন অনিশ্চিত নড়বড়ে ভবিষ্যতের জন্য তাকে গ্রহণ করতে পারেনি জীবনে। সেই বীনাকে শরীরের রোগ থেকে এবার বাঁচাতে চায় রাকেশ এই চূড়ান্ত মিডলম্যানের অবস্থার মধ্যে থেকেও। এই চূড়ান্ত অবস্থার মধ্যেই তার সবকিছুকে ঘিরেই ছবি শেষ হয়। আবারও বলছি, তার এই বিদ্রোহ বা রুখে ওঠা সম্পূর্ণ এক ভাববাদী ব্যাপার। কিন্তু তবুও এই ছবির বিশেষ সিনেমার গন্ধ, বিশেষ তাৎপর্য, সব কিছুকে ঢাকা দিয়ে দেয়। যেখানে সিনেমার ফর্মে ধরা পড়েছে এই মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত শ্রেণীটা টাইটে পরিণত হচ্ছে ক্রমশই এই বিশ্রী সমাজব্যবস্থায়। এই ছবিতে তারিফ করতে হয় ঘটনার সময়কে যে ভাবে ধরা হয়েছে, ১৯৭৭ সালের ৮ থেকে ১৫ই আগস্ট। মোট সাত থেকে আট দিনের বিস্তারে এই সিনেমার কাহিনী বিস্তৃত। ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষের নতুন দিগন্ত ব্রিটিশ শাসনের থেকে মুক্তি। আর এই ১৫ই আগস্ট ১৯৭৪ সালে রাকেশের আর্থনৈতিক বন্ধনের নাগপাশ থেকে মুক্তির দিন, রাজনৈতিক সংসারের হৈঁসেলের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখে নিয়ে ছবিটিকে এক বিশেষ তাৎপর্য্যে বেঁধে দিয়েছেন শঙ্করবাবু। ছবির শট্‌ ডিভিসন, ক্যামেরার কাজ, আলোর ব্যবহার, সঙ্গীতের ব্যবহার, শব্দ অনুষঙ্গ ব্যবহার, পাত্রপাত্রী নির্বাচন, স্থান নির্বাচন, সবই এককথায় অপূর্ব। একটা শট্‌ মনে আসছে এক্ষুনি যা ভীষণ, দারুণ লেগেছে, যেখানে পঙ্গু নীরার (মহুয়া রায়চৌধুরী

অভিনীত) সামনে ক্যামেরা ধরেই জুম ব্যাক করে আসে আবার তৎক্ষণাৎ কাট না করেই টিলট্ ডাউন করে আসে বারান্দায়, সিঁড়িকে দ্রুত ঘর্ষণে দেখিয়ে রাকেশের প্রবেশ হয়,—অপূর্ব শট্‌টি। এই পঙ্গু প্রেমিকা নীরার পঙ্গুত্ব যেন রাকেশের পঙ্গু মানসিকতার প্রতীক। ওর পঙ্গুতা যত বেড়েছে ততই রাকেশের মানসিকতার জড়তার জট বেড়েছে। এইখানে প্রসঙ্গত আরনল্ড ওয়েস্কারের 'চিকেন স্যুপ উইথ বার্লি' নাটকের হ্যারির পক্ষাঘাতের প্রতীক চিন্তার গভীরতা মনে পড়ে যায়।

ছবিটি নিঃসন্দেহে বাণিজ্যিক ছবি। প্রচলিত অর্থে কমার্শিয়াল ছবি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলার টালিগঞ্জের সিনেমার তথাকথিত জগতে দারুন স্বতন্ত্র চরিত্রের। ছবিটি যেমন একদিকে দারুন আনন্দদায়ক তেমনিই আবার তীব্রভাবে উদ্দেশ্যমূলক। যে উদ্দেশ্য অত্যন্ত সৎ ও আন্তরিক ভাবনা। যা শিল্পীর নিজ দায়িত্বের গভীর কথা। আনন্দদায়ক হওয়া সত্ত্বেও তা যে ভীষণ শিক্ষা ও বুদ্ধির চেতনার গভীরে তরঙ্গ তুলতে পারে এই ছবি তারই নিদর্শন। যেমন ব্রেখটের নাটক। একধারে দুর্দান্ত আনন্দদায়ক, আবার বিচারে তেমনি শিক্ষামূলক চেতনাসমৃদ্ধ।

'দৌড়' ছবিটি মোক্ষম প্রশ্নে নিজেকে জড়ায় বলেই এবং সিনেমার নিজস্ব-ভাষায় অত্যন্ত স্মার্ট ভঙ্গিতে কথা বলতে পারে বলেই ছবিটিকে প্রশংসা করতে ইচ্ছে করে। ভাবাই যায়না, ফিল্মমেকার শঙ্করবাবুর এই ছবিটি দ্বিতীয় ছবি। দুর্ভাগ্যবশত এই ছবি তেমন চলেনি। বহুদিন কাজহীন অবস্থায় বসে থাকতে হয় এইসব ফিল্মমেকারকে। এইরকম একজন সৈকত ভট্টাচার্য্য 'অবতার'-এর মতো চমৎকার ভাবনার এত সুন্দর চলচ্চিত্র তৈরী করতে পারলেও তা চলে না। কত কম টাকায় এই ছবিটি তৈরী হয়েছে। অথচ কত বিস্তৃত ভাবনা আর দক্ষতা এখানে রয়েছে। তবুও ফ্লপ্ করে যায়। কাজহীন অবস্থায় ফিরে যেতে হয়। অথচ বিশ্বের সমস্ত দেশের চাইতে সব থেকে দরিদ্র দেশ হয়েও এই আমাদের দেশ, আবার যেখানে যে দেশে সব থেকে সেলুলয়েড বই তৈরি হয়। যে দেশের শতকরা সত্তর জন মানুষ এখনও নিরক্ষর। শতকরা পঁয়ত্রিশ জন মানুষ মাটির ঘরে বাস করে। গড়পড়তা আয় যেখানে মাত্র দুটাকার মত, কৃষকদের পঁয়ষট্টি (৬৫) পয়সার মতো। শেষ পরিসংখ্যানে আবার জানা যায় একটাকার মূল্য এই মুহূর্তে মাত্র দশ পয়সা। যেখানে যে দেশের বৃহত্তর মানুষ সংবাদপত্রের সঙ্গে যোগাযোগহীন। সেইখানে সেই মানুষকে সচেতন করবার জন্য তৈরি হচ্ছে 'নবদিগন্ত', 'ভোলা ময়রা', 'চামেলী মেমসাব', 'প্রণয়পাশা', 'ফরিয়াদ', 'বহ্নিশিখা', 'স্ত্রী', 'সন্ন্যাসী রাজা', গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে মা করুণাময়ীর আদর্শ, তারক নাথের আদর্শ। যেখানে বিজ্ঞানকে প্রযুক্তিকে ছোট করা হচ্ছে। মগজ ধোলাই হচ্ছে. সামাজিক সমস্যা, রাজনৈতিক সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে বারবার সরানোর বিরাট এক কৌশল তৈরী হচ্ছে। একটা ভুল পথে জড়ানো হচ্ছে মানুষকে, অলস অকর্মণ্য করা হচ্ছে। হায়রে সিনেমার প্রকৃত শক্তির কথা।

এই হচ্ছে যখন অবস্থা, তখন একমাত্র জনগণের সাথী ও বন্ধু হয়ে তার জীবন ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে পশ্চিমবাংলার গ্রুপ থিয়েটার। সমাজের পচাগলা সিস্টেমকে বদলে দেবার কথা এবং সঙ্গে সঙ্গে আনন্দময় অথচ চেতনার কথা তারা বলে চলেছে। নাটকের মধ্যে তারা জীবন-যাপনের প্রবাহের কথা যেমন বলছে ঠিক তেমনি শিল্পও করছে। যোগ্যতার প্রশ্নে বারবার পরীক্ষিত হচ্ছে। যে যোগ্যতার অভাব টালিগঞ্জের সব ক্ষেত্রেই। ঠিক এই জন্যই আমাদের সকলকেই ঈশ্বরের মতো কিছুটা নির্দয় ও নির্মম হতে হবে। কারণ, ইতিহাস আমাদের ভবিষ্যতে ক্ষমা করবে না আমরা যদি দায়িত্ব ভার না নিই, প্রতিকার না করি। বস্তুতঃ আমরা কেউই চাইনা দেশের সবাই রাতারাতি আর্ট ফিল্ম-মেকার হয়ে যান। এটা পাগল ছাড়া আর কেউ ভাবে না। বিদেশের দিকে তাকালেও আমরা দেখবো যে সেখানেও আর্ট ফিল্ম, কমার্শিয়াল ফিল্ম দুটোই পাশাপাশি হয়, হয়ে থাকে। একটা দেশের সবাই গোদার-এর মতো. ক্রুফোর মতো, আন্তোনিওনির মতো, সত্যজিৎ রায়ের মত, বার্তোলুচির মত ছবি তৈরী করবে এতো ভাবাই যায় না। কিন্তু একটা প্রভাব একটা উন্নত রুচির পরিশীলিত মানবিকতার দাগ চলচ্চিত্র সহজেই রাখতে পারে। আর তাই থেকেই কমার্শিয়াল ফিল্ম বাঁচবার রসদ পায়। সুন্দর মার্জিত ও রুচির যুক্তিগ্রাহ্য এবং বুদ্ধির মানসিকতায় ছবি তৈরী হতে বাধাটা কোথায়! এখন যদি আমরা দেখি সিমলার মানে এই কলকাতার সেই নরেন্দ্রনাথ দত্ত যিনি পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করে বিবেকানন্দ হয়েছিলেন, সেই নরেন্দ্রনাথ B.A. পাশ করে শহর কলকাতার বুকে চাকরী খুঁজছেন, তবুও পাচ্ছেন না। এখন এটিকে টালিগঞ্জ যদি আমাদের সেলুলয়েডে দেখায় নরেন্দ্রনাথ চাকরী খুঁজতে খুঁজতে টাটা সেন্টারের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে তাহলে ব্যাপারটা কেমন দেখাবে ?

আগামী সংখ্যায় শেষ হবে।

গণদেবতা

চিত্রনাট্য : রাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কাট্ টু।

দৃশ্য—২২১

পাতু : এই দুগ্‌গা… !…দুগ্‌গা !

দুর্গা ঘুরে দাঁড়ায়। পাগলাটে চেহারা হয়েছে পাতুর। অবিন্যস্ত চুলদাড়িতে ভয় পাবার মত চেহারা। হাঁফাতে হাঁফাতে সে বলে—

পাতু : (ফিস্ ফিস্ করে) কুথা যেছিস রে ?…কক্কনা ?

দুর্গা : (এক মুহূর্ত তাকে দেখে) ক্যানে ?

পাতু তার ধুতির খুটো থেকে একটা ছোট্ট পুরিয়া বার করে।

পাতু : আজ রেতে…ইটা…বাবুদের গেলাসে মিশিয়ে দিবি ?

দুর্গা : কি উটা ?

পাতু : (আনন্দের সুরে) গরুমারা বিষ !…আমাদের জমিটা লিয়ে লিলে…দিবি ?



পদ্ম বৌ ও অনিরুদ্ধ (মাধবী চক্রবর্তী ও শমিত ভঞ্জ)

ছবি : ধীরেন দেব

গণদেবতা

চিত্রনাট্য : রাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার

কোর গ্রাউণ্ডে ঢুকেই ছুটে আসে। ছায়ামূর্তিটা পাতু বায়েনের। বিছানায় যতীন নেই।

পদ্ম : ও মা !…গেল কুথা ?

কাট্ টু।

দৃশ্য—২২৬

স্থান—নদীর পাড়ে শালের জঙ্গল।

সময়—সকাল।

যতীন আর উচ্চিংড়ে পাশাপাশি হাঁটছে।

যতীন : তোদের গাঁ-টা না…অ-সা-ধা-র-ণ— !

উচ্চিংড়ে : (খিল্ খিল্ করে) হেঁ হেঁ…

যতীন : হাসছিস যে ? কি বুঝলি ?

উচ্চিংড়ে : তোমার জামা উল্টো।

যতীনের জামাটাকে দেখায়।

যতীন : আরে ! তাই তো !

দূর থেকে একটা গানের সুর ভেসে আসে। উচ্চিংড়ে নদীর দিকে তাকায়। তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

উচ্চিংড়ে : বাবা !

সে দৌড়ে ফ্রেমের বাইরে চলে যায়।

কাট্ টু।

তারিনীর গান—

শোন্‌রে বলি
শুন হে সুজন
তোর জীবন রাধা
মনটি বাঁশি
মরণ বৃন্দাবন।
শুন হে সুজন
নিশির ডাকে হারালি রে
গহিন আঁধারে
পাখির ডাকে আসলি ফিরে
আবার নিজের ঘরে
ঘুমের নেশায় দেখিস না রে
তোর আঙিনায় কখন আসর
পাতল হে আগুন
শোন্ রে বলি
সময় যখন ফুরাবে রে
বেচাকেনার হাটে
নিজের কথা ভেবে ভেবে
ফিরবি নিজের ঘাটে
তখন, বুঝবি না তুই কেন ওরে
তুলসী তলায় রেখে মাথা
কানতে করে মন।
শোন্ রে বলি
শুন হে সুজন

দৃশ্য—২২৭

স্থান—নদীর পাড় ও চড়া।

সময়—সকাল।

প্রায় শুকনো নদীর ওপর দিয়ে তারিনী এই গান গাইতে গাইতে আসে। কয়েকটি ছোট ছোট শটে দেখান হয় যতীন গান শুনে মুগ্ধ। দুর্গা সারারাত্রির ক্লান্তি শেষে ভাঙা চেহারা নিয়ে এগিয়ে আসে। গানের কোন কোন লাইনে রি-অ্যাক্ট করে সকলে।

গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গা নদী পেরিয়ে এপারে যতীনের মুখোমুখি। একমুহূর্ত দ্বিধার পর সে কথা বলে—

দুর্গা : ও মা !…এত সকালে বাবু ?

যতীন : (নদীর দিকে তাকিয়ে) কি অদ্ভুত—না ?

দুর্গাও ঘুরে নদীটাকে দেখে।

কাট্ টু।

লং শটে দেখা যায় তারিনী নদীটা পেরিয়ে অন্য পারে চলে যাচ্ছে। উচ্চিংড়ে তখনও এপারে দাঁড়িয়ে।

কাট্ টু।

দুর্গা : উচ্চিংড়ের বাপ।

যতীন : মা নেই ?

দুর্গা : উঁ ?

যতীন : উচ্চিংড়ের মা নেই ?

দুর্গা : (একটু থেমে, হেসে) ও মা, থাকবে না ক্যানে ?

যতীন : তবে যে ও এমনি করে পরের বাড়ীতে পড়ে থাকে ?

দুর্গা সঙ্গে সঙ্গে রি-অ্যাক্ট করে, হাসি বন্ধ হয়ে যায়। যতীন দুর্গার দিকে তাকায়।

দুর্গা : ঐ তারিনীকে আজ অমন দেখছেন তো…আজ থেকে চার-পাঁচ বছর আগে…উয়রও একটা জমি ছিল…ঘর ছিল…তারপর সব গিয়ে ঢুকলো ঐ ছিরে পালের গভ্ভে !…জমি গেল…ঘর গেল…একদিন বৌটাও গেল।…এখন…ঐ জংশনে গিয়ে…বাজারের খাতায় নাম লিখাইছে।

যতীন : খাতা ?…কিসের খাতা ?

দুর্গা যতীনের দিকে তাকায়।

কাট্ টু।

যতীন সরল চোখে বিস্ময়ের সঙ্গে চেয়ে থাকে।

কাট্ টু।

দুর্গা : সে আপনি বুঝবেন না। উ খাতায় একবার নাম লিখাইলে—

বলতে বলতে থেমে যায় দুর্গা। অস্বস্তি হয় তার। হঠাৎ ছুটে ফ্রেম থেকে বেরিয়ে যায়।

কাট্ টু।

ক্যামেরা ট্র্যাক ফরোয়ার্ড করে যতীনের ওপর।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২২৮

স্থান—খিড়কি পুকুর।

সময়—দিন।

লং শটে দেখা যায় পদ্ম একবাটি মুড়ি হাতে নিয়ে চারদিকে অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকাচ্ছে।

পদ্ম : উচ্চিংগে—!…উচ্চিংগে—! না, আর পারিনে বাপু! সকাল-সন্ধ্যে এই ছেলের পেছনে টৈ-টৈ-টৈ-টৈ…

আবার পদ্ম উঠোনে ঢুকে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২২৯

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর উঠোন ও বারান্দা।

সময়—দিন।

একটা বাটি মুড়ি হাতে নিয়ে পদ্ম উঠোনে ঢুকে উচ্চিংড়েকে দেখতে পায় ও বলে—

পদ্ম : সকাল-সন্ধ্যে এই ছেলের পেছনে টৈ-টৈ-টৈ-টৈ—

কাট্ টু।

উচ্চিংড়ে সামনের দরজা দিয়ে বাড়ীতে ঢোকে।

পদ্ম : এই যে!…কুথা গিয়িছিলি বল্ তো?

যতীন : (off) মা-মণি!…মা-মণি!

হাতে একটা গাছের চারা নিয়ে উঠোনে ঢোকে যতীন।

যতীন শিগ্গির এক ঘটি জল, আর একটা শাবল! (চারাটা নিয়ে উঠোনের মধ্যিখানে বসে) এইখানেই লাগাই—কি বল্, উচ্চিংড়ে?

পদ্ম (এগিয়ে এসে) ও কি?

যতীন হেঁ হেঁ, বলো দেখি!…আসবার সময় দেখি রাস্তার ধারে এমনিই হয়ে আছে! (উচ্চিংড়েকে) কৈ রে—এলি?…যখন বড় হবে, ছায়া তো হবেই—আর থোকা থোকা লাল লাল ফুলে সারাটা উঠোন একবারে আগুন—বুঝলে—আগুন!…তখন মনে পড়বে আমার কথা!

পদ্ম : (গালে হাত দিয়ে) ও মা…তেঁতুল গাছে আবার লাল লাল ফুল কি গো?

যতীন : তেঁতুল…এটা তেঁতুল?

পদ্ম : তবে কি?

যতীন : (গম্ভীর হয়ে) হেঃ!…দিস ইজ 'সিজালপিনিয়া পাল্‌চেরিমা'।

পদ্ম : কি!!

যতীন : "সি-জা-ল-পি-নি-য়া পা-ল্-চে-রি-মা…" মানে তোমরা বলো কৃষ্ণচূড়া!…বোটানীর বই তো আর পড়োনি!

পদ্ম : ওসব বোঁটা-ফোঁটা বুঝিনে বাপু! দেখি—

হঠাৎ পদ্ম চারা গাছের পাতা ছিঁড়তে উদ্যত হয়।

যতীন : আরে, ও কি! ও কি!!…কি করছ?

পদ্ম কতগুলো পাতা ছিঁড়ে নিয়ে মুখে ফেলে চিবোতে থাকে। তারপর আরও কিছু পাতা ছিঁড়ে যতীনের মুখে গুঁজে দেয়।

পদ্ম : দেখি,—চিবোও, চিবোও—

যতীন একটু চিবিয়েই থেমে যায়।

পদ্ম : কি, কেমন?…কেমন লাগছে?

যতীন : ট…ক্…

পদ্ম হাসিতে ফেটে পড়ে। এমন সময় ভূপাল চৌকিদারকে দেখা যায় দরজার সামনে।

ভূপাল : নজরবন্দীবাবু—! এই যে,…চলেন গো একবার থানাটা হাজরে দিয়ে আসবেন।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৩০

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাশে ছিরু পালের উঠোন।

সময়—দিন।

ছিরু এবং দাসজী পাশা খেলছে।

পদ্ম : (off) সকাল সকাল ফিরো কিন্তু—

পদ্মর গলা শুনে দুজনে সেদিকে তাকায়। ক্যামেরা প্যান্ করলে দেখা যায় দূরে পদ্ম, যতীন ও ভূপাল।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৩১

স্থান—বাঁশ ঝাড়ের পাশে খিড়কি পুকুর ও রাস্তা।

সময়—দিন।

দেখা যায় পদ্ম বাড়ীর পেছনের দরজায় দাঁড়িয়ে, ভূপাল ও যতীন বাঁশ ঝাড়ের পাশ দিয়ে যায়।

পদ্ম : বেশী দেরী কোরো না যেন!

যতীন : আচ্ছা।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৩২

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাশে ছিরু পালের উঠোন।

সময়—দিন।

দাসজী : ব্বাবা!…এ যে সাক্ষাৎ রাধাকিস্টের লীলে হে!

ছিরু : উদিকে আয়ান ঘোষ!

বলেই সে উল্টোদিকে তাকায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৩৩

স্থান—বাঁশ ঝাড়ের পাশে খিড়কি পুকুর।

সময়—দিন।

পুকুরের উল্টো পার থেকে লো-অ্যাঙ্গেল শট্। অনিরুদ্ধ উল্টোদিক থেকে আসছে। সে রীতিমত টলছে তখন।

অনিরুদ্ধ : এ্যা ও! (তারপর যতীনের দিকে হাত নেড়ে) ইদিক্ ইদিক্…ইদিক্ ইদিক্—

যতীন এগিয়ে আসতে অনিরুদ্ধ তার জামা চেপে ধরে।

অনিরুদ্ধ : হ্যাঁঃ…উদিক কোথা?…আমার ঘরে সেঁধাই-ছিলি কেনে,—এ্যাঁ?

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৩৪

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর পেছন।

সময়—দিন।

পদ্ম দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে পায় অনিরুদ্ধ যতীনের জামা চেপে ধরেছে। সে প্রচণ্ড রি-অ্যাক্ট করে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৩৫

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাশে বাঁশঝাড়।

সময়—দিন।

ভূপাল : আহা, কম্মকার!…নজরবন্দীবাবু! তোমার ঘর ভাড়া লিছে যে গো—

অনিরুদ্ধ : ভাড়া লিছে!…কিসের ভাড়া?…আমি জানলাম না,—আমার ঘর ভাড়া লিছে!

হঠাৎ পদ্ম ফ্রেমে ঢুকে পড়ে অনিরুদ্ধর মুঠো থেকে যতীনকে কেড়ে নেয়।

পদ্ম : দেখি, দেখি,—যাও তো!…চলে যাও তোমরা!

যতীন সম্পূর্ণ হতভম্ব, পিছিয়ে যায় সে।

অনিরুদ্ধ : উঁ—! "চলে যাও"! আমার ঘরে উসব বেন্দাবন লীলে চলবে না—

কাট্ টু।

চকিতে পদ্ম ঘুরে দাঁড়ায় এবং অনিরুদ্ধর দিকে রক্তচোখে তাকায়। একটু বাদেই ঘরের দিকে চলে যেতে থাকে।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ : এ্যা-ও! উ কি!…তু কোথা চল্লি? ইদিক্… ইদিক্…

পদ্ম থেমে যায়, এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে এগিয়ে আসে। অনিরুদ্ধর মুখোমুখি ভাবলেশহীন দৃষ্টি নিয়ে তাকায়।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ বোকার মত হেসে ওঠে।

অনিরুদ্ধ : চার আনা পয়সা দিবি?

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—পদ্ম।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ জামার পকেট থেকে একটা খালি মদের বোতল বার করে।

অনিরুদ্ধ : দে না!…এই ছ্যাখ্!

পদ্ম : না!!

এবার পদ্ম আর থামে না। সোজা বাড়ীর উঠোনে ঢুকে যায়। পদ্মর অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত অনিরুদ্ধ অপেক্ষা করে।

অনিরুদ্ধ : ঠিক আছে, ঠিক আছে! কে তোর পয়সার ধার ধারে!…নবাবজাদী!

আবার উল্টোদিকে চলতে থাকে অনিরুদ্ধ।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৩৬

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাশে ছিরু পালের উঠোন।

সময়—দিন।

দাসজী : আবার চল্ল যে হে!

ছিরু : হুঁ…

দাসজী : তা দাও না,—এই মওকায় ব্যাটার একেবারে হাঁড়ি শুদ্ধ্ এঁটো করে!

দাসজীর কথার অর্থ বুঝতে না পেরে ছিরু পাল তার দিকে তাকায়।

দাসজী : কামারনী…কামারনী…(মিচ্কে হাসে)

ছিরু : নাঃ!…না দাসজী…

দাসজী : কেন ?

ছিরু : ক'টা দিন…ওসব—

দাসজী : সে কি হে ? বেড়ালের মুখে হঠাৎ হবিষ্যির গন্ধ !

ছিরু : 'পাল' কেটে 'ঘোষ' হয়েছি।…শালারা এখনো আড়ালে-আড়ালে হাসে। তাছাড়া, নজর এখন আমার অনেক ওপরে…

দাসজী : উদিকে ওপরের নজরও যে এখন তোমার দিকে হে—

ছিরু পাল দাসজীর দিকে তাকায়।

দাসজী : (গলা নামিয়ে) জমিদারবাবু !…চোৎ কিস্তির আগে…মাথায় হাত !…যদি ভরিয়ে দিতে পারো,…এক লাফে এ চাক্‌লার গোমস্তাগিরি !

ছিরু : দাসজী !

দাসজী : তবে হ্যাঁ, তার আগে কিছু সৎকাজ করে ফ্যালো দিকি !

ছিরু : সৎকাজ… ?

দাসজী : এই খুচরো ! ধরো একটা মন্দির সারালে…কি একটা থ্যাম্‌টা নাচালে…একটা হরিসভা খুললে…মানে পাঁচজন যাতে—(বলে, দুবার মুঠো খুলে বন্ধ করে) তবে হ্যাঁ,—যাই করো—এক ঢিলে দু পাখি !

ছিরু : কি রকম ?

দাসজী : এই মওকায় নিজের 'ঘোষ' নামটা একবারে পাকা করে ফ্যালো !…যেখানে যা কিছু করবে, পাথর খুদে লিখে দাও—

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৩৭
স্থান—সাধারণ।
সময়—দিন।

চড়া সুরে হারমোনিয়াম বাজছে। কতগুলি মার্বেল পাথরের পর পর ক্লোজ শট্।

শ্রী শ্রীহরি ঘোষেণ প্রতিষ্ঠিতং
অত্র হরি মন্দির
স্থাপিত ১০ই কার্ত্তিক। সন ১৩৩৩

এই পুষ্করিণীর সংস্কার
শ্রী শ্রীহরি ঘোষ কর্তৃক
সাধিত
সন ১৩৩৩। ১৬ই অগ্রহায়ণ

অত্র শিববাটী নির্মাতা
শ্রী শ্রীহরি ঘোষ
২২শে অগ্রহায়ণ। সন ১৩৩৩

শ্রী শ্রীহরি ঘোষের
অর্থ ও আনুকূল্যে
অত্র কূপ সন ১৩৩৩, ২রা পৌষ
তারিখে নির্মিত হইল

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৩৮
স্থান ঝুমুর নাচের আসর।
সময়—রাত্রি।

হারমোনিয়ামের ওপর থেকে ক্যামেরা পিছিয়ে এসে দেখায় এক ঝুমুর গানের আসর চলছে।

দর্শকদের সামনের সারিতে বসে আছে দারোগা, ভবেশ, হরিশ, গরাই, দাসজী এবং ছিরু পাল। একটি সুদৃশ্য শূন্য চেয়ার, বোধ হয় মান্যগণ্য কোন অতিথি আসবেন।

আসরের মাঝখানে একদল মেয়ে নেচে নেচে গাইছে।

'ভালো ছিল শিশুবেলা
যৈবন ক্যানে আসিল—'

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৩৯
স্থান—ঝুমুর আসরের পাশের রাস্তা।
সময়—রাত্রি।

রাতের অভিসারে বেরিয়েছে দুর্গা। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে শুনতে পায় গান। আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে আসরের দিকে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৪০

স্থান—ঝুমুর নাচের আসর।

সময়—রাত্রি।

দুর্গা এগিয়ে এসে একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়ায়। নাচ-গান চলতে থাকে।

কয়েক লাইন গান হবার পর মেয়েরা সরে গিয়ে বাজন-দারদের জায়গা করে দেয় আসরে। সবাই এসে বাজনা বাজায়। ওদের মধ্যে আছে একজন ঢোলবাদক 'পীতাম্বর'।

কাট্ টু।

দুর্গা পীতাম্বরকে দেখে রি-অ্যাক্ট করে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—পীতাম্বর ঢোল বাজাচ্ছে।

কাট্ টু।

ক্যামেরা চার্জ করে দুর্গার ওপর, তার মুখভঙ্গি বদলে যায়।

কাট্ টু।

ক্যামেরা জুম্ ফরোয়ার্ড করে ঢোলের ওপর।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৪১

স্থান—বায়েনপাড়া।

সময়—দিন।

ক্যামেরা অন্য একটা ঢোলের ওপর থেকে পিছিয়ে এসে দেখায় সানাইও বাজছে। ক্যামেরা প্যান্ করলে বোঝা যায় সেটা একটা বিয়ের আসর। পীতাম্বর দুর্গার কপালে সিঁদুর পরাচ্ছে।

পেছনে পাতু, গীতা ও অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রের হৈ-হল্লা হাসি ও টুকরো কথা শোনা যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৪২

স্থান—ঝুমুর নাচের আসর।

সময়—রাত্রি।

ঝুমুর দলের নাচ-গান চলছে। ঢোল বাজাচ্ছে পীতাম্বর।

কাট্ টু।

দুর্গা ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে দেখে।

মেয়েরা পরের কলিগুলো গায়।

কাট্ টু।

ঘোড়ায় টানা একটা সুন্দর গাড়ী এসে দাঁড়ায় গেটের সামনে।

কাট্ টু।

ছিরু পাল, গড়াই, দাসজী সবাই সেদিকে ছুটে যায়।

কাট্ টু।

গাড়োয়ান গাড়ী থেকে নেমে গাড়ীর দরজা খোলে। ছিরু পাল, গড়াই ও দাসজী ফ্রেমে ঢোকে অতিথিকে অভ্যর্থনা করতে।

কাট্ টু।

দুর্গা উৎসুক চোখে ঘোড়ার গাড়ীর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ রি-অ্যাক্ট করে।

কাট্ টু।

জমিদারবাবু গাড়ী থেকে নামছেন।

কাট্ টু।

ক্লোজ-আপ দুর্গা।

কাট্ টু।

ছিরু পাল, গড়াই ও দাসজী জমিদারকে আসরে নিয়ে যায়।

কাট্ টু।

ক্যামেরা চার্জ করে দুর্গার ওপর। সাউণ্ডট্র্যাকে বেজে ওঠে দূরের ঘণ্টাধ্বনির মত শব্দ।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৪৩

স্থান—জমিদারের কাছারি বারান্দা ও বাগান।

সময়—দিন।

সুদৃশ্য দেয়াল ঘড়ির ওপর থেকে ক্যামেরা সরে এসে দেখায় একটি বিরাট লম্বা বারান্দা। দুর্গা বিয়ের পরই এসেছে ঐ বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করতে। ন্যাতা দিয়ে সে মেঝে পরিষ্কার করছে।

আরো দুটি চরিত্র ফ্রেমে ঢোকে। একজন জমিদারের চাকর গগন, অন্যজন দুর্গার শাশুড়ি তার হাতে একটা ঝাঁটা।

গগন : বাঃ!...বৌ তোমার কম্ম আছে গো! পেথম দিনেই কেমন চেক্‌নাই তুলে দিয়েছে ত্যাখো!

শাশুড়ি : তবে? (দুর্গাকে) কি রে?...কষ্ট হ'চে?

দুর্গা মাথা নাড়ে।

শাশুড়ি : চল্! উদিকের একখান ঘর সারা কইল্লেই আজকের মত ছুটি—

ওরা চলে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৪৪

স্থান—জমিদারের বিশ্রাম ঘরের পাশের বারান্দা।

সময়—দিন।

দুর্গা, গগন ও দুর্গার শাশুড়ি বারান্দা দিয়ে এসে ঘরের সামনে দাঁড়ায়। ঘরের দরজা খোলা।

শাশুড়ি : (ঝাঁটাটা হাতে দিয়ে) যা!

শাশুড়ি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। দুর্গা গগনের সঙ্গে ভেতরে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৪৫

স্থান—জমিদারের বিশ্রাম ঘর।

সময়—দিন।

ঘরখানি ঝাড়লণ্ঠন, বিভিন্ন ধরণের মূর্তি, পুরনো আসবাব দিয়ে সাজানো।

দুর্গা ঘরে ঢুকে একটু চমকে যায়।

গগন : ও মুড়ো থেকে এ মুড়ো—কোন ভয় নেই।

দুর্গাকে রেখে গগন বাইরে চলে যায়।

দুর্গা ঘরের অন্য প্রান্তে গিয়ে ঘর মুছতে শুরু করে। হঠাৎ সে দরজার দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে।

কাট্ টু।

গগন বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে।

কাট্ টু।

দুর্গা ছুটে দরজার দিকে যায়। কিন্তু কয়েক পা গিয়েই পেছন থেকে শাড়িতে টান অনুভব করে। পেছন ফিরে তাকায় দুর্গা।

কাট্ টু।

একটা সোফার পেছন থেকে শক্ত হাতে কে যেন দুর্গার আঁচল ধরে টানছে।

আস্তে আস্তে সোফার আড়াল থেকে মাথাটা দৃশ্য হয়, জমিদার।

কাট্ টু।

ক্লোজ আপ—দুর্গা।

কাট্ টু।

জমিদার : (হেসে) ভয় কি?

দুর্গা ভীতসন্ত্রস্ত, আবার সে ছুটে যায় দরজার দিকে। দুর্গা ঝাঁপিয়ে পড়ে দরজার ওপর।

দুর্গা : মা!...মা গো!...দরজা খুলো!...মা—!

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৪৬

স্থান—জমিদারের বিশ্রাম ঘরের পাশের বারান্দা।

সময়—দিন।

বন্ধ দরজার ওপর থেকে ক্যামেরা প্যান করে দেখায় গগন দুর্গার শাশুড়ির কানে ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বলে। শাশুড়ি খুব খুশী। গগন ফ্রেমের বাইরে চলে যায়। দুর্গার শাশুড়ি মেঝেতে বসে, দোক্তা মুখে দেয় আয়েসের সঙ্গে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৪৭

স্থান—জমিদারের বিশ্রাম ঘর।

সময়—দিন।

ভেতরে চলছে তখন দুর্গা ও জমিদারের মারামারি। এক সময় দুর্গাকে মেঝেতে ফেলে দেয় জমিদার।

দুর্গার কাঁচের চুড়িগুলো ভেঙে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৪৮

স্থান—ঝুমুর গানের আসর।

সময়—রাত্রি।

ঝুমুর দলের মেয়েরা গাইছে আর নাচছে।

"বেলোয়ারী কাঁচের চুড়ি
নরম হাতে ভাঙিল—"

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—দুর্গার চোখে জল টল্ টল্ করছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৪৯

স্থান—বায়েনপাড়া।

সময়—সকাল।

ঝোড়ো পাখির মত চেহারায় উস্কোখুস্কো দুর্গা নিজের বাড়ির দিকে এগিয়ে আসে। হাতের মুঠোয় যেন কি ধরা আছে।

পাতু উঠোনে বসে বাঁশ কাটছে। দুর্গার মা খাচ্ছে হাঁড়িয়া। দুর্গাকে ঐ অবস্থায় দেখে দুজনেই স্তম্ভিত।

দুর্গার মা : উ মা!...বলা নাই...কওয়া নাই...শশুর বাড়ী থেকে চলে এলি যে!

পাতু : এই দুগ্ গা! কি হইচে তোর? দুগ্ গা! এ্যাই দুগ্ গা!

দুর্গা হাতের মুঠোর জিনিষ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চকিতে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

দুর্গার মা বিস্মিত। দুর্গার ছুঁড়ে ফেলা দলা পাকানো পাঁচ টাকার নোটটা তুলে নেয় সে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—পাঁচ টাকার নোট।

কাট্ টু।

দুর্গার মা যেন তখন কিঞ্চিৎ উৎফুল্ল। পাঁচ টাকার নোটের দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে সে দুর্গার বন্ধ দরজার দিকে আবার তাকায়।

কাট্ টু।

ক্যামেরা দুর্গার ওপর চার্জ করে। দুর্গা কাঁদছে। ঝুমুর গানের কয়েকটা লাইন এই দৃশ্যের ওপর ওভার-ল্যাপ্ করে।

"ভালো ছিল শিশুবেলা
যৈবন ক্যানে আসিল—"

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৫০

স্থান—ঝুমুর গানের আসর।

সময়—রাত্রি।

ক্লোজ শট্—দুর্গা, সে জোর করে চোখের জল থামাতে চেষ্টা করছে। ঝুমুর গানের আসর শেষ। শুধু ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

কাট্ টু।

লং শটে দেখা যায় ছিরু পালের চাকররা প্যাণ্ডেলের সবকিছু গোছগাছ করছে।

বাজিয়ের দল সব ঠিকঠাক করে আসর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে থাকে। সবার শেষে যায় পীতাম্বর।

কাট্ টু।

দুর্গা আরও কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে তারপর আস্তে আস্তে জায়গা ছেড়ে চলে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৫১

স্থান—ঝুমুর গানের আসরের পাশের রাস্তা।

সময়—রাত্রি।

ক্রেনের ওপর থেকে নেওয়া শট্। দুর্গা ফ্রেমে ঢোকে। সে চোখের জল থামাতে চেষ্টা করছে। কয়েক পা এগিয়ে একটা গাছের গুঁড়ির তলায় সে বসে পড়ে। দু হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকোয় বোঝা যায় এবার সে ছোট শিশুর মত কাঁদছে।

ক্যামেরা জুম্ ব্যাক করে।

কাট্ টু।

(চলবে

CHITRA-BIKSHAN ::
Regd. No. 13949/67 Rs 1.25 October 1979 Vol. 13 No. 1

Published by Alok Chandra Chandra from Cine Central, Calcutta,
2 Chowringhee Road, Calcutta-13,

মাসিক চলচ্চিত্র পত্রিকা
সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র

ত্রয়োদশ বর্ষ
দ্বিতীয় সংখ্যা
নভেম্বর, '৭৯



চিত্রবীক্ষণ

প্রচ্ছদচিত্র : 'ফার্স্ট চার্জ অফ দি ম্যাশেট' (কিউবা)
প্রচ্ছদশিল্পী : দীপক দে

সম্পাদক : অনিল সেন

বিষয়সূচী

শিলিগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সুনীল চক্রবর্তী
প্রযত্নে, বেবিজ স্টোর
হিলকার্ট রোড
পোঃ শিলিগুড়ি
জেলা ঃ দার্জিলিং-৭৩৪৪০১

আসানসোলে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সঞ্জীব সোম
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জি. টি. রোড ব্রাঞ্চ
পোঃ আসানসোল
জেলা ঃ বর্ধমান-৭১৩৩০১

বর্ধমানে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
শৈবাল রাউত্
টিকারহাট
পোঃ লাকুরদি
বর্ধমান

গিরিডিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এ, কে, চক্রবর্তী
নিউজ পেপার এজেন্ট
চন্দ্রপুরা
গিরিডি
বিহার

দুর্গাপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দুর্গাপুর ফিল্ম সোসাইটি
১/এ/২, তানসেন রোড
দুর্গাপুর-৭১৩২০৫

আগরতলায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অরিন্দ্রজিত ভট্টাচার্য
প্রযত্নে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
হেড অফিস বনমালিপুর
পোঃ অঃ আগরতলা ৭৯৯০০১

গৌহাটিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
বাণী প্রকাশ
পানবাজার, গৌহাটি
ও
কমল শর্মা
২৫, খারঘুলি রোড
উজান বাজার
গৌহাটি-৭৮১০০৪
এবং
পবিত্র কুমার ডেকা
আসাম ট্রিবিউন
গৌহাটি-৭৮১০০৩
ও
ভূপেন বরুয়া
প্রযত্নে, তপন বরুয়া
এল, আই, সি, আই, ডিভিসনাল
অফিস
ডাটা প্রসেসিং
এস, এস, রোড
গৌহাটি-৭৮১০১৩

বাঁকুড়ায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
প্রবোধ চৌধুরী
মাস মিডিয়া সেন্টার
মাচানতলা
পোঃ ও জেলা ঃ বাঁকুড়া

জোড়হাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অ্যাপোলো বুক হাউস,
কে, বি, রোড
জোড়হাট-১

শিলচরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এম, জি, কিবরিয়া,
পুষ্পিপত্র
সদরহাট রোড
শিলচর

ডিব্রুগড়ে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সন্তোষ ব্যানার্জী,
প্রযত্নে, সুনীল ব্যানার্জী
কে, পি, রোড
ডিব্রুগড়

বালুরঘাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অন্নপূর্ণা বুক হাউস
কাছারী রোড
বালুরঘাট-৭৩৩১০১
পশ্চিম দিনাজপুর

জলপাইগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দিলীপ গাঙ্গুলী
প্রযত্নে, লোক সাহিত্য পরিষদ
ডি. বি. সি. রোড,
জলপাইগুড়ি

বোম্বাইতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সার্কল বুক স্টল
জয়েন্দ্র মহল
দাদার টি. টি.
(ব্রডওয়ে সিনেমার বিপরীত দিকে)
বোম্বাই-৪০০০১৪

মেদিনীপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটি
পোঃ ও জেলা ঃ মেদিনীপুর
৭২১১০১

নাগপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
ধূর্জটি গাঙ্গুলী
ছোটি ধানটুলি
নাগপুর-৪৪০০১২

এজেন্সি ঃ

* কমপক্ষে দশ কপি নিতে হবে।
* পঁচিশ পার্সেন্ট কমিশন দেওয়া হবে।
* পত্রিকা ভিঃ পিঃতে পাঠানো হবে, সে বাবদ দশ টাকা জমা (এজেন্সি ডিপোজিট) রাখতে হবে।
* উপযুক্ত কারণ ছাড়া ভিঃ পিঃ ফেরত এলে এজেন্সি বাতিল করা হবে এবং এজেন্সি ডিপোজিটও বাতিল হবে।

সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটার আর্ট থিয়েটার প্রকল্প

আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে আমাদের এখানে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের শুরু। এই আন্দোলনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ছিল সুস্থ চলচ্চিত্র বোধ তৈরী এবং ভালো ছবির দর্শক সৃষ্টি করা। এই আন্দোলন শুরু থেকেই উপলব্ধি করেছিল যে একমাত্র ব্যাপক সচেতন দর্শকই পারবে সুস্থ সমাজ সচেতন চলচ্চিত্র তৈরীর উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে।

এই উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমাদের এখানে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন ক্রমশঃ সংগঠিত হয়েছে এবং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বিগত দশ বারো বছর ধরে এ আন্দোলন যথেষ্ট ব্যাপকতা লাভ করেছে। সারা ভারত জুড়ে এই আন্দোলন আজ এক সংগঠিত শক্তি।

এই আন্দোলনের অংশীদার হিসাবে সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটা বিগত বারো বছর ধরে সুস্থ চলচ্চিত্রের প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরী করার কাজ করে চলেছে নিরলস ভাবে। দেশ বিদেশের ভালো ছবির নিয়মিত প্রদর্শন, চলচ্চিত্র সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনার অনুষ্ঠান, জনমত সংগঠনে বিভিন্ন আনুসঙ্গিক বিষয়ে সভাসমিতির আয়োজন ইত্যাদি সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটার কর্মসূচীকে প্রতিফলিত করছে। সংস্থার পক্ষ থেকে বিভিন্ন পুস্তিকাও প্রকাশ করা হয়েছে চলচ্চিত্রের বিবিধ বিষয়কে তুলে ধরার জন্য। এছাড়া গত বারো বছর ধরে আমরা চিত্রবীক্ষণ বার করে যাচ্ছি। একথা বলা সম্ভবত বাহুল্য হবে না যে চিত্রবীক্ষণ, সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র হিসাবে সুধী মহলে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

কলকাতা শহরে ফিল্ম সোসাইটির নিয়মিত প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রেক্ষাগৃহের নিদারুণ অভাব। এখানে সান্ধ্য প্রদর্শনীর জন্য হল পাওয়া যায় না। যে দু-একটি স্কুলের হল পাওয়া যায় তা চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী নয়। মর্ণিং শো করে কোনক্রমে অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখতে হয়। সেক্ষেত্রেও এখন প্রায় সমস্ত হলে নুন শো চালু হওয়ার ফলে বেশ কিছু বাস্তব অসুবিধা দেখা যাচ্ছে।

এই সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করে সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটা কলকাতা শহরে একটি 'আর্ট থিয়েটার' সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করছে। এই আর্ট থিয়েটার ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করে সুস্থ চলচ্চিত্রের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

উচ্চ মানের সুস্থ রুচির ছবি যা সাধারণভাবে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রদর্শিত হবার সুযোগ পায়না সে ধরণের চলচ্চিত্রের নিয়মিত প্রদর্শনী এখানে সম্ভবপর হতে পারে। নতুন চিন্তা ভাবনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা নিয়ে যে সব ছবি এখানে ওখানে তৈরী হচ্ছে সে সমস্ত ছবির প্রদর্শনী এভাবে নতুন এক সচেতন দর্শকগোষ্ঠী গড়ে তুলতে সক্রিয় ভুমিকা নেবে।

কলকাতার সমস্ত ফিল্ম সোসাইটি এই আর্ট থিয়েটারে নিয়মিত তাঁদের ছবির অনুষ্ঠান করতে পারবেন।

অন্যান্য বিভিন্ন সংগঠন যাঁরা অনিয়মিতভাবে মাঝে মধ্যে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকেন তাঁরাও এখানে ছবি দেখানোর সুযোগ পাবেন।

চলচ্চিত্র এবং আনুসঙ্গিক সাংস্কৃতিক বিভিন্ন বিষয়ে এখানে আলোচনা সভা সমিতি ইত্যাদির অনুষ্ঠান করা যাবে।

এখানে নিয়মিতভাবে দেখানো যাবে শিশু চলচ্চিত্র, সরকারী এবং বেসরকারী তথ্য চিত্র, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিদ্যা এবং সংস্কৃতির নানান ছবি।

এই প্রস্তাবিত আর্ট থিয়েটারের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটার প্রাথমিক পরিকল্পনাগুলি মোটামুটি এইরকম—

(১) এই আর্ট থিয়েটারে থাকবে ৮০০ আসন বিশিষ্ট একটি হল যেখানে ১৬ মি. মি. ও ৩৫ মি. মি. দুজাতের ছবিই দেখানো যাবে। এই হলে নিয়মিত ছবির প্রদর্শনী হবে।

(২) ১৫০ আসন বিশিষ্ট একটি ছোট হল যেখানে সেমিনার সিম্পোজিয়াম বিতর্ক সভা ইত্যাদির নিয়মিত অনুষ্ঠান হবে। এখানে ১৬ মি. মি. ও ৮ মি. মি. ছবি দেখানোরও ব্যবস্থা থাকবে।

(৩) এখানে থাকবে রীডিং রুম ও লাইব্রেরী যেখানে অনুসন্ধিৎসু পাঠক চলচ্চিত্র সম্বন্ধে সিরিয়াস পড়াশুনার সুযোগ পাবেন।

(৪) চারটি প্রদর্শনী কক্ষ এই আর্ট থিয়েটারে থাকবে। এর মধ্যে তিনটি হবে স্থায়ী প্রদর্শনী যেখানে বাংলা ও ভারতীয় ছবির ইতিহাস ও গতিপ্রকৃতি তুলে ধরা থাকবে। এ ছাড়া যেখানে থাকবে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের ইতিহাসে যুগোত্তীর্ণ চলচ্চিত্রকারদের চলচ্চিত্র সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা। এ ছাড়া একটি প্রদর্শনী কক্ষে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।

প্রস্তাবিত এই আর্ট থিয়েটার সংগঠনের ক্ষেত্রে মূল সমস্যা দুটি। একটি নিঃসন্দেহে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ, এছাড়া একান্ত প্রয়োজন কলকাতার কেন্দ্রীয় কোনো অঞ্চলে উপযুক্ত একখণ্ড জমি। এই আর্ট থিয়েটার সংগঠনের সামগ্রিক পরিকল্পনাটি নিঃসন্দেহে দীর্ঘমেয়াদী, এই পথে যথেষ্ট প্রতিকূলতা।

১৯৭৭ সালের শেষ দিক থেকে বিভিন্ন সময় চলচ্চিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করে সিনে সেণ্ট্রাল; ক্যালকাটা এর মধ্যে ১ লক্ষ টাকারও বেশী পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করেছেন। সংস্থার প থেকে রাজ্য সরকারের কাছে এক খণ্ড জমির আবেদন রাখা হয়েছে।

আনন্দের কথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারও নিজস্ব একটি আর্ট থিয়েটার তৈরীর কাজে হাত দিয়েছেন। সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটার আর্ট থিয়েটার প্রকল্প একটি সহযোগী প্রচেষ্টা, কাজেই এই প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য চলচ্চিত্র প্রেমী সমস্ত সংগঠন ও ব্যক্তিকে এগিয়ে আসতে হবে।

সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটার 'আর্ট থিয়েটার' তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন।

চেক পাঠান এই নামে—

Cine Central, Calcutta, A/c, Art Theatre Fund

ও এই ঠিকানায়—

Cine Central, Calcutta
2, Chowringee Road, Calcutta-700013

টালিগঞ্জের সেলুলয়েড বই :
আমাদের সকলের ভাবনা ও কর্তব্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়

আমার মনে হয় এই ধরণের 'নবদিগন্ত' মার্কা কাজকর্ম যারা করেছেন তাদের হাত থেকে ক্যামেরা কেড়ে নিতে হবে। আমাদের নির্দয় হতে হবে, উপায় নেই ছবি তৈরীর ন্যূনতম জ্ঞান বা দক্ষতা যদি না থাকে, ক্যামেরা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা যদি না থাকে, কলাকৌশলের জ্ঞান যদি না থাকে, যন্ত্রপাতির চেহারা এবং চরিত্র যদি তারা না জানে, জীবন সমাজ সম্পর্কে যদি তাদের বোধ না থাকে, তবে আমরা তাদের কাজ করতে দেবো কেন ? এই ভীষণ সঙ্কটের সময় এইসব অদক্ষ লোককে কাজ করতে দেওয়ার অর্থই হল ইণ্ডাস্ট্রিকে আরো দুর্বল করা, আরো পঙ্গু করে তোলা, ভালো ছবির জন্মকে আরো বিলম্বিত করা, নষ্ট করা তার বাজার। অতএব ভালো সুস্থ মানের ছবি তৈরী হোক টালিগঞ্জে। বৃহত্তর জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন হোক। কমার্শিয়াল ছবিই তৈরী হোক অনেক বেশী মাত্রায়, সীমাবদ্ধ গণ্ডী থেকে বেরোবার চেষ্টা হোক। হিন্দী সিনেমার কুৎসিত যৌন আবেদন আর মারদাঙ্গার আক্রমণে বিধ্বস্ত শ্রমিঞ্চল উদ্ধার হোক, বাংলা ছবির বলার ভঙ্গী, দেখার ভঙ্গী প্রেজেন্টেসনের মধ্যে অভিনবত্ব আসুক, চমৎকারিত্ব আসুক। বুদ্ধির কিছু ব্যাপার স্যাপার সেখানে থাকুক। আমার মনে হয়, লক্ষ্য যদি স্পষ্ট হয়, গভীর হয়, যদি আমাদের মধ্যে অর্থাৎ যারা চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনা করি তাদের মধ্যে বোঝাপড়াকে আন্তরিক এবং শক্তিমান করে তোলা যায়, তবে অনেক জট খুলে যাবে, সমস্ত কিছুকে একটা আন্দোলনের নির্দিষ্ট চেহারায় আনা যাবে।

এই তপন সিংহ ('সফেদ হাতী', 'গল্প হলেও সত্যি' 'জতুগৃহ'; পাঠক মনে করুন সেই 'কাবুলিওয়ালা' রবীন্দ্রনাথের কাহিনী অবলম্বনে তৈরী সাংঘাতিক সেলুলয়েড। আজও মনে পড়ে মিনির মায়ের হাত দিয়ে কাবুলিওয়ালাকে টাকা তুলে দেওয়া নিয়ে কি ভীষণ হৈ-চৈ হয়েছিলো বিশ্বভারতী থেকে। কারণ মূল গল্পে ছিলো মিনির বাবা কাবুলিওয়ালার হাতে টাকা দিচ্ছে। ছবিটির বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সাক্সেস আমাদের গর্বিত করেছে। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে ওই বিশ্বভারতী শম্ভু মিত্রকেও তাঁর 'রক্তকরবী' নাটকটি প্রযোজনার জন্য বহু বিরূপ সমালোচনা করেছে। শম্ভু মিত্রের 'রক্তকরবী' নাকি রবীন্দ্রভাবনার অনুসারী নয় এই ছিলো বিশ্বভারতীর অভিযোগ। তাঁরা বন্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন 'রক্তকরবী'র অভিনয়। সিনেমা যে মূল গল্পের কার্বন কপি নয় তা একটু ভাবলেই বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথের গল্প 'নষ্টনীড়'কে ভেঙে সত্যজিৎ রায় তৈরী করেছিলেন 'চারুলতা', এ নিয়েও কম ঝড় ওঠেনি। বিভূতিভূষণের 'অশনি সংকেত' নিয়ে সত্যজিৎ রায় ছবি করেন, তখন কি একটা সাংঘাতিক কথা তিনি ছবির একেবারে শেষে বলতে পারেন গল্পটাকে পাল্টে অনঙ্গবৌকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় রেখে। যারাই বিভূতিভূষণের এই মূল গল্পটি পড়েছেন তারাই জানেন বইটির দ্বিতীয় পৃষ্ঠাতেই আছে অনঙ্গবৌয়ের দুটি ছেলে। বড়টির বয়স এগারো বছর, তার ডাক নাম পটল। ছোটটি আট বছরের। তাকে এখনও খোকা বলেই ডাকা হয়। পটল খুব সংসারী ছেলে এসব তরিতরকারীর ক্ষেত সেই সব করেছে বাড়ীতে---ইত্যাদি ইত্যাদি) এই রকম বহু কমার্শিয়াল দারুণ সেলুলয়েড দিয়েছেন তিনি, সাফল্যও এসেছে। ফলতঃ ছবি করবার ডাকও তিনি পেয়েছেন বারবার। অজয় কর 'সাত পাকে বাঁধা'র মতো আর একটাও ছবি তৈরী করতে পারলেন না। শেষকালে ওই সেদিন শরৎচন্দ্রের গল্প নিয়ে যে ছবিটা তিনি তৈরী করলেন তাতে তার বয়সের ভার, চিন্তার ও কাজের দক্ষতায় ভাঁটাই প্রমাণ করে। আগে তিনি সুন্দর-সুন্দর কমার্শিয়াল ছবি তৈরী করেছেন, 'সপ্তপদী', 'জীবন প্রভাত' এই রকম বেশ কিছু। মানু সেন বেশ কিছু কমার্শিয়াল ছবি তৈরী করেছেন। তপন সিংহ বা অজয় করের সঙ্গে যদিও তাঁর তুলনাই হয়না তবুও তাঁর ছবিতে সুস্থতা ও বলার ভঙ্গীটি ভালো না লেগে উপায় নেই। 'ভ্রান্তিবিলাস'-এর মতো সুন্দর হাসির ছবি তৈরী করে তিনি আমাদের দেখান কমার্শিয়াল সাক্সেসের জন্য কতো বৈচিত্র্য প্রয়োজন। এখনতো টালিগঞ্জ থেকে হাসির ছবি করার মেজাজটাই উঠে গেছে। অথচ এককালে এই টালিগঞ্জই যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে হাসির ছবি তৈরী করতো, যেমন 'পাশের বাড়ী', 'সাড়ে চুয়াত্তর', 'গণশার বিয়ে'। বস্তুতঃ টালিগঞ্জ থেকে হাসির ছবি করবার প্রবণতাই একেবারে উঠে গেছে। যা দু-একটা তৈরী হয় সেগুলি এতোই নির্বুদ্ধিতা আর একঘেঁয়েমিতে প্রবেশ করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রায় সতেরো-আঠারো বছর আগে তৈরী 'যমালয়ে

জীবন্ত মানুষ'-এর মতো সরল ফ্যানটাসির ছবিও তৈরী হলোনা। আমাদের টালিগঞ্জ সেই একই চর্বিত চর্বনে দিন কাটাচ্ছে। এখনও হাসির জন্য ব্যবহার হয় বাঙাল ভাষা, নয়তো ওড়িয়া ভাষা। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই একই চেহারা, সেই একই অভিনয় ভঙ্গী, একই কথার ঢং যে কত বিরক্তিকর হতে পারে, তা যে কত ভোঁতা হয়ে গেছে তা কি একবারও টালিগঞ্জ ভাববে। রবি ঘোষকে দিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত হাসির ছবি করা যায় তার প্রমাণও ইতিমধ্যে দেখা গেছে। তুলসী চক্রবর্তীর মতো অভিনেতা আজকে বিরল সারা দেশে। অমন রিজার্ভ অ্যাক্‌টিং যে হাসির চরিত্রে করা যায় তা ভাবা যায় না। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে তিনি সাংঘাতিকভাবে ঝলসে উঠেছিলেন। বহু নির্বোধ ছবিতেও তিনি অবশ্য দারুণ কাজ করেছিলেন। হাসি যে ভাঁড়ামো নয়, কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী নয়, বোকা কথা নয় সেটি একমাত্র তুলসী চক্রবর্তীই বহু দিন ধরে অভিনয় করে আমাদের বুঝিয়ে গেছেন। কিছুদিন আগে 'ধন্যি মেয়ে' নামে একটা হাসির ছবি তৈরী হয়েছিল। ছবিটির মধ্যে অন্য ধরণের হাসির ছবির উপকরণ জড়ো করা হয়েছিল। নচিকেতা ঘোষের মজাদার সঙ্গীত ছবিটিকে সাংঘাতিক গতি দিয়েছিলো, ছবিটা বক্স অফিস সফল হয়েছিলো। বেশ কিছুদিন আগে অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় তুলেছিলেন 'রায়বাহাদুর' নামে একটি সুন্দর মার্জিত রুচির হাসির ছবি। তরুণ মজুমদার 'এতটুকু বাসা' নামে যে সুন্দর হাসির ছবি তৈরী করেছিলেন, স্মৃতিতে তা আজও জ্বলজ্বল করছে।

হিন্দী ছবির ফর্মুলার মধ্যে হাস্যরসকে কাজে লাগানো হয় কমার্শিয়াল সাক্‌সেসের জন্য। আমাদের টালিগঞ্জ তা করলোনা। একটা জায়গা ভরাট করার দায়িত্ব দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় হাসির অভিনেতাদের। তারা যা পারলো করলো তাতে সাক্‌সেস এলো এলো, না এলো না এলো। কোনো বিশেষ পরিকল্পনা টালিগঞ্জে কাজ করে না। নবদ্বীপ হালদারের সেই গলা ভাঙার কাজ একদা বাঙালীর ভালো লেগেছিলো তাই বলে এখনও যে তা বাঙালীর ভালো লাগবে তার কোনো মানে নেই। নতুন অভিনেতা কেউই এখন আর কৌতুকাভিনেতা হতে চাননা। এর কারণ হল অনিশ্চয়তা, সিনেমা থেকে যদি নিশ্চয়তা পেতে পারতো তাহলে নতুন অভিনেতারা প্রেরণা পেতো। কাজ করতে ঔৎসুক্য বোধ করতো। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বিভিন্ন জলসায় যত কৌতুকাভিনেতাকে দেখা যায় তার সিকির সিকিকেও টালিগঞ্জের চত্বরে দেখা যায় না। বস্তুতঃ জলসায় একটা নির্ভরতা বা নিশ্চয়তার জায়গা আছে যেটা টালিগঞ্জে নেই। পলিটিক্যাল স্যাটায়ার ধর্মী হাসির ছবি তৈরীর ব্যাপারটা একেবারেই দূর অস্ত টালিগঞ্জে। এই ধরণের ছবি করতে গেলে সার্বিক ব্যাপারটার ওপর দারুণ জ্ঞান থাকা দরকার, মিডিয়ামটি জানা চাই। তবেই একটা পলিটিক্যাল স্যাটায়ার তৈরী হতে পারে, সৈকত ভট্টাচার্যের 'অবতার' এক অত্যন্ত সীরিয়াস কাজ। কিন্তু একটা হাসির ছবির সাবজেক্ট যে পলিটিক্যাল হতে পারে তা আমরাও দেখিনি টালিগঞ্জে।

হাসির ছবির জগতে একসময়ে মদত দিতে পারতেন গঙ্গাপদ বসু। তিনি কিন্তু টালিগঞ্জে অপাংক্তেয় হয়েছিলেন। অথচ এই মানুষটিকে সামান্য ব্যবহার করেছিলেন চরিত্র কিরকম রূপ নিতে পারে তার প্রকৃষ্ট চেহারা বহু দেখা গেছে। এই ধরণের চরিত্র-চিত্রণ অনেকদিন দেখা যায়নি। বহুদিন পর শঙ্কর ভট্টাচার্যের 'দৌড়' ছবিতে মিস্টার রায়ের চরিত্রে বিকাশ রায়ের অভিনয় ভালো লাগে। এই বিকাশ রায় বহুদিন ধরে একইভাবে অভিনয় করে চলেছেন। সেই একই ঢং-য়ে স্বরক্ষেপণ, একভাবে চোখ ফেরানো। এসবই বহু ব্যবহারে একেবারে মলিন একেবারে জীর্ণ হয়ে গেছে তা যারা বাংলা ছবির নিয়মিত দর্শক তারাই ভালোভাবে জানেন। জানেনা কেবল টালিগঞ্জ সেলুলয়েড।

হিন্দী ছবির দিকে তাকালে দেখা যায় সেই কে, এন, সিং-এর বাজার বহুদিন হল চলে গেছে। ওরা বুঝেছে সেই এক ধরণের চোখ কোঁচকানো, মাথাটা নীচুর দিকে করে একই ঢং-য়ে অভিনয় বহুদিন ধরে চলে আসছে এবং তা ক্রমশঃই দর্শককে ক্লান্ত করছে। এতেই কমার্শিয়াল বাজারে মন্দা আসতে পারে। তাই হিন্দী কমার্শিয়াল জগৎ ধরণ পালটালো, এলেন প্রাণ, এলেন মদনপুরী, নতুন ধরণের শয়তানির পথ খোঁজা চললো। টালি-গঞ্জের কমার্শিয়াল জগৎ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এনেছিলো। তপন সিংহ 'হাটেবাজারে' ছবিতে তাঁকে ভিলেন চরিত্রে ব্যবহার করলেন সফলভাবে। এরপরেও তিনি কিন্তু বহুদিন টালিগঞ্জে কাজ পাননি। 'গণদেবতা' ছবিতে অজিতেশ ছিরু পালের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন—এই অভিনয় অবশ্যই ভীষণ নাটকীয় গন্ধে ভরপুর। ভীষণ চড়াসুর আর জার্ক চোখে লাগে। পরিচালকের নির্দেশ মতোই তিনি এই চড়াসুরে অভিনয় করেছেন কিন্তু তবুও এই নাটকীয়তা সত্ত্বেও অজিতেশবাবু যেভাবে চরিত্রের বিশ্লেষণ করেছেন তা প্রশংসার দাবী রাখে।

অরবিন্দ মুখার্জী একসময়ে 'কিছুক্ষণ' নামে বনফুলের একটি গল্পকে আশ্রয় করে একটি সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত ছবি টালিগঞ্জের ফ্লোর থেকে বার করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অরবিন্দবাবুর আর কোনো ছবিতে এই জাতীয় মেজাজ আমরা পেলাম না। 'ধন্যি মেয়ে', 'আনন্দমেলা' এরই প্রমাণ—কমার্শিয়াল সাক্‌সেস এলেও শিল্পীহৃদয়টি এখানে চাপা পড়ে গেছে। ইন্দর সেন একসময়ে মৃণাল সেনের সহকারী ছিলেন, কিন্তু তাঁর স্বাধীনভাবে তৈরী একটি ছবিতেও সামান্য উন্নত মানসিকতার চেহারা আমরা দেখিনি। অথচ বাংলা সাহিত্য থেকে শ্রেষ্ঠ গল্পগুলিকে তিনি বেছে নিয়েছেন ছবি করার জন্য। যেমন 'অসময়' বিমল করের

ভয়ানক ভালো এক উপন্যাস। উপন্যাসটি তার কাব্যঝংকার, লিরিকভাব নিয়েও একটা ভায়োলেন্সের ছায়ায় আমাদের দোলাতে থাকে, (উপন্যাসটি আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত) যেন একটা অনড় কিছু ভাঙছে বা ভাঙবেই—এই ব্যাপারটা বিমল করের উপন্যাসে আছে। কিন্তু 'অসময়' ছবিতে সে ভাবটা মোটেই জাগে নি। গোড়া থেকেই তিনি এতো সিরিয়াস হয়ে গেছেন ক্যামেরা নিয়ে তার জন্য চরিত্রগুলির অন্তর্জগৎ বা পরিবেশটির জট ছাড়ানোর কোনো ভূমিকাই তিনি রাখতে পারেন না। আর একটি গল্প সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অর্জুন'। এখানেও সেই ভ্রান্ত বিবেচনা, সেই একই ব্যাপার কাজ করেছে। মানুষের উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়া, তার আশ্রয় খুঁজে পাওয়া, তাকে রক্ষা করা, জীবনের বিস্তার, সেই জীবনপ্রবাহের গতি প্রকৃতি তিনি সেটা ছবিতে ধরতে পারেন নি। অথচ এ দুটি গল্পই ভীষণ ফিল্মের জন্ম দিতে পারতো সহজেই।

বলাই সেন, বিজয় বসু, নারায়ণ চক্রবর্তী ছবি করতে গিয়ে ব্যর্থ হচ্ছেন নানান ভ্রান্ত অবিবেচনার জন্য, অদক্ষতার জন্য। রাজেন তরফদার অন্যের জন্য চিত্রনাট্য লিখতেই ব্যস্ত। অবশ্য বর্তমানে তিনি সরকারী অনুদান নিয়ে নতুন ছবি করার কাজে হাত দিয়েছেন। আমরা চাই তিনি আরো ছবি করুন। আমরা ভুলতে পারি না 'পালঙ্ক' ছবিটার কথা, যেমন আমরা ভুলিনি 'গঙ্গা' ছবিটিকে। বিমল ভৌমিক 'দিবারাত্রির কাব্য'-য়ের মত একটি ছবি তৈরী করেও বসে থাকেন, বসে থাকতে বাধ্য হন। অথচ অজস্র বাজে ছবির ছবি ছবি খেলা চলতেই থাকে অব্যাহত ভাবে। দিলীপ মুখোপাধ্যায় 'চাঁদের কাছাকাছি' নামক বাজে ছবি তৈরী করে জল ঘোলা করে চলেন, জল আরো ঘোলা করতে এগিয়ে আসেন সলিল দত্ত, সলিল সেন প্রমুখেরা।

বাংলা ছবির কমার্শিয়াল সাক্সেসের ক্ষেত্রে তরুণ মজুমদার একটি উল্লেখযোগ্য নাম। এতো ব্যস্ত ফিল্মমেকার এখন আর কেউ নেই। কিন্তু তাঁর শিল্পকর্মের মধ্যে বিশেষ কোনো ডেভলাপমেন্ট পরিলক্ষিত হচ্ছে না। একই জায়গায় বাঁধা তাঁর সব কাজ। পাঁচখানা গানের ছবির সঙ্গে একদম শেষের ছবি এবং একেবারে প্রথম ছবি 'কাঁচের স্বর্গ' স্বরচিত গল্প অবলম্বনে যা তৈরী হয়েছিলো, সবই একই জায়গায় বাঁধা। কিন্তু তাঁর ওপর আমাদের অনেক আশা ছিলো, আমরা ভেবেছিলাম তিনি পুরোপুরি কমার্শিয়াল আওতার মধ্যে থেকেও কিছু গভীর কাজ করবেন, কিন্তু আমাদের সেই আশা ফলবতী হয় নি। 'গণদেবতা' একটি পুরোপুরি বাণিজ্যিক ছবি, সাফল্যও পেয়েছেন তিনি, কিন্তু এটি সিনেমার কোনো বড়ো কাজ নয়। রঙের ব্যবহার হতাশাব্যঞ্জক, সঙ্গীতের ব্যবহারও ওই রকমই। মূল বিষয়টির মধ্যে থেকে যে লড়াকু অস্তিত্ব বার করবার চিন্তা তা অত্যন্ত অগোছালো। এবং গোটা ছবিটাই যেন সস্তা প্রমোদের তরণীতে গা ভাসিয়েছে, অথচ একটু চেষ্টা করলেই বৃহত্তর খেটে খাওয়া মানুষের দুর্দশার কাছে পৌঁছানো যেতো এবং বক্তব্য গভীর হয়ে উঠতো। এমনি আর একজন তপন সিংহ। এঁর ছবিতে এমন কোনো বিশেষ তাৎপর্য নেই যা প্রকৃত চলচ্চিত্রবোধে ভরপুর। এঁদের শিল্পবোধ, কারিগরী কলাকৌশল কিছুতেই উন্নততর পর্যায়ে যায় না এতো কাজ করা সত্বেও। তবুও একথা অনস্বীকার্য তপন সিংহ বা তরুণ মজুমদার যথেষ্ট কৃতী পরিচালক এবং তাঁদের কাজ যথেষ্ট জনপ্রিয়। চিদানন্দ দাশগুপ্ত কেন যে ছবি করেন না, তা বোঝা যায় না। ছবি করার ক্ষমতা তাঁর আছে অথচ ছবি করার ব্যাপার তিনি বোধ হয় ছেড়েই দিয়েছেন।

এই সব মানুষ, মানুষের কাছে শিল্পীর হৃদয় নিয়ে কিছু বলার জন্য আসেন। সুতরাং এই সব চলচ্চিত্রকার যতো বেশী মাত্রায় শৈল্পিক ছবি করার সুযোগ পাবেন ততোই দর্শকের কাছে তুলে ধরা যাবে জীবননিষ্ঠ কিছু ভাবনা। বস্তুতঃ এর মধ্যেই ধরা পড়বে আজকের আধুনিক জীবনের শিল্পকর্ম যা শুধু কোনো বিশেষ গল্পকেই বলে চলে না। সেই গল্পকে অবলম্বন করে একটা সময়, একটা পরিবেশ কিছু যন্ত্রণার কথা আঁকে। জীবনকে ব্যাখ্যা করে যায়। আজকের শিল্পকর্ম বিবরণধর্মী নয়। আজকের শিল্পকর্ম বস্তব্যধর্মী। বহুকাল আগে যেভাবে নাটকীয় ঢং-য়ে সিনেমার কাহিনীকে বলা হতো, সেই পদ্ধতি আজ পরিত্যক্ত। মঞ্চের ওপর অভিনেতা-অভিনেত্রীকে রেখে একটা নির্দিষ্ট ওঠাবসার মধ্যে একই ভাবে একই ফ্রেমে ক্যামেরা একই জায়গায় বসিয়ে ছবি তোলার দিন আমরা অনেকদিন আগেই ফেলে এসেছি। যতোই বিজ্ঞান এগোচ্ছে, প্রযুক্তির নানান দিক খুলে যাচ্ছে, ততোই এই সিনেমা শিল্প নিজেকে আরো গভীর করে রাখতে চাইছে মানুষের কাছে।

এযাবৎকাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে এতো ঘনিষ্ঠ মেলামেশা করে আর কোনো শিল্পমাধ্যম গড়ে ওঠেনি। বিপরীতে এই চলচ্চিত্রের ভাবনাই খুলে দিচ্ছে অন্য শিল্পকর্মের গভীর গোপন ভাবনা-চিন্তার ব্যাপ্তি। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, আজকের উপন্যাস আগেকার উপন্যাসের সেই গণ্ডী ধরে পাক খাচ্ছে না—চলচ্চিত্রের নানান ব্যাপার-স্যাপার বিষয়বস্তু অনুযায়ী নিজেকে প্রকাশউন্মুখ করে তুলছে। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ক্লোজ আপের ভঙ্গী, ফেড আউট, ফেড ইন, ফ্ল্যাশ ব্যাক, ফ্ল্যাশ ফরওয়ার্ড, জাম্প কাট—সবই উপন্যাসের মধ্যে মিলে মিশে সতেজ টানটান স্মার্ট ভঙ্গী নিচ্ছে। চলচ্চিত্রের সংলাপের আদলে আদল নিচ্ছে উপন্যাসের সংলাপ। এডনা ও ব্রাউনের দারুণ সতেজ সংলাপের কথা ভাবুন, কিম্বা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প বা উপন্যাসে সংলাপের ঋজুতা। এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ছে তরুণ কবি শ্যামল পুরকায়স্থের কবিতার ভঙ্গী এবং বিন্যাসের কথা। মনে পড়ছে দিব্যেন্দু পালিতের 'চরিত্র' কিম্বা প্যান্টোমাইমের মতো উপন্যাসের কথা।

এর থেকে থিয়েটারও পিছিয়ে নেই। ১৮৮৬ সালের পটভূমি

বিষয়বস্তু ছিলো পিসকাটারের 'ফ্ল্যাগস' নাটকের। সেই দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের দাবীতে যে আন্দোলন তাকে ঘিরেই ঐ নাট্য প্রযোজনা পিসকাটারের, সময় ১৯২৪ সাল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য পিসকাটার এই 'ফ্ল্যাগস' নাটককেই প্রথম অভিধা দেন এপিক নাটক বলে। এই নাট্য প্রযোজনায় মঞ্চের বাম দিকে এবং ডান দিকে সরু সরু সাদা পর্দা আটকে দেয়া হয়েছিলো। এই সাদা পর্দায় সিনেমার পদ্ধতিতে প্রোজেকশনে প্রোলোগের সময়কার প্রধান চরিত্রের ঘটনাকে বলা হয় এবং এও তিনি করেছেন দৃশ্যের শুরুতে ও শেষে ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য সাবটাইটেলে সেই পর্দায় সিনেমার মতোই ফেলে যা সিনেমা বা ফিল্ম ছাড়া আঙ্গিক দিক থেকে অন্য কিছু নয়। ব্রেখট্ অন থিয়েটারে ব্রেখটের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে—"মঞ্চোপকরণের একেবারে অভিন্ন আত্মা ও তার আত্মারূপে চলচ্চিত্র এবং তার প্রদর্শন, এই যে আয়োজন পিসকাটারের, যা তাঁর আবিষ্কারের সবকিছুর মধ্যে অন্যতম। এইভাবে মঞ্চ নিশ্চল হয় না, মঞ্চক্ষেত্র ব্যাপ্তি পায়, জীবন্ত হয় এবং তার নিজস্ব সফল ভূমিকা নিয়ে জীবনের আরও কাছে আসতে পারে।" ব্রেখট বলছেন, "এই চলচ্চিত্র এই নাট্য প্রযোজনায় হয়ে উঠেছে নতুন শক্তিশালী এক অভিনেতা। এরই সাহায্যে দৃশ্যপটের একান্ত অঙ্গরূপে দলিলপত্র, সংখ্যা পরিসংখ্যানের নতুন ভাষ্যকে প্রদর্শন করিয়ে দর্শককে তার স্বীয় কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করানো সম্ভব হলো।" একই সময়ের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিভিন্ন স্থানের একই বিষয়কে ঘিরে যে ঘটনা ঘটছে বা ঘটানোর চেষ্টা করছে একদল মানুষ, তা অবলীলাক্রমে প্রকাশ করা সম্ভব হলো। প্রসঙ্গত বলা উচিত, জার্মানীতে মুরনাউ, পাবস্ট, রবার্ট ভাইনে, ফ্রিজ্ ল্যাঙ্ চলচ্চিত্রে তার অসীম ক্ষমতার যে শক্তি তার প্রমাণ রাখছিলেন। সোভিয়েত রাশিয়ার আইজেনস্টাইন চলচ্চিত্রের এই সাংঘাতিক শক্তির কথা প্রমাণ করেছিলেন বড়ো আকারে। ব্রেখট এই চলচ্চিত্রকে তাঁর থিয়েটারে ব্রহ্মাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পেরেছেন। পিসকাটার যেমন চেয়েছেন আধুনিক জটিল জীবন-বিন্যাসকে ধরতে এই যন্ত্রায়ণের মধ্যে, তেমনি ব্রেখটও চেয়েছেন। সস্তা প্রতীকতার যান্ত্রিক উপকরণকে কাজে লাগানোর ঝোঁকের প্রতিবাদ তিনি করেছেন, ভুলভাবে প্রয়োগ করতে বারবার নিষেধ করেছেন। সঠিক প্রয়োগ যে কিরকম, তা তিনি তাঁর কাজে বারবার প্রমাণ করেছেন অত্যন্ত বড়ো আকারে, যা নতুন জনগণের থিয়েটারের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। আন্তর্জাতিক থিয়েটার ও ফিল্মের আজ যে গভীরতা এবং তীব্র ব্যাপকতা আমরা লক্ষ্য করি তার মূলে রয়েছে বৈজ্ঞানিক শক্তি, বিজ্ঞানের সতেজ সমৃদ্ধতা যা মানুষের মননের অগ্রগতির বিকাশকেই প্রমাণ করে। সমস্ত শিল্পমাধ্যমগুলি এই সমৃদ্ধতাকে বুকে করে নিয়েই এগিয়ে যায়, অনবরত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে থেকে আবিষ্কার করে নব নব দিগন্ত।

বস্তুতঃ এঁদের হাতে—তরুণ মজুমদার, রাজেন তরফদার, ইন্দর সেন, তপন সিংহ, অরুন্ধতী দেবী ('মেঘ ও রৌদ্র' ছবিটি স্মর্তব্য), অজয় কর, প্রভৃতি কয়েকজনের হাতেই ইণ্ডাস্ট্রি বাঁচে। এঁরাই ইণ্ডাস্ট্রি নামক গাড়ীটির তেল যোগাড় করেন, চাকাটাকে সচল ও গতিময় রাখার জন্য, যে গাড়ীতে চেপে সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, পূর্ণেন্দু পত্রী, শঙ্কর ভট্টাচার্য, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী প্রমুখ এগিয়ে যেতে পারেন। ছবির সংখ্যা যতো বৃদ্ধি পাবে, এই বৃদ্ধির পরিমাণ অনুযায়ী ততো বেশী পরিমাণে বলিষ্ঠ ভাষায় নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বক্তব্য রাখা যাবে। তাতে নতুন নতুন দিক খুলে যাবে, দর্শক আকৃষ্ট হবে, পয়সা দেবে, কারণ চলচ্চিত্র এখনো সবচেয়ে কম পয়সায় আনন্দদানের মাধ্যম। এভাবে যতো বেশী টাকার লেনদেনের সুযোগ হবে ততো বেশী পরিমাণে ইণ্ডাস্ট্রি সমৃদ্ধ হবে। নতুন নতুন যন্ত্রপাতি, নানান কারিগরী ব্যাপার-স্যাপার এসে পৌঁছে যাবে ল্যাবরেটরীতে। এর ফলে কলা-কুশলী, শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বাস্থ্য ফিরবে। সংঘবদ্ধ এক বিরাট সংগ্রাম এক নতুন উদ্দীপনায় অদম্য উৎসাহে সমগ্র ইণ্ডাস্ট্রিকে বসন্তের বাতাসে স্নিগ্ধ করবে নতুন জীবনে। ব্যবসায়ীদের যদি একবার বোঝানো যায় এখানে টাকা লগ্নী করাটা অনেক বেশী লাভজনক তেমনি অনেক বেশী শ্রদ্ধার ও সম্মানজনক তাহলেই বেশী মাত্রায় কাজ হবে।

পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল দত্ত, পীযূষ বসুর দল চলচ্চিত্রের ভীষণ শক্তির যে ন্যক্কারজনক অবমাননা শুরু করেছেন তাকে বন্ধ করতেই হবে। আমাদের ভাবা দরকার 'কল্পতরু' গোষ্ঠী নামে একজন-দুজন থিয়েটারের ব্যবসায়ী চলচ্চিত্র তৈরীর ধৃষ্টতা দেখাচ্ছেন, যাঁরা এখনও থিয়েটারের নিজস্বতাই বোঝেন না, তাঁরা আসছেন ছবি তৈরীর জগতে। কারণ, আজকের ব্যবসায়ী চলচ্চিত্র জগৎ এমনিই এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, যা ফেলে ছড়িয়ে লুটে পুটে খাই'-এর মানসিকতার সঙ্গেই তুলনীয়। এইসব অদক্ষ চিন্তার মানসিকতায় হাবুডুবু খাওয়া অশিল্পীরাই প্রমাণ করেছেন যৌনতা নিয়ে ছবি করা হলো জীবন বিরোধী কাজ যা এক চূড়ান্ত ন্যক্কারজনক অবস্থায় গিয়ে মানুষকে বিপাকে ফেলে। এরা জানেন না এই যৌনতা নিয়েও পৃথিবী বিখ্যাত চলচ্চিত্রকারেরা মননশীল জীবন বোধে সমৃদ্ধ ছবি তৈরী করেছেন। যেমন ব্রেঁসো করেছেন 'মুশেত', মার্গারেত দুরাস করেছেন 'লা মিউজিকা' ফ্রাঙ্কো রোসি করেছেন 'এরোজ ফর এপ্রিওয়ান'। এইসব ছবির মূল বিষয় কিন্তু যৌনতা, অথচ ছবিগুলি জীবনের সম্পদে বলীয়ান হয়ে শিল্প হয়ে উঠেছে। এ ছবিগুলি অসুস্থ চিন্তাধারার প্রতিফলন নয়, ছবিগুলিকে ক্লেদাক্ত পথে নিয়ে গিয়ে অর্থ উপার্জনের যন্ত্রে পরিণত হয়নি। আমার মনে পড়ছে ইয়াং জর্মান চলচ্চিত্র আন্দোলনের নেতা আলেকজাণ্ডার ক্লুগের কথা—ছবি তোলা হচ্ছে আদালতের সওয়াল জবাব। সমাজ এখানে

আসামী, কাঠগড়ায় রেখে সমাজকে বিচার করা হচ্ছে। আর ফ্রিল্মমেকার হচ্ছেন এই আদালতের এই আসামীর বিচারক। ঘটনার সাক্ষী সাবুদ এই শিল্পীরা (স্ক্রুলের বক্তব্যের ধরণটা এই রকম, কথাগুলি অবিকল মনে পড়ছেনা)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য পিসকাটার চেয়েছিলেন থিয়েটার যেন পার্লামেণ্ট হয়, দর্শকমণ্ডলী যেখানে হয়ে উঠবে আইন প্রণেতা। এই পার্লামেন্টেই পিসকাটার জনগণের বৃহত্তম প্রকল্পগুলিকেই তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, যে উত্তরগুলো সকলকে দিতে বাধ্য করা হবে। এক অস্তনীয় অমানবিকতা, অনাচারের ভীষণ কাণ্ডকারখানা যখন এই মঞ্চে বলা হচ্ছে, যা গাঁথা হচ্ছে এক শিল্পসম্মত মানসিকতায় অনুরূপ অনুভূতি বজায় রেখে মঞ্চে। তখন কোনো রাজনৈতিক নেতাকে ভাষণ দিতে ডাকা হয় নি। এই মঞ্চের দায় তখন এই যে, ভিন্নার্থে এই পার্লামেন্টের দর্শকমণ্ডলীকে এমন সব সংখ্যা পরিসংখ্যান ঘটনা, পরিবেশ অনবরত বলবে, এবং তার সঙ্গে শ্লোগান যোগাবে এই দর্শকমণ্ডলীকে যা ওই দর্শককে এক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করবে। এর মধ্যে থেকে তিনি এক লড়াকু মানুষের চেহারা তার সিদ্ধান্ত জীবনের ক্ষেত্রে এনে দাঁড় করা.ত চেয়েছেন তীব্রভাবে। এই প্রসঙ্গ ধরেই এগিয়ে গিয়ে বলা যায় বিখ্যাত চলচ্চিত্রকারের কথা, যিনি জাঁ লুক গোদার। গোদার কখনই একইভাবে তাঁর ফ্রিল্ম তৈরী করার জন্য শ্রেষ্ঠ কাহিনী তুলে নেন না। বারবার তিনি নিজের বক্তব্যকে তুলে ধরাটাই বড়ো কাজ মনে করেছেন, এরই জন্য রুশোর কাহিনী নিয়ে 'এমিল্রি' নামে বিখ্যাত ছবিটি তৈরী করতে পারেন যার মধ্যে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিকে নিদারুন চাবুক মারা হয়েছে (আমাদের দেশে এই রকম একটি দারুণ সমস্যা ও সাবজেক্ট থাকা সত্বেও একটিও ছবি তৈরী হয় না—রবীন্দ্রনাথের 'তোতা-কাহিনী' নিয়ে ফ্যান্টাসী আর ফেবলের মধ্যে থেকে এই অবস্থাকে চাবুক মারা যায় সজোরে)। আবার ওই গোদারই অতি সস্তা আমেরিকান থ্রিলার নিয়েও ছবির মতো দারুণ ছবি করতে চান। অথচ তিনি নিজেই জানান তাঁর প্রিয় উপন্যাস 'দি উইণ্ড প্লামস' তাঁর ভীষণ ভালো লাগে কিন্তু তবুও তিনি তাই নিয়ে ছবি তৈরী করতে উৎসাহ পান না। আমাদের ছবির জগৎ এর থেকে অনেক দূরে।

বস্তুতঃ টালিগঞ্জের এই নিদারুণ গতি প্রকৃতি দেখে আমার মনে হয় আমাদের কমার্শিয়াল ফ্রিল্ম মেকারেরা কেউই আদপে শিল্পী নন। যদি তাঁরা প্রকৃত অর্থে শিল্পী হতেন তাহলে দর্শক তাদের থেকে কিছুতেই সরে আসতো না। সত্যিকারের শিল্পী জানেন কাজটা নিজের মতের মধ্যে রেখেও আনন্দদায়ক করে তোলা যায়। দর্শককে কাছে পাওয়া যায়। একটু আগে এ প্রসঙ্গে দেবব্রত বিশ্বাসের উদাহরণ দিয়েছি। উদাহরণ হিসেবে ব্রেখটকেও ভাবা যেতে পারে। এঁরা মনে প্রাণে প্রকৃত শিল্পী, দর্শককেও কাছে পেতে তাঁদের কোনো অসুবিধে নেই। তার কারণ একটাই যা রেঁনোয়ার কথাতে প্রতিফলিত—দর্শককে আনন্দ দিতে হলে সবার আগে নিজেকে শিল্পীর প্রকৃত সিংহাসনে বসাতে হয়। সেখানে ফাঁকি থাকলে, কোন কিছুর কার্পণ্য থাকলে ওই জায়গায় ফাঁকি আর কার্পণ্য আসতে বাধ্য।

তুলি দিয়ে যখন ছবি আঁকতে হয়, সেই ছবিরও নিজস্ব চরিত্রের একটা বর্ণ আছে। যা এই চিত্রকরকে বুঝতে হয়, তারপর তার প্রয়োগ নিয়ে ভাবতে হয়। ছবি আঁকতে গেলে তাই প্রাথমিক ব্যাপারটা শিখে নিয়েই শুরু করতে হয়, আয়ত্ত করতে হয় কেমন করে তুলির আঁচড় দিলে আস্তে আস্তে একটি শূন্য সাদা ক্যানভাসে এক বৃহত্তর জীবন ধরা পড়ে। আমি সেতার বাজাতে জানিনা, আমার সামনে সেতার দিলে আমি বাজাবো কেমন করে? তাই আগে ছবিটাকে ছবি বলে গড়তে হবে, তারপরে অন্য সব ভাবনা। অতএব কোনো করুণা নয়, কোনো ক্ষমা নয়, যে পারবে সেই আঁচড়ের দক্ষতা দেখাতে, তাকেই আমরা ছবি করতে দেবো, তা না হলে তাকে বিদায় করবো। ঐসব অপদার্থ ছবি করিয়ের উদ্দেশ্যে বলছি আমরা একসঙ্গে জোট বেঁধে তোমার ছবি দেখবো না, দল বেঁধে যাবো তোমার টাকা পাওয়ার সোর্সকে নিরস্ত করতে, এর জন্য ব্যাপক জনমত তৈরী করবো। এদের আমরা স্টুডিও ভাড়া নিতে দেবোনা—পিকেটিং করবো। ল্যাবরেটরীতে কাজের সুযোগ দেবোনা, কলা-কুশলীদের বোঝাবো, তাদের মতামত নেবো এবং দেবো। সরকারের কাছে দাবী জানাবো যাতে ছবি তৈরী করতে না পারে। জনগণকে বোঝাবো আপনারাই দর্শক, সিনেমার ক্ষেত্রে আপনারাই প্রথম কথা বলবেন, আপনারাই শেষ কথা বলবেন। ঋত্বিক ঘটকের শেষ উদ্ধৃতি—"কিন্তু শেষ কথা হচ্ছে দর্শক। আপনারা কি করছেন? আপনাদের কি কোনো দায়িত্ববোধ নেই? বর্তমানে বাংলাদেশের সংস্কৃতি প্রধানত দুটি ধারায় বইছে, সাহিত্য এবং চলচ্চিত্র (এবং আমার সংযোজন গ্রুপ থিয়েটার), তার একটাকে আপনারা এইভাবে পঙ্গু রাখবেন? আমাদের বিকৃত রুচিকে আরও বিকৃত করার জন্য আপনারাই তো দায়ী। ঘৃণ্য জিনিষকে বর্জন করুন। ভদ্র যা তাকে গ্রহণ করুন। এই সমস্ত সমস্যা এক ফুঁয়ে—'মিলি মিলি যাও সাগর লহরী সমান।' আপনাদের হাতেই তো চাবিকাঠি।'

১৯৭০ সালে লেখা ঋত্বিক ঘটকের লেখা একটি মহামূল্যবান চিঠি আমরা দর্শকদের সামনে উপস্থিত করবো।—"এককালে আমরা ভেবেছিলাম যে যদি সেন্সর অনুসারে প্রকাশ করা যায়, তাহলে ছবির জগতে কিছু উন্নতি হয়। সাধারণতঃ পরীক্ষা, নিরীক্ষামূলক ছবি বেরোনোর পথে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করতো ছবি মুক্তির প্রথাটা। আমি আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, আমার প্রথম ছবি 'নাগরিক' নানা প্রকার ডামা-

ভোলে পড়ে প্রকাশ পেতেই পারলো না। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত এই ধরণের কত ছবি যে মার খেয়েছে তার হিসেব নেই। (অন্যত্র জানাচ্ছেন—ঠিক হিসেব বলতে পারবো না, তবে আন্দাজে একটা পরিসংখ্যান আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারি। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত বছরে গড়ে ৬০ খানা করে বাংলা ছবি তৈরী হয়েছে। সেখানে তখন হিসেব করলে দেখবেন, আপনারা যাদেরকে প্রগতিশীল বলেন, সেই সমস্ত পরিচালক ছবি করার সুযোগ পেয়েছেন, ভালো বা মন্দ যাই হোক। যেখানে ১৯৬৭-তে মাত্র ২৪টা ছবি হয়েছে, এবং এবছরে [১৯৬৮ সালের কথা বলছেন—এই লেখার সময়টা মে-জুন মাস] ১০টার বেশী ছবি হওয়ার সম্ভাবনা কম। এই দুর্ভিক্ষের বলি কারা? যারা গতানুগতিক ছবি করে যান তাঁরা কেউ নন, ঐ নতুন ধরণের ছবি করিয়েরা। তাদের মধ্যে কেউ দু'বছর, কেউ পাঁচ বছর বসে আছেন। এবং ঘটনাটা ঘটছে ঐ দর্শকদের অঙ্গুলি হেলনে।"

"কিন্তু এই চিন্তাধারায় আমার ভুল ছিলো। আমাদের প্রযোজকরা শুধু ছবির মুক্তির পথই খোঁজেন না, তাঁরা ভালো জায়গায় ছবির মুক্তির পথ খোঁজেন। অবশ্য তাঁদের মতে। ঘটনা এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে সেন্সর করা মাত্রই ছবিকে প্রকাশ করা আজ আর সম্ভব নয়। আজকে কে কার কোলে ঝোল টানবেন, সেইটে সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফল দাঁড়িয়েছে ওই যে বাংলা ছবি বছর কয়েক আগেও গোটা পঁচিশ ত্রিশ হতো, এখন সেটা গোটা কুড়িতে দাঁড়িয়েছে। এবং অদূর ভবিষ্যতে সেটা পাঁচ, দশটায় পৌঁছে যাবে, ফল হবে ভয়াবহ। ব্যবসাদাররা, যারা দুটো পয়সা লোটার লোভে ছবি করে, তারাও একে একে বিদায় নেবে। শিল্পীদের বড়ো বড়ো কথা বলা এবং চালিয়াতি বন্ধ হয়ে যাবে। সাধারণ কলাকুশলীরা না খেয়ে পরে মারা যাবে। এর কি কোনো পথ নেই? সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন অনেক করা হয়েছে। হয়তো তাঁরা কিছু করবেন, হয়তো কিছু করবেন না। সমস্যাটা হচ্ছে সাধারণ মানুষের। সাধারণ মানুষ আর কতোদিন এই সব উত্তমমার্কা ছবি দেখবেন। নিজেদের জীবনের শরিক হিসেবে কি ছবিকে গ্রহণ করতে পারবেন? সে ক্ষমতা এঁরা সম্পূর্ণভাবে হারিয়েছেন বলে মনে হয়। আঘাত করার দরকার। সে আঘাত সহ্য করার মতন মানসিক স্থৈর্য এবং ধৈর্য এদের আছে কিনা, সে বিষয়েও চিন্তার অবকাশ আছে। এরা দিনগত পাপক্ষয়ের অংশ হিসেবে ছবি দেখে থাকেন। তাই নিয়েই ব্যাপৃত হোন। নিজের জীবনের গভীরতম কথার অংশীদার হবার দয়া করে চেষ্টা করবেন না। আমার আক্রমণ সম্পূর্ণ দেশের মানুষের উপরে। তাঁরা দয়া করে ভালোবাসতে শিখুন। ভালো না বাসলে কিছুই দাঁড়াবে না। রাজনৈতিক বা সামাজিক বিভিন্ন স্তর বিন্যাস আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়, তবে এইটি আমার প্রচণ্ড ক্ষোভ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। আশা করি আপনারা আমাকে ক্ষমা

ঐ" [illegible]

পাঠক যখন এই লেখাটি পড়ছেন তখন কলকাতা, বর্ধমান ও আসানসোল এই রাস্তায় বাজার থেকে 'শ্রীকান্তের উইল' নামক উত্তম মার্কা সেলুলয়েড বই অন্তর্ধান করেছে। কিন্তু এখনো অর্থাৎ এই লেখার সময় অভি চলছে। গল্পটি শ্রীমতী প্রতিভা বসুর 'জন্মান্তর' থেকে নেয়া। কিন্তু দুটো পয়সা লোটার লোভে লোভী ব্যবসায়ী যাঁর গল্প অনুসরণ করে এই সেলুলয়েডের জন্ম তাঁরই নাম বিজ্ঞাপনে বাদ দিয়েছেন। এই নাম বাদ দেওয়ার মধ্যে ঘৃণ্য ব্যবসায়ী লোভ কাজ করেছে, গল্পটি শরৎচন্দ্রের না বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শককে এই দোদুল্যমান অবস্থার রেখে ব্যবসার লোভ। ছবির গল্পও যেমন, তেমনই জঘন্য ক্যামেরার কাজ, এডিটিং এবং কারিগরী কলাকৌশল। কাজেই ঋত্বিক ঘটকের ক্ষোভ-জ্বালা এবং অভিযোগকে আশ্রয় করে আমাদের এজাতীয় ছবির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠতে হবে।

ঋত্বিক ঘটক এই চিঠিতে লিখেছেন সরকারের কাছে আবেদন নিবেদনের কথা। তিনি এও বলেছেন সরকার হয়তো কিছু করবেন, হয়তো কিছুই করবেন না। এই চিঠির সময় ১৯৭০ সাল। তৎকালীন সরকার কাজের চেয়ে প্রতিশ্রুতি অনেক বেশী দিয়েছেন, কাজের কাজ বিশেষ কিছু হয় নি। বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার কাগজে প্রতিশ্রুতি থেকে বেরিয়ে এসে নির্দিষ্ট কিছু কাজ করছেন। ১৯৭৮-৭৯ সালে মোট এগারোজনকে সরকারী অনুদান দেওয়া হয়েছে, রঙিন ছবির জন্য দেড় লক্ষ টাকা, সাদা কালো ছবির জন্য একলক্ষ টাকা। যদিও প্রাথমিক পরিকল্পনায় এই টাকার পরিমাণ ও অনুদানের সংখ্যা বেশী নির্দ্ধারিত হয়েছিলো তবুও ভয়ংকরী বন্যায় জন্য বাজেটের কাটছাঁট করতে হয়েছে। একথা ঠিক যে এই অনুদান সকলেই পাচ্ছেন না তাহলেও এই বন্ধ্যা ইণ্ডাস্ট্রিতে এই আর্থিক সাহায্য যথেষ্ঠ প্রেরণার কাজ করছে একথা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না। অবশ্যই এই সরকারকেও প্রচলিত রীতি-নীতি এবং সিস্টেমের মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে ফলে স্বভাবতঃই সার্বিকভাবে যতটা অগ্রগতি হওয়া উচিত ছিলো ততটা এই আড়াই বছরে এই সরকারের পক্ষে করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি।

এছাড়া রয়েছে পরিবেশক-প্রদর্শকদের নানাবিধ কর্মকৌশল, যার ফলে প্রযোজক পড়ে পড়ে মার খান। এঁরা এই প্রদর্শক-পরিবেশক কম্বাইন মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলেন। ঋত্বিক ঘটকের ভাষায় এঁরা হলেন "জগন্নাথের দল—ফাজলু ফড়ে। এঁরা সাহেবদের স্যাণ্ডউইচের মতো দুপাশেতে দুই (একটা ছবি করার গোড়ার দিকে, অপরটি একেবারে শেষে) শোষণের

(পরবর্তী অংশ ১৭ পৃষ্ঠায়)

'সবুজ দ্বীপের রাজা'র কলঙ্ক

শ্রীকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

সম্প্রতি 'সবুজ দ্বীপের রাজা' নামে একটি বাংলা রঙিন ছবি নিয়ে কোলকাতার দর্শকদের মধ্যে বেশ হৈ-চৈ লক্ষ্য করা গিয়েছে, লক্ষ্য করা গিয়েছে প্রভাতী দৈনিক থেকে শুরু করে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে এ ছবির প্রশংসা কিন্তু লক্ষ্য করা যায় নি এ ছবির ক্ষতিকারক ভূমিকাটির আলোচনা। বিশেষত এ ধরণের জনপ্রিয় ছবির ক্ষেত্রে যা একান্ত প্রয়োজন। বর্তমান প্রবন্ধে সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করার চেষ্টা করা হল।

ছবির শুরু ১৯২৪ সালের সেলুলার জেল দিয়ে। সার বাঁধা বন্দীর মিছিলে চশমা পরা দীর্ঘদেহী ধুতী-সার্ট পরিহিত এক বাঙালী বন্দী সহজেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনার কাজে বন্দীদের ব্যস্ত দেখা যায়। হঠাৎ এক ফাঁকে বন্দীটি কাজ থেকে পালায়।

চিড়িয়াখানায়

আরো পঞ্চাশ বছর পর অর্থাৎ ১৯৭৪-এ চিড়িয়াখানায় দাদার সাথে একদল ভাই। বার পাঁচেক স্কুল পেরোনোর চেষ্টায় বিফল দাদাটি এবার ভায়েদের সাথে ১০+২ শিক্ষাক্রমে আর একবার চেষ্টা করে দেখতে চান বলে সগর্বে জানান। ডেঁপো অথবা লোফার বলে মনে হলেও অবলীলাক্রমে জন্তু জানোয়ারদের ল্যাটিন নাম তিনি বলে চলেন। পঞ্চাশোর্ধ ব্যক্তির সাথে বদ্-রসিকতা করতেও ছাড়েন না। পড়া মুখস্ত করে সময় নষ্ট করতে উনি একেবারেই নারাজ। তবে তাঁকে দিয়ে হেলা ভরে জীব জন্তুর বৈজ্ঞানিক নাম উচ্চারণ করিয়ে কি একথা প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছে যে, পড়াশুনা না করেও জ্ঞান আহরণ করা যেতে পারে ?

ইতিমধ্যে জনৈক পঞ্চাশোর্ধ স্যুট পরা জেন্টলম্যান বেঞ্চে বসা জনৈক ক্লান্ত প্রৌঢ়ের পাশে বসে পড়ে, মাঝে থাকে দুজনের অ্যাটাচী কেস দুটো। ক্যামেরা এগিয়ে এসে অ্যাটাচী দুটোকে ক্লোজ-আপে ধরে তাদের নিখুঁত সাদৃশ্যকে দেখায়। হঠাৎ পূর্বোক্ত ছেলের দলের মধ্য থেকে একজন 'উপেন জেঠু' বলে প্রৌঢ়কে সম্বোধন করলে অপ্রস্তুত প্রৌঢ় পালাতে উদ্যত হয়—ভুলক্রমে নিজের অ্যাটাচী কেস ফেলে রেখে যায়। এই সুযোগে জেন্টলম্যান আর অ্যাটাচী পাল্টে প্রৌঢ়কে দেয় এবং চাপা স্বরে নির্দেশ দেয় ম্যানিয়ে ছেলেটির কথার উত্তর দিতে—অর্থাৎ উভয়ে পূর্ব পরিচিত, তবে অ্যাটাচী পরিবর্তনটা এমন রহস্যজনকভাবে করতে হল কেন ? অযথা নয় কি ? অর্থাৎ অনর্থক দর্শককে উদ্বিগ্ন করে তোলা। তবে নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য হত যদি দর্শককে একথাটি বোঝান যেত যে আমাদের আশেপাশের অনেক উপেন জেঠুই অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকার ফলে এমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন এবং আমরা 'চিনতেই পারলো না' বলে বিস্মিত হই। এ রকম বুঝিয়ে থাকেন গোয়েন্দা ঔপন্যাসিক সত্যজিৎ রায়—

> ....কত ভবানন্দ, মন্দার বোস, মছলিবাবারূপী ফেরারী আসামী, একদিকে আর অন্য দিকে জমিদার বংশের মহীতোষ সিংহ রায়, এ্যাডভোকেট মহেশ চৌধুরী, প্রেসিডেন্সী কলেজে গোল্ড মেডেল পাওয়া গিরীন্দ্র বিশ্বাস, বোম্বের চলচ্চিত্র প্রযোজক জি গোরে, ল্যান্স-ডাউন রোডের পাণ্ডুলিপি চোর নরেশচন্দ্র পাকড়াশী, দীননাথ লাহিড়ীর বেকার ভাইপো, উমানাথ ঘোষালের সেক্রেটারী বিকাশ সিংহ, সন্ন্যাসী বেশী ভণ্ড এরা তো আমাদের প্রতিদিনের জীবনের সংগী, এমন ভাবে এদের অন্য পরিচয় উদ্ঘাটিত হবে আমরা কি জানতাম ?*

কিন্তু এ সত্য ছবিতে ধরা পড়ার নয়, এর মূল অন্যত্র।

দুই কক্ষে

পরিবর্তিত অ্যাটাচী হাতে জেন্টল্‌ম্যান একটি বহুতল বাড়ীর এক অ্যাপার্টমেন্টে এসে পৌঁছল। এখানে পর পর ঘটে চলে কয়েকটি নাটকীয় ঘটনা যা আমাদের পকেটমার, ছিনতাইকারী জাতীয় সমাজবিরোধীদের কথা মনে করিয়ে দেয়, দেশের শত্রু, বিশ্বব্যাপী যাদের চক্র ছড়ানো রয়েছে তাদের আচরণ এতো খেলো হবে—ভাবা যায় না। প্রকৃত ঘটনা হল—সংযমের তাগিদে সস্তা মাস্তানী পরিহার করলে ঘন ঘন হাততালি পাওয়া যায় না। অথচ এতে অযথা কিশোর তরুণদের উত্তেজিত করা হয়—তবে বর্তমান আলোচনা থেকে তাঁদের অনিবার্য কারণেই বাদ রাখা হল। এ ধরণের অকারণ উত্তেজনা অপরিণত ছেলে-মেয়েদের যুক্তিনিষ্ঠ, বাস্তববাদী না করে আবেগ প্রবণ, কল্পনা বিলাসী করে তোলে, অসামাজিক রোমান্টিকতায় উৎসাহ যোগায়। রুদ্ধশ্বাস রহস্যচিত্র করে তোলার চেষ্টায় কোমল মনে ঐ ধরণের চাপ সৃষ্টি করা স্পষ্টতই অন্যায়।

এরপর দর্শককে নিয়ে আসা হল অন্য এক কক্ষে যেখানে প্রাক্তন আই, বি, অফিসর মি· রায়চৌধুরী কোন এক জায়গায়

* বর্ণমালা/সত্যজিৎ রায় সংখ্যায় নন্দরাণী চৌধুরীর 'ফেলুদার সঙ্গে ভুলভুলাইয়ায়' রচনা দ্রষ্টব্য।

রওনা হবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কিন্তু টেলিফোনের অপর প্রান্তে জনৈক (অধস্তন) সরকারী কর্মচারীকে নির্দেশ দিলেন তাঁর রওনা হবার খবর হোম ডিপার্টমেন্টকে জানাতে হবে রওনা হবার চব্বিশ ঘণ্টা পর—এ ধরণের নির্দেশ দান কি অবাস্তব নয়? অথচ নিছক রহস্য জমিয়ে তোলার তাড়নায় এই অযৌক্তিক দূরভাষণের অবতারণা করা হল। এরকম অসঙ্গতির উদাহরণ ছবির সর্বত্র রয়েছে, আমরা তার বিশেষ কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করব। মি. রায়চৌধুরীকে খাবার দিতে এসে তাঁর বৌদি, সন্তুর মা তাঁকে সন্তুর দিনরাত ঐসব 'ক্যারাটে-ম্যারাটে' চর্চা ছেড়ে লেখাপড়ায় মন দিতে বলতে বলেন। সরকারী উচ্চ-পদের প্রাক্তন অফিসার, সন্তুর প্রাক্তন কাকা সন্তুর মা-কে জানালেন যে আজকের দিনে ওগুলোর বিশেষ দরকার। অর্থাৎ? লেখা-পড়া ছেড়ে বালকের দল এক্ষুণি ক্যারাটে নিয়ে লেগে পড়? 'এন্টার দ্য ড্রাগন' ছবির পর হঠাৎ কোলকাতার যুবকদের মধ্যে ক্যারাটে-কুংফুর মহড়া চলতে লাগল পথে-ঘাটে, বইয়ের দোকানে শো-কেসে একাধিক বাংলা বইও এ বিষয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারল। ছবিটি সে প্রচারে আর একটু এগিয়ে গেলে তাকে শিক্ষার ওপরে স্থান দিয়ে। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে চিড়িয়াখানায় 'দাদা'টির পড়াশুনা সম্পর্কে অভিমত। মায়ের কথায় এবং ভঙ্গীতে মধ্যবিত্ত মায়ের সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কার মানসিকতা—যদিও কথাবার্তা, আচার-আচরণে পরিবারটিকে ধনী বলেই মনে হয়, তা ছাড়া দার্জিলিংয়ের শৈলশিখরে ভ্রমণ, ছেলের ক্যারাটেপ্রিয়তার মেয়াদ মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে বড়জোর দুদিন—ফুটে ওঠে। অথচ কাকার জবাবের পর মায়ের নীরবতা প্রেক্ষাগৃহে রব তোলে—সাবাশ কাকা, এই তো চাই! বিষয়টি দশ থেকে পনের বছরের ছেলেমেয়েদের ভীষণভাবে আলোড়িত করে।

জাহাজে

আন্দামানগামী জাহাজে সন্তুকে একসময়ে ছদ্মবেশধারী দুজন অপরাধী জলে ফেলে দেবার উপক্রম করলে সন্তুর অনগল বলে যাওয়া অপরাধীদের প্রতি সাবধানবাণী, তাদের (অপরাধীদের) পরিচিতি, ডায়েরীর বিষয়বস্তু, কাকার পরিচয় আদৌ সম্ভব বলে মনে হয় না। অথচ ছবির নায়ককে বাঁচিয়ে রাখতেই এই উদ্ভট দৃশ্যের পরিকল্পনা করা হল। দলপতির নির্দেশে সন্তু রক্ষা পেল। এ সময়ে, পরে সিকিওরিটি বলে জানা গেছে এমন, একজনের যথেষ্ট দূর থেকে দৃশ্যটি উপভোগ করা রীতিমতো অবাস্তব। সিকিওরিটি লোকটির সন্তুদের কেবিন দেখে যাওয়াও ছিল অস্বাভাবিক।

আন্দামানে পদার্পণ

আন্দামানে পৌঁছে জনৈক সরকারী কর্মী মি. দাশগুপ্তের দেওয়া বর্ণনার—পরাধীন ভারতবর্ষে মেয়ে কয়েদীদের ঐ দ্বীপে ফাঁসি দেওয়া হত—আদৌ সত্য নয়। কারণ, ১৯৫৭ সাল থেকে পরাধীন ভারতবর্ষে যে কয়জন বন্দীকে আন্দামানে পাঠানো হয়েছিল তাদের নামের যে তালিকাটি আজ পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে [মুক্তিতীর্থ আন্দামান।। গণেশ ঘোষ / ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য] তার মধ্যে একজনও নারী কয়েদীর নাম পাওয়া যায় না। তার অন্যতম কারণ শ্রীমতী বীণা দাস প্রণীত 'শৃঙ্খল ঝঙ্কার'-এ পাওয়া যায় (পৃষ্ঠা ৬৮), "—যখন আমাদের আন্দামান যাবার কথা হয়, মা বাবা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সে সময়ে যাঁদের চেষ্টায় আমাদের (মেয়েদের) আন্দামান যাওয়া বন্ধ করা হয়—তাঁদের একজন রবীন্দ্রনাথ আরেকজন সি. এফ. এণ্ড্রুস।"১

মি. দাশগুপ্ত স্বাভাবিক উৎসাহভরে আন্দামানের বর্ণনা দিয়ে চললে, মি. রায়চৌধুরী উচ্চপদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির মতো তাতে বাধা দেন, যুক্তি—'আমি এখানে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে আসিনি।' কর্তব্য-পরায়ণতার দৃষ্টান্ত এ নয়, আবার এতে মি. রায়চৌধুরীর কর্ম জগতের অমানুষিক রূপটিরও প্রকাশ ঘটে না। সমুদ্র তীরে ঘুরে বেড়াবার সময় শিখ-এর ছদ্মবেশী অপরাধীর সাথে সন্তুর মারামারির ঘটনাটি কাকার ক্যারাটে শিক্ষার (অ)বাস্তব প্রয়োজনীয়তা এবং লেখাপড়ার চেয়ে এই শিক্ষার অধিকতর প্রয়োজনীয়তাকেই প্রতিষ্ঠিত করে। হাততালিতে ফেটে পড়ে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ—কারণ সন্তু জয়ী।

সেলুলার জেল পরিদর্শনরত মি. রায়চৌধুরী বলে চলেন এক আজন্ম বিপ্লবীর কথা, যিনি জেল থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিদেশী সরকারের রিপোর্ট বলে তাঁকে মেরে ফেলা হয়েছে। এ সম্পর্কে জেলের ফাইলগুলো তিনি দেখতে চাইলে জানা গেল সমস্ত ফাইল দিল্লী পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইতিহাস বলে অন্য কথা—

> আন্দামানে কত সহস্র রাজবন্দীকে তারা পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করেছে আজও তা' সঠিকভাবে জানা যায়নি এবং কখনই তা' জানা যাবে না; কেন না ১৯৪৭ সালে ভারত পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ার সময়ে তারা খুব সতর্কভাবে এই বিষয় সম্পর্কিত সকল কাগজপত্র একেবারে নষ্ট করে গিয়েছে।২

অথবা

> তাদের এই নৃশংস বর্বরতার কথা যদি ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের মানুষ জেনে ফেলে এই ভয়ে ইংরেজ-

---

১। মাসিক বসুমতী, আশ্বিন ১৩৬৬-তে শ্রীসমর ভাদুড়ী লিখিত 'রাজনৈতিক বন্দিনী' শীর্ষক পত্র দ্রষ্টব্য।

২। ভূমিকা: মুক্তিতীর্থ আন্দামান।

দস্যুরা ভারতের সেই সকল দেশপ্রেমিক শহীদদের অথবা সেই নির্বাসিত স্বাধীনতা সৈনিকদের নামের কোন তালিকাও রেখে যায়নি। ভারত ত্যাগের পূর্বে সেই দীর্ঘ তালিকা তারা পরিকল্পিতভাবেই সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে ফেলেছে।[১]

এরপর চিত্রনির্মাতা পরিবেশন করেন আরেকটি ভ্রান্ত তথ্য—মিডল্ আন্দামানে সেন্টিনেলিসরা থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা বসবাস করে সেন্টিনেল দ্বীপের মধ্যেই, এই সেন্টিনেল দ্বীপ দক্ষিণ আন্দামান দ্বীপ সমূহের একটি। আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে চারটি বড় দ্বীপ আছে—উত্তর আন্দামান, মধ্য আন্দামান, দক্ষিণ আন্দামান এবং নিকোবর।

অজানা রহস্যের সন্ধানে

মি· রায়চৌধুরীর আন্দামানে আসার উদ্দেশ্য অপরাধীদের গ্রেফতার নয়, আরো সাংঘাতিক কোন রহস্যের সমাধান করা। তাঁর নিজের কথায়—পৃথিবীতে এমন কিছু রহস্য আছে যার আজও মানুষ সমাধান করতে পারেনি। উদাহরণ হিসাবে তিনি জানান সাংহাইয়ের এক দোকান থেকে দুটো এক ইঞ্চি লম্বা দাঁত পাওয়া গিয়েছে; ও দুটো মানুষেরই। কিন্তু অতবড় মানুষ পৃথিবীতে কোনদিন ছিল না। পাঠক সাধারণ একটু মিলিয়ে নিলে দেখতে পাবেন এখানে 'দানিকেন তত্ত্বে'র আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এরিক ফন দানিকেন তাঁর 'নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন' গ্রন্থে [পৃষ্ঠা ৩৮] লিখেছেন ঃ

> সীরিয়ার সাব্রিতা থেকে চার মাইল দূরে সাসনীখে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা পাথরের যে সব যন্ত্রপাতি পেয়েছেন তাদের ওজন চার সেরের মতন। পূর্ব মরক্কোর আয়ন ফ্রিতিশায় যেগুলো পাওয়া গেছে, সেগুলোও ফেলনা নয়। লম্বায় ১২½ ইঞ্চি, চওড়া ৮½ ইঞ্চি আর ওজনও প্রায় সাড়ে চার সের। যদি সাধারণ মানুষের উচ্চতা আর তার গঠনের ওপর নির্ভর করে বিচার করি, তাহলে দেখতে পাবো, ওই জ্যাবড়া জবর হাতিয়ার ব্যবহার করতে গেলে মানুষটাকে অন্তত বারো ফুট লম্বা হতে হবে।*

অথবা, দক্ষিণ আমেরিকার গোলক রহস্য—দানিকেনের গোলক রহস্যের অবিজ্ঞানমুখী ব্যাখ্যা সুবিদিত। অর্থাৎ তাঁর উদাহরণগুলো দানিকেনের আবিষ্কারের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

মি. রায়চৌধুরী বলতে চান এই দিকে কিছু বিদেশী বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন সময়ে কোন অনুসন্ধান কার্যে এসে আর ফিরে যেতে পারেননি। এ-ও ঐ একই ধরণের এক রহস্য। এ রহস্য উন্মোচনেই তাঁর আন্দামানে আগমন। দুর্ধর্ষ জারোয়াদের প্রসঙ্গ উঠলে জানা গেল জনৈক প্রীতম সিংকে কোন এক বিশেষ কারণে জারোয়ারা হত্যা করেনি, কিন্তু দ্বীপের ভেতরেও প্রবেশ করতে দেয়নি। কেবল খাদ্য আর লাল কাপড় চাইত আর তা নিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিত। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা হল, দ্বীপের ভেতরে এমন কিছু আছে যা তারা বিদেশীদের কাছ থেকে গোপন রাখতে চায় এবং এটিকে তারা প্রাণ দিয়ে রক্ষা করার জন্য বিশ্ব জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। এর একাধিক অসত্য তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। প্রথমত প্রীতম সিং প্রসঙ্গ, দ্বিতীয়ত জারোয়াদের লাল কাপড়-প্রিয়তা এবং সভ্য জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার কারণ বা সভ্য মানুষ বিদ্বেষ।

প্রীতম সিং নয় "এপ্রিল মাসের (১৯৫৮) ২৩শে তারিখে দুধনাথ তেওয়ারী আরও ৯০ জন বিদ্রোহী বন্দীকে সঙ্গে নিয়ে 'রস' দ্বীপ থেকে পলায়ন করে সরে যায়।....দুধনাথকে আহত করে বন্য মানুষেরা তাদের নিজস্ব পল্লীতে নিয়ে যায় এবং.... একটি বন্য কন্যাকে বিবাহ দেয়। দুধনাথ প্রায় একবছর তাদের সঙ্গে ছিল এবং তাদের ভাষা শিখে নেয়।"[২] বিভিন্ন সাময়িক পত্র ও কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদের তালিকা ঘেঁটে শ্রীদিলীপ মজুমদার ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ থেকে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত যে 'কারা-শহীদদের তালিকা' প্রস্তুত করেছেন তাতে প্রীতম সিং নামটি পাওয়া যায় নাভা জেলের বন্দী হিসাবে।[৩] আর এবারডিন অঞ্চল আক্রমণ (আন্দামানীদের একটি উল্লেখযোগ্য সভ্যতা-বিরোধী অভিযান)-এর পরিকল্পনায় ব্যস্ত থাকাকালীন দুধনাথ পালিয়ে এসে পরিকল্পনার কথা ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীকে বলে দেয়। বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার হিসাবে দুধনাথের জীবন রক্ষা পায়। কিন্তু দুধনাথকে কারা আটকেছিল—জারোয়ারা কি? তাকে তারা দ্বীপের ভেতরে একবছর রেখে দেয়, অর্থাৎ দ্বীপের ভেতরের কোন রহস্য তাদের সভ্যতা-বিরোধী করে তোলেনি। শেষ পর্যন্ত দুধনাথের পলায়ন ও বিশ্বাসঘাতকতা 'প্রীতম সিং তথ্যে'র বিরোধিতাই করে। ইতিহাস মেনে দুধনাথের ঘটনা বিবৃত করা হলে চলচ্চিত্রকারের গোটা অলীক পরিকল্পনাটাই মাটি হয়ে যেত। তাই এখানেও তাঁকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে।

এরপর আসে জারোয়াদের লাল কাপড়-প্রিয়তার কথা। লাল কাপড়ের সাথে হিন্দু ধর্মের শাক্ত সম্প্রদায়ের একটা যোগ আছে, কিন্তু গীতা-ভক্ত বৈষ্ণবের লাল কাপড়-প্রিয়তা খানিকটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু এখানে বলা হল যেন সেই লাল কাপড়ের প্রতি অনুরাগ গড়ে ওঠে সেই সন্ন্যাসীর কাছ থেকে যাঁকে তারা

১। পৃষ্ঠা ১ ঃ ঐ।

* অনুবাদ / অজিত দত্ত ঃ লোকায়ত প্রকাশন।

২। পৃষ্ঠা ১৩ ঃ পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

৩। দিলীপ মজুমদার প্রণীত 'বন্দীহত্যা বন্দীমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' নবাঙ্কুর প্রকাশনীর পরিশিষ্টাংশ দ্রষ্টব্য।

'রাজা' বলে মেনে নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'জারোয়ারা নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকে।'[১]

সভ্য জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার কারণ হিসাবে যে সন্দেহ এ ছবিতে কারণে পরিণত করা হয়েছে তা ঐতিহাসিক নয়। এ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য হল :

> জারোয়ারা অত্যন্ত দুর্দমনীয় এবং সভ্য মানুষ মাত্রকেই ওরা শত্রু বলে মনে করে ও বিষাক্ত তীর দিয়ে হত্যার চেষ্টা করে। ওদের বর্তমানের এই অনমনীয় জেদ ও সভ্যতাবিরোধী মনোভাবের কিছুটা বাস্তব কারণও আছে ; ওরা সভ্য মানুষদের কাছে সম্পূর্ণ বিনা কারণে যথেষ্ট প্ররোচনা পেয়েছে। ১৯২১ সালে আন্দামানের ইংরেজ শাসকেরা অবিবেচকের ন্যায় শুধুমাত্র কৌতুকপরায়ণতার বশবর্তী হয়ে জারোয়াদের কিছু সংখ্যক মানুষকে ধরে নিয়ে আটক করে রাখে। এর ফলে জারোয়ারা উত্তেজিত হয়ে কিছু কিছু এমন কাজ করে, যার জন্য স্থানীয় শাসকেরা মনে ভাবে যে তাদের সম্ভ্রম হানি হচ্ছে। তাই জারোয়াদের শিক্ষা দেবার জন্য এবং ইংরেজ সরকার যে অপরিসীম শক্তির অধিকারী সেকথা ঐ সকল অসভ্য বন্য জারোয়াদের ভালো করে বুঝিয়ে দেবার জন্য ১৯২৩ সালে ৩৭ জন জারোয়াকে ইংরেজ শাসকদের নির্দেশে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার পর থেকে জারোয়ারা আর সভ্য মানুষদের বিশ্বাস করে না এবং সভ্য জগতে আসবার ঘোরতর বিরোধী হয়ে পড়েছে। তাদের এই মনোভাব আজও অক্ষুণ্ণ আছে।*

তাহলে দেখা যাচ্ছে বার বার দর্শককে টেনে আনা হয়েছে শিক্ষা থেকে অশিক্ষায়, বাস্তব থেকে অবাস্তবে, যুক্তি থেকে আবেগে —যার পরিণতিতে কোন সুস্থ-সভ্য-প্রগতিশীল সমাজ পাওয়া অসম্ভব।

নিকটবর্তী দ্বীপ সমূহ ও সমুদ্র অঞ্চল পরিদর্শন করতে করতে হঠাৎ মি. রায়চৌধুরী ভারত সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ জারোয়াদের জঙ্গলাকীর্ণ দ্বীপে নামতে চাইলেন। লিখিতভাবে নামার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে, পিস্তল উঁচিয়ে নেমে গেলেন সেই ভয়ংকর দ্বীপে, সঙ্গে গেল সন্তু। দ্বীপে নামার সময়ে সরকারী অনুমতির কথা উঠলে মি. রায়চৌধুরী জানান, ভারতবর্ষের কোন নিষিদ্ধ জায়গায় যেতে তাঁর অনুমতি লাগে না। 'কোন ভারতীয় নাগরিক বা বিদেশীর ক্ষেত্রে এ বিষয়ে সরকারী ছাড় আছে ? কথাটি যত না ক্ষমতাবান রাজকর্মচারীর মত তত টা পাড়ার 'হিরো'দের মত। সেই সস্তায় বাজীমাৎ-এর ইচ্ছা।

দ্বীপে নামার পর একটি ঘটনায় দেখা যায় জনৈক জারোয়ার তীরকে অবলীলাক্রমে এড়িয়ে যায় সন্তু এবং ক্যারাটে শিক্ষার জোরে জারোয়াটিকে হত্যা করে ক্যারাটে শিক্ষার মাহাত্ম্য আবার প্রতিষ্ঠা করে।

আগুন রহস্য

ঘটনাক্রম দর্শককে পৌঁছে দেয় সেই চরম জায়গায় যেখানে লাল কাপড় পরা সারিবদ্ধ তীরন্দাজ জারোয়া দলের সামনে দাঁড়িয়ে এক হিন্দু যোগী (?)। বৈদিক ঋষিদের মত তাঁর পক্ক কেশ, শ্মশ্রুগুম্ফ সমন্বিত মুখমণ্ডল, পরিধানে লাল কাপড়, ঘাড়ের ওপর দিয়ে আজানুলম্বিত আর এক লাল কাপড়। মুখোমুখি বসে আছে চারজন অপরাধী, তাদের হাত পেছনে জোড়া করে বাঁধা। পাশে একটু উঁচু ঢিপির মধ্যে নীলাভ আগুন জ্বলছে। একে একে অপরাধীদের অস্ত্রগুলো সন্ন্যাসী সেই অগ্নি-গহ্বরে নিক্ষেপ করলেন এবং অপরাধীদের শাস্তির কথা ঘোষণা করলেন। এই সময়ে উদ্যত রিভলবার হাতে মি. রায়চৌধুরীর ঘটনাস্থলে প্রবেশ। কিছু উত্তেজনাকর ঘটনার পর সন্ন্যাসী অপরাধী চতুষ্টয় এবং কাকা-ভাইপোর আগমনের উদ্দেশ্য অবহিত হলেন। জানলেন, ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। সেখানে বিপ্লবী গুণদা তালুকদারের জন্মদিন পালিত হয়—স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের শ্রেষ্ঠ (?) উপায় জন্মদিন পালন। সন্ন্যাসীর স্মৃতিতে জেগে ওঠে অতীত, তিনি বলে চলেন, জেল থেকে পালিয়ে গিয়ে ছ'মাস ধরে একটু একটু করে তিনি একটি ভেলা তৈরী করেন, তাতে চড়ে এই জারোয়াদের দ্বীপে এসে পড়েন। যখন তিনি এখানে এলেন তখন ছিলেন অজ্ঞান। কি জানি, কেন তারা তাঁকে হত্যা না করে সুস্থ করে তুলল। এখন তাঁকে জারোয়ারা 'রাজা' বলে।

ছ'মাস ধরে ভেলা তৈরী করলেন গুণদা তালুকদার অথচ ইংরেজ নায়ক টের পেল না—একথা হাস্যকর। জারোয়াদের সাথে তাঁর প্রথম পরিচয়ের কথা সযত্নে এড়িয়ে গেলেন অজ্ঞান থেকে।

পরবর্তী এবং শেষ প্রসঙ্গ—আগুন ; সমস্ত রহস্য, সমস্ত কিছুর চূড়ান্ত ফলাফল এই আগুনের মধ্যে কেন্দ্রীভূত। প্রথমে যখন পর্দায় অগ্নি-গহ্বরটি দেখা গেল তখন ভেতরে নীল রঙের আগুন জ্বলছে, কিছুক্ষণ পর দুষ্ট চতুষ্টয়ের আগ্নেয়াস্ত্রগুলি নিক্ষেপ করার পর তা লাল হয়ে যায় এবং পরে আবার নীল। এর অর্থ কি অলৌকিকত্ব ? তাই এর কোন শিখা নেই ? গহ্বরের ভেতরে ঠিক মধ্যস্থল বরাবর দেখা যায় সাদা গোলাকৃতি একটি পদার্থ। একটা ধাতু নাকি ভেতরে রয়েছে যার ফলে এই আগুন। সন্ন্যাসীর ভাষায়—রোদে, বৃষ্টিতে, ঝড়ে, শীতে এ নেভেনা, আত্মার মতো এর বিনাশ নেই। হাজার বছর ধরে

১। পৃষ্ঠা ৫ : মুক্তিতীর্থ আন্দামান।

* পৃষ্ঠা ৪-৫ : পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

এই আগুন জ্বলছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে এ আগুন জারোয়াদের রক্ষা করে (কিভাবে?)। বার বার বিদেশীরা এ আগুন চুরি করতে এসেছে, কিন্তু পারে নি। বিদেশের কাছে 'টাকা খেয়ে' এই দুর্বৃত্তরাও এসেছিল।

ইতিমধ্যে একটি ঘটনা নাটকীয়ভাবে ঘটে যার ফলে একজন দুর্বৃত্ত অগ্নিউৎপাদক ধাতু কর্তৃক আকৃষ্ট হয়ে মারা যায়।

মি. রায় চৌধুরী সন্ন্যাসীর তুলনায় বিজ্ঞানে অধিকতর অগ্রসর। এতক্ষণ তিনি জানতেন না কি রহস্য যার খোঁজে তিনি এসেছেন, বিজ্ঞানীরা আসেন কিন্তু ফিরতে পারেন না, জারোয়ারা সভ্যতা বিমুখ ইত্যাদি। কিন্তু এখন কোন এক যাদুমন্ত্র বলে তিনি এক বৈজ্ঞানিক (?) ব্যাখ্যা জুড়ে দিলেন সন্ন্যাসীর পাশে, হয়ে উঠলেন রহস্য সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ। তিনি জানালেন—এ আগুন পৃথিবীর আগুন নয়, ভিন্ন কোন গ্রহ থেকে উল্কার মতো ধাতুপিণ্ড, যার জন্য এ আগুন অনির্বাণ। এর প্রচণ্ড চৌম্বক শক্তি পৃথিবীর সব ধাতুকে আকর্ষণ করে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারে। বিজ্ঞানীরা এটাকে নিয়ে গবেষণা করতে চায়। হয়ত ধাতুটা থেকে ওরা এমন বোমা বানাতে পারবে যা সমস্ত পৃথিবীটাকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি (ভারত সরকারের একটি সংস্থা) প্রযোজিত শিশুবর্ষে মুক্তিপ্রাপ্ত একটি ছবি কি সাংঘাতিক অবিজ্ঞানের বিষ ছড়াতে পারে! ছোটদের জন্য ছবি যে দেশে প্রায় হয় না সে দেশের তৃষ্ণার্ত কিশোরের সামনে এ ধরণের পানীয় পরিবেশন নিঃসন্দেহে অপরাধ। টিকিটের সর্বোচ্চ হার এক টাকা হওয়ায় প্রায় সকলের কাছেই দ্বার ছিল অবারিত। তাই সকলেই আকণ্ঠ পান করেছে।

গীতায় আত্মা সম্পর্কে বলা আছে আত্মাকে অস্ত্রে কাটা যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না, জলে ভেজানো যায় না, বায়ুতে শুকানো যায় না। [২৩/২] গীতা বুকে করে যাঁর পঞ্চাশাধিক বৎসরকাল অতিবাহিত হল সেই শাস্ত্রজ্ঞ আত্মার মতো অবিনশ্বর আর কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন কি? প্রকৃতপক্ষে এ ধরণের শাশ্বত চিন্তা অবিজ্ঞান প্রসূত। এখানে সেই অবৈজ্ঞানিক কল্পনাকে অপরিণত কিশোরদের নিক্ষেপ করার ঘৃণ্য প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সন্ন্যাসীর বিশ্বাসের এ অসঙ্গতির মূল আমরা খুঁজে পাব মি. রায়চৌধুরীর ব্যাখ্যায়।

মি. রায়চৌধুরীর ব্যাখ্যা—গ্রহান্তর থেকে ছুটে আসা উল্কাপিণ্ড—দানিকেনের অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনুসারী। একবার তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন'-এর একাত্তর পৃষ্ঠায় আসুন। এখানে বলা হয়েছে কোস্টারিকায় অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি দেখেছেন: পঁয়ত্রিশটা গোলক জ্বলন্ত রোদে পুড়ছে, কোন মান্ধাতার কাল থেকে, কে জানে আগুন গরম ডিকুইস নদীর পাড়ে।

আর তাই দানিকেনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন জারোয়াদের সভ্য মানুষ বিদ্বেষের কারণ হিসাবে। দানিকেনের অভিজ্ঞতা হল: ইচ্ছে হল ওই 'গোলক' ধাঁধার একটা সমাধান বের করি কিন্তু আদিবাসীদেরকে সেগুলোর উৎস এবং উদ্দেশ্যের কথা জিজ্ঞেস করতে, তারা বোবা মেরে গেল। আমাকে যেন ওরা সন্দেহ করতে লাগল। মিশনারীরা বারে বারে গেছে তাদের কাছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার অর্থনৈতিক আদান প্রদান মারফত আলোকপ্রাপ্ত হয়েছে তারা, তবু অন্তরের অন্তঃস্থলে তারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন থেকে গেছে।....আদিবাসীদের কাছে গোলক রহস্য নিষিদ্ধ কথা, ট্যাবু। কিন্তু কেন ট্যাবু তা আমার বুদ্ধির অগোচর।[১]

'ট্যাবু'র কারণ দানিকেনের বুদ্ধির অগোচর হতে পারে আলোচ্য চিত্রের নির্মাতার কাছে নয়। তিনি তা ছবিতে ব্যাখ্যা করেছেন। এখন প্রশ্ন এমন কোন চুম্বকের কথা বিজ্ঞানের জানা আছে কি যা বিশ্বের সমস্ত ধাতুকেই আকর্ষণ করে? না, এমন চুম্বক নেই। আর চুম্বক টেনে নিয়ে পুড়িয়েও দেয়? স্কুলের বিজ্ঞানের ছাত্রও জানে "চুম্বককে উত্তপ্ত করলে তার চুম্বকত্ব সম্পূর্ণ অন্তহিত হয়। অবশ্য বিভিন্ন চৌম্বক পদার্থের এই নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বিভিন্ন। এই তাপমাত্রাকে বলা হয় কুরী-বিন্দু (curie point)।"[২] অথচ এ চুম্বক যেমন প্রচণ্ড গরম যেমন প্রচণ্ড এর আকর্ষণী শক্তি—এমনকি মানুষকেও টেনে নেয়। তবে এর আওতায় মি. রায়চৌধুরীর পিস্তল কাজ করল কি করে? সবশেষে বৈজ্ঞানিকদের এর প্রতি আগ্রহের কারণ হিসেবে মি. রায়চৌধুরীর মনে হয়েছে এর ধ্বংস করার ক্ষমতার কথা, অমঙ্গলের ক্ষমতা—মঙ্গলের নয়।

দানিকেনের আশঙ্কাকে রূপ দিতে হলে এ জিনিসের অবতারণা না করলে চলে না, আবার গীতার ব্যাখ্যা এর অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, যদিও দানিকেনকে ঘেঁটে বেড়াতে হচ্ছে সারা জগতের ধর্মগ্রন্থাবলী—তবু দানিকেনের নয়া পদ্ধতি। ফলে, ধর্মীয় বিশ্বাসে অসঙ্গতি আনতে হয়েছে। বাংলা ভাষার চলচ্চিত্র দানিকেন প্রচার করছে; পত্রপত্রিকা এ ছবির গুণগান গাইছে। অথচ দর্শকের মনের অগোচরে তার চিন্তারাজ্যে বিষ মিশিয়ে দিচ্ছে এই ফ্যাসিস্ট ছবি।

পরিশেষে জানিয়ে রাখি দস্যুদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছিল সন্তুর জন্যই। তার অতর্কিত আক্রমণ সম্ভব করে তুলেছিল দস্যুদের পরাজয়। আরও একবার প্রমাণিত হল শিক্ষা নয় ক্যারাটে, মননশীলতা নয় পশুবৃত্তিই শ্রেষ্ঠতর।

১। পৃষ্ঠা ৭৩: নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন।

২। পদার্থ বিজ্ঞান/অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত: বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড-এর পৃষ্ঠা ২৪৪ দ্রষ্টব্য।

রোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী বিশ্বসাহিত্যকে উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধি দান করেছে। বাঙালী পাঠক দীর্ঘ দিন থেকেই জুল ভার্ন-এর সাথে পরিচিত। সম্প্রতি 'সমকালীন কলকাতা' পত্রিকা 'সর্বাধিক বিক্রির চাবিকাঠি কুড়িয়ে' নেওয়া পুস্তক প্রণেতাদের মধ্যে জুল ভার্ন অন্যতম। মনে রাখা দরকার তাঁর উপন্যাসে প্রত্যক্ষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারী য়ুরি গ্যাগারিন। আর আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টি প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু। সত্যজিৎ রায়ও বিকৃত করেন নি বিজ্ঞানকে কিংবা ইতিহাসকে। ফলে, কিশোর মনের অনুসন্ধিৎসাকে জাগিয়ে তুলে তাকে সঠিক পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন, ঠিক একজন 'কমিটেড' শিল্পীর মতই; কারণ তাঁর রহস্যঘন কাহিনীগুলো গড়ে ওঠে নির্ভেজাল কল্পনার জগতে। কিন্তু আলোচ্য ছবিটিতে বাস্তব সত্যের সাথে কাল্পনিক সত্যের মিশ্রণ ঘটিয়ে চিত্র নির্মাতা তপন সিংহ ছোটদের প্রতি করে বসলেন এক মারাত্মক অন্যায়। না হলে এভাবে আলোচনার প্রয়োজন ছিল না।

টালিগঞ্জের সেলুলয়েড

(১০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বস্তু বা চিপির পাধা হয়ে আছেন। তবে স্যাণ্ডউইচের মধ্যভাগে সার পদার্থ থাকে এরা সে হিসেবে তার থেকেও নিকৃষ্ট।"

এই জন্যেই ঋত্বিক ঘটক চেয়েছিলেন সমস্ত কিছুর "জাতীয়করণ। সোজাসুজি দেশের সব কটি চিত্রগৃহ রাতারাতি সরকারী সম্পত্তি করে ফেলা এবং সেই সম্পত্তি স্বয়ংচালিত একটা সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া যেমন হয়েছে আমাদের জীবন বীমার সংস্থার ব্যাপার।"

সম্প্রতি দিনে টেকনিসিয়ান্স এণ্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলনে একাধিক বক্তা বহুবিধ বক্তব্যের মধ্যে সরকারের কাছে কিছু প্রস্তাব রেখেছেন। এর মধ্যে প্রথম প্রস্তাব হল সরকারী উদ্যোগে একাধিক চিত্রগৃহ তৈরী করার আশু পরিকল্পনা, যার মাধ্যমে ছবি মুক্তির সুসম পক্ষপাতহীন ব্যবস্থা করা যায়। কলকাতায় অন্তত পক্ষে একটা রিলিজ চেনও সরকারী ব্যবস্থাপনায় আনা গেলে প্রদর্শক, পরিবেশকদের ছবি মুক্তির ব্যাপারে একচেটিয়া কর্তৃত্বকে কিছুটা চ্যালেঞ্জ জানানো যাবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবশ্য চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে নেই। বাংলা ছবির জন্য সরকার কি করতে পারেন সেই সংক্রান্ত পরিকল্পনার বিবরণ সরকার কিছুদিন আগে আমাদের সামনে রেখেছেন। এই পরিকল্পনার মধ্যে শুধু কিছু ছবিকে আর্থিক অনুদানের বিষয়টিই নেই, রয়েছে কালার ফিল্ম ল্যাবরেটরী তৈরী, স্টুডিও কর্মচারীদের নির্দিষ্ট বেতনহার, সমস্ত চিত্রগৃহে পশ্চিমবঙ্গে তৈরী ছবির আবশ্যিক প্রদর্শনী, ছোটদের জন্য স্বল্প দৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন, ডকুমেন্টারী ছবির নির্মাণ ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা, আর্ট-ফিল্ম-থিয়েটার তৈরী ইত্যাদি। এছাড়াও সরকারী উদ্যোগে ও সাহায্যে কলকাতায় এবং বিভিন্ন জেলায় বেশ কিছু চিত্রগৃহ নির্মাণের কর্মসূচীও সরকার নিয়েছেন। এভাবে এখানে তৈরী ছবি দেখানোর জায়গা ক্রমশঃ প্রসারিত হয়ে উঠবে। গোটা পশ্চিমবঙ্গে সিনেমাহলের সংখ্যা মাত্র ৬৮০, শহর কলকাতায় ৮৫টি এবং বাকী ২৯৫টি গোটা রাজ্যে। এর মধ্যে বেশ কিছু হলে নিয়মিতভাবে এবং তার চেয়েও বেশী সংখ্যক হলে মিলিয়ে মিশিয়ে ভিন রাজ্যে তৈরী ছবি দেখানো হয়ে থাকে। কাজেই এরাজ্যে তৈরী ছবির প্রদর্শনের ব্যাপারটাকে আবশ্যিক শর্ত হিসেবে রেখে নতুন নতুন চিত্রগৃহ নির্মাণের সরকারী কর্মসূচী নেওয়া একান্তই জরুরী।

সরকারী অনুদান নিয়ে যাঁরা ছবি করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন জ্ঞানেশ মুখার্জী, অমল দত্ত, অশোক দাস, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, নীতিশ মুখার্জী, মঞ্জু দে, যান্ত্রিক, নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর ভট্টাচার্য ও আরো কয়েকজন। সরকারের নিজস্ব উদ্যোগে তৈরী হচ্ছে বা হয়েছে—উৎপল দত্তের 'ঝড়', মৃণাল সেনের 'পরশুরাম', সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে' ও রাজেন তরফদারের 'নাগপাশ'। এছাড়া বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত 'দূরত্ব' ছবির প্রিন্টের জন্য এবং মৃণাল সেন 'ওকা উরি কথা'র হিন্দী ভার্সানের জন্য অর্থ সাহায্য পেয়েছেন। বেনেগাল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হয়ে একটি কাহিনীচিত্র করবেন। এছাড়া বেশ কিছু শিশু চলচ্চিত্র তৈরী হচ্ছে সরকারী উদ্যোগে যেমন বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত করছেন 'বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, পূর্ণেন্দু পত্রী 'ক্ষীরের পুতুল, শঙ্কর ভট্টাচার্য 'তোতাকাহিনী', মোহিত চট্টোপাধ্যায় 'মেঘের খেলা', রঞ্জিত ঘোষাল 'ছেলেটা' পট্টভিরামা রেড্ডি 'ডাকঘর' বিজয়া মূলে পাপেট ছবি ইত্যাদি। কাজেই বেশ কিছু কাজ হচ্ছে যা আমাদের আশান্বিত করে তুলছে।

এ রাজ্যে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন সুস্থ চলচ্চিত্রের সপক্ষে যে ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে চলেছে তা নিঃসন্দেহে যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। বর্তমান সরকার এই আন্দোলনকে আরো প্রসারিত করার কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ এই সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারের কাছ থেকে আর্থিক অনুদান পেয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র আলোচনার সংকলন প্রকাশ এবং লাইব্রেরী ইত্যাদির জন্য। এই রাজ্যে প্রথম একটি ফিল্ম সোসাইটি সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটা সরকারী তথ্যচিত্র নির্মাণের সুযোগ পেয়েছেন। বিভিন্ন সরকারী উৎসবে ফিল্ম সোসাইটিগুলির সক্রিয় সহযোগিতা নেওয়া হচ্ছে। কাজেই এটাও একটা নতুন সুযোগ তৈরী করে দিচ্ছে এবং এভাবে সুস্থ চলচ্চিত্রের জন্য যৌথ সংগ্রামের ক্ষেত্র ক্রমশঃই প্রশস্ত হয়ে উঠছে।

আজ এক ভীষণ অভিভাবকহীন অবস্থা টালিগঞ্জের—চিত্র ভাষা বর্জিত এক আত্মঘাতী কণ্ঠস্বর মর্মভেদী হয়ে সারা দেশের ওপর পড়ছে। তাই এই রাজ্যের মুমূর্ষু চলচ্চিত্রশিল্পকে বাঁচাতে আমাদের সকলকে কোমর বাঁধতে হবে। সীরিয়াস হতে হবে জীবন সম্পর্কে, শিল্প সম্পর্কে, ইণ্ডাস্ট্রি সম্পর্কে। যাঁরা ছবির জগতের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যক্ষভাবে, যাঁরা এই সব নিয়ে ভাবেন, আলোচনা করেন, লেখেন তাঁদের সকলের ভালোবাসাই বাঁচাতে পারে এই রুগ্ন, ক্ষয়ে যাওয়া হৃতগৌরব ইণ্ডাস্ট্রিকে বাঁচাতে। এই ভালোবাসাই শেষ রক্ষাকবচ—যা গোড়া ধরে নাড়া দেবে।

ভবিষ্যত সবসময়েই উজ্বল
সূর্যময় সবক্ষেত্রেই।
কোনো বিশেষ অবস্থাই চিরন্তন নয়।
প্রগতির শক্তি নিশ্চিতভাবেই অগ্রগামী।
বাংলা ছবির জগৎ বিস্তারিত হোক।
বাংলার ছবি গৌরবময় হোক।
বাংলা ছবি জীবনবাদী হোক।
জয় হোক বাংলা ছবির।
দীর্ঘজীবী হোক বাংলা ছবির শিল্পী,
কলাকুশলী, দর্শক এবং পৃষ্ঠপোষকগণ।

গণদেবতা

চিত্রনাট্য : রাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দৃশ্য—২৫২

স্থান—নদীর ধারের রাস্তা।

সময়—দিন।

উচ্ছল ছন্দোবদ্ধ সঙ্গীতের তালে তালে ক্যামেরা রাস্তার ধারের ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

ক্যামেরা বাঁ দিকে ঘুরতেই দেখা যায় দূরে গ্রাম। কয়েকটা রাখাল ছেলে গরু চরাচ্ছে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—মুড্ডো। ক্যামেরার দিকে তাকিয়েই সে চমকে ওঠে। পেছন ফিরে সে গ্রামের দিকে ছুটতে শুরু করে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৫৩

স্থান—গ্রামের রাস্তা।

সময়—দিন।

কয়েকজন গ্রামের লোক একটা গাছের তলায় বসে পাশা খেলছিল। মুড্ডো চিৎকার করতে করতে বাঁ দিক থেকে ফ্রেমে ঢোকে।

মুড্ডো : পণ্ডি—ত !…পণ্ডিত আসচে গো !…পণ্ডিত…

গ্রামের লোকগুলো তার কাছে দৌড়ে আসে। অনেকে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। মুড্ডোকে সবাই জিজ্ঞাসা করতে শুরু করে।

কাট্ টু।

টপ্ লং শট। মুড্ডোকে সবাই ঘিরে আছে। সে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে জবাব দিতে।

কাট্ টু।

(২৫৩ থেকে ২৫৭ দৃশ্য নেই)

দৃশ্য—২৫৮

স্থান—নতুন চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।

সময়—দিন।

ক্লোজ শট্—জেল ফেরৎ দেবু পণ্ডিত ফিরছে। এক মুখ দাড়ি। চণ্ডীমণ্ডপের সামনে এসে সে দাঁড়ায়।

কাট্ টু।

চণ্ডীমণ্ডপ নতুন চেহারায়। যেন অপরিচিত। বাঁধানো মেঝে, ধবধবে, সাদা থাম, নতুন চালা।

কাট্ টু।

দেবু প্রথমটায় বুঝতে পারে না ব্যাপারটা। একটু পরে চণ্ডীমণ্ডপের সামনে গিয়ে প্রণাম করে।

কাট্ টু।

হঠাৎ সে থেমে যায়। ক্যামেরা সরে এসে দেখায় পুরনো শ্বেতপাথরের জায়গায় নতুন পাথর বসানো হয়েছে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—দেবু।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—শ্বেতপাথর, তাতে লেখা।

সেবক
শ্রী শ্রীহরি ঘোষেন
প্রতিষ্ঠিতং

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—দেবু। বিস্মিত চোখে চারদিকে তাকায়।

কাট্ টু।

জুম্ ফরোয়ার্ড শট্ একটু দূরে পুরনো পাথরটা ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে আছে।

কাট্ টু।

দেবু এগিয়ে গিয়ে সেই পাথরটা ছোঁয়।

এই সময় গ্রামের দিক একদল লোক ছুটতে ছুটতে আসে।

—দেবু— !

—পণ্ডিত— !

—দেবু ভাই— !

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৫৯

স্থান—দেবুর বাড়ির সামনের রাস্তা।

সময়—দিন।

বিলু দরজার কাছে ছুটে আসছে।

বিলু : (মুড্ডোকে) কি হয়েছে রে, এই ?
মুড্ডো : পণ্ডিত ! পণ্ডিত এস্চে সজিব্যান !
বিলু : এঁ্যা ?
মুড্ডো : হ্যাঁ গো,…ঐ শোন ক্যানে !

শঙ্খধ্বনি শোনা যায় দূরে। কি করবে বিলু বুঝতে পারে না। হঠাৎ তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে, ফুঁপিয়ে ওঠে বিলু।

মুড্ডো : কি হল ?…ও সজিব্যান ?…সজিব্যান ?

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৬০
সময়—দিন।
স্থান—নতুন চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।

গ্রামবাসীদের সঙ্গে দেবু পণ্ডিত গ্রামের দিকে আসছে।
—এসো এসো, এই সর্ গা…ভিড়টা একটু ছাড় ক্যানে !
—কেমন আছ দেবু ভাই ?

দুর্গা ছুটে আসে।

দুর্গা : জামাই পণ্ডিত !

দেবুকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে।

জগন : তুমি জেলে থাকতে ও রোজ রাতে ওর মাকে পাঠাত তোমার বাড়ি শুতে
হরেন : As your wife's bodyguard
জগন : এদিকে জানতো, চণ্ডীমণ্ডপ এখন ছিরুর কাচারী !
দেবু : সে কি ?
হরেন : Yes ! and we have also given মুখের মত জবাব। প্রজাসমিতি তৈরি করেছি আমরা।
জগন : গাঁয়ে প্রজাসমিতি তৈরি করেছি আমরা।

হঠাৎ দেবু পণ্ডিত কিছু একটা দেখে থমকে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৬১
স্থান—গ্রামের নতুন স্কুল।
সময়—দিন।

লং শটে গ্রামের নতুন স্কুলটি দেখা যায়। ছাত্ররা নতুন মাস্টারমশাইকে নিয়ে বারান্দায় বসে।

স্কুলের সামনে একটা বড় সাইনবোর্ড
শ্রীহরি বিদ্যামন্দির
প্রতিষ্ঠাতা শ্রী শ্রীহরি ঘোষ।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৬২
স্থান—নতুন চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।
সময়—দিন।

দেবু পণ্ডিত স্কুলটির দিকে তাকিয়ে আছে।

জগন : চণ্ডীমণ্ডপ থেকে পাঠশালা উঠিয়ে দিয়েছে ছিরু…

এই সময় রাঙাদিদি ছুটে এগিয়ে আসে।

রাঙাদিদি : কৈ রে ?…দেবা কৈ ?…অ দেবা !
দেবু : রাঙাদিদি !

রাঙাদিদির পায়ে নমস্কার করতে যেতেই তাকে সে টেনে তোলে।

রাঙাদিদি : পণ্ডিত না মুণ্ডু !…আয় !…ই ছোঁড়ার কুনো আক্কেল নাই—
দেবু : দাঁড়াও আগে পেন্নাম করি—
রাঙাদিদি : নিকুচি তোর পেন্নাম ! আয় বলছি !…আয় আয়…

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৬৩
স্থান—দেবুর বাড়ীর উঠোন ও বারান্দা।
সময়—দিন।

উঠোনে পড়শী মেয়ে-বৌদের ভিড়।

রাঙাদিদি দেবু পণ্ডিতকে টানতে টানতে নিয়ে আসে।

রাঙাদিদি : এ্যাই !…এ্যাই ছুঁড়িরা !…যা ভাগ্ ভাগ্ সব ইখান থেকে…নইলে এক্ষুণি মুখ ছোটাবো বল্লাম !…পালা !…

ওরা সবাই বারান্দার দিকে এগিয়ে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৬৪
স্থান—দেবু পণ্ডিতের ঘর।
সময়—দিন।

রাঙাদিদি দেবু পণ্ডিতকে টেনে নিয়ে ঘরে ঢোকে। বিলুর দিকে তাকে ঠেলে দিয়ে বলে—

রাঙাদিদি : লে !

সে বেরিয়ে এসে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

দেবু পণ্ডিত ঘরে ঢোকে, বিলুর সঙ্গে প্রায় ধাক্কা লাগে। পেছন ফিরে দরজার দিকে তাকায়।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—বিলু।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—দেবু পণ্ডিত।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—বিলু।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—দেবু পণ্ডিত।

দেবু : (হেসে) কি ? কি হয়েচে ?

কাট্ টু।

বিলুর চোখে জল। দেবুর বুকে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

দেবু : (গভীর স্নেহে) বিলু !

বিলু : এত রোগা হয়ে গ্যাছো কেন ?

দেবু বিলুর মাথায় চুম্বন করে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৬ঃ

স্থান—নতুন চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।

সময়—দিন।

ক্লোজ শট্—যতীনের হাতে একটা চারা 'সিজালপিনিয়া পাল্চেরিমা'। চণ্ডীমণ্ডপের দিকে সে এগিয়ে চলেছে।

কাট্ টু।

চণ্ডীমণ্ডপের কাছে একটি খাটিয়ায় ছিরু পাল, ভবেশ, হরিশ, দাসজী, গরাই বসে আছে। কাছারির আলোচনা চলছে। কয়েকজন গরীব গ্রামবাসী সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে।

ছিরু : (একটা ফর্দ পড়তে পড়তে) গনেশ পাল,…ন'টাকা সাত আনা—, ভবহরি মণ্ডল…ছ'টাকা ছ'আনা তিন পয়সা,…অনিরুদ্ধ কম্মকার—

দাসজী : (ফোঁড়ন কেটে) হিসেবের বাইরে…লিখে রাখো তামাদি…

যতীনকে চণ্ডীমণ্ডপের দিকে আসতে দেখা যায়।

যতীন : নমস্কার, ঘোষ মশাই !

ছিরু : নমস্কার। হাওয়া খেতে বুঝি !

যতীন : না। (হাতের চারাটা দেখিয়ে) সিজালপিনিয়া পাল্চেরিমা !

ছিরু : এ্যাঁ ?

যতীন : সিজালপিনিয়া পালচেরিমা—

ছিরু পাল ও দাসজী অবাক হয়ে দুজনে দুজনের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

এই সময় দেখা যায় ভূপাল চৌকিদার ও লোটন পাতু বায়েনকে টানতে টানতে চণ্ডীমণ্ডপে নিয়ে আসছে।

ভূপাল : আয় ! আয় !…আয় শালা !—

পাতু : ছেড়ে দে বুলছি !…ছেড়ে দে—

ধস্তাধস্তি করতে করতে পাতু নিজেকে মুক্ত করে নেয়।

পাতু এ্যাঁ—! খুটোর জোরে ম্যাড়া !…মনিবকে দেখে খু-উ-ব তেজ বাড়িছে,—না ?

লোটন খবদ্দার।

ছিরু কি হইছে ?

ভূপাল দ্যাখেন না, সাতদিন হল খবর দিছি, "লবান গেইছে, এবার আয়—চালগুলোন সারা",—তা নিজে তো আসবেই না—পাড়া শুদ্ধু বিগড়াইছে। বুলছে, ইবার থেকে চণ্ডীমণ্ডপে আর ব্যাগার দিবে না কেউ।

কাট্ টু।

ছিরু : (উঠে দাঁড়ায়) ক্যানে ?

কাট্ টু।

পাতু : কেনে তুব মশাই ? চণ্ডীমণ্ডপ এখুন কার কি ? উ তো এখন আপনার কাচারি !

হঠাৎ ফ্রেমের বাইরে থেকে একটা হাত এসে পাতুকে চড় মারে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—ছিরু পাল।

কাট্ টু।

দেবু একটু দূর থেকে ফ্রেমে ইন্ করে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—যতীন।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—পাতু, তার চোখ চাপা রাগে যেন জ্বলতে থাকে।

কাট্ টু।

ছিরু : হারামজাদা !

কাট্ টু।

পাতু হাসতে থাকে।

পাতু : হে হে হে…মারেন…কাটেন…আর ফাঁসিই লটকান…ভবী ভোলবার লয় !…পেজা সমিতির হুকুম !

ছিরু : চুপ্ কর্ !

হঠাৎ দূরে কাউকে দেখে ছিরু পালের মূর্তি বদলে যায়।

ছিরু : আরে, কখন ?…কৎখন ?

কাট্ টু।

যতীনকে পাশ কাটিয়ে দেবু পণ্ডিত এগিয়ে আসে।

দেবু : কি ব্যাপার?

যতীন : নমস্কার। আপনিই তো দেবুবাবু।

দেবু : আপনি?

যতীন : আমার নাম যতীন,—যতীন মুখুজ্যে।··· আপনাদের গ্রাম শাসন দেখছিলাম।

এই বলে সে ছিরু পালের দিকে তাকায়।

কাট্ টু।

ছিরু পাল যতীনের দিকে তাকিয়ে আছে।

কাট্ টু।

যতীন : (দেবুকে) আচ্ছা, পরে আবার দেখা হবে, এ্যাঁ?

সে চলে যায়। দেবু পণ্ডিত যতীনের দিকে তাকিয়ে থাকে। ক্যামেরা চার্জ করে তার ওপর।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—ছিরু পাল ও যতীনের যাবার দিকে তাকিয়ে আছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৬৬

স্থান—নতুন চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।

সময়—দিন।

ক্লোজ শট্—একটা থালার ওপর ৫/৬ কাপ ধূমায়িত চা।

ছিরু পাল একটা চায়ের কাপ তুলে দেবুকে দেয়। তার পাশে খাটিয়ায় বসে আছে ভবেশ, হরিশ, গরাই ও অন্যান্যরা।

ছিরু : শোন খুড়ো, দৈবের বিপাকে তো মেলা কষ্ট পেলে! আর যেন ওসব পথে যেয়ো না বাবা তুমি!···কি দরকার···সংসার রইছে···Home family রইছে···বাড়ীঘরদোর রইছে···তাছাড়া গায়ের যা অবস্থা···তোমার মতো ঠাণ্ডা-মাথা লোকের খুবই দরকার,—বুঝলে না?

ভবেশ : ছিরু তো বলছিল—"খুড়োকে আসতে দাও,—দেখবে জোয্য ব্যাপারে আর কেউ ট্যাঁ-ফোঁটি করবে না।"

হরিশ : খাজনাবৃদ্ধি! আরে বাবা, ধন্মতঃ যা মানবার সে তো মানতেই হবে! বুল্লে তো হবে না!

ভবেশ : তাছাড়া নিজে বুঝদার, পাঁচজনকে মানাইতে পারে···তুমি ছাড়া···হেঁ হেঁ···

ছিরু : ও ইস্কুলের চাকরির লেগে তুমি কিছু ভেবো না। ও ধরো তোমারই রইছে। তুমি শুধু কাল-পরশু একবার থানায় যাবে···ও ছোটবাবুর সঙ্গে সব কথা বলা রইছে। একটা মুচলেকা মতো—

কাট্ টু।

দেবু পণ্ডিত।

কাট্ টু।

ছিরু : আর হ্যাঁ, ঐ যে ছোকরা গো···নজরবন্দী···ঝেশী ধারে কাছে ঘেঁষো না যেন—বুঝলে?

দেবু : (হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে) বুঝলাম!

হরিশ : ও কি? হয়ে গেল?

দেবু : হ্যাঁ, চলি!

ছিরু : তাহলে থানার ব্যাপারটা কাল-পরশুর মধ্যেই—

দেবু : না ছিরু, ওসব মুচলেকা-টুচলেকা···আমার দ্বারা আর হবে না—

চণ্ডীমণ্ডপ থেকে নেমে দেবু পণ্ডিত চলে যায়।

ছিরু পাল ও তার দল সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৬৭

স্থান—বাঁশ ঝাড়ের পাশের রাস্তা।

সময়—দিন।

দেবু পণ্ডিতের পাশাপাশি ট্রলি করে ক্যামেরা একটু লো অ্যাঙ্গেলে তাকে অনুসরণ করে। হঠাৎ সে শব্দ শুনে দাঁড়িয়ে পড়ে।

কাট্ টু।

একটু দূরে মাতাল অনিরুদ্ধ এগিয়ে আসতে চাইছে। আর দুর্গা তাকে প্রাণপণ বাধা দিচ্ছে।

অনিরুদ্ধ : ছাড়্···ছেড়ে দে!···ছেড়ে দে আমাকে! আমি খুন করব শালাকে—

দুর্গা : খবদ্দার! খবদ্দার যেতে পারবে ওর কাছে! আচ্ছা, তুমি কি গো?···তোমার বৌকে সে মা বলে,···পায়ে হাত দিয়ে পেন্নাম করে···নরকে থাকতে থাকতে তুমিও নরকের পোকা হয়ে গেলে!

অনিরুদ্ধ : চুপ্!!

দুর্গাকে সে আঘাত করে।

দুর্গা : উঃ!

এই সময় অনিরুদ্ধ দূরে দাঁড়িয়ে থাকা দেবু পণ্ডিতকে দেখতে পায়। টলতে টলতে সে এগিয়ে আসে।

অনিরুদ্ধ : দেবু ভাই!···দেবু ভাই!···কখন এলে দেবু ভাই?

দেবু : ছিঃ!···ছিঃ অনিভাই!···এ তুমি কি হয়ে গ্যাছো?···ছি ছি ছি—

অনিরুদ্ধকে ফেলে সে চলে যায়।

অনিরুদ্ধ : (একটু বাদে) এ্যাঁ?

কাট্ টু।

(চলবে)

সুস্থ অসুস্থ চলচ্চিত্র প্রসঙ্গ

কল্পতরু সেনগুপ্ত

অসুস্থ চলচ্চিত্রের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আলোচনা শুরু হয়েছে। অর্থাৎ চলচ্চিত্রকে অপসংস্কৃতির পঙ্ক থেকে উদ্ধার করার জন্য দেশের প্রগতিশীল মানুষ ও রাজ্য সরকার চিন্তা শুরু করেছেন। চলচ্চিত্র সবচেয়ে শক্তিশালী এবং জনপ্রিয় শিল্প—যার মাধ্যমে দেশের মানুষের চিন্তা, পোশাক-পরিচ্ছদ, চালচলন প্রভাবিত হয়। চলচ্চিত্র সম্পর্কে ধনতান্ত্রিক জগতের রাষ্ট্রচালকদের এক রকম চিন্তাধারা, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অন্যরকম চিন্তাধারা। বর্তমান জগতে আমরা তিন রকমের চলচ্চিত্র দেখতে পাই। ধনতান্ত্রিক জগতের পণ্যচিত্র, সমাজতান্ত্রিক জগতের বাস্তবধর্মী ছবি এবং তৃতীয় বিশ্বের চলচ্চিত্র—যার মধ্যে আমরা বিপ্লবী চলচ্চিত্রের প্রভাব দেখতে পাই।

সারা জগৎব্যাপী ধনতান্ত্রিক জগতের অর্থাৎ হলিউড ছবির প্রাধান্য রয়েছে। যদিও জগৎটা ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক—দুভাগে বিভক্ত হয়ে আছে এবং সদ্য স্বাধীন ও উন্নয়নশীল দেশগুলিকে নিয়ে তৃতীয় বিশ্বের অস্তিত্ব রয়েছে। বিশ্বের এই তিন ভাগেই নিজের নিজের চলচ্চিত্র শিল্প ও নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধরন-ধারণ আছে। তা সত্ত্বেও ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার ছবির প্রাধান্য এখনো রয়ে গেছে। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশে হলিউড ছবির বাজার। সাধারণভাবে ধনতান্ত্রিক জগতের ছবির নতুন কিছু দেবার মত আজ আর শক্তি নেই, ধনতন্ত্র আজ বিদায় নেবার পথে। অবক্ষয়ী সংস্কৃতি তার অবলম্বন, তাই দর্শকদের তাৎক্ষণিক আনন্দ দেওয়া ছাড়া আর কী দিতে পারে! চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের প্রধান উদ্দেশ্য, মুনাফা করা। মুনাফার উদ্দেশ্যে তারা দেশে দেশে চলচ্চিত্র ফেরী করে। ওদের ছবি যত জৌলুসদার হবে তত কাটতি। রঙচঙে বাহার দেখে দর্শকরা মজা পায়। কিন্তু বুর্জোয়ারা শ্রেণীস্বার্থ ছেড়ে কিছু করে না। ওরা শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি ভক্তি দেখায় অথচ ওদের ছবি ব্যবসার জন্য পণ্য ছাড়া আর কিছু নয়। যেমন, নৃত্য এক উচ্চাঙ্গের শিল্প। কিন্তু বুর্জোয়ারা সেই শিল্প সৌন্দর্যকে বিবস্ত্রা নর্তকীর পায়ের তলায় টেনে নামিয়ে বিকৃত আনন্দ উপভোগ করে আর দর্শকদের রুচি বিকৃত করে মুনাফা করে। নরনারীর সম্পর্ককে যৌনতার উর্ধে ওরা ভাবতে পারে না, তাই ওদের ছবিতে যৌনজীবন হল প্রধান কথা। প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাকে চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা মনোরম ভঙ্গীতে পরিবেশন করে। ধর্ম, অলৌকিকতা, ব্যক্তিপূজা, কুসংস্কার ইত্যাদিকে প্রশ্রয় দিয়ে মানুষকে ভাগ্যনির্ভর হতে উৎসাহ যোগায়। হতাশাগ্রস্ত জনতার মনে এসব ছবি আফিমের কাজ করে। মানুষকে সমাজবিমুখ ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে তোলে। গত ক'বছর হলিউডের এমন বহু ছবি আমাদের দেশে দেখানো হয়েছে যেগুলি আরো ভয়ঙ্কর—আমাদের দেশের ঐতিহ্য বিরোধী। কিন্তু কংগ্রেসের ইন্দিরা সরকার ওসব ছবি নির্বিঘ্নে প্রদর্শনের ছাড়পত্র দিয়েছিল। এই ছবিগুলির মধ্যে ছিল 'উম্যান ইন নাইট' বা বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক-ধনতান্ত্রিক দেশে নাইট ক্লাবে নারীদের বিভিন্ন দেহভঙ্গীর স্থূল ছবি—যা কেবল যৌন বাসনা জাগিয়ে তোলে এমন নারীদেহের প্রদর্শনী মাত্র। তার পরে দেখানো হয়েছিল বিশেষ ধরনের গোয়েন্দা ছবি, যাতে সি-আই-এ সম্পর্কে ভাবমূর্তি সৃষ্টির চেষ্টা চলেছিল এবং বিশ্ব শান্তির শত্রু হিসাবে দেখানো হতো যে দুটি দেশকে, যাতে দর্শকদের বুঝতে বাকি থাকত না যে, এ দুটি দেশ সোভিয়েত রাশিয়া এবং চীন। বিদেশ নীতিতে নিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে অবাধে এই ছবির ছাড়পত্র দেওয়া হত। এই সঙ্গে খুন করার নানা পদ্ধতি দেখানো হতো এবং মানুষ হত্যা যে গুরুতর কিছু নয়—এই ধারণা জাগাতো। পরে আরেক ধরনের ছবি দেখান শুরু হল যাতে বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনে ও ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে সমাজ বিরোধী বা দস্যুদলকে ব্যবহার করা ও তাদের বীর হিসাবে দেখান হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক ও সমাজজীবনে এই ছবিগুলির ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসের সময় মনে হতো এই ছবিগুলি যেন খুন-খারাবির ট্রেনিং দিয়ে গেছে। দেখা গেল পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক জগতে সমাজবিরোধীরা অংশগ্রহণ করছে। রাজনৈতিক শ্লোগান দিয়ে তারা মানুষ খুন করছে। 'যুগ যুগ জিও' ধ্বনি দিয়ে শান্তিপ্রিয় মানুষের বাড়ি চড়াও হচ্ছে, নারীদের অসম্মান করছে, বলাৎকার করছে। পথে ঘাটে নারীদের সম্মান করার যে চিরাচরিত রীতি-নীতি আমাদের দেশে ছিল, রাতারাতি তাকে বিদায় দেওয়া হ'ল। মাদক দ্রব্যের প্রতি আসক্তি বেড়ে গেল, যুবক ও ছাত্ররা পর্যন্ত তার শিকার হয়েছিল। ছবিতে যে রকমটি দেখা গিয়েছিল সেই ধরনের খুন, যুবকদের পোষাক সব ছিল একই রকম। তাই প্রশ্ন জেগেছে, বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কি এই ছবিগুলি আমদানি করা হয়েছিল, যে ছবিগুলি এই রাজ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে, এদেশের ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি চেতনার সর্বনাশ

করেছে? এই ছবিগুলি ও তার প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে কংগ্রেসের স্বৈরাচারী শাসন রাজনৈতিক দিক থেকে আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে যেমন কেড়ে নিয়েছিল, তেমনি আমাদের সংস্কৃতিকে পঙ্গু করে দিয়েছিল, অপসংস্কৃতির প্রবাহ আমদানি করেছিল। এ কারণে বলছি—যদিও বুর্জোয়ারা মুনাফার জন্য চলচ্চিত্র ব্যবসা করে, কিন্তু নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে অর্থাৎ শোষণ করার ক্ষমতা রক্ষার জন্য তারা চলচ্চিত্র এবং সংস্কৃতিকে ব্যবহার করে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিকৃতি আনে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে।

কিন্তু ধনতান্ত্রিক জগতেও ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। গতানুগতিকতা মানতে চান না এমন মানুষও থাকেন—যাঁরা শিল্প সংস্কৃতিকে মানুষের কল্যাণের উপচার মনে করেন। যেমন—আমেরিকায় গ্রিফিথ 'ইনটলারেন্স'-এর মত ছবি করেছিলেন বুর্জোয়া মানবিকতার মুখোস খুলে দিয়ে। সে বহু বছর আগে ১৯১৬ সালে। চার্লি চ্যাপলিন সারাটা জীবন একটা আদর্শবোধ নিয়ে ছবি করেছেন। তার জন্য চ্যাপলিনকে বহু বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমেরিকা ছাড়তে হয়েছে। কিন্তু চলচ্চিত্রে মানবতাকে, মহৎ আদর্শকে তিনি যে-ভাবে শিল্প-সৌন্দর্যে তুলে ধরেছেন, যে ভাবে শোষণের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন তার জন্য তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। চলচ্চিত্র, নাটক ও সাহিত্য সুস্থ সমাজ গঠনে সাহায্য করে, মানুষের প্রতি বিশ্বাস জাগায়, সুস্থ জীবনবোধে অনুপ্রাণিত করে। ইওরোপের বিভিন্ন দেশে গতানুগতিকতার উধ্বে' উপরোক্ত ভাবাদর্শে অনেক ভাল ছবি তৈরি হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিপ্লবী মানবিক আদর্শ নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশে চলচ্চিত্র কেবল পণ্যচিত্র নয়—তা আনন্দময় গণশিক্ষার মাধ্যম। চলচ্চিত্র শিল্প সমাজতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রের পরিচালনাধীন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে জগতের বিরাট এক অংশের মানুষ নিজ নিজ দেশে সমাজতন্ত্রের আদর্শকে রূপদান করেছে। চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতির নানা বিভাগে এই নতুন আদর্শের বিকাশ ঘটেছে। নরনারীর প্রেম ও ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে এসব ছবিতেও প্রশ্ন তুলে ধরা হয়। কিন্তু প্রেম সেখানে নেহাৎ যৌন কামনা ও দৈহিক মিলন দৃশ্যে অবলম্বিত নয়। যদি কোথাও হয়ে থাকে তবে তা ব্যতিক্রম বা বিচ্যুতি। সমাজতান্ত্রিক চলচ্চিত্রের সূচনা হয়েছিল নভেম্বর বিপ্লবের পরে। রুশ বিপ্লবের পূর্ব ও পরবর্তী ঘটনাবলী এবং নতুন সমাজ সংগঠনের ক্রিয়া-পদ্ধতিকে অবলম্বন করে সমাজতান্ত্রিক ছবির বিস্তার ঘটেছে। গত মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ভয়ঙ্কর বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলীকে অবলম্বন করে সমাজতান্ত্রিক চলচ্চিত্র মানুষকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং সভ্যতার বিকাশের পথে বাধাবিঘ্ন সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছে।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে দ্রুত চলচ্চিত্র শিল্প গড়ে উঠেছে এবং প্রধানত সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত বিপ্লবী চলচ্চিত্রের পথ অনুসরণ করছে। কিউবা, আলজেরিয়া, ভিয়েতনাম ইত্যাদি দেশের ছবিগুলি মুক্তিসংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায় এবং বিপ্লবের দেশ গঠনের সমস্যা ও সাফল্যকে প্রকাশ করেছে। এসব ছবির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি তাদের ত্যাগ ও বীরত্বের কথা এবং কি অসাধারণ কৃতিত্বে দ্রুতগতিতে তাঁরা নতুন এক সমাজ গড়ে তুলছেন। সেই সমাজ নতুন মানব সভ্যতার বিজয় পতাকা উধ্বে' তুলে ধরেছে। অবশ্য তৃতীয় বিশ্বের সব দেশ এখনো পুঁজিবাদী অর্থনীতির বন্ধন থেকে মুক্ত নয়। সে কারণে সে-সব দেশের ছবি মুক্ত দুনিয়ার বার্তাবাহী বা আঙ্গিক সৌন্দর্যে সমভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে ওঠেনি।

ভারতের চলচ্চিত্র শিল্পের জন্ম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনাধীন কালে। স্বভাবতই এদেশের চলচ্চিত্র শিল্প হলিউড ও ব্রিটিশ চলচ্চিত্রের প্রভাবে বড় হয়েছে। সেই প্রভাব থেকে স্বাধীনতার পরবর্তী ত্রিশ বছরেও মুক্ত হতে পারেনি। যদিও স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে সমতা রেখে কয়েকজন চলচ্চিত্র স্রষ্টা ভারতীয় চলচ্চিত্রের বিকাশের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের ছবিতে দেশ ও মানুষ প্রতিফলিত হয়েছে, সমস্যা ও স্বপ্নের কথা বলা হয়েছে। কলকাতায় নিউথিয়েটার্স, বোম্বাইতে মেহবুব, ভি. শান্তারাম প্রভৃতির ছবি জাতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণে নতুন উদ্যোগ। স্বাধীনতার পরে সত্যিকার জাতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণে যাঁরা অগ্রসর হয়েছেন তাঁদের মধ্যে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক ও মৃণাল সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বাংলায় সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের শিল্পসৃষ্টি নিয়ে ছবি করার পথপ্রদর্শক ঋত্বিক ঘটক। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে বাঙালীর জাতীয় চেতনার সঙ্গে বাস্তববাদ ও নন্দনতত্ত্বের বিস্ময়কর প্রকাশ দেখা গেছে, যা বাংলা ছবিকে অসাধারণ মর্যাদা দিয়েছে। বর্তমানে ভারত চলচ্চিত্র নির্মাণে শীর্ষ স্থানে রয়েছে এবং বোম্বাই চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রধান কেন্দ্র। কিন্তু বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্রের কোন জাতীয় রূপ নেই, সেগুলি হলিউড বা ধনতান্ত্রিক দেশের অন্ধ অনুকরণ। দেশ, মানুষের জীবন, সমস্যা স্বপ্ন বা দেশের অগ্রগতির কোনরূপ প্রকাশ এসব ছবিতে নেই, থাকলেও তা কৃত্রিমতায় ভরা। মানুষকে সংগ্রাম-বিমুখ করে তোলা, শোষকশ্রেণীর প্রতি মোহ সৃষ্টি করা, ভাগ্য-নির্ভর করা এবং বিকৃত জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে অধিকাংশ হিন্দী ছবি। এসব ছবি যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করছে, স্বদেশ-চেতনাহীন স্থূলজীবন-পথে টেনে নামাচ্ছে। সন্ত্রাসের সময়ে

স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এই হিন্দী ছবিগুলির ভূমিকা বড় কম ছিল না।

যদিও বাংলা চলচ্চিত্র সুস্থ চিন্তা ও আঙ্গিকের সুস্থ ঐতিহ্যের দাবী করে, কিন্তু অধিকাংশ ছবির দেশ পরিচয় নির্ণয় করা কঠিন। বাংলায় সংলাপ ও পোশাক পরিচ্ছদে বাঙালী হলেও এই ছবিগুলিতে বাঙালীর জীবনবোধের বলিষ্ঠতা থাকে না। এমন সব কাহিনী এসব ছবির অবলম্বন যা সাজানো, জীবনবোধ, ইতিহাস ও জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে যার তেমন সঙ্গতি নেই। তাই এসব ছবি বোম্বাইয়েরও হয় না—আবার বাঙালীরও হয় না। সুতরাং সমাজজীবনে বা সুস্থ সমাজ গঠনে ও মানবিকতা বিকাশে এসব ছবির ভূমিকা কী থাকতে পারে? বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক দিক থেকে এক নতুন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সন্ত্রাস পরাজিত হয়েছে—গণতন্ত্র ফিরে এসেছে। রাজ্য সরকার বর্তমানে চলচ্চিত্র শিল্পের সহায়ক শক্তি হিসাবে এগিয়ে এসেছে এবং কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। গত ত্রিশ বছরে রাজ্য সরকার আর চলচ্চিত্র শিল্প এত কাছাকাছি আসেনি। চিত্র নির্মাতাদের কর্তব্য এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে বাংলা ছবিকে যথার্থ জাতীয় চলচ্চিত্রে উন্নীত করা, হলিউড বা বোম্বাইয়ের অবক্ষয়ী চিন্তাধারার প্রভাবমুক্ত হয়ে সত্যিকার জাতীয় ছবি তৈরি করা। বাঙালীর ইতিহাস, বাঙালীর ঐতিহ্য ও দেশপ্রেম, বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম, শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলন, আমাদের দেশের মানুষের সুস্থ জীবনবোধকে চলচ্চিত্র-কাহিনীতে রূপ দেবার সময় উপস্থিত হয়েছে। সমাজ গঠনে চলচ্চিত্রের যে ভূমিকা আছে তা যথার্থভাবে পালন করা চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কর্তব্য, যাতে সমাজকে সুন্দর করে গড়ে তোলা যায়, যুবকদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও দেশাভিমান জাগিয়ে তোলা যায়। দেশপ্রেম ও সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদে অনুপ্রাণিত চিত্রনির্মাতাদের আজ এগিয়ে আসতে হবে—যাতে তাঁরা সোশ্যাল ইঞ্জিনীয়ার বা কারিগরের ভূমিকা পালন করতে পারেন।

সিনে ক্লাব, আসানসোলের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশনা

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের

চলচ্চিত্র ● সমাজ ও সত্যজিৎ রায় (১ম খণ্ড)

আসানসোল সিনে ক্লাবের আবেদন—

ফিল্ম সোসাইটিগুলির গঠনতন্ত্রে অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে 'গ্রন্থ প্রকাশনা' একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেলেও, একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, কেবল দু'একটি ফিল্ম সোসাইটির পক্ষেই এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়েছে। এর মূল কারণ এই লক্ষ্য সাধনের পথটি কুসুমাস্তীর্ণ নয়, এবং এ সম্পর্কে সর্ববিধ বাধার কথা জেনেই আসানসোল সিনে ক্লাব একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছে। গ্রন্থটির নাম "চলচ্চিত্র, সমাজ ও সত্যজিৎ রায়", লেখক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, যিনি ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি মানুষের কাছে এবং সামগ্রিকভাবে সাংস্কৃতিক জগতের অনেকের কাছেই চলচ্চিত্র আলোচক হিসাবে পরিচিত (কর্মসূত্রে শ্রীচট্টোপাধ্যায় এক দশকের কিছু বেশীকাল এ অঞ্চলের অধিবাসী এবং আমাদের ক্লাবের সদস্য)। প্রকাশিতব্য গ্রন্থটির নির্বাচনের প্রেক্ষাপট হিসাবে কয়েকটি কথা প্রাসঙ্গিক।

যে প্রতিভাধর চলচ্চিত্র স্রষ্টা অমর 'পথের পাঁচালী' সৃষ্টি করে ভারতীয় চলচ্চিত্রকে সত্যকার ভারতীয় করেছেন যাঁর ছবির ওপর বিদেশে অন্ততঃপক্ষে তিনটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যার একটির বিক্রয় সংখ্যা লক্ষ কপিরও বেশী—অথচ দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরেও তাঁর সুদীর্ঘ চলচ্চিত্র কর্মের কোন দেশজ বাস্তবধর্মী মূল্যায়নের সামগ্রিক চেষ্টা হয়নি (খণ্ড খণ্ড ভাবে কিছু উৎকৃষ্ট কাজ হলেও)—এটি একটি লজ্জাজনক ঘটনা। সেই অক্ষমতা অপনোদনের প্রচেষ্টা এই গ্রন্থটি। সত্যকার বাস্তবধর্মী ও নিজস্ব সাংস্কৃতিক সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কোন দেশীয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্রকারের মূল্যায়নের চেষ্টা না হলে, বিদেশী ও বিশেষ করে পশ্চিমী প্রতিষ্ঠানিক চলচ্চিত্র আলোচনার দর্পণে তাঁর যে মুখচ্ছবি প্রতিফলিত হয় তাতে যে কত ইচ্ছাকৃত ও অজ্ঞানকৃত ভুল থাকে, এবং সেই সব ভ্রান্ত প্রচার যে তাঁর চলচ্চিত্র কর্মকে ও চলচ্চিত্রের অনুরাগীদের এবং পরোক্ষভাবে জাতীয় চলচ্চিত্রবোধকে ভুল পথে চালিত করে—এ সবের নিপুণ বিশ্লেষণের জন্য এই গ্রন্থটি প্রত্যেক চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষের অবশ্য পাঠ্য।

প্রকাশিতব্য প্রথম খণ্ডটি সত্যজিৎ রায়ের প্রথম পর্বের ছবিগুলির গবেষণাধর্মী আলোচনায় সমৃদ্ধ। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মহৎ 'অপুচিত্রত্রয়ী'। এই গ্রন্থের অর্ধাংশ জুড়ে 'পথের পাঁচালী' সহ এই চিত্রত্রয়ী আলোচনায় দেখান হয়েছে পশ্চিমের 'দিকপাল' ব্যাখ্যাকারদের দৃষ্টিভঙ্গী কোথায় সীমাবদ্ধ, এবং দেশজ সাংস্কৃতিক সামাজিক ভূমিকায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এই চিত্রত্রয়ীর ব্যাখ্যা কত গভীর ও মৌলিক হতে পারে—যার ফলে ছবিগুলি আবার নূতন করে দেখার ইচ্ছে করবে। অবিস্মরণীয় 'পথের পাঁচালী'র ২৫তম বর্ষপূর্তি হিসাবে ১৯৮০ সালটি ভারতের ফিল্ম সোসাইটিগুলির দ্বারা বিশেষ মর্যাদা সহকারে পালিত হচ্ছে—এই প্রেক্ষাপটে এই বৎসর এই গ্রন্থটির প্রকাশ এক তাৎপর্যমণ্ডিত ঘটনা বলে স্বীকৃত হবে বলে আমরা আশা রাখি। ভারতীয় চলচ্চিত্রের এক পবিত্র বৎসরকে আমরা উপযুক্ত কর্তব্য পালন দ্বারা চিহ্নিত করতে চাই। আশা করি এই কাজে আমরা ক্লাব সদস্য সহ সমগ্র চলচ্চিত্রানুরাগী মানুষের সহযোগিতা পাব।

গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি আমরা প্রকাশে উদ্যোগী, তার আনুমানিক পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫০, বহু চিত্রশোভিত এবং সুদৃশ্য লাইনো হরফে ছাপান এই খণ্ডটির আনুমানিক মূল্য ২৫ টাকা। কিন্তু আমরা ঠিক করেছি চলচ্চিত্র অনুরাগী মানুষ যাঁরা অগ্রিম ২০ টাকা মূল্যের কুপন কিনবেন—তাঁদের গ্রন্থের মূল্যের শতকরা ২০ ভাগ ছাড় দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে যাঁরা উৎসাহী তাঁরা **সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার অফিসে যোগাযোগ করুন** (২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩ ॥ ফোন : ২৩-৭৯১১)।

CHITRA-BIKSHAN

Regd. No. 13949/67 Rs 1.25 November 1979 Vol. 13 No. 2

Published by Alok Chandra Chandra from Cine Central, Calcutta, 2 Chowringhee Road, Calcutta-13. Phone : 23-7911 & Printed by him at MUDRANEE, 131B, B. B. Ganguli Street, Calcutta-12.

Cover : De-Luxe Printers.

মাসিক চলচ্চিত্র পত্রিকা
সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র

ত্রয়োদশ বর্ষ
তৃতীয় সংখ্যা
ডিসেম্বর, '৭৯



চিত্রবীক্ষণ

সম্পাদক : অনিল সেন

বিষয়সূচী

প্রচ্ছদচিত্র : 'অবসেশন' (পোল্যাণ্ড)

প্রচ্ছদশিল্পী : দীপক দে

শিলিগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সুনীল চক্রবর্তী
প্রযত্নে, বেবিজ স্টোর
হিলকার্ট রোড
পোঃ শিলিগুড়ি
জেলা : দার্জিলিং-৭৩৪৪০১

আসানসোলে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সঞ্জীব সোম
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জি. টি. রোড ব্রাঞ্চ
পোঃ আসানসোল
জেলা : বর্ধমান-৭১৩৩০১

বর্ধমানে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
শৈবাল রাউত
টিকারহাট
পোঃ লাকুরদি
বর্ধমান

গিরিডিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এ, কে, চক্রবর্তী
নিউজ পেপার এজেন্ট
চন্দ্রপুরা
গিরিডি
বিহার

দুর্গাপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দুর্গাপুর ফিল্ম সোসাইটি
১/এ/২, তানসেন রোড
দুর্গাপুর-৭১৩২০৫

আগরতলায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অরিন্দ্রজিত ভট্টাচার্য
প্রযত্নে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
হেড অফিস বনমালিপুর
পোঃ অঃ আগরতলা ৭৯৯০০১

গৌহাটিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
বাণী প্রকাশ
পানবাজার, গৌহাটি
ও
কমল শর্মা
২৫, খারঘুলি রোড
উজান বাজার
গৌহাটি-৭৮১০০৪
এবং
পবিত্র কুমার ডেকা
আসাম ট্রিবিউন
গৌহাটি-৭৮১০০৩
ও
ভূপেন বরুয়া
প্রযত্নে, তপন বরুয়া
এল, আই, সি, আই, ডিভিসনাল অফিস
ডাটা প্রসেসিং
এস, এস, রোড
গৌহাটি-৭৮১০১৩

বাঁকুড়ায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
প্রবোধ চৌধুরী
মাস মিডিয়া সেন্টার
মাচানতলা
পোঃ ও জেলা : বাঁকুড়া

জোড়হাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অ্যাপোলো বুক হাউস,
কে, বি, রোড
জোড়হাট-১

শিলচরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এম, জি, কিবরিয়া,
পুঁথিপত্র
সদরহাট রোড
শিলচর

ডিব্রুগড়ে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সন্তোষ ব্যানার্জী,
প্রযত্নে, সুনীল ব্যানার্জী
কে, পি, রোড
ডিব্রুগড়

বালুরঘাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অন্নপূর্ণা বুক হাউস
কাছারী রোড
বালুরঘাট-৭৩৩১০১
পশ্চিম দিনাজপুর

জলপাইগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দিলীপ গাঙ্গুলী
প্রযত্নে, লোক সাহিত্য পরিষদ
ডি. বি. সি. রোড,
জলপাইগুড়ি

বোম্বাইতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সার্কল বুক স্টল
জয়েন্দ্র মহল
দাদার টি. টি.
(ব্রডওয়ে সিনেমার বিপরীত দিকে)
বোম্বাই-৪০০০০৪

মেদিনীপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটি
পোঃ ও জেলা : মেদিনীপুর
৭২১১০১

নাগপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
ধূর্জটি গাঙ্গুলী
ছোটি ধানটুলি
নাগপুর-৪৪০০১২

এজেন্সি :

* কমপক্ষে দশ কপি নিতে হবে।
* পঁচিশ পার্সেন্ট কমিশন দেওয়া হবে।
* পত্রিকা ভিঃ পিঃতে পাঠানো হবে, সে বাবদ দশ টাকা জমা (এজেন্সি ডিপোজিট) রাখতে হবে।
* উপযুক্ত কারণ ছাড়া ভিঃ পিঃ ফেরত এলে এজেন্সি বাতিল করা হবে এবং এজেন্সি ডিপোজিটও বাতিল হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও চলচ্চিত্রশিল্প

বেশ কিছুদিন ধরে পশ্চিমবাংলার চলচ্চিত্রশিল্প এক গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে। বহুবিধ সমস্যায় আক্রান্ত ক্ষয়িষ্ণু পশ্চিমবাংলার চলচ্চিত্রশিল্প আজ প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে চলেছে। এই ক্রমবর্দ্ধমান সংকট থেকে চলচ্চিত্রশিল্পকে মুক্ত করার জন্য কোন প্রয়োজনীয় উদ্যোগ বা কার্যকরী পরিকল্পনা এর আগে কোন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়নি। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দু-একটি কার্য্যকলাপ ব্যতিরেকে চলচ্চিত্রশিল্প সম্পর্কে রাজ্য সরকারের ভূমিকা ছিল নীরব দর্শকের মত।

সেই ১৯৫৫ সালে 'পথের পাঁচালী' ছবি নির্মাণে প্রত্যক্ষ এবং আর্থিক সহায়তা দেয়া ছাড়া পুর্ববর্তী কংগ্রেস সরকার সমূহ চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নতির জন্য কোন কিছু করেছেন কিনা সন্দেহ। শেষ কয়েক বছর উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বেশ কিছু ছবিকে করমুক্ত করা এবং সত্যজিৎ রায়কে দিয়ে 'সোনার কেল্লা' ও তরুণ মজুমদারকে দিয়ে 'গণদেবতা' (ছবিটি অবশ্য বর্তমান সরকারের সময় শেষ হয়) ছবি করানো ছাড়া চলচ্চিত্রশিল্প সম্পর্কিত কোন কাজকর্ম কংগ্রেসী সরকারগুলির ছিল কিনা সন্দেহ।

১৯৬৯ সালে চলচ্চিত্র পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করে এবং সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার সুস্পষ্ট কার্যক্রম নিয়ে কাজ শুরু করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই সরকারকে অল্প কিছুদিনের মধ্যে খারিজ করে দেওয়ায় সেই পরিকল্পনা কার্যকরী হয়ে উঠতে পারেনি।

১৯৭৭ সালে বিপুল জনসমর্থনে প্রতিষ্ঠিত বামফ্রন্ট সরকার চলচ্চিত্র-শিল্পের সংকটের গভীরতা বুঝতে চেয়েছেন সততার সঙ্গে এবং এই শিল্প-সম্পর্কিত সামগ্রিক জটিল সমস্যাবলীর মোকাবিলা করতে চেয়েছেন সাহসের সঙ্গে।

ছবির জগতে শিল্পবোধের নিদারুণ অভাবে যে সাংস্কৃতিক সঙ্কট ঘনিয়ে আসছিল তা মোকাবিলা করার জন্য রাজ্য সরকার প্রথমেই বেশ কিছু ছবি তৈরীর কাজে হাত দিলেন। এই কর্মসূচী অনুযায়ী ইতিমধ্যেই তৈরী হয়ে গেছে মৃণাল সেনের 'পরশুরাম' ও উৎপল দত্তের 'ঝড়', আরো দুটি ছবির কাজও অনেক দূর এগিয়ে গেছে—ছবি দুটি হল সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে' ও রাজেন তরফদারের 'নাগপাশ', শ্যাম বেনেগালও রাজ্য সরকারের হয়ে একটি কাহিনীচিত্র নির্মাণ করবেন. সে ব্যাপারে প্রাথমিক কাজকর্মও শুরু হওয়ার পথে।

এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার পঁচিশজন চলচ্চিত্র নির্মাতাকে ছবির জন্য সরাসরি অনুদান দিচ্ছেন যার অর্থমূল্য সাদাকালো ছবির জন্য ১ লক্ষ এবং রঙীন ছবির জন্য ২ লক্ষ টাকা। ছবিগুলি এখন নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ে। সাহায্যপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে রয়েছেন পূর্ণেন্দু পত্রী, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত অশোক দাস, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী ও শঙ্কর ভট্টাচার্য। সরকারী অনুদান নিয়ে শুধু এখানকার চলচ্চিত্রকাররাই ছবি করছেন না, ছবি করছেন দিল্লীর কবিতা নাগপাল, বাঙ্গালোরের এম, এস, সথ্যু।

সরকারের পক্ষ থেকে সহজতম শর্তে ঋণ দেয়া হয়েছে মৃণাল সেনকে 'ওকা উরি কথা' ছবির হিন্দী ডাবিং করার জন্য এবং বুদ্ধদেব দাশগুপ্তকে 'দূরত্ব' ছবির ইংলিশ সাব-টাইটেলিং করার জন্য।

তথ্যচিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমের নিদর্শন রেখেছেন, বিশেষ করে বিষয় নির্বাচনে এই প্রথম সরকারী তথ্যচিত্র জনজীবনের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তথ্যচিত্র এই আড়াই বছরে তৈরী হয়েছে—যেমন 'জরুরী অবস্থার দুঃস্বপ্ন', 'নিরক্ষরতার অভিশাপ', 'বেকার যুবকের আত্মকথা', 'কুলি সে মজদুর'। এছাড়া ছ-টি স্বল্পদৈর্ঘের ছবি সরকার কিনেছেন। নিয়মিত নিউজরীলও তৈরী হয়ে চলেছে উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জীকে তুলে ধরে। স্বল্পদৈর্ঘের ছবির ব্যাপারে ফিল্মস্ ডিভিসন গঠনের পরিকল্পনা চলছে, ১৬ মি, মি, চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও এক সুসংবদ্ধ পরিকল্পনার কথা ভাবা হচ্ছে সরকারী তরফে।

শিশুচিত্র নির্মাণের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কার্যক্রম রীতিমত যুগান্তকারী, আটটি মাঝারি মাপের ছবি তৈরী হচ্ছে যার মধ্যে কয়েকটি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শিশুচিত্র-প্রেক্ষাগার নির্মাণের পরিকল্পনাও সরকার গ্রহণ করেছেন।

সরকারের উদ্যোগে একটি কালার ফিল্ম ল্যাবরেটরী নির্মাণের উদ্যোগ-আয়োজন প্রস্তুতির পর্বে। সরকারী অধিগৃহীত নিউ থিয়েটার্স ২নং স্টুডিওটিকে আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে কর্মক্ষম করে তোলা হচ্ছে, সম্প্রতি টেকনিসিয়ানস্ স্টুডিওটিও অধিগ্রহণ করা হয়েছে। কলকাতা শহরে এবং বিশেষ করে মফঃস্বলে চিত্রগৃহ নির্মাণে ব্যাপক আর্থিক সহযোগিতার কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার একটি আর্ট ফিল্ম-থিয়েটার কমপ্লেক্স গঠনের কাজও শুরু করছেন।

সবমিলিয়ে যথেষ্ট আশাপ্রদ কর্মকাণ্ডের এক পরিকল্পনা রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছেন—একমাত্র এই কর্মসূচীর সাফল্যই পশ্চিমবাংলার মুমূর্ষু চলচ্চিত্রশিল্পকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে। সমস্ত চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষকে এই কর্মসূচী ও পরিকল্পনার সমর্থনে এগিয়ে আসতে হবে সক্রিয়ভাবে।

সিনে ক্লাব, আসানসোলের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশনা

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের

চলচ্চিত্র • সমাজ ও সত্যজিৎ রায় (১ম খণ্ড)

আসানসোল সিনে ক্লাবের আবেদন—

"ফিল্ম সোসাইটিগুলির গঠনতন্ত্রে অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে 'গ্রন্থ প্রকাশনা' একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেলেও, একথা বলতে দ্বিধা নেই যে কেবল দু'একটি ফিল্ম সোসাইটির পক্ষেই এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়েছে। এর মূল কারণ এই লক্ষ্য সাধনের পথটি কুসুমাস্তীর্ণ নয়, এবং এ সম্পর্কে সর্ববিধ বাধার কথা জেনেই আসানসোল সিনে ক্লাব একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছে। গ্রন্থটির নাম "চলচ্চিত্র, সমাজ ও সত্যজিৎ রায়", লেখক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, যিনি ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি মানুষের কাছে এবং সামগ্রিক ভাবে সাংস্কৃতিক জগতের অনেকের কাছেই চলচ্চিত্র আলোচক হিসাবে পরিচিত (কর্মসূত্রে শ্রীচট্টোপাধ্যায় এক দশকের কিছু বেশীকাল এ অঞ্চলের অধিবাসী এবং আমাদের ক্লাবের সদস্য)। প্রকাশিতব্য গ্রন্থটির নির্বাচনের প্রেক্ষাপট হিসাবে কয়েকটি কথা প্রাসঙ্গিক।

যে প্রতিভাধর চলচ্চিত্র স্রষ্টা অমর 'পথের পাঁচালী' সৃষ্টি করে ভারতীয় চলচ্চিত্রকে সত্যকার ভারতীয় করেছেন যাঁর ছবির ওপর বিদেশে অন্ততপক্ষে তিনটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যার একটির বিক্রয় সংখ্যা লক্ষ কপিরও বেশী—অথচ দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরেও তাঁর সুদীর্ঘ চলচ্চিত্র কর্মের কোন দেশজ বাস্তবধর্মী মূল্যায়নের সামগ্রিক চেষ্টা হয়নি (খণ্ড খণ্ড ভাবে কিছু উৎকৃষ্ট কাজ হলেও)— এটি একটি লজ্জাজনক ঘটনা। সেই অক্ষমতা অপনোদনের প্রচেষ্টা এই গ্রন্থটি। সত্যকার বাস্তবধর্মী ও নিজস্ব সাংস্কৃতিক সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কোন দেশীয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্রকারের মূল্যায়নের চেষ্টা না হলে, বিদেশী ও বিশেষ করে পশ্চিমী প্রাতিষ্ঠানিক চলচ্চিত্র আলোচনার দর্পণে তাঁর যে মুখচ্ছবি প্রতিফলিত হয় তাতে যে কত ইচ্ছাকৃত ও অজ্ঞানকৃত ভুল থাকে, এবং সেই সব ভ্রান্ত প্রচার যে তাঁর চলচ্চিত্র কর্মকে ও চলচ্চিত্রের অনুরাগীদের এবং পরোক্ষভাবে জাতীয় চলচ্চিত্রবোধকে ভুল পথে চালিত করে—এ সবের নিপুণ বিশ্লেষণের জন্য এই গ্রন্থটি প্রত্যেক চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষের অবশ্য পাঠ্য।

প্রকাশিতব্য প্রথম খণ্ডটি সত্যজিৎ রায়ের প্রথম পর্বের ছবিগুলির গবেষণাধর্মী আলোচনায় সমৃদ্ধ। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মহৎ 'অপুচিত্রত্রয়ী'। এই গ্রন্থের অর্ধাংশ জুড়ে 'পথের পাঁচালী' সহ এই চিত্রত্রয়ী আলোচনায় দেখান হয়েছে পশ্চিমের 'দিকপাল' ব্যাখ্যাকারদের দৃষ্টিভঙ্গী কোথায় সীমাবদ্ধ, এবং দেশজ সাংস্কৃতিক সামাজিক ভূমিকায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এই চিত্রত্রয়ীর ব্যাখ্যা কত গভীর ও মৌলিক হতে পারে—যার ফলে ছবিগুলি আবার নতুন করে দেখার ইচ্ছে করবে। অবিস্মরণীয় 'পথের পাঁচালী'র ২৫তম বর্ষপূর্তি হিসাবে ১৯৮০ সালটি ভারতের ফিল্ম সোসাইটিগুলির দ্বারা বিশেষ মর্য্যাদা সহকারে পালিত হচ্ছে--এই প্রেক্ষাপটে এই বৎসর এই গ্রন্থটির প্রকাশ এক তাৎপর্যমণ্ডিত ঘটনা বলে স্বীকৃত হবে বলে আমরা আশা রাখি। ভারতীয় চলচ্চিত্রের এক পবিত্র বৎসরকে আমরা উপযুক্ত কর্তব্য পালন দ্বারা চিহ্নিত করতে চাই। আশা করি এই কাজে আমরা ক্লাব সদস্য সহ সমগ্র চলচ্চিত্রানুরাগী মানুষের সহযোগিতা পাব।

গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি আমরা প্রকাশে উদ্যোগী, তার আনুমানিক পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫০, বহু চিত্রশোভিত এবং সুদৃশ্য লাইনো হরফে ছাপান এই খণ্ডটির আনুমানিক মূল্য ২৫ টাকা। কিন্তু আমরা ঠিক করেছি চলচ্চিত্র অনুরাগী মানুষ যাঁরা অগ্রিম ২০ টাকা মূল্যের কুপন কিনবেন—তাঁদের গ্রন্থের মূল্যের শতকরা ২০ ভাগ ছাড় দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে যাঁরা উৎসাহী তাঁরা **সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটার অফিসে** (২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৩, ফোন : ২৩-৭৯১১) **যোগাযোগ করুন।**

হলিউডের এক বিস্মৃতপ্রায় বামপন্থী চলচ্চিত্রকার ঃ লিউস্ মাইলস্টোন

রজত রায়

"একজন সৃজনশীল শিল্পী হিসেবে আমার কাজ হওয়া উচিত সৃষ্টি করে যাওয়া। তবুও আজকের দিনে চলচ্চিত্র নির্মাণের নান্দনিক নীতিগুলি ছাড়াও আমাকে অবশ্যই আরও অনেক কিছু নিয়েই ভাবতে হবে।—সুতরাং একজন পরিচালক হিসেবে আমাকে কেবলমাত্র চলচ্চিত্রের কারিগরী প্রকৌশল এবং শিল্পের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামালেই চলবে না, যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে আমাকে কাজ করতে হয় সেই পরিবেশ সম্বন্ধেও সজাগ আগ্রহ থাকাটা আমার পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজন। হলিউডের পরিকল্পিত হিস্টিরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার জন্য আমার পক্ষে যা যা করা সম্ভব তা অবশ্যই আমাকে করতে হবে।" ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে উপরের এই কথাগুলি যিনি বলেছিলেন তিনি হলেন তিরিশ ও চল্লিশের দশকের হলিউডে যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় বামপন্থী চলচ্চিত্রকার (সংখ্যায় এঁরা প্রায় এগারজন) মোটামুটি খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পেরেছিলেন, তাঁদেরই একজন,—লিউস্ মাইলস্টোন (১৮৯৫-   )।

হলিউডের প্রযোজক-অধ্যুষিত এবং বড় বড় পুঁজিবাদী সংস্থা নিয়ন্ত্রিত চলচ্চিত্র উৎপাদনের রাজত্বে বাস করেও লিউস্ মাইলস্টোন কোনমতেই প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণের কাছে আত্মসমর্পণ করেন নি। স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্বাধীন শিল্পীসত্তাকে বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি টিঁকিয়ে রেখেছিলেন যার জন্য হলিউডের গতানুগতিক ব্যবসায়িক চলচ্চিত্র উৎপাদনের ধারায় লিউস্ মাইলস্টোন কিছুটা ব্যতিক্রম, এ কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাদের স্মরণে রাখা প্রয়োজন।

১৯২৫ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত এই সাঁইত্রিশ বছরে তিনি বাইশটিরও বেশী পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি তুলেছেন যার ভেতরে গোড়াকার চারটি ছবি হল নির্বাক এবং বাদবাকি আঠারোটি ছবি সবাক। তা ছাড়া ১৯৪১ সালে বিখ্যাত মার্কসবাদী তথ্যচিত্র নির্মাতা জোরিস ইভেন্সের সঙ্গে একসাথে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উপর একটি প্রামাণ্যচিত্রও তিনি তৈরী করেছিলেন, যার নাম 'আওয়ার রাশিয়ান ফ্রন্ট'।

আজকের দিনে লিউস্ মাইলস্টোনের ছবি বিশেষ কোথাও আর দেখানো হয় না। তাঁর সর্বশেষ ছবিটি তোলা হয়েছিল ১৯৬২ সালে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত, ১৯৮০ সালের মার্চ মাসেও পঁচাশি বছর বয়সের এই প্রগতিশীল চলচ্চিত্রকারটি জীবিত আছেন, যদিও গত আঠারো বছর তাঁর কর্মজীবনকে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়ই বলা যায়।

১৮৯৫ সালে লিউস্ মাইলস্টোনের জন্ম হয় রাশিয়ায়। তাঁর কৈশোর ও ছাত্রজীবন রাশিয়াতেই কাটে। চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সম্পাদনার ক্ষেত্রে, প্রাথমিক শিক্ষাও বলতে গেলে রাশিয়াতেই। চিত্র সম্পাদনার কাজে কিছুটা দক্ষতা অর্জন করবার পর ১৯১৯ সালের শেষ দিকে, চব্বিশ বছর বয়সে তিনি হলিউডে চলে আসেন এবং সেখানেই পাকাপাকিভাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। বেশ কিছু নির্বাক ছবিতে সম্পাদক হিসেবে কাজ করবার পর পরিচালক হিসেবে তিনি প্রথম যে নির্বাক ছবিটি তোলেন তার নাম 'দি কেভ ম্যান' (১৯২৫)। পরবর্তী ছবি 'টু অ্যারাবিয়ান নাইটস্' একটি পরিচ্ছন্ন কমেডি চিত্র। প্রথম দিককার এই দুটি ছবিতেই সুনির্বাচিত ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল ও হাফ লাইটিং-এর ব্যবহারে মাইলস্টোনের বিশেষ কৃতিত্ব দেখা যায়। ঘটনার নাটকীয়তা সৃষ্টিতেও তাঁর ক্ষমতা অনেকেরই সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তৃতীয় নির্বাক ছবি 'দি র‍্যাকেট' (১৯২৮) বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তোলা একটি গ্যাংস্টার ছবি। পরবর্তী কালে আমেরিকায় যে প্রচুর পরিমাণে গ্যাংস্টার ছবি তোলা হয়েছে এটিকে তারই এক পূর্বসুরী বলা চলে। বারলেট কোরম্যাক নামে একজন সাংবাদিকের লেখা একটি জনপ্রিয় নাটকের কাহিনী নিয়ে এই সামাজিক সমালোচনার ছবিটি তৈরী হয়েছিল। রাজনৈতিক স্তর, প্রশাসনিক স্তর এবং পুলিশের ওপর মহল—সমাজের এই সুবিধাভোগী শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে যে প্রচণ্ড দুর্নীতি এবং শঠতা বিরাজমান তাকে এই ছবিতে তীব্র কশাঘাত করা হয়েছিল। কাহিনীর ঘটনাস্থল শিকাগো শহর এবং কেন্দ্রীয় চরিত্র মদের চোরা চালানকারী একটি গুণ্ডা। এই গুণ্ডাটি রাজনৈতিক নেতা এবং বড় বড় আমলাদের কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়ে থাকে, কেন না ভোটের জন্য নেতাদের এই গুণ্ডাটিরই শরণাপন্ন হতে হয়। গুণ্ডাটি প্রকাশ্যে এবং ব্যাপকভাবে শহরের সর্বত্র চোলাই করা মদের ব্যবসা চালিয়ে থাকে। একবার পুলিশের হাতে সে ধরাও পড়ে। কিন্তু রাজনৈতিক নেতার সুপারিশে সে মুক্তি পেয়ে যায়। পুলিশেরই একজন সৎ অফিসার গুণ্ডাটির কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে রাজী হন না। একবার এই সমাজবিরোধী লোকটি একজন পুলিশ কর্মচারীকে খুনও করে এবং নিরাপদে গা ঢাকা দিতেও সমর্থ হয়। কিন্তু সৎ পুলিশ অফিসারটি তাকে একদিন ঠিকই ধরে ফেলেন এবং গুলি করে তাকে হত্যা করেন। কারণ তিনি জানতেন যে এই সমাজে আইনের বিচার একটি প্রহসন মাত্র। বিচারালয়ে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এবং প্রভাবশালী নেতার হস্তক্ষেপে সে ঠিকই মুক্তি পেয়ে যাবে। শিকাগো শহরেরই মেয়রকে এই ছবিতে প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ করা হয়েছিল এবং বড় বড় আমলাদেরও দেখানো হয়েছিল অসৎ, দুর্নীতিপরায়ণ এবং

ঘুষখোর হিসেবে। স্বভাবতই ছবিটি তোলা শেষ হয়ে যাবার পর এটি সেন্সর কর্তৃপক্ষের কোপে পড়ে। নিউ ইয়র্ক, শিকাগো, ডালাস এবং পোর্টল্যাণ্ডের সেন্সর ছবিটিকে প্রচণ্ড কাটাকুটি করে তবে ছাড়পত্র দেন। গুণ্ডা বদমাশদের সঙ্গে ভোটপ্রার্থী সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতাদের গোপন আঁতাত প্রতিষ্ঠানিক কর্তৃপক্ষের গাত্রদাহের কারণ হয়। পুলিশকে ঘুষ দিয়েই যে পুঁজিবাদী সমাজে সব কাজে সিদ্ধিলাভ করা যায় এই বিদ্রূপাত্মক বক্তব্য কর্তৃপক্ষকে যেমন রুষ্ট করে তোলে, তেমনই তা সাধারণ দর্শকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৯৫২ সালে আমেরিকাতেই ছবিটি আর একবার পুনর্নির্মিত হয়েছিল।

চতুর্থ ও শেষ নির্বাক ছবি 'বিট্রেয়াল'-এ (১৯২৯) অভিনয় করেছিলেন সেকালের দিনের বিখ্যাত অভিনেতাদ্বয় এমিল জ্যানিংস্ এবং গ্যারি কুপার।

১৯৩০ সালে 'নিউ ইয়র্ক নাইটস্' নামে প্রথম যে সবাক ছবিটি মাইলস্টোন তোলেন তাতে ছবিতে শব্দের ব্যবহারের বিষয়ে তিনি বেশ ভালো রকমেরই নিপুণতা দেখান। ঐ একই বছরে তোলা হয় তাঁর জীবনের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ণ ফ্রন্ট' (১৯৩০)। এরিখ মারিয়া রেমার্কের একটি অতি বিখ্যাত উপন্যাস অবলম্বনে তোলা আড়াই ঘন্টা দৈর্ঘ্যের এই ছবিটির আবেদন যুদ্ধ-বিরোধী বক্তব্যে সমৃদ্ধ। মহৎ মানবিক আবেদনের এই চলচ্চিত্রটি তার বাস্তবতা এবং শিল্পনৈপুণ্যের জন্য মূল উপন্যাসটির মতোই আজও একটি স্মরণীয় সৃষ্টি বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। ছবির মূল চরিত্রগুলি সকলেই জার্মান। স্কুলের সাতটি বালককে তাদের বিদ্যালয় থেকে সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হয়। দেশপ্রেমের উত্তেজনায় তাদের উদ্দীপিত করে তোলা হয়। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে নিদারুণ বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং ট্রেঞ্চে বাস করবার ভয়াবহ পরিচয় লাভ করবার পর ছেলে সাতটির মন থেকে যুদ্ধের যাথার্থ্য সম্বন্ধে মোহমুক্তি ঘটল। শেষ পর্যন্ত মাত্র একজন বাদে বাকি ছয়টি ছেলেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারালো। ট্রেঞ্চ যুদ্ধের যথাযথ এবং বাস্তবানুগ চিত্রায়ণের জন্য ছবিটি ব্যাপকভাবে দর্শকমহলে সাড়া জাগিয়ে তোলে। এই ছবি দেখেই সাধারণ দর্শকরা সর্বপ্রথম একটি ধারণা করতে পারেন যে এক একটি ট্রেঞ্চে কী নিষ্ঠুর অমানবিক পরিবেশের মধ্যে সৈন্যদের দিন কাটাতে হয়।

ইউনিভার্সাল পিকচার্স প্রযোজিত ব্যয়বহুল এই ছবিটিতে লিউস্ মাইলস্টোন কাজ করবার স্বাধীনতা পেয়েছিলেন প্রচুর এবং সেই স্বাধীনতার উপযুক্ত সদ্ব্যবহারও তিনি করেছিলেন। বহু একর জমির উপর যুদ্ধক্ষেত্র বানিয়ে তুলে যেভাবে যুদ্ধের দৃশ্য তোলা হয়েছিল তা এতই বাস্তবানুগ এবং যথাযথ হয়েছিল যে অনেক তথ্যচিত্রেও বাস্তবের এমন নিপুণ প্রতিরূপ দেখা যায় না। জার্মানীতে নাৎসীরা তখনও ক্ষমতায় আসেনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ছবিটির বিরুদ্ধে সেখানে তারা এমন প্রবল আন্দোলন এবং বিক্ষোভ শুরু করে দেয় যে সে দেশে ছবিটি দেখানো নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হন।

একটি মাত্র সাউণ্ড ট্র্যাকের সাহায্যে শব্দগ্রহণের দ্বারা এই ছবিতে ধ্বনি ও সংলাপ ব্যবহারে যে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখা যায় তা বিশেষভাবে স্মরণীয়। প্রসঙ্গত জেনে রাখা ভাল যে আধুনিক কালের যে কোন সবাক ছবিতেই সাধারণত চার, পাঁচ বা ততোধিক সাউণ্ড ট্র্যাকের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ১৯৩০ সালে যান্ত্রিক কলাকৌশলের ততটা উন্নতি হয়নি বলেই মাইলস্টোনকে বাধ্য হয়ে মাত্র একটি ট্র্যাকের সাহায্য নিতে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও সুসম্পাদিত আকারে শব্দ ও সংলাপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি এই ছবিতে যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তা তাঁকে একজন প্রথম শ্রেণীর চিত্রপরিচালকের মর্যাদা এনে দেয়। একটি দৃশ্যের কথা বিশেষভাবে বলা যেতে পারে। একটি দীর্ঘ ট্র্যাকিং শট্ শুরু হয় রাস্তার উপর জার্মান স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ট্রেনিং এবং মিলিটারি ব্যাণ্ডের দৃশ্য দিয়ে। ক্যামেরা আস্তে আস্তে পিছিয়ে একটা খোলা জানালার মধ্য দিয়ে ঢুকে একটি স্কুলের ক্লাসরুমে প্রবেশ করে। সেখানে দেখা যায় একজন শিক্ষক উত্তেজিত ভাষণের মাধ্যমে ছাত্রদের যুদ্ধে যোগদানের জন্য উদ্দীপিত করে তুলছেন। ক্যামেরা ক্লাসরুমের পেছন থেকে গোটা দৃশ্যটি একটি লং শটে দেখাতে থাকে। সেকালের দিনের কোন সবাক ছবিতে মাইক্রোফোন সহ ক্যামেরাকে নাড়াতে কোন পরিচালক ভয় পেতেন। তখনকার সময়ে মাইক্রোফোনকে বিশেষ নড়াচড়া করানো যেত না বলে ছবির দৃশ্যগুলিও বেশীর ভাগই হত নিশ্চল। সেক্ষেত্রে সবাক ছবির গোড়ার যুগেই ট্র্যাকিং শটের ব্যবহার করে লিউস্ মাইলস্টোন বেশ কিছুটা দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। এই দৃশ্যে ক্যামেরা যখন ধীরে ধীরে ক্লাস ঘরে প্রবেশ করে তখনও মাইক্রোফোনটি রয়ে যায় রাস্তার উপরেই। যার ফলে কেবলমাত্র মিলিটারি ব্যাণ্ডের বাজনাই শোনা যায়, শিক্ষকটির কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ অশ্রুতই থাকে। আজকের দিনে হলে বিভিন্ন সাউণ্ড ট্র্যাকের সাহায্যে এই দৃশ্যটিতে মিলিটারি ব্যাণ্ডের আওয়াজের সঙ্গে শিক্ষকটির উত্তেজিত কণ্ঠস্বরের যথাযথ সংমিশ্রণ করে তাকে আরও বাস্তবধর্মী করে তোলা যেত।

ছবিটিতে যুদ্ধের দৃশ্যের আওয়াজও তোলা হয়েছিল অত্যন্ত পারদর্শিতার সঙ্গে। সেকালের দিনের গতিহীন দৃশ্যাবলীর চিত্রায়িত নাটকের যুগে 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট' ছবির ক্যামেরার সচলতা এবং জটিল সম্পাদনা রীতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই ছবির শেষের সিকোয়েন্সটি অসাধারণ চিত্রভাষায় সমৃদ্ধ। সেখানে দেখা যায় পল নামে জার্মান সৈনিকটি একজন ফরাসী স্নাইপারের গুলিতে নিহত হয়। একটি শট্-এ দেখা যায় স্নাইপারটি সতর্কভাবে তার রাইফেল তাক করে চলেছে। পরের শটে দেখা যায় পলের একটি হাত একটি প্রজাপতি ধরবার চেষ্টা করছে। হাতটি যে পলেরই তা বোঝা যায় এই কারণে যে আমরা আগেই জেনেছি যে পল হচ্ছে একজন প্রজাপতি-সংগ্রাহক। স্নাইপারের রাইফেল এবং পলের হাত ও প্রজাপতি দেখিয়ে ক্রমে ক্রমে দর্শকের উৎকণ্ঠাকে বাড়িয়ে তোলা হয়। তারপরেই একটি

গুলির আওয়াজ। হাতটি কাঁপতে থাকে এবং ধীরে ধীরে পড়ে যায়। পলের গোটা শরীরটা না দেখিয়ে কেবলমাত্র তার হাতের গতি এবং স্থির নিশ্চলতার মাধ্যমে তার মৃত্যুর দৃশ্যকে পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়। এই দৃশ্যটির ইঙ্গিতধর্মিতার সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর' ছবির একটি দৃশ্যের তুলনা করেছেন র‍্যাল্‌ফ স্টিফেনসন এবং জঁ দেব্রিক্স তাঁদের 'দি সিনেমা অ্যাজ আর্ট' বইটিতে। 'মহানগর'-এর বৃদ্ধ হেডমাস্টারটি এক ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন একটি বাড়ির তিন তলায়। বৃদ্ধটি একটি লাঠি হাতে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন। যখন তিনি সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপটিতে গিয়ে পৌঁছেছেন তখনই কাট্ করে দেখানো হয় যে কোন একজন লোক তাঁর সঙ্গে কথা বলবার জন্য এগিয়ে আসছেন। পর মুহূর্তেই লোকটির চোখমুখে এক আশঙ্কার ভাব ফুটে ওঠে। তারপরে নিচু থেকে তোলা একটি শটে দেখা যায় যে বৃদ্ধের লাঠিটি সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। আমরা কখনই বৃদ্ধ মানুষটিকে অজ্ঞান হয়ে যেতে দেখি না, কিন্তু তাঁর এই দুর্ঘটনার দৃশ্যটি ইঙ্গিতের সাহায্যে দেখানো হয়েছে বলেই সেটা আরও বেশী শক্তিশালী ও শিল্পসম্মত হয়েছে।

মাইলস্টোন পরিচালিত পরের ছবিটিও একটি বিখ্যাত সৃষ্টি—'দি ফ্রন্ট পেজ' (১৯৩১)। পৌনে দু ঘণ্টার এই সবাক ছবিটি বেন হেচ্‌ট এবং চার্লস ম্যাক আর্থার লিখিত একটি নাটকের কাহিনীকে ভিত্তি করে নির্মিত। এই ছবিটির চিত্রনাট্য লিখে দিয়েছিলেন বার্টলেট কোরম্যাক এবং চার্লস লেডারার। অসাধু রাজনৈতিক নেতা এবং সাংবাদিকদের জীবনের ঘটনা নিয়ে এই ছবিটির কাহিনীর বিস্তার। যদিও ছবির প্রধান চরিত্রগুলি প্রায় সকলেই সাংবাদিক তবুও এই ছবিটির ঘটনাস্থল কোন সংবাদপত্রের অফিস ঘর নয়, তা হচ্ছে একটি ফৌজদারী আদালতের কক্ষ, যেখানে একটি খুনের মামলাকে কেন্দ্র করে একদল সাংবাদিক জড় হয়েছেন। একজন নৈরাজ্যবাদী বন্দী যাকে বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসিয়ে মৃত্যুর জন্য দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাঁর বীরত্বের কাহিনী এবং তার এই মামলাকে কেন্দ্র করে যতগুলি চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে তাদের প্রত্যেকের সামাজিক অবস্থানকে এই ছবিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

'দি ফ্রন্ট পেজ' ছবিতে মাইলস্টোনের পরিচালনা রীতির উপর সোভিয়েত চলচ্চিত্রকার পুদোভকিনের প্রভাব লক্ষ্য করবার মত। ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ নির্বাচন এবং সম্পাদনার ক্ষেত্রে পুদোভকিনের রীতিতেই কাহিনী বলার চাইতেও চরিত্রগুলির সঙ্গে তাদের পারিপার্শ্বিকের সম্পর্ক স্থাপনের উপরেই অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

১৯৪০ সালে এই একই কাহিনীকে নিয়েই আর একটি ভিন্ন নামের ছবি উঠেছিল, 'হিজ গার্ল ফ্রাইডে'। অবশ্য তাতে মূল চরিত্র পুরুষ সাংবাদিকটিকে স্ত্রী চরিত্রে রূপান্তরিত করে নেওয়া হয়েছিল। আরও পরবর্তীকালে, ১৯৭৪ সালে 'দি ফ্রন্ট পেজ' ছবিটি আরো একবার পুনর্নির্মিত হয় বিল্লি ওয়াইল্ডারের পরিচালনায়। তাতে সাংবাদিকের চরিত্রটিতে অভিনয় করেছিলেন বিখ্যাত অভিনেতা জ্যাক লেমন।

মাইলস্টোন পরিচালিত পরের ছবি 'রেইন' (১৯৩২)। এতে নায়িকার ভূমিকায় ছিলেন খ্যাতনামা অভিনেত্রী জোয়ান ক্রফোর্ড। এই সময়েই পর পর দুটি ছবি তোলা হয়—'প্যারিস ইন স্প্রিঙ্' এবং 'এনিথিং গোস্'। কিন্তু এগুলির একটিও কোন উল্লেখযোগ্য কাজ নয়। ১৯৩৩ সালে তোলা হয় নিগ্রোদের নিয়ে একটি সঙ্গীত প্রধান ছবি 'হ্যাল্লেলুজা, আই অ্যাম এ ব্যাম'। বেন হেচ্‌ট রচিত চিত্রনাট্যের ভিত্তিতে তোলা এই ছবিটির মধ্য দিয়ে সাম্যবাদের বাণী প্রচারের কিছু সচেতন চেষ্টা ছিল। কিন্তু শিল্পসৃষ্টি হিসেবে ছবিটি বিশেষ সার্থকতা অর্জন করতে পারেনি।

পরের বছর তোলা হল 'দি ক্যাপটেন হেটস্ দি সী' (১৯৩৪)। প্রমোদবিলাসীদের প্রতি তীব্র বিদ্রূপাত্মক এই ছবিটি জন গিলবার্টের স্মরণীয় অভিনয়ের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে। 'দি জেনারেল ডায়েড অ্যাট ডন' (১৯৩৬) বামপন্থী গ্রুপ থিয়েটারের নাট্যকার ক্লিফোর্ড ওডেট্স্-এর লেখা একটি প্রগতিশীল নাটকের চিত্ররূপ। ওডেট্স্ ছিলেন আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। তাঁর এই নাটকের বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল বিস্তর সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আমেরিকানদের সমৃদ্ধি ও সততার পাশাপাশি এতে তৎকালীন চীন দেশের অধিবাসীদের একাংশের চতুরতা ও শয়তানির কিছু কিছু ঘটনা তুলে ধরা হয়েছিল। ঔপনিবেশিক চীনা সরকার এই ছবিটিকে চীন দেশে দেখানো নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং প্রযোজক প্রতিষ্ঠান প্যারামাউণ্ট পিকচার্সের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেন। ১৯৪২ সালে 'দি জেনারেল ডায়েড অ্যাট ডন'কে আবার চীন দেশে দেখাবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু সেবারেও তীব্র বিক্ষোভের মুখে পড়ে ছবিটি দেখানো বন্ধ হয়ে যায়। পরিবেশক সংস্থা ১৯৪৯ সালে তৃতীয়বার চেষ্টা করেন চীনে ছবিটির মুক্তি দিতে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী তরফ থেকে স্বরাষ্ট্র বিভাগ এবার নিজে থেকেই আপত্তি জানান। তাঁরা মনে করেন যে এই ধরনের ছবি নাকি জাতিতে জাতিতে সম্প্রীতির সম্পর্ককে নষ্ট করে দিতে পারে।

এর পরে লিউস্ মাইলস্টোন যে ছবিটি পরিচালনা করেন সেটি হল জন স্টেইনবেক রচিত জনপ্রিয় একটি কাহিনী অবলম্বনে তোলা 'অফ মাইস অ্যাণ্ড মেন' (১৯৩৯)। কিছু মানুষের আর্থিক লোভ ও শোষণের লালসার বিরুদ্ধে এতে সমগ্র মানবজাতির বিবেককে জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছিল।

১৯৪১ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন সমগ্র ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে তখন মাইলস্টোন বিখ্যাত মার্কসবাদী তথ্যচিত্র নির্মাতা জোরিস ইভেন্সের সঙ্গে যুগ্মভাবে পরিচালনা করেন একটি প্রামাণ্য চিত্র 'আওয়ার রাশিয়ান ফ্রন্ট' (১৯৪১)। ১৯৪১-এর জুন মাসে হিটলারের নাৎসী বাহিনী যখন

সোভিয়েত রাশিয়াকে আক্রমণ করে তার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মাইলস্টোন এবং ইভেন্স যৌথভাবে এই ছবিটি তোলা শুরু করে দেন। আমেরিকার 'রাশিয়ান ওয়ার রিলিফ কমিটি'র প্রযোজনায় ছবিটি নির্মিত হয়েছিল এবং প্রায় বারো চোদ্দ জন সোভিয়েত ক্যামেরাম্যানের একটি দল এই তথ্যচিত্রটির ছবিগুলি তুলেছিলেন। এতে বিখ্যাত সোভিয়েত সুরকার সোস্টাকোভিচ-এর সঙ্গীত থেকে কিছু নির্বাচিত অংশ ব্যবহার করা হয়েছিল এবং কণ্ঠ সঙ্গীতগুলি গেয়েছিলেন রাশিয়ার রেড আর্মি কোরাস-এর দল। তথ্যচিত্রটি সম্পাদনার কাজ যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে সেই সময়েই জাপান আমেরিকার পার্ল হারবার-এ বোমা বর্ষণ করে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তোলা মাইলস্টোন পরিচালিত তিনটি যুদ্ধবিষয়ক ছবি—'এজ অফ ডার্কনেস' (১৯৪৩), 'দি নর্থ স্টার' (১৯৪৪), 'দি পারপেল হার্ট' (১৯৪৪)—বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন কাজ নয়, বরং এই ছবি তিনটি গতানুগতিকতার উর্দ্ধে উঠতে পারেনি—এ কথাই বলা চলে। মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার বছরে মাইলস্টোন যে ছবিটি তোলেন তাকে বরং কিছুটা ভাল কাজ বলা যেতে পারে। 'এ ওয়াক ইন দি সান' (১৯৪৫) ছবিতে সৈনিক চরিত্রগুলির চিত্রায়ণ বাস্তবানুগ এবং প্রশংসার যোগ্য। এই ছবির কিছু কিছু অংশ তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ণ ফ্রণ্ট'-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। পরের ছবি 'দি স্ট্রেঞ্জ লাভ অফ মার্থা ইভেরস্' (১৯৪৬) রবার্ট রোসেন রচিত চিত্রনাট্য নিয়ে নির্মিত।

আঠারো বছরের ব্যবধানে, ১৯৪৮ সালে মাইলস্টোন আবার ফিরে আসেন এরিথ মারিয়া রেমার্কের উপন্যাসে, তোলা হয় 'আর্ক অফ ট্রায়াম্ফ' (১৯৪৮)। এই ছবির পরেই মাইলস্টোনের পরিচালক জীবনে প্রায় এক যুগের বিরতি। এই সময়ে হলিউডের প্রযোজক সংস্থাগুলির সঙ্গে তাঁর চলতে থাকে তুমুল বিরোধ। ইতিমধ্যে মার্কিন মুলুকে 'হাউস আন-আমেরিকান অ্যাক্টিভিটিস্ কমিটি' চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মধ্যেও কমিউনিস্ট সন্দেহে জোর সন্ত্রাস শুরু করে দেয়। ফলে সৃজনশীল শিল্পীদের মধ্যে নেমে আসে নিষ্ক্রিয়তা ও কিছুটা ঔদাসীন্য। সামাজিক অথবা রাজনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ কোন প্রগতিশীল ছবি তৈরীর পথ একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। অন্য আরো অনেক চলচ্চিত্র কর্মীর মতো লিউস্ মাইলস্টোনের উপরেও এই প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিবেশ প্রভাব ফেলে। এই সময়কার হলিউডের চলচ্চিত্র জগতে যে সংকটের কালো ছায়া নেমে আসে ১৯৪৮ সালে রচিত 'এক রুগ্ন দৈত্যের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা' (ফার্স্ট এইড ফর এ সিক জায়াণ্ট) নামে একটি প্রবন্ধে মাইলস্টোন তার সুন্দর আলোচনা করেছেন। সেই প্রবন্ধটি থেকে কিছু অংশ নিচে তুলে দেওয়া হল, যা এই পরিচালকের মানসিকতার পরিচয় পেতে অনেকখানি সাহায্য করবে।—

"ছবিতে কোন 'বাণী' থাকা চলবে না। ব্যবসার অবস্থা খুবই খারাপ। হলিউডে মোট বারোশ অভিনেতা-অভিনেত্রীর মধ্যে এখন মাত্র তিনশ সত্তর জন অভিনেতা স্টুডিওগুলির সঙ্গে দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তিতে আবদ্ধ। গত তিন বছরে চিত্রনাট্য রচনার কাজ করেছেন এমন প্রায় আঠারোশ লেখকের মধ্যে এখন মাত্র দুশো পঞ্চাশ জন কর্মে নিযুক্ত এবং তাঁদের ভেতরেও পঞ্চাশ জন দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তিতে কাজ করছেন। হলিউড শহরে বেকার বীমার জন্য যত আবেদনকারী আছেন তাঁদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশই হলেন স্টুডিওগুলির কর্মী। পরিচালকদের মধ্যেও বেকারের তালিকাটি সুদীর্ঘ।...হলিউডে চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে যাঁরা জড়িত এই হচ্ছে তাঁদের আজকের অবস্থা।

অতীতে হলিউডের যখন মোটামুটি সুদিন ছিল তখন সমস্ত সৃজনশীল শিল্পী—পরিচালক, লেখক, অভিনেতা, শিল্প নির্দেশক—একটা ছবি করার জন্য তাঁদের প্রত্যেকের ক্ষমতা অনুযায়ী যথাসাধ্য কাজ করতেন। তখন আমাদের 'ফার্স্ট' অ্যামেণ্ডমেণ্ট', ঝুঁকি বীমা, প্রধান কেশ প্রসাধকের রাজনৈতিক বিশ্বাস, আণবিক বোমার গোপনীয়তা ফাঁস, অথবা নিউ জার্সির কংগ্রেস ম্যানদের বিষয়, ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলি নিয়ে আদপেই মাথা ঘামাতে হত না। আমরা মনে করতাম যে সফল ছবি তুলতে গেলে সমস্ত কারিগরী শাখাগুলি—গিল্ড, ইউনিয়ন এবং বিভিন্ন ফ্রণ্ট অফিস-এর মধ্যে সম্পূর্ণ সহযোগিতা নিয়ে কাজ করা দরকার।...

আজকের দিনে চলচ্চিত্রের জন্য মৌলিক গল্প বনাম প্রকাশিত উপন্যাস, অথবা স্টার সিস্টেম বনাম অজানা গুণী শিল্পী, অথবা এই শিল্পের অন্যান্য কারিগরী প্রশ্ন ইত্যাদি যে সব বিষয় নিয়ে আমরা বিতর্ক চালাতাম সেই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করাটা যেন নিছক অ্যাকাডেমিক বিষয় হয়ে গেছে। কি ধরনের প্রমোদ উপকরণ আমরা সৃষ্টি করব সেটা আজকের দিনে কোন প্রশ্নই নয়; আজকের প্রশ্ন হল—বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা কি আদপেই কোন ছবি করতে পারব?...

যদি প্রযোজকেরা ভাল ছবি তৈরীর ব্যাপারে আন্তরিক আগ্রহী হয়ে থাকেন, এবং তাঁরা যদি মনে করেন যে ব্যয়বাহুল্যই প্রথম শ্রেণীর ছবি তৈরীর পক্ষে একমাত্র বাধা, তাহলে তাঁরা ব্যয় সংকোচের জন্য নিচের বিষয়গুলি বিবেচনা করে দেখতে পারেন। তাতে ছবির মান বিসর্জন দিতে হবে না, ইউনিয়ন ভাঙাভাঙিও করতে হবে না, ছাঁটাই কিংবা লে-অফেরও কোন প্রয়োজন হবে না।—

ক. গল্পের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে :—খুব কম ক্ষেত্রেই পরিচালককে তাঁর চিত্রনাট্য প্রস্তুত করে নেওয়ার সময় দেওয়া হয়। বিচক্ষণতার সঙ্গে চিত্রনাট্য প্রস্তুতির অর্থ হল যে পরিচালক লেখকের সহযোগিতায় কাহিনী সংক্রান্ত সমস্যাগুলি চিত্র নির্মাণ শুরু করার 'আগেই' সমাধান করে ফেলবেন।

খ. প্রাক-স্যুটিং রিহার্সালের ক্ষেত্রে :—এর অর্থ হল পরিচালক, কুশীলব এবং মুখ্য কারিগরী কর্মীরা কাহিনীর বিভিন্ন ঘটনাগুলিকে বিকশিত করবার জন্য পূর্বাহ্নেই প্রস্তুত হয়ে নিতে পারেন। ছবি তৈরী শুরু হয়ে যাবার পর তা করার কোন প্রয়োজন নেই।

গ. মৌলিক গল্প ক্রয়ের ক্ষেত্রে :—স্টুডিওগুলি চলচ্চিত্রের জন্য মৌলিক গল্প নির্বাচনের বিষয়ে খুব কমই দৃষ্টি দিয়ে থাকে। যদিও ব্যতিক্রম আছে, তবুও একথা বলা চলে না যে ব্রডওয়েতে যা সাফল্য অর্জন করেছে অথবা কোন বুক ক্লাব যে কাহিনী নির্বাচন করে দিয়েছে তা সিনেমায় তুললে আপনা আপনিই বক্স অফিসে সফল হয়ে পড়বে।

ঘ. প্রযোজক নিয়োগের ক্ষেত্রে :— প্রযোজক পদ্ধতি যাতে একজন মানুষ গোটা বছর ধরে অনেকগুলি ছবি নির্মাণের তত্ত্বাবধান করে থাকেন—তা তৈরই হয়েছিল অর্থনৈতিক প্রয়োজনের স্বার্থে। ধরে নেওয়া হয়েছিল যে প্রযোজক ছবি নির্মাণ শুরু হওয়ার আগেই তত্ত্বাবধায়কের কাজগুলি করবেন। এইভাবে প্রাক্ উৎপাদন প্রস্তুতের ক্ষেত্রে পরিচালকের প্রয়োজনীয়তাকে একেবারেই বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি যতগুলি ছবি প্রযোজনা করবেন সেই সব কটির মধ্যেই তাঁর বেতনের টাকাটা ভাগ করে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আজকালকার প্রযোজক একজন ব্যবসাদারের চাইতে বেশী কিছু হয়ে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর নান্দনিক বোধ জন্মেছে এবং কখনো তাঁর একটি কাহিনীচিত্রের প্রস্তুতির কাজ সারতেই দুই বছরের মত লেগে যায়। যা কিনা প্রথমে অর্থ এবং সময় বাঁচাবার জন্য করা হয়েছিল, তাই এখন একটা অর্থনৈতিক জটিলতাকলে পরিণত হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে গড়ে বারোজন প্রযোজক এক বছরে হয়ত মাত্র তিনটি ছবি উৎপাদন করতে পেরেছেন।

ঙ. লোকেশন বা স্যুটিংয়ের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে :—গল্পের পটভূমি এবং পরিবেশ নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রায়শই বিশেষ চিন্তা-ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় না। স্টুডিওর সেটের চাইতে যথাযথ বাস্তব পরিবেশ প্রায়ই অনেক ভাল এবং কম ব্যয়সাপেক্ষ।

চ. কার্য্যকরী-কাহিনী বিভাগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে :—যখনই ব্যয় সংকোচনের প্রশ্ন ওঠে স্টুডিওগুলি তখনই রহস্যজনক কারণে প্রথমেই এই কাহিনী বিভাগটিকে ছেঁটে দেন। তাঁরা টাকা বাঁচাবার অন্ধ তাগিদে পাণ্ডুলিপির পাঠক এবং কাহিনী বিশ্লেষকদের ছাঁটাই করে দেন। কাহিনী বিভাগের যাঁরা প্রধান তাঁরা চলচ্চিত্র এবং সাহিত্যের মান সম্পর্কে বিশেষভাবে শিক্ষিত অথচ খুব কম ক্ষেত্রেই তাঁদের যথোচিত ক্ষমতা ও অধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। যে কোন স্টুডিওর উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই কাহিনী বিভাগটিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত। ... ..

লিউস্ মাইলস্টোন লিখিত প্রবন্ধটি থেকে যে অংশটি উদ্ধার করা হল তা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে হলিউডের বড় বড় স্টুডিও নিয়ন্ত্রিত চলচ্চিত্র প্রযোজনার জগতে তিনি বেশ কিছুটা প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেছেন। এ ক্ষেত্রে হলিউডের মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন চলচ্চিত্রকার তাঁর সহযাত্রী ছিলেন তাঁরা হলেন উইলিয়ম ওয়েলম্যান (১৮৯৬—), কিং ভিডর (১৮৯৬—), ফ্রিজ ল্যাঙ্ (১৮৯০-১৯৭৬), এবং জন হাস্টন (১৯০৬—)। এঁরা প্রত্যেকেই যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন হলিউডের ছকে ফেলা জগতেও নিজেদের কিছুটা ব্যক্তিগত স্বাধীন প্রগতিশীল চিন্তাভাবনাকে এবং ধ্যান ধারণাকে ও স্বকীয় স্টাইলকে তাঁদের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে বজায় রাখতে। এঁরা কখনোই ঠিক প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেন নি, আবার সব কিছুকেই নীরবে মেনেও নেন নি। হলিউডে বসেই ছবি তৈরীর কাজ করেও এঁরা নিজেদের স্বতন্ত্র শিল্পীসত্বাকে অনেকাংশেই প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পেরেছেন। হলিউড কোনমতেই এঁদের পুরোপুরি মগজ ধোলাই করে উঠতে পারে নি অনেক চেষ্টা করেও। যেখানে বেশীর ভাগ চিত্র নির্মাতাই যখন কেবলমাত্র বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদনের কাজে ব্যস্ত, সেখানে সামাজিক জটিলতা ও দ্বন্দ্বের বিষয়বস্তুকে রাজনীতির আলোয় বিশ্লেষণ করে ছবি তোলার কাজ চালিয়ে যাওয়াটা নিশ্চয়ই অভিনন্দনের যোগ্য। লিউস্ মাইলস্টোন ঠিক এই কাজটিই করেছেন, যদিও সব সময় সফল শিল্প সৃষ্টি হয়ত তিনি করে উঠতে পারেন নি।

এক যুগের বিরতি ও ব্যবধানের পর ১৯৬০ সালে মাইলস্টোন যে ছবিটি তুললেন তা তারকাসমৃদ্ধ একটি ছবি হলেও নিষ্প্রভ প্রয়াস। ফ্রাঙ্ক সিনাট্রা এবং তাঁর সঙ্গী সাথীরা ডীন মার্টিন, পিটার লফোর্ড, এবং স্যামি ডেভিস, জুনিয়ার- যাঁরা 'সিনাট্রা ক্ল্যান' নামে হলিউডে পরিচিত—একত্রে এই ছবিটিতে অভিনয় করেছিলেন।

মাইলস্টোনের জীবনের সর্বশেষ ছবির নাম হল 'মিউটিনি অন দি বাউন্টি'র (১৯৬২) একটি নব সংস্করণ। ১৯৩৫ সালে ফ্রাঙ্ক লয়েড-এর পরিচালনায় যে ছবি উঠেছিল, ১৯৬২ সালে সেই ছবিই লিউস্ মাইলস্টোনের পরিচালনায় পুনর্নির্মিত হয়। প্রথমে এটি পরিচালনা করছিলেন ক্যারল রীড। তাহিতি দ্বীপে দুই বছর লোকেশনে স্যুটিং করবার পর অভিনেতা মারলোন ব্র্যাণ্ডোর সঙ্গে রীডের মতবিরোধ হওয়ার দরুন ক্যারল রীডকে ছাড়িয়ে দিয়ে লিউস মাইলস্টোনকে পরিচালক নিযুক্ত করা হয়। দুই কোটি সত্তর লক্ষ ডলার ব্যয় করে টেকনিকালারে এবং ৭০ মি. মি. প্যানাভিসনে যে ছবিটি শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হল, তা কিন্তু ১৯৩৫-এর প্রথম সংস্করণটির মতো আকর্ষণীয় হতে পারল না।

যা মনে হয় ভাবী যুগের চলচ্চিত্র রসিকেরা লিউস মাইলস্টোন পরিচালিত বেশীর ভাগ ছবির কথা মনে না রাখলেও কেবলমাত্র 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ণ ফ্রন্ট' এবং 'দি ফ্রন্ট পেজ' ছবি দুটির জন্যই তিনি চলচ্চিত্রের ইতিহাসে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবেন।

বাংলার শিশুচিত্র—
একটি সমালোচনামূলক ইতিবৃত্ত

নন্দন মিত্র

চিলড্রেন ফিল্ম

এই রকম একটি আলোচনা করতে যাওয়ার পূর্বে আমাদের দেশে চিলড্রেন শব্দটি নিয়ে যে বিভ্রান্তি আছে সেটা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন কারণ ইংরাজীতে চিলড্রেন শব্দটি যদিও একেবারে ছোট থেকে যে কোনও বয়সী অপরিণতদের বোঝাতে ব্যবহৃত হয় বাংলা এর প্রতিশব্দ শিশু শুধুমাত্র ৭/৮ বৎসর পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েদের বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। অনেকেই তাই শিশুচিত্র বলতে ঐ বয়স সীমার উপযোগী ছবির কথাই বোঝেন। তাই এই অসঙ্গতির কথা মনে রেখে 'চিলড্রেন ফিল্ম'-এর বঙ্গার্থ শিশুচিত্র শব্দটিকে চিলড্রেন শব্দটির মতই ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করতে হবে শিশু ও কিশোরদের উপযোগী ছবি বোঝাতে।

তবে চিলড্রেন শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হলেও একেবারে ছোটদের ও কিশোরদের জন্য পৃথক ছবির উপযোগিতা স্বীকৃতি লাভ করেছে কারণ কিশোরদের উপযোগী বহু ছবি একেবারে ছোটদের বোধগম্য নাও হতে পারে যেমন ধরা যাক 'জয় বাবা ফেলুনাথ' ছবিটি।

৭/৮ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুদের যা ভাল লাগে তা হল রূপকথার গল্প, বনের জন্তু জানোয়ারের ওপর লোমহর্ষক ছবি, চিড়িয়াখানার পশুপক্ষীদের বিচিত্র ক্রিয়াকলাপের ওপর ডকুমেন্টারি। সবচেয়ে ভাল হয় হিতোপোদেশের গল্প বা রুশী উপকথার ওপর তোলা কার্টুন বা পাপেট ছবি। এই ধরনের বিষয়বস্তুর সবচেয়ে সুবিধা হল পশুপক্ষী চরিত্র সম্বলিত এইসব ছবি দেখতে ছোট শিশুরা একদিকে যেমন আনন্দলাভ করে অন্যদিকে গল্পচ্ছলে তাদের মনে অনেক প্রাথমিক শিক্ষার বীজ অঙ্কুরিত করা যায়। অথচ আমাদের দেশে এই এজ গ্রুপদের জন্য ছবি হয়নি বললেই চলে। সত্যজিৎ-এর 'গুপি গাইন বাঘা বাইন', নিউ থিয়েটার্স নির্মিত কার্টুন ছবি 'মিচকে পটাশ' বা সাম্প্রতিকালে প্রদর্শিত 'একটি মোরগের কাহিনী' (সর্ট ফিল্ম) এইসব শিশুদের উপযোগী বলা যেতে পারে। অথচ বিদেশে ওয়াল্টার ডিজনির আমল (১৯২৭) থেকেই যে কত ধরণের ভূরি ভূরি শিশুচিত্র নির্মিত হয়েছে তার কোনও ইয়ত্তা নেই।

বাংলা শিশু সাহিত্য

অথচ বাংলা শিশু সাহিত্যে এই ধরণের ছবি নির্মাণের প্রচুর উপাদান রয়েছে। উপেন্দ্রকিশোর, সুখলতা রাও বা লীলা মজুমদারের আধুনিক রূপকথার গল্প, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি' বা 'ঠাকুরদার ঝুলি', অবনীন্দ্রনাথের 'ক্ষীরের পুতুল' বা 'বুড়ো আংলা', ত্রৈলোক্য মুখার্জির 'আজগুবি গল্প' বা সুকুমার রায়ের 'মজার ছড়া' থেকে ছোটদের ছবির আহরণ করার অনেক কিছুই আছে। আর এই সম্পদকে সঠিক ভাবে কাজে লাগালে তা যে একাধারে বড়দেরও উপভোগ্য হতে পারে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত সর্বাধিক সফল বাংলা ছবি 'গুপি গাইন বাঘা বাইন'।

কিশোরদের ছবি নির্মাণের ব্যাপারেও যা হয়েছে তা সমুদ্রে বারিবিন্দুর মত। অথচ বাংলায় এই এজ-গ্রুপদের জন্যও সাহিত্য কম রচিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' ও অবনীন্দ্রনাথের 'রাজকাহিনী' থেকে সুরু করে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা, সত্যজিৎ-এর ফেলুদা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদা, শিবরাম চক্রবর্ত্তির মজার গল্প বা অখিল নিয়োগী ও বিমল ঘোষের ছোট গল্পের মধ্যে কিশোরদের উপযোগী ছবির প্রচুর মালমশলা রয়েছে। এগুলিকে দু-একজন পরিচালক ছাড়া কেউ কাজে লাগান নি। তাছাড়া কিশোরদের জন্য নির্মিত শিক্ষামূলক ছবির সংখ্যাও নগণ্য। আর বিজ্ঞানধর্মী বা খেলাধুলার ওপর ছবি তো আমাদের দেশে হয় না বললেই চলে।

তবে বাংলা চলচ্চিত্রে এমন কিছু সর্বজন আবেদনমূলক ছবি নির্মিত হয়েছে যেগুলি কিশোরদের দেখার উপযোগী কারণ 'পথের পাঁচালি' 'অপরাজিত, 'পোস্ট মাস্টার,' 'কাবুলিওয়ালা', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' বা 'হেডমাস্টার' প্রভৃতি ছবিগুলির মধ্যে যে গভীর মানবিক আবেদন থাকে তা কিশোরদের মনে ঐসব অনুভূতিগুলির বিকাশে খুবই সাহায্য করে। আমার মনে হয় সেন্সর কর্তৃপক্ষের উচিত শুধুমাত্র এই ধরনের ছবিগুলকে Universal Certificate দেওয়া। অন্যান্য ব্যবসায়িক ছবিগুলির জন্য আলাদা মান নির্দ্ধারিত হওয়া উচিৎ।

ইতিবৃত্ত :

যতদূর জানা যায় বাংলায় নির্মিত প্রথম শিশুচিত্র পঞ্চাশ দশকের প্রথমভাগে নির্মিত সত্যেন বসুর 'পরিবর্ত্তন'। সত্যেন বসু যিনি 'পথের পাঁচালি' নির্মাণের পূর্বেই 'ভোর হয়ে এল'-র মত প্রথা-বিরুদ্ধ ছবি নির্মাণ করেছিলেন, তিনি 'পরিবর্ত্তন' নির্মাণের মাধ্যমে কিশোরদের জন্য ছবি নির্মাণে বাংলা চলচ্চিত্রে অভিনবত্ব আনতে পেরেছিলেন। একটি ছেলের দুরন্তপনা এর মূল উপজীব্য। পরে একটি দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে ছেলেটির মনের পরিবর্ত্তন দেখান হয়। অনেক দোষত্রুটি সত্ত্বেও প্রথম আধুনিক কিশোর-চিত্র হিসাবে প্রচেষ্টাটি প্রশংসনীয়। এরপর বোম্বাই চলে যাবার পর সত্যেন বসু হিন্দীতে কয়েকটি শিশুচিত্র নির্মাণ করেন, যেগুলি ছিল আদর্শবাদ ও সেন্টিমেন্টে ভারাক্রান্ত।

এরপর নির্মিত হয় কিরণ সরকারের 'স্বপ্নপুরী'। এটিই বাংলায় সর্বপ্রথম রঙিন শিশুচিত্র। নাম শুনেই বোঝা যায় এটি একটি রূপকথার গল্প। এরপর নির্মিত হয় 'দেড়শো খোকার কাণ্ড'। ছবিটি তখনকার দিনে (৫০ দশকের শেষা-শেষি) অস্বাভাবিক ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করে। ছবিটি কিশোরদের জন্য নির্মিত হলেও বক্স-অফিসের দিকে তাকিয়ে ছবি করার ফলে পরিচালককে এমনকিছু সস্তার দৃশ্য ঢোকাতে হয় যা ছোটদের কুশিক্ষাই দেবে। ঐ ছবিতে 'কুমড়ো পটাশ খায় পেয়ারা' গানের দৃশ্যটি একটি মোটা ছেলেকে ব্যঙ্গ করে রচিত হয়েছিল। দৃশ্যটি যে অশোভন তা বলাই বাহুল্য।

এরপর নির্মিত হয় 'লালু ভুলু'। একটি পঙ্গু ও এক অন্ধের পরস্পর নির্ভরতার গল্পের মধ্যে শিশুচিত্রের উপাদান থাকলেও পরিচালকের লক্ষ্য ছিল দর্শকের চোখে জল আনা। ফলে সেই সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। 'অবাক পৃথিবী'-ও ছিল সেন্টিমেন্টে ভারাক্রান্ত। এরপর ছেলেধরার কাণ্ড নিয়ে নির্মিত হয় 'মানিক' ও 'পান্নার' মত ছবি, বেশী মাত্রায় নাটকীয় উপাদান ও মেলোড্রামার আতিশয্যের ফলে কোনটাই আদর্শ শিশুচিত্র হয়ে উঠতে পারেনি।

অবশ্য এর পাশাপাশি 'পথের পাঁচালি'র পরবর্তি যুগে বাংলায় যে নতুন চলচ্চিত্র সংস্কৃতির সূচনা হয়েছিল তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নির্মিত হয়েছিল ছোটদের বেশ কয়েকটি ভাল ছবি। এই ধরনের প্রথম ছবিটি নির্মিত হয় শিবরাম চক্রবর্ত্তির গল্প অবলম্বনে ঋত্বিক ঘটকের 'বাড়ী থেকে পালিয়ে'। যদিও ছবির মূল সারমর্মটি ছোটদের উপযোগী নয় তবু এই ছবিটির মধ্য দিয়ে ছোটরা দেখল তাদেরই একটি সমবয়সী ছেলের গ্রামের বাড়ী থেকে সহরে পালিয়ে আসার অ্যাডভেঞ্চার। তার বহু তিক্ত-মধুর অভিজ্ঞতা তাদের কাছেও শিক্ষণীয় হয়ে রইল। এরপর রঘুনাথ গোস্বামী নির্মিত 'হট্টগোল বিজয়' ছবিটি প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদক পায়।

ষাট দশকের শেষাশেষি মৃণাল সেন রবীন্দ্রনাথের কাহিনী অবলম্বনে নির্মান করেন 'ইচ্ছাপূরণ'। রবীন্দ্রনাথের সেই বাবা-র ছেলে হওয়ার বায়না ও ছেলের বাবা হওয়ার বায়নার বিখ্যাত গল্পকে তিনি সফলভাবে চিত্ররূপ দেন। এই ছবিতে শব্দের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। ছবিটি ব্যঙ্গাত্মক হলেও শিশুদের কাছে উপভোগ্য ও শিক্ষণীয়।

ঐ সময়ে লীলা মজুমদারের 'বক ধার্মিক' কাহিনী অবলম্বনে শান্তি প্রসাদ চৌধুরী নির্মাণ করেন 'হীরের প্রজাপতি'। ছবিটি '৬৮ সালের জন্য শ্রেষ্ঠ শিশুচিত্র হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদক পায়। একটি হীরের প্রজাপতি হারিয়ে যাওয়া ও তা খুঁজে পাওয়া এবং তার মধ্য দিয়ে এবং বক ধার্মিক গুরুদেবের ভণ্ডামি উন্মোচন (expose) করা এই ছবির উদ্দেশ্য। কিন্তু এটা শিশুদের কাছে ভালভাবে তুলে ধরতে পরিচালক ব্যর্থ হয়েছেন। এতদসত্ত্বেও ছবিটি শ্রেষ্ঠ শিশুচিত্র হিসাবে পুরস্কৃত হওয়া আমাদের দেশের শিশুচিত্রের দুরবস্থার দিকটাই তুলে ধরে।

এর কিছু আগে ষাটদশকের প্রথমদিকে সত্যজিৎ রায় নির্মাণ করেন 'টু', অবশ্য এটি ছিল একটি টেলিভিশন চিত্র। এই ছবির দুটি চরিত্র— একজন ধনী সন্তান যে প্রকাণ্ড অট্টালিকায় বাস করে এবং যার ঘর ভর্ত্তি নানারকম আধুনিক খেলনা; অন্যজন গরীব সন্তান যে অট্টালিকার পাশেই একটি ভাঙ্গা কুঁড়েতে বাস করে। এদের দ্বন্দ্ব (সত্যজিৎ যাকে খুনসুটি বলেছেন) এই ছবির প্রধান উপজীব্য। ছবির শেষে ধনী সন্তানটি গরীব ছেলের ওড়ানো ঘুড়িকে এয়ারগান দিয়ে দিল ফাঁসিয়ে কিন্তু ধনী সন্তানের খেলনাগুলি গুঁড়িয়ে দিল তারই একটা রোবট। অবশেষে গরীব ছেলেটি আবার সুর তুলল তার বাঁশীতে। ছবিটি অবশ্য বিদেশের টেলিভিশনের জন্য নির্মিত হয়েছিল। আমাদের টি. ভি. কর্তৃপক্ষরা এই ছবিটি দেখাবার ব্যবস্থা করতে পারেন।

এরপরই '৬৯ সালে সত্যজিৎ রায় নির্মাণ করেন 'গুপী গাইন বাঘা বাইন', এই ছবিটি সর্বদিক দিয়ে একটি শিশুচিত্র হয়ে উঠেছিল। সত্যজিৎ উক্ত ছবিটিতে ভূত নামক কুসংস্কার থেকে শিশুদের মুক্ত করতে না পারলেও পুরানো ধারণায় ভাঙ্গন এনেছিলেন। তার ছবির ভূত ভীতির সঞ্চার না করে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করল এবং গুপি বাঘার ভাগ্য ফিরিয়ে দিল। অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটি তিনি ফ্যান্টাসির পর্য্যায়ে রাখলেই ভাল করতেন। কিন্তু ভূতের রাজার মাথায় বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহার করে তিনি এমন আভাস দিলেন (Science fiction) যে একদিন এইভাবে হয়তো মানুষের সঙ্গে ভূতের কোনও বৈজ্ঞানিক উপায়ে যোগাযোগ ঘটবে। এইভাবে আত্মার অস্তিত্বের ব্যাপারটায় তিনি গুরুত্ব না দিলেই ভাল করতেন। অবশ্য বরফি নামক যাদুকর-এর যাদুবিদ্যা যে অলৌকিকতা নয় বরং বিজ্ঞান-নির্ভর তা তার ল্যাবরেটরি ও সম্মোহন করার ভঙ্গিতে দুহাত তোলা প্রমাণ করে।

সত্যজিৎ এই ছবিতে সাহিত্যের ভঙ্গিতে গল্প না বলে তাকে চলচ্চিত্রের ভাষাতেই বলেছেন অথচ এত মুন্সিয়ানার সঙ্গে যে তা শিশুদের বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয়নি। শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে গুপী ও বাঘার মুখ তিনি ফ্রিজ শটে এঁকেছেন। আবার নির্জন বনে বাঘ আসার সময়ে শিশুদের মনে যে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয় বাঘার ঢোলের ওপর জল পড়ার আওয়াজ তার সঠিক পরিপূরক। ভূতের নাচের দৃশ্যটি এই ছবির সবচেয়ে বড় সম্পদ। এই নাচের দৃশ্যটিতে তিনি যে টেকনিকের সাহায্য নেন তা আমাদের দেশে তো বটেই, সম্ভবত এর ব্যবহার অন্য কোথাও এর আগে হয়নি।

এই ছবির মেক্-আপও সত্যজিৎ রায় নিজে করেন। বিভিন্ন দেশের দূতদের পরিহিত জাতীয় পোষাক যেমন রাজসভাকে প্রকৃত রূপ দেয় তেমনি যাদুকর বরফির কালো চৌকো চশমা ঢাকা চোখ ও দাড়ি ঢাকা মুখ তাকে সহজেই শিশুদের কাছে রহস্যময় করে তোলে। এই ছবির সেট-সেটিংও রূপকথার কল্পনাকে প্রবলতর করে।

এই ছবির গানগুলির ভাষা ও সুর এত সহজ যে তা শিশুদের মনে চট্ করে দাগ কেটে ফেলে।

লীলা মজুমদারের গল্প অবলম্বনে নির্মিত অরুন্ধতী দেবীর 'পদি পিসির বর্মি বাক্স' শিশু থেকে কিশোর পর্য্যন্ত সকলের ভাল লাগবে যদিও ছোটদের ছবির বিচারে ছবিটা কোনও কোনও স্থানে ত্রুটিপূর্ণ এবং বিকৃত রুচির সহায়ক যেমন বৃদ্ধদের মেয়ে সেজে নাচার দৃশ্যটি। তবে ডাকাতদের দৃশ্য রচনায় তিনি যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। বাক্স উদ্ধারের দৃশ্যটিতেও তিনি দর্শকদের মধ্যে যথেষ্ট উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। পদি পিসির ভূমিকায় ছায়া দেবীর অভিনয় ছবিটিকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছিল।

পুরো ছবিটিকে রঙিন করার বদলে আংশিক রঙিন করার ফলে রঙের ব্যবহার খুব প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছে। ছবিটির কিছু অংশ বাদ দিয়ে পুনরায় সম্পাদনা করলে এটি একটি প্রকৃত শিশুচিত্র হতে পারে। ছবিটা ভাল না চলার এক বড় কারণ যে ছবিটি নভেম্বর-ডিসেম্বরে মুক্তি পায় যখন শিশু দর্শকরা পরীক্ষায় ব্যস্ত।

আমাদের দেশের অর্থনীতিতে সামন্ততন্ত্রের মূলোচ্ছেদ না ঘটিয়ে উপর থেকে পুঁজিবাদ চাপিয়ে দেওয়ার ফলে বুদ্ধিজীবিদের ভাবনা চিন্তাতেও এর প্রতিফলন ঘটছে। অন্ততঃ 'সফেদ হাতি' দেখে আমার সেই ধারণা হয়েছে। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে যেমন রোমাঞ্চকর শিকারের কাহিনী অথবা অরণ্যের জন্তু জানোয়ারের ওপর ছবি তোলা হয় এই ছবিতে তারই কিছুটা ধার নিয়ে তাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে মামা-মামীর অত্যাচারের বস্তাপচা কাহিনীর ওপর। অর্থাৎ জন্তু-জানোয়ার থাকলেও, নেই কোনও অ্যাডভেঞ্চার এবং তার বদলে এসেছে সমস্যার অলৌকিক সমাধান। একটি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ঐরাবত ও একটি ময়না পাখী কিভাবে একটি ভাই ও বোনকে তাদের মামা-মামীর অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করল তাই এই ছবির কাহিনী। অবশ্য উক্ত ছবিটিকে পরিচালক তপন সিংহ যদি ফ্যান্টাসির পর্য্যায়ে নিয়ে যেতেন তাহলে এ প্রসঙ্গ উঠত না। সমস্ত ছবিটাকেই তিনি বাস্তবের পটভূমিকায় দেখাতে চাইলেন। এই ধরণের ছবি দেখার ফলে ছোটদের মধ্যে অলৌকিকতার প্রতি প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে। ছবিটি হিন্দীতে উঠলেও স্থানীয় পরিচালকের দ্বারা নির্মিত বলে এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করলাম। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছবিটিকে কর রেহাই না দিয়ে উপযুক্ত কাজই করেছেন।

এটি লক্ষ্য করবার বিষয় যে ইদানিংকালে ক্রাইমকে ভিত্তি করে বাংলায় বেশ কয়েকটি ছোটদের ছবি গড়ে উঠেছে। ছোটদের ছবি ক্রাইম-ভিত্তিক না হওয়াই উচিত তবে বর্ত্তমান সমাজে অপরাধ যেহেতু একটি বাস্তবতা তাই এই বিষয়টি নিয়ে ছবি হবেই। সেক্ষেত্রে অপরাধমূলক ব্যাপারগুলিকে কে কিভাবে দেখালেন তা অবশ্যই বিবেচ্য। সত্যজিৎ রায়ের অপরাধমূলক ছবিগুলিতে ভায়োলেন্সকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। শিশুমনে ভায়োলেন্সের প্রভাব যে ক্ষতিকারক সত্যজিৎ সে ব্যাপারে সজাগ। এর বদলে বুদ্ধির লড়াই যার একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকে তিনি সেটাকেই প্রাধান্য দেন। তাঁর রচিত সাহিত্যেও এটা লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া তিনি তাঁর গল্পে খুঁটিনাটি তথ্য দেন যেগুলি গল্পচ্ছলে ছোটদের কাছে শিক্ষণীয় হয়ে ওঠে।

অবশ্য ছবির গল্পের মাধ্যমে যদি একটি অবৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রচার পায় তাহলে তাকে নিশ্চয়ই সমালোচনা করতে হবে। 'সোনার কেল্লা' ছবি দেখে ছোটদের মধ্যে জাতিস্মরতা বা জন্মান্তরবাদের মত বৈজ্ঞানিকভাবে অপ্রমাণিত ধারণা গেড়ে বসতে পারে যা তাদের এগিয়ে নেওয়ার বদলে পেছিয়ে দেবে। অন্যদিকে 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এর মত ছবির প্রচেষ্টা যা ধর্মীয় ভণ্ডামির মুখোস খুলে ফেলে তাকে অবশ্যই সাধুবাদ জানাতে হবে।

শিশুদের মনের গহনে প্রবেশ করায় সত্যজিৎ-এর জুড়ি নেই। তাই ভণ্ড সাধুটার নাম দিলেন 'মছলি বাবা'-এর কারণ সে বলে যে সে এখানে সাঁতার কেটে এসেছিল। নামকরণটা এক দিকে যেমন শিশু মনের উপযোগী, অন্যদিকে এই নামের মধ্য দিয়ে প্রথম থেকেই চরিত্রটি সম্বন্ধে একটি সন্দেহের বীজ শিশুদের মনে অঙ্কুরিত হয়ে যায় কারণ এই নামটার সঙ্গে বক ধার্মিক কথাটার যেন একটা কোথায় সাদৃশ্য আছে। বেনারসের মত স্থানকে ঘটনার প্রেক্ষাপট হিসাবে বেছে নেবার অন্যতম কারণ এই বলে মনে হয় যে এইখানেই বহু সাধু সন্ন্যাসীর নানারকম অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের গল্প প্রচলিত আছে মছলিবাবা-র স্বরূপ উন্মোচনের মধ্য দিয়ে তিনি প্রচলিত বিশ্বাসকে আঘাত করলেন। ফেলুনাথের দৃষ্টি দিয়ে তিনি এও দেখালেন যে এইসব ভণ্ডরা যে শুধু প্রতারক তাই না এদের সঙ্গে underworld-এর ও যোগাযোগ থাকে। ঐ ছবিতে তিনি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়েছেন ঐ বডি-বিল্ডারের মাধ্যমে। ঐ বডি-বিল্ডারকে একটি মন্দিরের সঙ্গে ও তার পেশীগুলিকে মন্দিরের কারুকার্য্যের সঙ্গে তুলনা করে তিনি রুচি পরিবর্ত্তনের বার্ত্তা ঘোষণা করেছেন।

অথচ কিছুদিন পূর্বে প্রদর্শিত তপন সিংহের 'সবুজ দ্বীপের রাজা' ছবিতে না আছে কোনও বুদ্ধির খেলা না আছে শিশুদের মানসিকতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টা। বরং এই সব ছবি দেখে ছোটরা ভবিষ্যতে

গোয়েন্দা ও পুলিশের মার্কা Actual Thriller-এর প্রতি আকর্ষিত হবে। জানিনা কি কারণে পরিচালক সরকার ছবিটিকে শিশুদের ছবি হিসাবে নির্দেশের অনুমোদন দিলেন।

অপরাধীদের ধরার জন্ত বুদ্ধির খেলার বদলে দেখা গেল যে কয়েকটি ঘটনাচক্র ও কাকতালীয় ব্যাপার ছেলেটিকে সাহায্য করল। সমস্ত ছবিটাতে অপরাধীদের খুব বোকা ও অসতর্ক বলে মনে হয়েছে। তাদের আচরণ দেখে মনে হয়েছে তারা ধরা পড়তেই এসব করছে। ছেলেটি অপরাধীদের কথাবার্তা যেভাবে আড়ি পেতে শুনেছে তা কখনো বাস্তবে সম্ভব নয় তবে ছোট ছেলেটি যেভাবে ক্যারেট ও যুযুৎসু চালিয়ে দুটি পেশাদারী গুণ্ডাকে কাবু করেছে তাকে শুধু অবাস্তবোচিত-ই নয় হাস্যকরও মনে হয়েছে। এই ছবি দেখে ছোটদের বিপক্ষকে underestimaate করার প্রবৃত্তি জাগা অস্বাভাবিক নয়। পরিচালক শিশুচিত্র নির্মাণ করার সময়ও দর্শককে অহেতুক ভাবপ্রবণ করার পুরানো অভ্যাসটা ছাড়তে পারেননি। পরিচিত ভাবনা হাত থেকে জলে পড়ে যাওয়া ও তারপর একটি গাছের ডাল ব্যবহার করার ঘটনাটি এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে। কাবুলিওয়ালার পরিচালকের কাছ থেকে আমরা এর থেকে অনেক ভাল ছবি আশা করেছিলাম। কিন্তু বাংলা শিশুচিত্রের মরুভূমিতে তিনি কিছু বারি সিঞ্চন করতে পারবেন কিন্তু তা মরীচিকায় পর্যবসিত হল।

বরং সেদিক দিয়ে টেনিদা-র গল্প অবলম্বনে নির্মিত উমানাথ ভট্টাচার্য্যের 'চার মূর্তি' অনেক উপভোগ্য। কিছু আতিশয্য থাকলেও ছবিটি ছোটদের মন জয় করেছে।

সবশেষে কিছুদিনের মধ্যেই 'হীরক রাজার দেশে'-এর মধ্য দিয়ে আমরা খুব ভাল একটা শিশুচিত্র দেখার আশা পোষণ করে এই প্রবন্ধ শেষ করছি।

সত্যজিৎ-চলচ্চিত্র ঃ রবীন্দ্র-সাহিত্যভিত্তিক

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা

বাংলার নব-জাগৃতি যার সূচনা রামমোহন রায় এবং পরম পরিণতি রবীন্দ্রনাথে—এই ধরণের একটি ধারণা এদেশে প্রচলিত। কিন্তু এই ধারণায়, বাংলার নবজাগৃতির যতটা মহত্বপ্রাপ্তি ঘটে ততটা রবীন্দ্রনাথের মহত্ব সূচিত হয় কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তার কারণ, যে কোন দেশের নব জাগৃতি বা রেনেসাঁ সৃষ্টি করে কিছু অবিস্মরণীয় প্রতিভাবান মানুষ, সেই হিসেবে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ইত্যাদি যে সব বড় মাপের মানুষ সে সময়ে অল্প কিছু বৎসরের ব্যবধানের মধ্যে এসে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন এটা একটা স্বাভাবিক ঐতিহাসিক ঘটনা। ইউরোপীয় রেনেসাঁও এমনিভাবে জন্ম দিয়েছিল আশ্চর্য কয়েকজন বীরোচিত মানুষের—যাদের মধ্যে মানবোচিত পূর্ণতা এমন রূপ পরিগ্রহ করেছিল যে আজো তা আমাদের বিহ্বল করে, যেমন মুগ্ধ করেছিল মাকর্স এবং এঙ্গেলসকে। এই পূর্ণতার একটি দিক ছিল তাঁদের চিন্তার ও চরিত্রশক্তির বৈপ্লবিক দিক, তৎকালীন প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে তাঁরা ছিলেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে নূতন যুগের অগ্রগামী দূত এবং সংগ্রামী। এর কারণ, তাঁদের নব জাগরণ ঘটেছিল মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে পেরিয়ে আসার সংগ্রামের মধ্যে—দান্তের কাব্য ও কর্মসাধনার মধ্যে যা হয়েছিল মূর্ত। বাংলার নবজাগৃতির প্রেক্ষাপট ছিল অনেকটাই অন্য রকমের। এখানে ইতিমধ্যেই নূতন যুগের আলোকপ্রাপ্ত একটি বিদেশী জাতি, এক্ষেত্রে ইংরেজ, তার ভাবধারার সংস্পর্শে এসে অনেক কাল ধরে থেমে থাকা, বা সত্য অর্থে, পিছিয়ে পড়া বাঙালী তথা ভারতীয় জাতি হঠাৎ তার সুপ্ত বা স্তব্ধ হয়ে পড়া সৃজনী শক্তির উৎস মুখ খুঁজে পেয়েছিল-বা আরো সত্য অর্থে তার জাতীয় সংকীর্ণতা ও একদেশদর্শিতাকে ঘুচিয়ে দিয়ে এক নূতন বিশ্বকে গ্রহণ করতে পেরেছিল তুলনামূলকভাবে নূতন আলোকপ্রাপ্ত একটি বিদেশী জাতির চিন্তাধারার স্পর্শে—যে বিদেশী জাতি কিন্তু তার মানবিক প্রগতিশীল ভাবধারাই শুধু সঙ্গে নিয়ে এসেছিল তা নয়, এনেছিল শোষণের সরঞ্জামও। তার এক হাতে ছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁর শ্রেষ্ঠ কমল, অন্য হাতে ছিল শৃঙ্খল। ইউরোপীয় রেনেসাঁর দেবীর এক হাতে যেখানে ছিল নূতন চিন্তারাশির গ্রন্থ, অন্য হাতে মধ্যযুগ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সংগ্রামের তরবারি—বাংলার রেনেসাঁর হাতে সেই তরবারিটি ছিল প্রায় অনুপস্থিত। তাই বাংলার নবজাগৃতির দূতদের কণ্ঠে একদিকে যেমন মানবিকতার বাণী মন্ত্রিত হয়েছে, তেমনি কিছুটা সূক্ষ্মভাবে শৃঙ্খলের ঝনঝনও যে শোনা যায়নি তা নয়। রামমোহন দিয়ে গেছেন অনেক, কিন্তু ভারতবর্ষকে ইংরেজের কাছে সমর্পিত করার বিরুদ্ধে কিছু করেন নি, বরং কিছু কিছু কাজ এমন করেছেন— যাতে ইংরেজের এদেশে স্থায়ী হয়ে বসবার সুযোগ গিয়েছিল বেড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রগতিশীল অবদান আমাদের চিন্তার রক্তস্রোতে কিন্তু সেই মহাশিল্পী বঙ্কিমের কণ্ঠস্বরে একটি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কণ্ঠও শোনা গেছে, যেমন 'নীলদর্পণ' প্রসঙ্গে তাঁর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া স্মর্তব্য। সেই যুগটির সীমাবদ্ধতার সব চেয়ে বড় প্রমাণ, ঠিক সেই সময়ের মধ্যে (রামমোহন যখন ইংরেজদের কাছে আমাদের 'সম্মান বাড়িয়ে তুলছেন' বলে আমরা গর্বিত) কলকাতার কাছেই তিতুমীর যে স্বাধীনতা যুদ্ধ চালিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে—এই সমস্ত মানুষগুলির আশ্চর্য অসচেতনতা! অর্থাৎ বাংলার নবজাগৃতি বলতে আমরা যা বুঝি—তার মধ্যে কিন্তু তৎকালীন কৃষক বিদ্রোহগুলির বা তিতুমীরের মত মানুষগুলির কোন অবদান স্বীকৃত হয়নি। তাই সামগ্রিক অর্থে, বাংলার নবজাগৃতি, যদিও নবজাগৃতি কিন্তু তার মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা সত্য অর্থে জাগৃতির সূচক নয়। এই অর্থেই, বাংলার নবজাগৃতির প্রাণমূর্তি বা পরিণতি বলায় রবীন্দ্রনাথের সম্ভবতঃ ততটা গৌরব বাড়ে না—যতটা আমাদের ভাবানো হয়েছে।

অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথকে আমরা কিভাবে দেখবো, শুধুমাত্র রামমোহণের উত্তরসুরী হিসেবেই—নবজাগৃতির পরিণতি হিসেবে অথবা একই সঙ্গে আরো একটা নূতনতর যুগের অগ্রগামী চিন্তার অগ্রদূত হিসেবে? আমার মতে দ্বিতীয় অর্থে দেখাটাই সত্যকার দেখা। যদিও বাঙালী লেখক শিল্পীর বৃহত্তর অংশই নবজাগৃতির পূর্ণাবয়ব মূর্তি হিসেবেই রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করেন।

যে কথা এখানে প্রাসঙ্গিক সেটা হচ্ছে—সত্যজিৎ রায়কেও বাংলার নব জাগৃতির পরবর্তীকালীন ধারক হিসেবে গ্রহণ করার একটা চেষ্টা হয়, চিদানন্দ দাশগুপ্ত এদেশে, এবং বিদেশে মারী সীটন যেভাবে দেখাতে চেয়েছেন। এটা এই মুহূর্তে আমার বিচার্য নয়, আমার বিচার্য সত্যজিৎ রায় নিজে রবীন্দ্রনাথকে কি ভাবে গ্রহণ করেন বা করেছেন তাঁর নিজের সৃষ্টিতে। এটা বাংলাদেশে প্রায় সর্বজনবিদিত যে সত্যজিৎ রায়দের পরিবার প্রায় দুই পুরুষ আগে থেকেই ঠাকুর পরিবারের সাংস্কৃতিক ক্রিয়া-কর্মের সঙ্গে যুক্ত, স্বভাবতই একজন রাবীন্দ্রিক হিসেবে সত্যজিৎ রায়ের একটা বিশেষ পরিচিতি আছে—আমার বিচার্য এটি নয়, আমার বিচার্য

আসল রবীন্দ্রনাথ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে না হয়নি সত্যজিতের রবীন্দ্র সাহিত্য ভিত্তিক ছবিতে।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে যখন বাংলার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষ মাত্রই উদ্বেলিত তখন খুব স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের কাছে একটি সুযোগ এল, কেননা সত্যজিৎ রায় তখনই এই মহান ঘটনাকে স্মরণ করে প্রথম ছবি করলেন রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোট গল্প নিয়ে—যে ছোট গল্প রবীন্দ্র প্রতিভার একটি শ্রেষ্ঠ কমল। আমাদের আলোচনা সেই 'তিন কন্যা' ছবিটি নিয়ে, পরে 'চারুলতা' নিয়ে।

তিন কন্যা
(১৯৬১)

রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ'-এর তিনটি গল্প 'পোস্টমাস্টার', 'মণিহারা' ও 'সমাপ্তি'—অবলম্বনে রচিত সত্যজিৎ রায়ের 'তিন কন্যা' ছবি। তিনটি গল্প ভিন্ন বক্তব্যের ও স্বাদের। কিন্তু তিনটি গল্পতেই কবি যাদের প্রতি বেশি মনোনিবেশ করেছেন তারা নারী, তাই সত্যজিৎ রায়ের ছবির নামকরণ যথার্থ। এর মধ্যে দুটি কন্যার বয়স কম। 'পোস্টমাস্টার'-এর রতন বালিকা বললেই হয়, কিন্তু তার মনস্তত্বে কবি কিশোরী মেয়ের মনের ছবি ধরেছেন, সুতরাং আকারে বালিকা হলেও প্রকৃতিতে সে কিশোরী। 'সমাপ্তি'র মৃন্ময়ী অবশ্যই কিশোরী, যদিও তার নারীত্ব প্রাপ্তিই গল্পের একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। একমাত্র 'মণিহারা'র নায়িকাকেই কবি পূর্ণবয়স্কা পরিণত নারী হিসেবে দেখিয়েছেন, অবশ্য এই নারী একটু বিশেষ ধরণের—এবং নারী মনস্তত্বের শুধু বিশেষ একটি দিক নিয়ে গল্পটি রচিত; কিন্তু গল্পটি বলার সিরিও-কমিক ভঙ্গিমা ও বর্ণনাকারীর দ্বারা নারীমনস্তত্বের বিভিন্ন দিকগুলির ওপর রসাত্মক মন্তব্যগুলি গল্পটিকে অসামান্য করে তুলেছে।

তিনটি ছবির আলোচনা আলাদা আলাদাভাবে করা বাঞ্ছনীয়, কেননা মূলতঃ এগুলি তিনটি ভিন্ন ছবি—যদিও একটি কেন্দ্রীয় ভাবনার ঐক্যসূত্রে বিধৃত, যাকে বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের নারী সম্পর্কে ভাবনা। তিনটি সংক্ষিপ্ত গল্প নিয়ে এই ছবিটি যেন একটি খুদে 'চিত্রত্রয়ী' বা মিনিট্রিলজি—অবশ্যই ভাবনামূলক ট্রিলজি।

'তিন কন্যা' সম্পর্কে আর একটি নূতন তথ্য স্মর্তব্য, তা হচ্ছে এই ছবি থেকেই সত্যজিৎ রায় নিজেই তাঁর ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করে আসছেন। অর্থাৎ 'তিন কন্যা'তেই তাঁকে প্রথম একজন সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে পেলাম।

পোস্টমাস্টার

'পোস্টমাস্টার' গল্পের বিষয়বস্তু : কলকাতার একজন মধ্যবিত্ত 'বাবু' শ্রেণীর যুবক একটি অজ পাড়াগাঁয়ে পোস্টমাস্টারের চাকরি নিয়ে গেলে গ্রাম্য নির্জন পরিবেশের মধ্যে পড়ে, এবং সেই নিঃসঙ্গ পল্লী নির্জনতার মধ্যে একটি অনাথ কিশোরীর (যে মেয়েটি পোস্টমাস্টারবাবুর ঝি-এর কাজ করত) সঙ্গে অলক্ষ্য একটি মানবিক সম্পর্ক রচিত হয়, যে-সম্পর্ক যুবকটির দিক থেকে অবিমিশ্র স্নেহের সম্পর্ক, অথচ যা কিশোরীর দিক থেকে 'নারী হৃদয়ের রহস্য' সূত্রে জটিল। দুঃসহ নির্জনতা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, রোগভোগ ইত্যাদির পর শহুরে কলকাতার বাবু অনিবার্য নিয়মে গ্রাম ছেড়ে, চাকরি ছেড়ে আবার কলকাতায় ফিরে আসার সময় অজ্ঞাতসারে ছিন্ন করে দেয় অনাথ সর্বহারা কিশোরীর একমাত্র স্নেহের অবলম্বন ও জটিল রহস্যময় নারী অনুভূতির জগৎ। এবং একেবারে বিচ্ছেদের মুহূর্তে কিশোরীর হৃদয়ের বেদনা ও যন্ত্রণার মানবিক রূপটি প্রথম ধরা পড়ে পোস্টমাস্টার বাবুর কাছে। স্রোতোচ্ছল নদীবক্ষে নৌকো করে যেতে যেতে মধ্যবিত্ত পোস্টমাস্টার একবার ভাবে ফিরে গিয়ে এই অনাশ্রিত অনাথ গরীব মেয়েটিকে নিয়ে যায় কলকাতায় তাদের বাড়ীর একজন আশ্রিতা হিসেবে—কিন্তু যথারীতি মধ্যবিত্তসুলভ পলায়নবাদী দার্শনিকতায় তার ক্ষণিক মানবিকতাবোধ চাপা দিয়ে যেমন আসছিল তেমনি চলে আসে। গল্পের শেষ অসাধারণ ছত্রটিতে অভ্রান্তভাবে দেখান হয় বাবুটির মধ্যবিত্তসুলভ পলায়নপর স্বার্থপরতার বিপরীতে কিশোরীটির সর্বহারা-সুলভ মাটি ঘেঁসা রূঢ় বাস্তবতা, অথচ প্রায় অসম্ভব এক আশা নিয়ে বেঁচে থাকার নিগূঢ় যন্ত্রণা, নারী মনস্তত্বের রহস্যে যা আরো বিচিত্র ও জটিল। বলাবাহুল্যমাত্র মূল গল্পের শেষ দুটি ছত্রেই গল্পের প্রাণবস্তুটি ধরা পড়েছে অমোঘভাবে, যার শিল্পকৃতির কোন তুলনা নেই। গল্পটি নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের মানবচরিত্র নিরীক্ষণের তথা শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণের এবং একটি কিশোরমেয়ের মধ্যে নারীচরিত্রের রহস্যের আলোছায়ার চিত্রণে—তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির অন্যতম।

মূল গল্পের এই বিষয়বস্তু যে বর্ণনা দেওয়া হ'ল তার সঙ্গে ছবির বিষয়বস্তুর অনেকটা মিল হয়না। হয়না বলেই একটি প্রশ্ন দেখা দেয় ছবিটি গল্পের মূল প্রাণবস্তুটি ধরতে পেরেছে না পারেনি।

এখানে একটি তর্ক উঠতে পারে, যে তর্ক সব সাহিত্য-ভিত্তিক ছবির ক্ষেত্রেই অল্প বিস্তর উঠে থাকে। শুধু এই ছবির ক্ষেত্রেই নয়, সাধারণ ভাবেই প্রশ্নটি আলোচিত হওয়া উচিত। প্রশ্নটি হচ্ছে, কোন সাহিত্য-ভিত্তিক ছবিকে তার মূল গল্প বা উপন্যাসের প্রসঙ্গে বিচার করাটা আদৌ প্রয়োজনীয় কি না? সাহিত্য হচ্ছে সাহিত্য, এবং চলচ্চিত্র চলচ্চিত্র—সুতরাং চলচ্চিত্র কর্মটি রচিত হবার পর তা মূল সাহিত্যটির সঙ্গে আর কোন ভাবেই তুলনীয় হতে পারেনা।—এটি আপাত দৃষ্টিতে একটি বলিষ্ঠ যুক্তি বলে মনে হতে পারে, কিন্তু শিল্প কর্ম হিসেবে যখন দেখা যায় কোন বিশেষ কারণ বা বক্তব্য না থাকা সত্ত্বেও চলচ্চিত্র রূপটি মূল সাহিত্য রূপটির অনেক গুণ, গভীরতা ও বক্তব্য বর্জন করেছে, বিনিময়ে নূতন কিছু গুণ, গভীরতা বা বক্তব্য সৃষ্টি করেনি—অর্থাৎ এক

কথায় মূল সাহিত্যের তুলনায় অনেক নিম্নমানের শিল্প হয়েছে—তখন 'ছবি ছবিই' এই যুক্তিটি কি যথেষ্ট বলিষ্ঠ বলে মনে হয়? তখন এটি তো একজন চলচ্চিত্রকারের ত্রুটির দোষস্খালনের জন্য ব্যবহৃত মুখোস হতে পারে।

প্রশ্নটি হচ্ছে; সাহিত্য ভিত্তিক ছবির বিচারের ক্ষেত্রে আমাদের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী কি হওয়া উচিত? আমার মতে, এই প্রশ্নটি অনেককাল আগেই মীমাংসিত হয়ে গেছে, এবং প্রশ্নাতীত ভাবে। তর্কের ধুনো তবু যাঁরা এখনো ওড়ান, তাঁরা হয় সেই মীমাংসার সূত্রটি জানেন না, নয়তো শিল্পে স্বাধীনতার নামে নৈরাজ্যবাদ তাঁদের পছন্দ। মীমাংসার সূত্রটি দিয়ে গেছেন স্বয়ং আইজেনস্টাইন, এবং সহমত হয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর ভক্ত ও সহকর্মী ইভর মন্টেগু তাঁর 'With Eisenstein in Hollywood" গ্রন্থে। আইজেনস্টাইন ও তাঁর সহকর্মীদের কাছেও এই প্রশ্নটি উঠেছিল যখন আমেরিকায় থিয়োডর ড্রেজার-এর 'এ্যান আমেরিকান ট্রাজেডি' গ্রন্থ অবলম্বনে আইজেনস্টাইন একটি ছবি তৈরী করতে যান, এবং অনবদ্য চিত্রনাট্যটি রচনা করেন। অবশ্য ছবি নির্মিত হয়না, হলিউডের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে তিনি ব্যর্থ হন। প্রযোজকরা চেয়েছিলেন মূল উপন্যাসের মূল বক্তব্যের কিছু পরিবর্তন। লেখক থিয়োডর ড্রেজার তাঁর উপন্যাসে মার্কিন পুঁজিবাদের যে সূক্ষ্ম কিন্তু নির্মম বিশ্লেষণ করেছিলেন, তা স্বভাবতই হলিউডের প্রযোজকদের পক্ষে রুচিকর ছিলনা। আইজেনস্টাইন এই পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না। যদিও এই বিশেষ গ্রন্থটির ক্ষেত্রে এই মূলানুগতার প্রশ্নটির বিতর্কটি ছিল একটি 'বিশেষ ঘটনা', সংঘাত অনিবার্য ছিল মার্কসবাদী আইজেনস্টাইন ও পুঁজিবাদী হলিউড প্রযোজকদের মধ্যে। কিন্তু চলচ্চিত্রতত্ত্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক আইজেনস্টাইনের ক্ষেত্রে যা সর্বদা হয়েছে, এখানেও এই 'বিশেষ বিতর্কের' বিশেষ প্রশ্নটি বা 'ইস্যু'টি নিয়ে ভাবনার ফলে সাহিত্যভিত্তিক চলচ্চিত্রের মূলানুগতার প্রশ্নের সমাধানের একটি সাধারণ শৈল্পিক সূত্র আইজেনস্টাইন দেন, যা তাঁর তৎকালীন সহযোগী ইভর মন্টেগু তাঁর নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সেটি হচ্ছে এই :—

"A **minor** work has no claim to act as more than a spring-board when adapted for another medium, but a **major** deserves that any approach is made with respect for its essence...**The scenario must express the quintessence of the book**. It must emerge as clearly as possible, an honour to the original, to our process of transportation and to cinematic art" (ইভর মন্টেগু লিখিত 'উইথ আইজেনস্টাইন ইন হলিউড' গ্রন্থের পৃষ্ঠা ১১৫-১৬, পূর্ব জার্মানীর সেভেন সীস্ প্রকাশনা সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত)। বিশেষ চিহ্নিত করণ বর্তমান লেখকের)

অর্থাৎ আইজেনস্টাইন ও তাঁর সহযোগীদের মতে সাহিত্য ভিত্তিক ছবিকে দুটো ভাগে ভাগ করে বিচার করা উচিত—'মাইনর' বা সাধারণ সাহিত্য কর্মের ওপর রচিত ছবি, এবং 'মেজর' বা মহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য-কর্মের ওপর রচিত ছবি। প্রথমটির ক্ষেত্রে উক্ত 'মাইনর' সাহিত্য কর্মটিকে চলচ্চিত্র রূপায়ণের জন্য ব্যবহৃত একটি ধাপ মাত্র ভাবলেই যথেষ্ট, তার চেয়ে বেশি মূল্য দেবার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু **যেখানে কোন চলচ্চিত্র রচিত হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বা মহৎ সাহিত্য কর্মের ওপর ভিত্তি করে যেখানে মূল সাহিত্য কর্মের মূল তাৎপর্যটি ক্ষুণ্ণ করার অধিকার কারুর নেই**। এবং এটি এমনভাবে করা উচিত যেন ছবিটির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—(১) মূল সাহিত্য কর্ম-টির প্রতি শ্রদ্ধা, (২) যে পদ্ধতিতে একটি শিল্প মাধ্যম থেকে অন্য শিল্প মাধ্যমে বক্তব্যটি স্থানান্তরিত হচ্ছে—সেই পদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধা, এবং (৩) চলচ্চিত্রের শৈল্পিক দিকটির প্রতি শ্রদ্ধা।

আমার মনে হয় এর থেকে যে বক্তব্যটি স্পষ্ট প্রতীয়মান সেটি হচ্ছে : যদি পরিবর্তন জরুরি হয়ে পড়ে তবে তা বিশেষ কারণেই করা উচিত, এবং সে কারণ হতে পারে দুটি—এক, নূতন যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গীতে মূলের তাৎপর্যটি আরো বিশদভাবে নূতন চিন্তার আলোকে ব্যাখ্যা করার জন্য, যেমন 'ম্যাকবেথ' অবলম্বনে কুরোশোয়ার রচিত ছবি 'থ্রোন অব ব্লাড'—অথবা কোজিনৎসভের 'ডন কুইকসোট' ছবি। দুই, মূল সাহিত্য-কর্মের কিছু নিকৃষ্ট অংশকে বর্জন বা পরিবর্তন করে মূলের উৎকৃষ্ট অংশের তাৎপর্যকে নূতনতর গভীরতায় মণ্ডিত করে মূলের চেয়েও উৎকৃষ্টতর চলচ্চিত্র সৃষ্টির জন্য, যেমন পরিবর্তনের ফলে সত্যজিৎ রায়ের 'অপরাজিত' মূলের চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট শিল্প সৃষ্টি হয়েছিল।

যেহেতু সাহিত্যভিত্তিক ছবিই এখন পর্যন্ত এদেশে বেশি রচিত হয় এবং যেহেতু সাহিত্য ও চলচ্চিত্র দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন শিল্প মাধ্যম বলে মূলানুগতার প্রশ্নটিকে একেবারে উড়িয়ে দেবার যথেচ্ছাচারী প্রবৃত্তি মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তাই ওপরের আলোচনাটি বিশদভাবে করা হল। আশা করি, এই নিয়ে সব অনর্থক তর্কের ওপর যবনিকাপাত যে ঘটা উচিত, আইজেনস্টাইন তার পূর্ণ সমাধান করে গেছেন—এবিষয়ে কারুর কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। অবশ্য কোন সাহিত্যকর্ম—'মেজর' না 'মাইনর', নূতন আলোকপাত সত্যিই পরিবর্তনের ফলে ঘটেছে না ঘটেনি—এ সব তর্ক ছবি বিশেষকে নিয়ে সর্বদাই থাকবে। কিন্তু তর্কের সাধারণ সমাধানটিও একটি বড় রকম পদক্ষেপ, চলচ্চিত্র তত্ত্বের প্রগতির দিক থেকে, একথা অনস্বীকার্য।

অবশ্যই প্রমোদ ব্যবসায়ী সুযোগ সন্ধানীরা কোন দিনই যুক্তি মেনে নেয়না, তার প্রমাণ, আইজেনস্টাইনকে হলিউড খালি হাতে বিদায় দেবার বেশ কিছুকাল পরে, ওই একই উপন্যাস অবলম্বনে মূল প্রাণবস্তুকে বিসর্জন

নিয়ে একটি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী রহস্য রোমাঞ্চের ছবি তৈরী হয় 'এ প্লেস ইন দ্য সান'—পরিচালক হলিউডের জর্জ স্টিভেন্স, প্রধান নায়িকা এলিজাবেথ টেলর। উপন্যাসের মূল বক্তব্যকে পরিহার করা হয় বলে লেখক থিওডর ড্রেজার প্রবল প্রতিবাদ করেন, এবং এই ছবির সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত করতে নিষেধ করে দেন। কিন্তু তাতে কিছু হয় না, ছবিটি দেশে দেশে লক্ষ লক্ষ ডলার মুনাফা অর্জন করে। অর্থাৎ যে ছবি হবার ছিল সমাজ সচেতনতার ছবি, সে ছবি হয়ে উঠেছিল শুধু প্রমোদ এবং তখনো হলিউডের প্রভুদের যুক্তি ছিল 'সিনেমা হচ্ছে সিনেমা ও সাহিত্য সাহিত্য—সুতরাং ছবি মূল গ্রন্থের তাৎপর্যকে রাখবে কি রাখবেনা সেটা কোন বিচার্য বস্তুই নয়'। এই অসৎ উদ্দেশ্যপূর্ণ সর্বনাশা যুক্তির ফল কি হতে পারে এই ঘটনাটি তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ।

রবীন্দ্রনাথের মত মহৎ সাহিত্যিকের রচনা অবলম্বনে রচিত ছবির ক্ষেত্রে আইজেনস্টাইনের সূত্র আমাদের সর্বদা খেয়াল রাখা দরকার। এবং 'চারুলতা' প্রসঙ্গে লিখিত আলোচনায় সত্যজিৎ রায় নিজেও তাঁর নিজস্ব যে মত প্রকাশ করেছেন তাও আইজেনস্টাইনের সূত্রের কাছাকাছি। তিনি লিখেছেন যে চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে গেলে মূল কাহিনীর যে পরিবর্তন করা হয়, তা বিশেষ অনিবার্য প্রয়োজনেই হয়, "খামখেয়াল বশতঃ নয়, বা পরের কাহিনীর ভিত্তিতে ছবি তৈরী করে মৌলিক রচনার বাহবা নেবার জন্য নয়।" (বিষয় চলচ্চিত্র, পৃষ্ঠা ৫৮)

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে 'পোস্টমাস্টার' ছবির বিশ্লেষণে এলে তবেই আমরা দেখতে পাব (১) মূল গল্পের বক্তব্যটিই ছবিতে ফুটে উঠেছে কি ওঠেনি এবং (২) অন্তিম মূহুর্তের মানবিক বেদনার সুরটি খণ্ডিত হয়ে গেছে কি যায়নি।

আগে দ্বিতীয়োক্ত বিষয়টি আলোচিত হোক। রতনের সঙ্গে পোস্টমাস্টারের বিচ্ছেদের মূহুর্তটি নারী হৃদয়ের রহস্যে জটিল, অথচ এমন একটি মেয়ের যে এখনো পূর্ণ নারীত্ব অর্জন করেনি, যদি হ'ত তাহলে এটিকে সরলই বলা যেতে পারত। ব্যাপারটি আরো জটিল হয়ে উঠেছে চলচ্চিত্র মাধ্যমের চরিত্রের জন্য। মূল গল্পে রতনের বয়সের উল্লেখ আছে—'বয়স বারো-তেরো'। এবং তার মনের যে ছবিটি রবীন্দ্রনাথের অভ্রান্ত কলমে ফুটে উঠেছে তার মধ্যে একটি কিশোরীর মূর্তি পাই, যার মধ্যে নারীত্বের প্রাথমিক আভাষ দেখা দিয়েছে। তখনকার কালে গ্রাম্য প্রথা অনুযায়ী যার বিয়ে হয়ে যাওয়ার কথা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "মেয়েটির নাম রতন। বয়স বারো-তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।" কিন্তু ছবিতে যে মেয়েটিকে চাক্ষুষ দেখি তাকে দেখে বালিকা ছাড়া অন্য কিছু বলে মনে হয়না। রবীন্দ্রনাথের কল্পিত রতনকে যদি রবীন্দ্রনাথ চাক্ষুষ দেখতে পারতেন তাহলে তাকেও হয় আমাদের এ-যুগের চোখে বালিকাই লাগত, কিন্তু সাহিত্যের মাধ্যমগত সুবিধে (এবং অন্যভাবে অসুবিধেও) এই যে সাহিত্যে কল্পিত চরিত্রের মনের ছবিটি যতটা স্পষ্ট ভাবে ফুটে ওঠে, তার শরীরের ছবিটি সবসময়ে ততটা সৃষ্টি হয় না। চরিত্রের প্রকৃতিটা যতটা স্পষ্ট শরীরের আকৃতিটা ততটা নয়। এখানে আকৃতিটা পাঠকের নিজের কল্পনা শক্তির ব্যবহারের দ্বারা নিজের মনে গড়ে নেওয়ার অবকাশ থাকে, অন্ততঃ কিছুটা। ছবিতে তা অসম্ভব, সেখানে চলচ্চিত্রকারের কল্পনাই দর্শকের কল্পনা। সুতরাং এখানে সাহিত্যের চরিত্রকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করার ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রকারের বেশ কিছু অসুবিধে ঘটতে পারে। রতনকে বারো বছরের মেয়ে হিসেবে দেখালে, তার মধ্যে যে 'নারী হৃদয়ের রহস্যে'র কথাটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন তা বিশ্বাসযোগ্যভাবে ফুটিয়ে তোলার বেশ অসুবিধে হয়। কোন চোদ্দ বা পনেরো বছরের মেয়েকে রতন হিসেবে দেখালে হয়না। 'সমাপ্তি'র মৃণ্ময়ীর ভূমিকায় অপর্ণাকে কিশোরী হিসেবে ঠিকই মানিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রতনের ভূমিকায় চন্দনা বন্দোপাধ্যায়কে 'কিশোরী' হিসেবে মানায়না, তাকে মনে হয় বালিকা। হয়ত বাহ্যতঃ তার সঙ্গে মূল গল্পের রতনের খুবই মিল আছে, কিন্তু গল্পের চরিত্রটির জটিল নারী রহস্যের ব্যাপারটি প্রকাশ করার প্রসঙ্গ যখন আসে তখন দেখা দেয় চন্দনা উপযুক্ত "টাইপেজ" হয়ে উঠছেনা। 'টাইপেজ'-এর ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত সত্যজিৎ রায়ের পক্ষে জ্ঞানতঃ এই ভুল হওয়াটা বিস্ময়কর, সুতরাং মনে হওয়া স্বাভাবিক যে রতনের 'নারী হৃদয়ের রহস্য'-এর ব্যাপারটাই হয় সত্যজিৎ রায়ের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, নয় এটিকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাননি। তিনি পোস্টমাস্টার ও রতনের সম্পর্কটি একটি মানবিক স্বাভাবিক স্নেহের ও প্রীতির সম্পর্কে হিসেবেই দেখেছেন আর তা যদি না হয়, তাহলে রতনের ভূমিকায় চন্দনার নির্বাচন অবশ্য ভুল নির্বাচন, অথবা এক্ষেত্রে আর যা যা করণীয় ছিল যাতে উক্ত 'নারী হৃদয়ের রহস্য'টি উন্মোচিত হয় তা ঠিক মত করেন নি। যেভাবেই হোক না কেন, এতে ছবিটি মূল গল্পের একটি প্রধান তাৎপর্যের দিক থেকে দরিদ্র হয়ে গেছে। এতে অন্তিম সিকোয়েন্সটি মূল গল্পের তুলনায় কি ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা লক্ষ্যণীয়।

মূল গল্পে এই বিচ্ছেদের মূহুর্তটি 'নারী হৃদয়ের রহস্যে জটিল' এবং রবীন্দ্রনাথই সে সময়ের রতনের আচরণের 'অস্বাভাবিকতার' বর্ণনায় লিখেছেন, ..."**কিন্তু নারী হৃদয় কে বুঝিবে** "। এই নারী হৃদয় রহস্যটি বোঝানোর জন্য রতনের দুটি 'বিচিত্র' আচরণ ও সংলাপ রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন। প্রথমটি, যখন পোস্টমাস্টার বিদায়ের প্রাক্কালে বলল, "রতন আমার জায়গায় যে লোকটি আসবেন তাঁকে বলে দিয়ে যাব তিনি তোকে আমারি মতন যত্ন করবেন, আমি যাচ্ছি বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে না", তখনকার রতনের আচরণ। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, এই কথাগুলি যে অত্যন্ত স্নেহগর্ভ এবং দয়ার্দ্র হৃদয় হইতে উত্থিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, **কিন্তু নারী হৃদয় কে বুঝিবে**।......(রতন)

একেবারে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "না, না, তোমার কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি থাকতে চাই না।" অর্থাৎ এটি হচ্ছে রতনের অসহায় প্রতিবাদ, পোস্টমাস্টার যে রতনের হৃদয়টির কোন খবর নেয়নি, এবং তাকে এক গচ্ছিত সম্পত্তির মতই আর এক বদলি বাবুর হাতে হাত বদলি বা গচ্ছিত করে যাচ্ছে, এই অবমাননার বিরুদ্ধে দুঃখের অসহায় নারীসুলভ প্রতিবাদ। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, যখন ঠিক বিদায়ের মুহূর্তে পোস্টমাস্টার কিছু টাকা রতনকে দিতে গেল, 'তখন রতন ধুলায় পড়িয়া তাহার পা জড়াইয়া কহিল, "দাদাবাবু তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে কিছু দিতে হবে না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমার জন্য কাউকে কিছু ভাবতে হবে না"—বলিয়া এক দৌড়ে সেখান হইতে পলাইয়া গেল।'

ছবিটিতে এদুটিই পাল্টে ফেলা হয়েছে। ছবিতে দেখান হয় পোস্ট মাস্টার রতনকে টাকা দেয়, রতন তা না নিয়ে সেইখানেই রেখে দেয়। পরে বিদায় মুহূর্তে পোস্টমাস্টার রতনের এই প্রত্যাখ্যাত টাকাটা দেখতে পায়, এবং রতনের এই টাকাটা প্রত্যাখ্যানের পিছনে যে কি পরিমাণ অভিমান আছে তা বুঝতে পারে, রতনের জন্য তার কষ্ট হয় ও চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। হঠাৎ সে শুনতে পায় বাইরে রতনের কণ্ঠস্বর : "নতুন বাবু জল এনেছি।" এটি একটি মর্মান্তিক বাক্য, রতন যেন বুঝিয়ে দেয় সব শাস্তি সে মাথা পেতে মেনে নিচ্ছে, কদিন সে এক নতুন বাবুর কাছে স্নেহ পেয়ে 'মানবকন্যা' হয়ে উঠেছিল. যাবার সময় নতুন বাবু তাকে বুঝিয়ে দিল সে আসলে ঝি পরিচারিকা মাত্র, তাই সে মেনে নিচ্ছে। এটি বেদনার তীব্রতায় ধাক্কা দেয় পোস্টমাস্টারের বুকে। ঠোঁট চেপে অশ্রুরুদ্ধ চোখে পোস্টমাস্টার এগিয়ে চলে। আমরা দেখি অদূরে রতন বালতি নামিয়ে অশ্রুসজল নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে আছে। অদূরে বসে আছে বিশে পাগলা. যাকে আগে সর্বদাই হঠাৎ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠতে দেখেছি—এবারেও প্রতিমুহূর্তে শঙ্কিত হই কখন সে চীৎকার করে উঠবে এই আশংকায় শেষ মুহূর্তের ট্রাজিক অনুভূতিটিও ঘনিষ্ঠ হতে পারে না। বিশে পাগলাও এবার কিন্তু চীৎকার করে ওঠে না. বোধ হয় সেও মানবিক ট্রাজেডিটি উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু তার অনর্থক উপস্থিতি-টাই আমাদের সেই অন্তিম করুণ মুহূর্তটিকে অনুভবে বিঘ্ন ঘটায়। (বস্তুতঃ এমন একটি অনর্থক চরিত্র সৃষ্টি কেন যে সত্যজিৎ রায় করলেন তা আজো আমার কাছে রহস্য—গল্পেও এই চরিত্র নেই, ছবিতেও তাকে সৃষ্টি করে যতটুকু কাজ হয়েছে তার চেয়ে অকাজ হয়েছে বেশি।)

রতনের শেষ নির্নিমেষ চাহনি—তার দুটি চোখের ভাষা অবশ্যই মানবিকতায় গভীর। এ নিয়ে পশ্চিমী আলোচকরা পঞ্চমুখ কিন্তু তারা তো রবীন্দ্রনাথ পড়েননি, প্রশ্ন হচ্ছে এর মধ্যে রতনের নারী চরিত্রের রহস্য ধরা পড়ে কি? আমার মনে হয় পড়ে না, তার বালিকা আকৃতিই একটা বাধা, তা ছাড়া শুধু চোখের ভাষা দিয়ে ব্যাপারটা বোঝান যায় নি। এখানে চোখের ভাষা মানবিকতায় গভীর, কিন্তু এতে তার জটিল নারী হৃদয়ের রহস্যের ছায়া পড়েনি, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'নারী হৃদয় কে বুঝিবে'—এর কোন ছায়াপাতই ঘটেনি।

মূল গল্পে এর পরই আছে নদীর একটি অসামান্য ব্যবহার, যা এই বিচ্ছেদের করুণ রসের চিত্র প্রতিমার মতই, যেন চলচ্চিত্র ভাষার একটি সাহিত্যিক রূপ—"বর্ষা বিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মত চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল।" মানবিক বেদনার চলচ্ছবি দেখানর জন্য এই ভাবেই নদীর স্রোতরাশির ছবির 'মন্তাজ' চলচ্চিত্রে রচিত হয়। যিনি সমগ্র 'অপু চিত্রত্রয়ী'তে জলের এমন অসামান্য চিত্রকল্পগুলি দিয়ে গেলেন, তিনি মূল গল্পে চলচ্চিত্র ভাষায় এমন সূত্র থাকা সত্বেও কেন নদীকে পরিহার করলেন তা আমি বুঝতে পারিনি, এবং তাতে ছবিটি যে দরিদ্র হয়েছে সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। শুধু নদীর চিত্র প্রতিমাটি নয়, একটু পরে একটি শ্মশানের উল্লেখ আছে—নদী তীরবর্তী শ্মশান—সেটিও যেন অসাধারণ সিনেমাটিক প্রয়োগ—ছবিতে এসমস্তই বাদ।

'পোস্টমাস্টার' ছবির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগটি আরো গুরুতর, এইখানেই ছবিটি মূল গল্পের প্রাণসত্তাটি ধরতে পারেনি বলে আমার ধারণা।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "বর্ষা বিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মত চারিদিকে ছলছল করতে লাগিল। পোস্টমাস্টার তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন—একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল 'ফিরিয়া যাই জগতে ক্রোড় বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি।' কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীতীরে শ্মশান দেখা দিয়াছে—এবং নদী প্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল; জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।"

গল্পের এই ছত্রটি এবং পরের ছত্রটি মণিগর্ভ। গভীর বেদনা অনুভব হয়, যখন দেখি সত্যজিৎ রায় এই দুটি ছত্রের বক্তব্যটি একবারও অনুধাবন করলেন না। 'নদীবক্ষে ভাসমান পথিক' সেই পোস্টমাস্টারের মনস্তত্ত্বটি চমৎকার ভাবে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন। ইতিপূর্বে প্রথমদিকে পোস্টমাস্টার সম্পর্কে তাঁর উক্তিগুলির মধ্যে একটু স্নেহমিশ্রিত হলেও, শ্লেষ ছিল, যেমন সে যে 'বাবু' শ্রেণীর, সে যে 'কলকাতার বাবু' গ্রামের লোক যে তার সঙ্গে 'মিশবার উপযুক্ত নয়', গ্রামে তার অবস্থাটা যে 'জল হইতে তোলা ডাঙার মাছের মত'—এই সব ছোট ছোট উক্তির মধ্যে পোস্টমাস্টারের শহুরে শ্রেণীচরিত্রটি রবীন্দ্রনাথ কোথাও অস্পষ্ট রাখেননি

এবং একথাও অস্পষ্ট রাখেন নি যে ব্যক্তি মানুষ হিসেবে মানুষটা স্নেহশীল ও দয়ার্দ্র। একটি বিশেষ অবস্থায় পড়লে একাধারে তার ব্যক্তিস্বরূপের দয়া ও মমতাবোধ, অন্যদিকে শহুরে মধ্যবিত্তের দায়িত্ব-এড়ান স্বার্থমুখী পলায়নপরতা—এ দুটির দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়ই এবং তারই একটি চেহারা উক্ত ছত্রে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ ভাষায় প্রকাশ করে গেছেন, এবং তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম স্নেহটুকু তুলনাহীন। পোস্টমাস্টার একবার ভাবল 'যাই জগতে ক্রোড়বিচ্যুত অনাথিনীকে সঙ্গে নিয়ে আসি।' কিন্তু তার আজন্মলালিত মধ্যবিত্তসুলভ এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই হচ্ছে বিরুদ্ধগতির বিরুদ্ধাচরণ না করার, সে ক্ষমতা তার নেই, সুতরাং পালে যখন ততক্ষণে 'বাতাস পাইয়াছে', নদীর স্রোত 'খরতর বেগে বহিতেছে'—তখন ফিরে যাই ভাবলেও নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে ফিরবার ইচ্ছা ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু এটুকুই তার মনস্তত্ত্বের সব কথা নয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসামান্য শ্লেষ ও নিপুণ বিশ্লেষণী কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন—বাক্যের শেষাংশে—শুধু পালে বাতাস লেগেছে, নদী খরতর বেগে বয়ে যাচ্ছেই নয়—"গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীতীরে শ্মশান দেখা দিয়াছে"—শ্মশানের চিত্রকল্পটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এবং তখনি পোস্টমাস্টারের মধ্যবিত্ত মন নিজের স্বার্থপর পলায়নপরতাকে একটি সহজ দার্শনিকতার দ্বারা স্বচ্ছন্দে চাপা দিয়ে বিবেকের দংশনে শীতল করল। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন "গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীতীরে শ্মশান দেখা দিয়াছে—এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার?" এতো সেই মোহমুদ্গরের বাণী—কস্তে পুত্র? কা তব কান্তা? এই পোড়া দেশে আদর্শ পলায়নবাদী দার্শনিকতার যে মজুত ভাণ্ডারটি আছে সেই বৈদান্তিক মায়াবাদের (শ্মশানের উল্লেখ সেই জন্যেই) আড়ালে আমাদের পোস্টমাস্টার বাবু বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করল।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অন্তর্ভেদী দৃষ্টির, শ্লেষ ও মানবিকতার চরম পরিচয় এর পরের অর্থাৎ গল্পের শেষ লাইন কটিতে। রবীন্দ্রনাথ পোস্টমাস্টারের মনে 'তত্ত্বের উদয় হইল' একথা জানিয়ে পরের ছত্রে লিখছেন, "কিন্তু রতনের মনে কোন তত্ত্বের উদয় হইল না।.. সে সেই পোস্টঅফিস গৃহের চারিদিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে…"

অর্থাৎ 'বাবুদের' পালাবার ক্ষমতাও আছে, উপায়ও আছে, এবং মানবতাবোধে জাগলে তার জন্য ভাববাদী তত্ত্বও আছে, কিন্তু রতনদের কোন পালাবার স্থান নেই, তাদের মনে কোন 'তত্ত্বের' উদয় হয় না—চারিদিকে জন্ম থেকে মার খেতে খেতে, দারিদ্র্যের মার, অর্ধাশন অনশনের মার, রোগ শোকের মার—এবং কখনো কখনো রতনের মত 'ভালবাসার' মার খেতে খেতে তাদের মস্তিষ্কে কোন তত্ত্বের উদয় হতে পারেনা। তাদের কাছে কোন ভাববাদী তত্ত্বের কোন অবকাশ নেই, তারা রূঢ়-বাস্তবের মধ্যে মানুষ, তাদের চারিদিকে জলন্ত বাস্তবতা, মূলতঃ বস্তু-তান্ত্রিক, এবং অজস্র ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও আশাবাদী—সর্বহারা শ্রেণীচরিত্রের এই মানসিকতাটুকু পোস্টমাস্টারের মধ্যবিত্ত মানসিকতার বৈপরীত্যে কী অসামান্য ইঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে দিয়েছেন তাঁর এই অমর ছোট গল্পটিতে।

বলা বাহুল্যমাত্র, সত্যজিৎ রায় মূল গল্পটির এই গূঢ় কিন্তু অভ্রান্ত বক্তব্যটি—দুটি শ্রেণীচেতনার বৈপরীত্য) ও সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বটি—তাঁর ছবিতে ধরতে পারেন নি। এটাই ছবির সবচেয়ে বড় দারিদ্র। তা না হলে ছবিটিতে রবীন্দ্রনাথের পোস্টমাস্টার, রতন, তার গ্রাম যেন জীবন্ত ধরা পড়েছিল—এমন অনবদ্য বহিরঙ্গের চিত্রণ তুলনাহীন, কিন্তু গল্পের essense বা সারবত্তা তো শুধু বহিরঙ্গে নয়, তার মূল বিষয়ে—এটাও স্মর্তব্য।

(চলবে)

গণদেবতা

চিত্রনাট্য : রাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দৃশ্য—২৬৮

স্থান—দেবু পণ্ডিতের বাড়ীর উঠোন ও বারান্দা।

সময়—দিন।

সতীশ, তারিনী ও একদল বাউরি উঠোনে বসে। সতীশ হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে তাকায়।

সতীশ : এই যে !…সেই কখন থেকে বসে আছি তোমার লেগে !

দেবু : কেন রে ?

সতীশ : আজ সনজেবেলায়…বুড়ো শিবতলায়…ঘেঁটুর আসর। আমাদের তারিনী গান বেঁধেছে গো—জব্বর গান !

বিলু : (বারান্দা থেকে) এবার কি নিয়ে,—সতীশ দাদা ?

সতীশ : হেঁ হেঁ এখন বুলব ক্যানে ?…আগে সন্‌জে হোক—তোমরা সবাই এসো,—আসরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে…ফুলের মালা গলায় পইরে…ঢোলের ওপর যখন কাঠির চাঁটিটি পড়বে—

তাক্‌ধিনা ধিন্ তাক্‌ধিনা ধিন্
তাক্‌ধিনা ধিন্ তাক্‌ধিনা ধিন্…

বলেই সতীশ নাচতে আরম্ভ করে। ক্যামেরা চার্জ করে তার ওপর।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৬৯

স্থান—বুড়ো বটতলায় ঘেঁটু গানের আসর।

সময়—রাত্রি।

ঢোলের ক্লোজ শট্ থেকে ক্যামেরা সরে এসে সম্পূর্ণ আসরটিকে ধরে। বাউরিরা সব আসরে বসে। দ্বারকা চৌধুরী, হরেন, জগন সবাই সেখানে উপস্থিত। যতীন বসে আছে একটি চেয়ারে। জগন এবং হরেন দেবু পণ্ডিতকে নিয়ে আরেকটি চেয়ারে বসিয়ে দেয়।

গান :—

এক ঘেঁটু তার সাত বেটা
শিব শিব রাম রাম
সাত বেটা তার সাতান্ত
শিব শিব রাম রাম
… … …
… … …
… … …

ভূমিকা শেষ হবার পর তারিনী আর তার দল আসরে গাইতে নামে।

তারিনী :

দেশে আসিল জরিপ
দেশে আসিল জরিপ
রাজা পেজা ছেলে বুড়োর বুক ঢিপ্ ঢিপ্
দেশে আসিল জরিপ

কাট্ টু।

যতীন : বাঃ !…এ যে একেবারে খবরের কাগজের রিপোর্টিং !

দেবু : তাই নিয়ম। যে বছর যা ঘটে আর কি !

যতীন : আচ্ছা !

তারিনী গান গেয়েই চলে—

… … …
… … …
কুঁচবরণ রাঙা ঠোঁট তারার মত ঘোরে
দস্ত কড়মড়ি বলে "এই উল্লুক, ওরে !"
হায় কলিতে মাটি কাটে না

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ ভিড়ের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে।

কাট্ টু।

তারিনীর গান—

… … …
…ও সে আর সইতে পারে না

কাট্ টু

দেবু : এ কি ?

যতীন : (হেসে) যে বছর যা ঘটে আর কি !

কাট্ টু।

তারিনীর গান-

…দেবু কারো ধার ধারে না

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ মনোযোগ দিয়ে গান শুনছে।

কাট্ টু।

তারিনীর গান—

… … …

…তবু ঘোষের মন টলে না

কাট্ টু।

ভিড়ের মধ্যে পদ্ম, বিলু, দুর্গা, অশ্রুসজল রাঙাদিদি। বিলুর চোখে একটু গর্বের ভাব।

কাট্ টু।

তারিনীর গান—

…দেবতা নইলে হায় এ কাজ কেউ পারে না-

কাট্ টু

অনিরুদ্ধর মুখের ওপর ক্যামেরা চার্জ করে। দেবু পণ্ডিতের সঙ্গে নিজের পার্থক্যটা সে যেন বুঝতে চেষ্টা করছে।

হঠাৎ সে জায়গা ছেড়ে চলে যায়। গানও শেষ।

সতীশ, তারিনীর দল এসে দেবু পণ্ডিতের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে।

যতীন : বাঃ ভারি সুন্দর! তুমি বেঁধেছো?

জগন : খাসা হয়েছে!…কিন্তু এটা কি হল?

তারিনী : এজ্ঞে?

জগন : ফুলের মালাটা যে আমিই দিয়েছিলাম, এটা বাদ পড়ল কি করে? …মালা আছে…গলা আছে…অথচ আমি নাই!…বাঃ! বেশতো!

সবাই হো হো করে হেসে ওঠে।

Mixes into

দৃশ্য—২৭০

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ির উঠোন ও বারান্দা।

সময়—দিন।

চোখ বাঁধা পদ্মর ওপর থেকে ক্যামেরা সরে এসে দেখায় সে উচ্চিংড়ে ও কতগুলো পাড়ার ছোট ছেলের সঙ্গে কানামাছি খেলছে।

কানামাছি ভোঁ ভোঁ

যাকে পাবি তাকে ছোঁ—

পদ্ম হঠাৎ দরজার দিকে তাকিয়ে থেমে যায়

এক হাতে কুড়ুল, আরেক হাতে দুটো নতুন বাঁশের খুঁটি নিয়ে ঢোকে অনিরুদ্ধ, থেমে দাঁড়িয়ে একবার পদ্মর দিকে তাকায় সে।

কাট্ টু।

পদ্ম অবাক।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ ভাঙাচোরা কামারশালের কাছে গিয়ে খুঁটি দুটো রাখে। ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা শাবল এনে গর্ত খুঁড়তে থাকে।

কাট্ টু।

পদ্ম এবং ছেলেরা অনিরুদ্ধকে দেখে।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ বুঝতে পারে সব চোখ এখন তার দিকে।

অনিরুদ্ধ : (এক মুহূর্ত থেমে) একটা ঝাঁটা।

কাট্ টু।

পদ্ম বারান্দা থেকে একটা ঝাঁটা এনে অনিরুদ্ধর কাছে যায়। মাটিতে রেখে দেবে কিনা ভাবে।

অনিরুদ্ধ : এখানে নয়। ভেতরটা সাফ্ কর। ফের কামারশাল বসাবো আমি।

কাট্ টু।

ক্যামেরা পদ্মর ওপর চার্জ করে। সে যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। অবাক চোখে সে স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ : (ধমকের সুরে) হাঁ করে দেখছিস কি? পারি না, না কি?…ওপারের কাবলি চৌধুরী…ট্যাকা ধার দেবে বুলেছে। এক বছরের জন্যে জমিটা বাঁধা রইল তো কি হল?…এখনো গায়ে তাগদ আছে…খাজনাটা শুধে দেব…আর কলে একটা চাকরি লেব। সন্‌ঝেবেলা বাড়ি ফিরে এখানেই টুকটাক যা হোক—দেবু ভাই আজ গাঁয়ের রাজা…সবার মাথার মণি…আর আমি…কেশব কামারের ছেল্যা…হিতু কামারের নাতি…মুখ দিয়ে যখন বলেছি বসাবো তো বসাবো।

অনিরুদ্ধর এই কথাগুলো বলার সময় পদ্ম আস্তে আস্তে কামারশালে ঢুকে পড়ে। আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

সে একটা বাঁশের খুঁটি ধরে আবেগ সামলে নেয়।

তারপর কেঁদে ফেলে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৭১

স্থান—পলাশ মহুয়ার জঙ্গল।

সময়—দিন।

মিষ্টি সুর বাজছে বাঁশিতে। থোকা থোকা ফুলে ঢাকা পলাশ গাছের ওপর দিয়ে ক্যামেরা প্যান্ করে যায়। টিল্ট ডাউন করে দেখায় দুর্গা একটা ঝুড়িতে মহুয়া ফুল কুড়োচ্ছে।

কাট্ টু।

ক্লোজ-আপ—দুর্গার হাত মহুয়া ফুল কুড়োচ্ছে। ক্যামেরা টিল্ট-আপ করে দুর্গার মুখ দেখায়। দূরে কিছু দেখে সে থমকে যায় তারপর এগিয়ে চলে।

কাট্ টু।

লং শট। যতীন একটা গাছের তলায় বসে আছে। বাঁশিটা সেই বাজাচ্ছে।

কাট্ টু।

ক্লোজ-আপ—বিস্মিত দুর্গা।

কাট্ টু।

যতীন বাঁশি বাজাচ্ছে।

কাট্ টু।

দুর্গা যতীনকে দেখে।

কাট্ টু।

যতীন বাঁশি বাজাচ্ছে।

কাট্ টু।

একটু পরেই দুর্গা আবার ফুল কুড়োতে শুরু করে।

কাট্ টু।

যতীন হঠাৎ দুর্গাকে দেখতে পায়।

যতীন আরে!…কি কুড়ুচ্ছ?

দুর্গা মৌ-ফুল।

যতীন কি ফুল?

দুর্গা মহুয়া ফুল বাবু। আমরা বলি মৌ-ফুল।

যতীন (উঠে আসতে আসতে) কি হয়…ওতে?

দুর্গা গরুকে খাওয়ালে দুধ বাড়ে, আর—

যতীন আর?

দুর্গা (লজ্জার হাসি হেসে) সে আপনার শুনে কাজ নাই।

যতীন : কেন?

দুর্গা : আমরা একরকম খাবার জিনিষ তৈরী করি তো! …কাঁচাও খাই…ভারি মিষ্টি—

যতীন : (হঠাৎ হাত পেতে) কৈ, দেখি—

দুর্গা : হেই মা!

যতীন : কি হল?

মুহূর্তের জন্য দুর্গা চমকে ওঠে। তারপর হাসিতে ফেটে পড়ে।

দুর্গা : হি হি…আপুনি বড় খ্যাপা বটে! আমার ছোঁয়া কি খেতে আছে?

যতীন কেন? নেই কেন?

দুর্গা (ম্লান হেসে) আমরা যে বায়েন!

যতীন বায়েন?

দুর্গা মুচী বাবু।

যতীন আরে ধুত্তোর মুচী!

হঠাৎ সে দুর্গাকে ছুঁয়ে ফেলে। ওর হাত থেকে কিছু মহুয়া ফুল তুলে নেয়।

দুর্গা : (বিস্মিত হয়ে) ই কি!!

যতীন : কেন?…ওসব জাত-টাত আমি মানিনে!… যে পরিষ্কার…তার ছোঁয়া খেতে কোনও দোষ নেই।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্। কয়েক মুহূর্ত যতীনের দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয় দুর্গা, তারপর বলে—

দুর্গা : আমি খুব পেস্কের নই বাবু!

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্। যতীন দুর্গাকে দেখে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্। দুর্গা।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্। যতীন। এই মুহূর্তে যতীন যেন দুর্গার আসল পরিচয়টা পেল।

কাট্ টু।

দুর্গা : এ দিগরের ভদ্দরনোকেরা…দিনমানে কক্ষণো আমাকে ছোঁয় না।…রাতে পায়ে গড় কত্তে কুনো দোষ নাই। আপনিই পেথম…দিনমানে ছুঁলেন। (যতীনের দিকে তাকিয়ে একটু এগিয়ে আসে) আমিও এট্টু ছোঁব বাবু?

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্। যতীন। সে দুর্গার মতলবটা ঠিক বুঝতে পারে না।

হঠাৎ দুর্গা এগিয়ে এসে নীচু হয়ে তাকে প্রণাম করে। তারপর

হঠাৎই যতীনকে ফেলে রেখে দ্রুত পায়ে চলে যায়। সে হতবাক।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৭২

স্থান—কাবলি চৌধুরীর দোকান।

সময়—দিন।

কাবলি চৌধুরী একগোছা টাকা আর একটা স্ট্যাম্পড্ কাগজ এগিয়ে দেয়।

কাবলি : নে, এইটায় একটা টিপছাপ দে।

অনিরুদ্ধ : (টাকাটা পকেটে রেখে) আমি সই কত্তে জানি, ...গ্যান্, কলমটা গ্যান্।

সে কলমটা দেখিয়ে দেয়।

কাবলি : (চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে) অঁ।

অনিরুদ্ধর হাতে কলমটা দিয়ে সে বলে—

কাবলি : দেখিস, কলম ভাঙিস নে!

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৭৩

স্থান—গ্রামের বাইরে কোন জায়গা, কালবৈশাখী ঝড়ের সময়।

সময়—দিন।

পাখোয়াজ বাজছে। ক্যামেরা কালো মেঘে ঢাকা আকাশের ওপর প্যান্ করে।

ক্যামেরা টিল্ট ডাউন করে দেখায় অনিরুদ্ধ দূর থেকে আসছে।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—অনিরুদ্ধ। সে আকাশের দিকে তাকায়। হাতে ধরা ক্যামেরা তাকে অনুসরণ করে।

কাট্ টু।

আকাশে মেঘের ভিড়। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে ওঠে।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ হাসে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

কালবৈশাখী ঝড়ের অনেকগুলি দৃশ্য আছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৭৪ থেকে ২৭৮ গ্রহণ করা হয়নি।

দৃশ্য—২৭৯

স্থান—দেবু পণ্ডিতের বাড়ী।

সময়—দিন, ঝড় চলছে।

দেবু পণ্ডিত টেবিলে বসে কি যেন লিখছে। বিলু ঘরে ঢুকে দেবুর হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে যায় বাইরে।

বিলু : এসো,—মজা দেখবে এসো—

দেবু : ছাড়ো...ছাড়ো...দাও আমায় দাও...

বিলু : উঃ মা গো!

কাট্ টু।

তারা জানলার কাছে আসে।

রাধা-কৃষ্ণের বাঁধানো ছবিটা ঝড়ের বাতাসে দেয়াল থেকে পড়ে যায়।

দৃশ্য—২৮০-২৮২ গ্রহণ করা হয়নি।

দৃশ্য—২৮৩

স্থান—বায়েনপাড়া।

সময়—দিন, ঝড় চলছে।

টপ্ শটে দেখা যায় বায়েনপাড়ার কুঁড়েঘরগুলোর চালা ঝড়ের বাতাসে ঝাঁকুনি খেতে খেতে একসময় উড়ে যায়।

মেয়ে পুরুষ বাচ্চারা চীৎকার করতে করতে সেই সব ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

একটা লোক ডান দিকের ফ্রেমে ঢোকে।

সামাল !...সামা-ল—!!

মেয়েরা বাচ্চা কোলে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরতে থাকে।

তুলো আর শুকনো পাতায় ভরে যায় সারা ফ্রেম।

হঠাৎ একটা উড়ে আসা চাল ক্যামেরার লেন্সের সামনেই এসে পড়ে যায়।

বৃষ্টি শুরু হয়।

প্রচণ্ড বৃষ্টিতে বাউড়ি মেয়ে পুরুষরা আশ্রয় খুঁজতে ব্যস্ত।

মিক্সেস ইন্টু।

(চলবে)

CHITRA-BIKSHAN ::

Regd. No. 13949/67 Rs 1.25 December 1979 Vol. 13 No. 3

Published by Alok Chandra Chandra from Cine Central, Calcutta, 2 Chowringhee Road, Calcutta-13. Phone : 23-7911 & Printed by him at MUDRANEE, 131B, B. B. Ganguli Street, Calcutta-12.

মাসিক চলচ্চিত্র পত্রিকা
সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র

ত্রয়োদশ বর্ষ
চতুর্থ সংখ্যা
জানুয়ারী, '৮০



চিত্রবীক্ষণ

বিষয়সূচী

সম্পাদক : অনিল সেন

প্রচ্ছদচিত্র : জোলতান ফাব্রি পরিচালিত 'হাঙ্গারিয়ান্স'
প্রচ্ছদশিল্পী : দীপক দে

শিলিগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সুনীল চক্রবর্তী
প্রযত্নে, বেবিজ স্টোর
হিলকার্ট রোড
পোঃ শিলিগুড়ি
জেলা ঃ দার্জিলিং-৭৩৪৪০১

আসানসোলে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সঞ্জীব সোম
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জি. টি. রোড ব্রাঞ্চ
পোঃ আসানসোল
জেলা ঃ বর্ধমান-৭১৩৩০১

বর্ধমানে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
শৈবাল রাউত্
টিকারহাট
পোঃ লাকুরদি
বর্ধমান

গিরিডিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এ, কে, চক্রবর্তী
নিউজ পেপার এজেন্ট
চন্দ্রপুরা
গিরিডি
বিহার

দুর্গাপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দুর্গাপুর ফিল্ম সোসাইটি
১/এ/২, তানসেন রোড
দুর্গাপুর-৭১৩২০৫

আগরতলায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অরিন্দ্রজিত ভট্টাচার্য
প্রযত্নে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
হেড অফিস বনমালিপুর
পোঃ অঃ আগরতলা ৭৯৯০০১

গৌহাটিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
বাণী প্রকাশ
পানবাজার, গৌহাটি
ও
কমল শর্মা
২৫, খারঘুলি রোড
উজান বাজার
গৌহাটি-৭৮১০০৪
এবং
পবিত্র কুমার ডেকা
আসাম ট্রিবিউন
গৌহাটি-৭৮১০০৩
ও
ভূপেন বরুয়া
প্রযত্নে, তপন বরুয়া
এল, আই, সি, আই, ডিভিসনাল অফিস
ডাটা প্রসেসিং
এস, এস, রোড
গৌহাটি-৭৮১০১৩

বাঁকুড়ায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
প্রবোধ চৌধুরী
মাস মিডিয়া সেন্টার
মাচানতলা
পোঃ ও জেলা ঃ বাঁকুড়া

জোড়হাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অ্যাপোলো বুক হাউস,
কে, বি, রোড
জোড়হাট-১

শিলচরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এম, জি, কিবরিয়া,
পুষ্পিপত্র
সদরহাট রোড
শিলচর

ডিব্রুগড়ে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সন্তোষ ব্যানার্জী,
প্রযত্নে, সুনীল ব্যানার্জী
কে, পি, রোড
ডিব্রুগড়

বালুরঘাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অন্নপূর্ণা বুক হাউস
কাছারী রোড
বালুরঘাট-৭৩৩১০১
পশ্চিম দিনাজপুর

জলপাইগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দিলীপ গাঙ্গুলী
প্রযত্নে, লোক সাহিত্য পরিষদ
ডি, বি. সি. রোড,
জলপাইগুড়ি

বোম্বাইতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সার্কল বুক স্টল
জয়েন্দ্র মহল
দাদার টি. টি.
(ব্রডওয়ে সিনেমার বিপরীত দিকে)
বোম্বাই-৪০০০০৪

মেদিনীপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটি
পোঃ ও জেলা ঃ মেদিনীপুর
৭২১১০১

নাগপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
ধূর্জটি গাঙ্গুলী
ছোটি ধানটুলি
নাগপুর-৪৪০০১২

এজেন্সি ঃ
* কমপক্ষে দশ কপি নিতে হবে।
* পঁচিশ পার্সেন্ট কমিশন দেওয়া হবে।
* পত্রিকা ভিঃ পিঃতে পাঠানো হবে, সে বাবদ দশ টাকা জমা (এজেন্সি ডিপোজিট) রাখতে হবে।
* উপযুক্ত কারণ ছাড়া ভিঃ পিঃ ফেরত এলে এজেন্সি বাতিল করা হবে এবং এজেন্সি ডিপোজিটও বাতিল হবে।

নতুন ফিল্ম সোসাইটিগুলি ফেডারেশনের সদস্যপদ পাচ্ছেনা কেন ?

বেশ কিছুদিন ধরে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন মফঃস্বল অঞ্চলে বেশ কিছু ফিল্ম সোসাইটি কাজ করে চলেছেন যথেষ্ট উদ্যম নিয়ে, আশাপ্রদ প্রত্যয়ের সঙ্গে। কলকাতা শহরেও ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনে সক্রিয় শরিক হিসেবে এগিয়ে এসেছেন নতুন একটি সংস্থা। বিভিন্ন জেলা শহর ও সাব ডিভিসনাল টাউনে নতুন নতুন ফিল্ম সোসাইটি যথেষ্ট কর্মচঞ্চল হয়ে উঠছে।

নতুন উৎসাহ, নবীন প্রাণচাঞ্চল্য পশ্চিমবাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ফিল্ম সোসাইটি কার্যক্রমকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে, চলচ্চিত্র মনস্কতা এক নতুন সম্ভাবনাকে আসন্ন করে তুলছে। কাজেই এখন প্রয়োজন এই আন্দোলনকে সুসংবদ্ধ চেহারায় সংগঠিত করা। এবং এব্যাপারে ফিল্ম সোসাইটিগুলির কেন্দ্রীয় সংগঠন ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী।

অথচ আশ্চর্যের কথা ফেডারেশন এক নিস্পৃহ অনীহা নিয়ে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের এই ক্রমবিস্তারকে লক্ষ্য করছেন। শুধুমাত্র উদাসীন নিরাসক্তিই কিন্তু ফেডারেশনের দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রতিফলিত করছেনা, প্রায়শঃই ফেডারেশন ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের এই বিস্তারকে এবং নতুন উদ্যোগগুলিকে বাধা দেবার চেষ্টা করছেন সক্রিয়ভাবে।

সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটা যখন নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন দূতাবাসের ছবি আনিয়ে এবং সেন্সর করিয়ে এই জাতীয় সোসাইটিগুলির অনুষ্ঠান-সূচীকে অব্যাহত রাখতে সাধ্যমত সাহায্য করছেন তখন ফেডারেশন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন অজুহাত তুলে এই প্রচেষ্টাকে বাধা দিতে চেষ্টা চালিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের কাছ থেকে সেন্সরসিপ থেকে অব্যাহতি নেওয়ার একচেটিয়া অধিকারকে সংকীর্ণ স্বার্থে ব্যবহার করে ফেডারেশন নতুন ফিল্ম সোসাইটিগুলির কার্যক্রমকে বানচাল করার চেষ্টা করে এসেছেন এতদিন ধরে। ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত নয় এই অজুহাতে ফেডারেশন নতুন সোসাইটিগুলি যাতে ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভ থেকে ছবি না পান তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে এসেছেন। নতুন সোসাইটিগুলি যাতে প্রমোদ কর থেকে অব্যাহতি পায় বা সহজে পুলিশ লাইসেন্স পেতে পারে এমন কোন সহায়ক প্রচেষ্টা ফেডারেশন থেকে নেয়া হয়নি একই অজুহাতে। বরং বহুক্ষেত্রে উল্টো প্রচেষ্টাই করা হয়েছে।

এই চিত্রটি কিন্তু একান্তভাবেই পূর্বাঞ্চলীয়। পশ্চিমবাংলা এবং পূর্বাঞ্চলীয় নতুন ফিল্ম সোসাইটিগুলিই এই বৈষম্য ও বিমাতৃসুলভ আচরণের শিকার হচ্ছেন। দক্ষিণ, উত্তর বা পশ্চিম অঞ্চলে এই চেহারাটা একেবারেই বিপরীত, ওই সব অঞ্চলে আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে বা অল্প কিছু দিনের মধ্যেই আবেদনকারী নতুন সংস্থাগুলি ফেডারেশনের সদস্যপদ পেয়ে যাচ্ছেন। আর পূর্বাঞ্চলের চিত্রটি এই রকম, ফেডারেশনের সদস্যপদ পাননি এমন সংস্থা সমূহের সংখ্যা প্রায় পঁয়ত্রিশটি। এঁদের মধ্যে এমন অনেক সংস্থা রয়েছেন যাঁরা প্রায় তিন বছর ধরে কাজ করে চলেছেন এবং যথেষ্ট ভালোভাবে।

কাজেই ফেডারেশনকে এই বিমাতৃসুলভ মনোভাব পরিত্যাগ করে এখনই এই সোসাইটিগুলিকে সদস্যপদ দিতে হবে। ফেডারেশনের সংবিধানে দু-ধরনের সদস্যপদ রয়েছে পূর্ণ সদস্য ও সহযোগী সদস্য। সহযোগী সদস্যের সন্তোষজনক ছয়মাস কার্যকলাপই তাকে পূর্ণ সদস্য-পদের অধিকারী করে তোলে। কাজেই নতুন আবেদনকারী সংস্থাগুলিকে সহযোগী সদস্যপদ দেওয়ার ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকা উচিত নয়।

আর ফেডারেশন যদি এই বৈষম্যমূলক আচরণ পরিত্যাগ না করেন তাহলে ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত এবং বাইরের সংস্থাগুলিকে এক ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম নিতে হবে, দৃঢ়ভাবে ফেডারেশনের কাছে দাবী জানাতে হবে, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের কাছে ফেডারেশনের একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে হবে, কেননা ফেডারেশনের শুধু অধিকার থাকবে, কোন দায়িত্ব থাকবেনা—এ চলতে পারে না।

ফেডারেশন সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপে ক্রমশঃই এই বিষয়টিকে পরিষ্কার করে তুলছেন যে অন্তত পশ্চিমবাংলায় ফেডারেশন ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন নয়। ফেডারেশন কর্তৃপক্ষের সর্বনাশা নীতি কিন্তু ফেডারেশনে ভাঙনের পথকেই প্রশস্ত করছে।

সিনে ক্লাব, আসানসোলের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশনা

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের

চলচ্চিত্র • সমাজ ও সত্যজিৎ রায় (১ম খণ্ড)

আসানসোল সিনে ক্লাবের আবেদন—

"ফিল্ম সোসাইটিগুলির গঠনতন্ত্রে অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে 'গ্রন্থ প্রকাশনা' একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেলেও, একথা বলতে দ্বিধা নেই যে কেবল দু'একটি ফিল্ম সোসাইটির পক্ষেই এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়েছে। এর মূল কারণ এই লক্ষ্য সাধনের পথটি কুসুমাস্তীর্ণ নয়, এবং এ সম্পর্কে সর্ববিধ বাধার কথা জেনেই আসানসোল সিনে ক্লাব একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছে। গ্রন্থটির নাম "চলচ্চিত্র, সমাজ ও সত্যজিৎ রায়", লেখক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, যিনি ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি মানুষের কাছে এবং সামগ্রিক ভাবে সাংস্কৃতিক জগতের অনেকের কাছেই চলচ্চিত্র আলোচক হিসাবে পরিচিত (কর্ম সূত্রে শ্রীচট্টোপাধ্যায় এক দশকের কিছু বেশীকাল এ অঞ্চলের অধিবাসী এবং আমাদের ক্লাবের সদস্য)। প্রকাশিতব্য গ্রন্থটির নির্বাচনের প্রেক্ষাপট হিসাবে কয়েকটি কথা প্রাসঙ্গিক।

যে প্রতিভাধর চলচ্চিত্র স্রষ্টা অমর 'পথের পাঁচালী' সৃষ্টি করে ভারতীয় চলচ্চিত্রকে সত্যকার ভারতীয় করেছেন যাঁর ছবির ওপর বিদেশে অন্ততপক্ষে তিনটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যার একটির বিক্রয় সংখ্যা লক্ষ কপিরও বেশী—অথচ দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরেও তাঁর সুদীর্ঘ চলচ্চিত্র কর্মের কোন দেশজ বাস্তবধর্মী মূল্যায়নের সামগ্রিক চেষ্টা হয়নি (খণ্ড খণ্ড ভাবে কিছু উৎকৃষ্ট কাজ হলেও)— এটি একটি লজ্জাজনক ঘটনা। সেই অক্ষমতা অপনোদনের প্রচেষ্টা এই গ্রন্থটি। সত্যকার বাস্তবধর্মী ও নিজস্ব সাংস্কৃতিক সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কোন দেশীয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্রকারের মূল্যায়নের চেষ্টা না হলে, বিদেশী ও বিশেষ করে পশ্চিমী প্রতিষ্ঠানিক চলচ্চিত্র আলোচনার দর্পণে তাঁর যে মুখচ্ছবি প্রতিফলিত হয় তাতে যে কত ইচ্ছাকৃত ও অজ্ঞানকৃত ভুল থাকে, এবং সেই সব ভ্রান্ত প্রচার যে তাঁর চলচ্চিত্র কর্মকে ও চলচ্চিত্রের অনুরাগীদের এবং পরোক্ষভাবে জাতীয় চলচ্চিত্রবোধকে ভুল পথে চালিত করে— এ সবের নিপুণ বিশ্লেষণের জন্য এই গ্রন্থটি প্রত্যেক চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষের অবশ্য পাঠ্য।

প্রকাশিতব্য প্রথম খণ্ডটি সত্যজিৎ রায়ের প্রথম পর্বের ছবিগুলির গবেষণাধর্মী আলোচনায় সমৃদ্ধ। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মহৎ 'অপুচিত্রত্রয়ী'। এই গ্রন্থের অর্ধাংশ জুড়ে 'পথের পাঁচালী' সহ এই চিত্রত্রয়ী আলোচনায় দেখান হয়েছে পশ্চিমের 'দিকপাল' ব্যাখ্যাকারদের দৃষ্টিভঙ্গী কোথায় সীমাবদ্ধ, এবং দেশজ সাংস্কৃতিক সামাজিক ভূমিকায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এই চিত্রত্রয়ীর ব্যাখ্যা কত গভীর ও মৌলিক হতে পারে—যার ফলে ছবিগুলি আবার নতুন করে দেখার ইচ্ছে করবে। অবিস্মরণীয় 'পথের পাঁচালী'র ২৫তম বর্ষপূর্তি হিসাবে ১৯৮০ সালটি ভারতের ফিল্ম সোসাইটিগুলির দ্বারা বিশেষ মর্য্যাদা সহকারে পালিত হচ্ছে—এই প্রেক্ষাপটে এই বৎসর এই গ্রন্থটির প্রকাশ এক তাৎপর্যমণ্ডিত ঘটনা বলে স্বীকৃত হবে বলে আমরা আশা রাখি। ভারতীয় চলচ্চিত্রের এক পবিত্র বৎসরকে আমরা উপযুক্ত কর্তব্য পালন দ্বারা চিহ্নিত করতে চাই। আশা করি এই কাজে আমরা ক্লাব সদস্য সহ সমগ্র চলচ্চিত্রানুরাগী মানুষের সহযোগিতা পাব।

গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি আমরা প্রকাশে উদ্যোগী, তার আনুমানিক পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫০, বহু চিত্রশোভিত এবং সুদৃশ্য লাইনো হরফে ছাপান এই খণ্ডটির আনুমানিক মূল্য ২৫ টাকা। কিন্তু আমরা ঠিক করেছি চলচ্চিত্র অনুরাগী মানুষ যাঁরা অগ্রিম ২০ টাকা মূল্যের কুপন কিনবেন—তাঁদের গ্রন্থের মূল্যের শতকরা ২০ ভাগ ছাড় দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে যাঁরা উৎসাহী তাঁরা **সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটার অফিসে** (২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৩, ফোন : ২৩-৭৯১১) **যোগাযোগ করুন।**

লুই বুনুয়েলের প্রথম পর্বের ছবি, মগ্নচৈতন্যবাদ, মার্কসবাদ

র‍্যাওল কনরাড

অনুবাদ ঃ পবিত্র বল্লভ

'দি গোল্ডেন এজ'-এর চূড়ান্ত দৃশ্যে দেখা যায় যে ছবির নায়ক নায়িকা—যারা পরস্পরের জন্য যৌন আকাঙ্ক্ষার স্বাভাবিক নিবৃত্তিতে সর্বদা বাধা পায় ও যাদের মাজোর্কান নামক এক বিধ্বস্ত বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা সবসময় হয়রান করে—চরম আঘাত পাচ্ছে। প্রচণ্ড ফর্মাল এক অভ্যর্থনায় অন্যান্য নিমন্ত্রিতরা যখন অন্যত্র ব্যস্ত, তখন প্রণয়ীযুগল বাগানের গোপনীয়তায় চুপি চুপি সরে পড়ে এবং পারস্পরিক খামচাখামচি শুরু করে দেয়—বাগানের নুড়ি বিছানো রাস্তা বা নিজেদের জামাকাপড়ের অসুবিধে সত্ত্বেও, যদিও জামাকাপড় খোলার দিকে তাদের কারোরই নজর নেই। শীঘ্রই একজন ভৃত্য তাদের আনন্দে বাধা দেয়। ভৃত্যটি ঘোষণা করে আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী (Minister of the Interior) ফোনে নায়কের সঙ্গে এক্ষুণি কথা বলতে চান। প্রেমিকটি ক্রুদ্ধ হয়ে ফোনের দিকে এগোয়।

লাইনের অন্য প্রান্তে অবিশ্রান্ত অভিযোগ নিক্ষেপকারী রাগান্বিত এক শুভ্রশ্মশ্রু বৃদ্ধ তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে এবম্বিধ আনন্দ উপভোগ করতে গিয়ে প্রেমিক প্রবরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক কূটনৈতিক কর্তব্য অবহেলা করেছে এই অক্ষমনীয় বিচ্যুতির ফলে নির্দোষ স্ত্রী-পুরুষ ও শিশু বিপর্যয়ে ধ্বংস হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বুনুয়েল কাট্ করে সংবাদচিত্রে চলে যান—দৃশ্য হয় মারদাঙ্গা জনতা জ্বলন্ত ধ্বংসাবশেষ থেকে রণাক্রান্তদের পলায়ন। ক্রুদ্ধ প্রেমিকটি তড়পে ওঠে। "কেবল এই কথা বলার জন্য আমাকে বিরক্ত করলেন? আপনার প্যানপ্যানানির নিকুচি করেছে। আপনি মরে পড়ে থাকলেও আমার মাথাব্যথা নেই।" অসম্মানিত মন্ত্রী শেষ অপমান ছুঁড়ে দিয়ে গুলি করে আত্মহত্যা করলেন, কিন্তু গুলির শব্দ প্রেমিকটি শোনেইনি. ইতি-মধ্যেই তার একমাত্র বাস্তব প্রেমিকার কাছে ছুটে গেছে। কিন্তু তখন বেশ দেরি হয়ে গেছে, তাদের আচরণ ক্রমশ অস্বস্তিজনক হয়ে দাঁড়ায়, পরস্পরকে আঘাত করতেই তখন ব্যস্ত তারা। প্রণয়যুদ্ধে ইনহিবিশনই জয়ী হয়, বয়স্ক এক মাজোর্কানের জন্য স্ত্রীলোকটি তার প্রেমিককে ত্যাগ করে। শেষ সিকোয়েন্সটি পরিণত হয় অক্ষমতা ও বিকৃতির প্রতীকে।

'দি গোল্ডেন এজ' (L'Age D'or, France 1930) লুই বুনুয়েলের প্রধান মগ্নচৈতন্যবাদী ছবি এবং টেলিফোনের দৃশ্যটি মগ্নচৈতন্যবাদ ও বুনুয়েলের ছবির কয়েকটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

একটি সামাজিক বাস্তবের পুনর্সৃষ্টি এবং পর্দায় পরিচিত চরিত্রের উপস্থাপন—এরকম প্রথাসিদ্ধ ন্যারেটিভের বিপরীত প্রান্তে আমরা উপস্থিত হই। বুনুয়েলের নায়কের সঙ্গে নিজেদের আইডেন্টিফাই করার দরকার নেই। বুর্জোয়া গণ্যমান্যদের অপমান করার সময় নায়ককে কৌতুকপ্রদ মনে হয়, কিন্তু যখন সে অসহায় মানুষকে আক্রমণ করে, জনগণকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয় কিংবা এমন একটা প্রেমের দৃশ্যে গুছিয়ে বসে যেখানে রক্ত ও হত্যার সঙ্গে যৌনতার সম্পর্ক তৈরি হয়, তখন আমরা শকড্ হই। বুনুয়েল চরিত্রগুলির উত্তেজিত ও বাস্তবরীতির সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত আচরণ উপস্থাপিত করেন। প্রত্যেক সিকোয়েন্সের যতটা দরকার ততক্ষণই চরিত্রগুলি পর্দায় থাকে—যেন স্বপ্নে দেখা চরিত্র, বাস্তব পৃথিবী থেকে যারা আহরিত অথচ কোন না কোন প্রতীকী বৈশিষ্ট্যের জন্য যাদের স্পষ্ট করা হয়েছে।

যে নির্বিকার সমাজের মধ্যে বুনুয়েলের নায়ক বন্ধুর অথচ মহান পথ তৈরি করে নেয়—সেটি নিশ্চিতই সমসাময়িক ইউরোপীয় সভ্যতার সমাজ। কিন্তু বাস্তব আইডেন্টিফিকেশনের চেষ্টা বাধা পায় একপ্রকার উচ্ছ্বসিত প্রতীকীবাদে—ছবির ঘটনাটি ঘটে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী রোমের শাসকশ্রেণী মাজোর্কানদের মধ্যে।

'দি গোল্ডেন এজ' ছবির জড়বস্তুও স্বপ্নবস্তুর দ্বৈত দ্যোতনা লাভ করে—স্পর্শযোগ্য জড়ত্ব যুক্ত হয় এমন এক প্রতীকীবাদের সঙ্গে যা একই সঙ্গে সহজ ও রহস্যময়। এই প্রতীকগুলিকে বুনুয়েল খুব প্রাধান্য দেন না, বাস্তবের ও ঘটনার অংশ হিসেবেই তাদের ব্যবহার করেন, প্রায়ই তারা যেন একটুকরো কমেডির মক্ষোপকরণ। লাঙল, অগ্নিময় সবুজ প্রান্তর এবং খড় পোরা জিরাফ—এগুলি নিঃসন্দেহে হতাশ প্রেমিকের 'State of erection'-এর প্রতীক। (অন্তত যৌন প্রতীকের প্যারডি—মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতার বিষয়ে আধুনিক প্রিটেনশনের বুনুয়েলকৃত বিদ্রূপাত্মক অনুকরণ)। তবু সিনেমা হিসেবে তাদের কার্যকরী হবার কারণ এই যে বুনুয়েল তাদের অসমানুপাতিক আকার

ও তার, তাদের বাস্তবতা অনুভব করতে আমাদের বাধ্য করেন, যখন নায়ক সোৎসাহে ও অদ্ভুতভাবে সেগুলিকে অনুপস্থিত প্রেমিকার জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে।

'দি গোল্ডেন এজ'-এর সমাজের চিত্র এই দ্বিমুখী প্রতীকীবাদের ওপর নির্ভরশীল। আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী বা প্রামাণ্য শহরচিত্র বা মাজোর্কানদের ককটেল রিসেপশন, যা-ই তিনি উপস্থাপিত করুন না কেন—এই বাস্তবগুলির অবজেকটিভ ও সাবজেকটিভ তাৎপর্য অথবা বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী উভয়বিধ প্রতীকীবাদ আছে। আমাদের আলোচ্য আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী। বাহ্যত তিনিই রাষ্ট্র, স্বাদেশিক কর্তব্যের প্রতি আনুগত্য তিনিই বলবৎ করেন। একই সঙ্গে মন্ত্রীর আহ্বান যেন ব্যক্তির অপরাধী বিবেকের অনুতাপ প্রার্থী অন্তরকণ্ঠ।

এইভাবে বুনুয়েলের নায়কের রাজনৈতিক বিদ্রোহ প্রধানত ধর্ম-বিরোধী আচরণের একটি দিকই হয়ে দাঁড়ায়। চার্চের শাস্ত্রানুযায়ী ঈশ্বর পৃথিবীর মুক্তির জন্যই মানব রূপ গ্রহণ করেছিলেন, মৃত্যুবরণ করেছিলেন স্বেচ্ছায়। বুনুয়েলের ছবিতে প্রেমিকটি ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। মন্ত্রীকে আত্মহত্যা করতে যে উত্তেজিত করে আবার মন্ত্রীর মৃত্যুকালীন কথাগুলো অবহেলাও করে (বস্তুত, ফোনটা সে ভেঙে ফেলে)। প্রত্যাখ্যাত মন্ত্রীই যে রাষ্ট্রশক্তি ও বিবেকের প্রতীক তার সূত্র আমরা পেয়ে যাই আত্মহত্যার দৃশ্যটির প্রয়োগের মধ্যে। রিসিভারটি পড়ে গিয়ে মাটির দিকে ঝুলতে থাকে কিন্তু মন্ত্রীর নিষ্প্রাণ দেহটি মাধ্যাকর্ষণকে তুচ্ছ করে একটি অলঙ্কৃত ঝাড়লণ্ঠনের পাশে সিলিংয়ে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে থাকে—মন্ত্রী স্বর্গে দেহত্যাগ করেন। তার বাণী থেকে যায় অশ্রুত।

'দি গোল্ডেন এজ' নিপীড়ক সমাজকে আক্রমণ করে বটে, কিন্তু বুনুয়েলের কাছে সামাজিক নিপীড়ন আর ব্যক্তিগত সংস্কার (inhibition) একই বাস্তবের দুটি দিক মাত্র। 'দি গোল্ডেন এজ'-এর দ্বিমুখী প্রতীকীবাদের সাহায্যে বুনুয়েল বাইরের বন্দীশালা অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী রোম, খ্রীষ্টীয় সভ্যতা, বুর্জোয়া সমাজ অন্তর্নিগড় ঃ এক অপরাধবোধ যা আনন্দকে অস্বীকার করে। প্রবৃত্তিকে দমন করে আর মানুষকে করে তোলে আপোষপ্রিয়—এই দুইয়ের মধ্যে এক ডায়ালেকটিককে প্রকাশ করেন। প্রতিটি দিকই অপর দিকটির প্রতিচ্ছবি ঃ উভয়ে তৈরি করে একটি অবিভাজ্য সমগ্র, আর বুনুয়েলের লক্ষ্যই হল এই সমগ্রটি।

বুনুয়েলের কাছে কামনাই মুক্তির চাবিকাঠি, কামনাই মানবিক আচরণের উৎসমুখ। 'দি গোল্ডেন এজ'-এর নিখুঁত আদর্শগত পরিপূরক হল ফ্রয়েডের সমসাময়িক গবেষণা 'Civilisation and its Discontents'—যৌনকামনার শুদ্ধিকরণে যে সভ্যতার জন্ম, ব্যক্তির পরিণতিতে যে কার্যপ্রণালীর প্রকাশ। অশুদ্ধিকৃত যৌনতা সভ্যতার সমস্ত কীর্তিই নষ্ট করতে চায়, তাই তার বহিঃপ্রকাশকে দমন করার অবাঞ্ছিত অথচ অপরিহার্য দায়িত্ব সমাজকে নিতে হয়, অপরাধ-বোধ দিয়ে প্রবৃত্তিগুলিকে নিষিদ্ধ করতে হয়। বুর্জোয়া তথা সর্বপ্রকার সমাজের কলঙ্কস্বরূপ এই সত্যকে উন্মোচিত করার মধ্যেই বুনুয়েলের মৌলিকত্ব নিহিত।

যাই হোক, যৌনতা রূপ পায় প্রতীকের, যে সব প্রতিষ্ঠান যৌনতার ক্ষমতাকে অস্বীকার করে তাদেরই দেহে তা মূর্ত হয়ে ওঠে; যা সমানভাবে দেখা যায় শ্রদ্ধেয় স্মারকস্তম্ভে কিংবা রাস্তার সাইনবোর্ডে। 'দি গোল্ডেন এজ' ছবিতে নায়ক, কিছুটা অচেতনভাবে কিছুটা প্রবৃত্তির তাড়নায়, সামনে যা পায়—হাতের ক্রিম, সিল্কের মোজা কিংবা কেশচর্চার শস্তা বিজ্ঞাপনও—তাকেই, সমাজ তার কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়েছে যাকে সেই স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে যৌন হ্যালুশিনেশন উদ্দীপ্ত করার কাজে লাগায়। 'প্রখ্যাত নগরীর বিভিন্ন ছবির মত বৈশিষ্ট্য' শিরোনামায় একটি নকল ভ্রমণসংক্রান্ত সিকোয়েন্সে নাগরিক পরিবেশে প্রত্যহ দেখা স্মৃতিস্তম্ভগুলির যৌনচারিত্র্যকে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ এক জোড়া 'নিম্ফ' কিংবা 'কিউপিড' একটা মোটা স্তম্ভকে, যার থেকে ফোয়ারার মত জল বেরুচ্ছে, আদর করছে, পিছন থেকে একটি মূর্তিকে মনে হচ্ছে যেন পোষাক খুলছে; সদর, বেড়া, খোলা দরজা পুরুষ ও স্ত্রী দেহের অনুষঙ্গ আনে। একটি সাবটাইটেল রাজতন্ত্রী রোমের কেন্দ্রকে চিহ্নিত করে এই উপমাটি দিয়ে—'ভ্যাটিকান, ধর্মের দৃঢ়তম স্তম্ভ।'

সুতরাং চারপাশের এই ইঁট-কংক্রীটের নিপীড়ক সভ্যতাকে একমাত্র তখনই আঘাত করা সম্ভব যখন আমাদের দৃষ্টি প্যাশনে শানিয়ে ওঠে। নকল তথ্যচিত্রে দেখা যায় নির্জন রাস্তায় একসারি বাড়ির সামনের ভাগটা বিস্ফোরণের ঢেউয়ে ভেঙে পড়েছে। অবশ্য 'দি গোল্ডেন এজ'-এর অধিকাংশে সাম্রাজ্যবাদী রোমের অট্টালিকাগুলো দাঁড়িয়ে থাকে ঃ যাদের অন্তর্দৃষ্টি নেই তাদের কাছে সমাজ অনড় অভেদ্য।

অভেদ্য, এবং অপরিবর্তনীয়ও বটে। মাজোর্কানরা তাদের আনুষ্ঠানিক উৎসব (self celebration) চালিয়ে যায়, ওদিকে তাদের ভৃত্যরা মাঝে মাঝে ঈশ্বরের শিশুবধ (মালীর দৃশ্য) কিংবা আত্মহত্যার (মন্ত্রীর দৃশ্য) আধ্যাত্মিকতাহীন রক্তাক্ত মিথের পুনরাভিনয় করে। প্রায়ই এই অপরিবর্তনীয় সমাজই হয়ে ওঠে বিস্ফোরণ, আক্রমণ, একটা দুর্বোধ্য ঘটনার ক্ষেত্র, যদিও মাজোর্কানরা থাকে অবিচলিত। যৌনতাতেই নিজের সৃষ্টি—এই সত্যটা আত্মসংরক্ষণের স্বার্থে সমাজ দৃঢ়ভাবে অবহেলা করে। তাদের একমাত্র শত্রু বুনুয়েলের অনুতাপহীন নায়ক কারণ যে অপরাধবোধ থেকে মুক্ত, তথাপি সমাজকে

অতিক্রম করতে কিংবা নিজের প্যাশনের সম্পূর্ণ উপলব্ধিতে সেও ব্যর্থ।

'দি গোল্ডেন এজ'—এর আগে একই থিম ও প্রতীকীভাষায় 'অ্যান আন্দালুসিয়ান ডগ' নামক একটি স্বল্পদৈর্ঘ ছবি বুনুয়েল করেন। পুরুষ চরিত্রটি—পুরুষ হলেও যৌনাগম যার এখনো প্রতিহত—এক পরিণত স্ত্রীলোকের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে অসংখ্য নিষেধ থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য হাস্যকর সহিংস প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় (যদিও স্ত্রীলোকটি তার পাগলামিকে পাত্তা দেয় না)। 'দি গোল্ডেন এজ'-এর নায়ক যেমন মন্ত্রীকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে। তেমনি 'অ্যান আন্দালুসিয়ান ডগ'-এর নিজের সুপারইগোকে গুলি করে হত্যা করে, এই সুপার-ইগো তার নিজেরই প্রাপ্তবয়স্ক রূপ যে চায় সে বড় হোক, সঠিক আচরণ করুক। 'দি গোল্ডেন এজ'-এর মতই। অবশ্য, আত্ম-মুক্তির এই অভিব্যক্তি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পাণিপ্রার্থীর মুখের ওপরই নায়িকা দরজা বন্ধ করে দেয় এবং একজন পরিণত, বিবেচক মানুষের সঙ্গে চলে যায়।

কেন্দ্রীয় দৃশ্যে দেখা যায় নায়ক ও স্ত্রীলোকটি ওপরের জানলা থেকে রাস্তা দেখছে। একটি দুর্ঘটনা দেখে স্ত্রীলোকটির জন্য নায়কের কামনা বেড়ে যায়। এটা আরো বেশী হয় কারণ লোকটি ঘটনার আগেই মৃত্যুর উপস্থিতি দেখতে পেয়েছিল এবং ভবিষ্যৎ পরিণতির জন্য উত্তেজিত হয়েছিল।

জীবনীশক্তি ও অন্যের মৃত্যুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এই দৃশ্যটির তুলনায় একটি দৃশ্য 'দি গোল্ডেন এজ' ছবিতে আছে। যেখানে মন্ত্রীর প্রতি নায়কের স্পর্ধিত প্রত্যুত্তর বহির্জগতে তার কামনার ফলে সংঘটিত মানুষের ধ্বংসের তথ্যচিত্রের মধ্যে বুনুয়েল ইণ্টারকাট করেন।

'অ্যান আন্দালুসিয়ান ডগ' চিত্রে অন্যান্যদের মত মৃত চরিত্রটিও কোন ভিন্ন লোক নয়—নায়কেরই প্রোজেকশন। এক্ষেত্রে কাটাহাতটি ইন্দ্রিয়জ আনন্দ থেকে নায়কের বিচ্ছিন্নতার প্রতীক এবং মৃত লোকটি সেই প্রতীকের ওপর প্রোথিত এক অনিশ্চিত যৌনতার প্রাণী। যৌনপরিণতির জন্য নায়কের এই দিকটাকেই আগে মারতে হবে। অন্য দিকে, 'দি গোল্ডেন এজ' ছবিতে, অতর্কিত ধ্বংসে যে জনতা বিনষ্ট হয় (যার কারণ নায়কের সক্রিয় বিসমকামিতা hetero sexuality) তারা নিশ্চিত অন্য মানুষ, নায়কের চেতনাবহির্ভূত ; এবং তারা আরো বেশি বাস্তব, কারণ বুনুয়েল তাদের চিত্রায়ণে আসল ঘটনার ফুটেজ ব্যবহার করেন।

উল্লিখিত তুলনাটি 'আন্দালুসিয়ান ডগ' ও 'গোল্ডেন এজ'-এর প্রধান পার্থক্যটি ব্যাখ্যা করে। 'অ্যান আন্দালুসিয়ান ডগ' মনোজীবনের রূপক, এর প্রতীক আবেগানুভূতির একমাত্র সাবজেক্টিভ প্রান্তকে প্রতিভাত করে। অন্যদিকে, প্রতীকগুলির দ্বৈত চরিত্রের জন্য, 'দি গোল্ডেন এজ' হয়ে উঠেছে সমাজ ও তার দ্বন্দ্বের পূর্ণ কিংবদন্তী। একই সময় ছবিটি সমাজকে আক্রমণ করে, সংঘাতগুলিকে করে পরিস্ফুট।

অধিকন্তু, যে সমাজকে তিনি আক্রমণ করেন সেটা আমাদেরই এই বুর্জোয়া সমাজ। 'দি গোল্ডেন এজ'-এর অন্তর্ঘাতী মৌলিকতাকে প্রায়ই মার্কসবাদের সঙ্গে এক করে দেখা হয়েছে। বুনুয়েলের শ্রেণীসচেতন বক্তব্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি বিশেষ দৃশ্যকে নির্দেশ করা যায়। ককটেল, ডিনারের পোষাক, গার্ডেন, গম্ভীর আলাপ—রিসেপশনের সব কিছুই চলতে থাকে। তার মধ্যে মাঝে মাঝে অকারণ বাধাও আসছে। এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ হচ্ছে বলরুমে শস্তা মদ্যপানরত তিনজন শ্রমিক চালিত ঘোড়ায় টানা ক্ষেতের গাড়ির সশব্দ উপস্থিতি। পার্টির মধ্য দিয়ে শব্দ করতে করতে অপেক্ষাকৃত বড় ওয়াগনটি সোজা বিপরীত দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়, কিন্তু অতিথিরা বিন্দুমাত্র বিস্মিত হন না। প্রত্যেকেই সেটাকেই দেখে, কিন্তু কেবল কয়েকজন কথাবার্তা না থামিয়ে একটু আলতো সরে দাঁড়ায়।

অবশ্য এটি একটি বিতর্কমূলক দৃশ্য। পরস্পর বিরোধী শ্রেণী-গুলির বিচ্ছিন্নতা এবং শ্রমিকশ্রেণীর সুপ্ত ক্ষমতার চিত্রকল্প হিসেবেই বুনুয়েল এটিকে এঁকেছেন। তবে সেই সুপ্ত ক্ষমতাকে মাজোর্কানরা মোটেই ভয় পায় না। তাছাড়া, সর্বহারার এই সংক্ষিপ্ত উপস্থিতি ব্যতিক্রম বই কিছু নয়। 'দি গোল্ডেন এজ'-এর তাৎপর্যপূর্ণ শ্রেণীসম্বন্ধ মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্ক নয়, বরং সেটাকে বলা যেতে পারে প্রভু ও ভৃত্যের সম্পর্ক—ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সমাজকে বাস্তবতার পূর্ববর্তী পৃথিবীতে বর্তমান ক্ষমতা, আনুগত্য, সন্তোষবিধান ইত্যাদির ভূমিকার প্রতীকীকরণের পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত এক সম্পর্ক। সেই পৃথিবী অভিজাতের, অহংবোধের।

তবু বিদ্রোহী নায়ক ও তারই জন্য নিশ্চিহ্নপ্রায় জনসমষ্টির মধ্যে যে সম্পর্কটি বুনুয়েল প্রতিষ্ঠা করেন, মার্কসবাদী দর্শকের কাছে সেটিকে আরো বেশী সমস্যাসংকুল মনে হবে আশা করা যায়। তাদের পরিণতি তাকে কোনভাবেই বিচলিত করে না ; "তোমার প্যানপ্যানানির নিকুচি করেছে।" কামনা-দগ্ধ মানুষের কাছে অন্য মানুষের ভবিষ্যতের কোন গুরুত্বই নেই ; কেবল প্রথাগত মানসিক বন্ধনই নয় (পরিবার, রাষ্ট্র, ক্রিশ্চিয়ান প্রেম), রাজনৈতিক ঐক্যও শূন্যতায় সংকুচিত।

যথাসম্ভব সহজভাবে বুনুয়েল এবম্বিধ বিরোধিতাকে চিহ্নিত করেছেন। তা সত্ত্বেও, তথ্যচিত্রের কিছু শটে দৃষ্ট, জনতা পুলিশের অবরোধ ভাঙার চেষ্টা করছে—সম্ভবত এই ঘটনা থেকে

ইঙ্গিত দিয়ে একজন সমালোচক সামান্য অথচ তাৎপর্যপূর্ণভাবে সিকোয়েন্সটির ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করেছেন।

'হতাশার এই দৃশ্যের (প্রণয়ীযুগলের যৌন বিক্ষোভ) বিপরীতে আছে নায়কের কামনার সামাজিক পরিণতি—এই পরিণতি তার কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যায়; যথা দাঙ্গার দৃশ্য ও মন্ত্রীর আত্মহত্যা। যে মুহূর্তে কামনা একটা যৌথ ও গতিশীল ক্ষমতা হয়ে ওঠে। সেই মুহূর্ত থেকে তা মাজোর্কান সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক।'

জনতার ভীড়কে নায়কের শিকার হিসেবে (অথচ, স্পষ্টত এইটিই সিকোয়েন্সটির মূল ভাব; মন্ত্রীমহোদয় চীৎকার করেন, "তুমি খুনী। যা কিছু ঘটেছে তার জন্য একমাত্র তুমিই দায়ী") না দেখে তার লিবিডোর সক্রিয় যৌথ সম্প্রসারণস্বরূপ দাঙ্গাবাজ জনতা হিসেবে চিহ্নিত করে উক্ত সমালোচক মাজোর্কান সমাজের বিপদকে' গণবিক্ষোভের ডায়ালেকটিকের সঙ্গে সমীকরণ করে ফেলেছেন, এই ঐতিহাসিক ডাইনামিক মার্কসবাদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক, কিন্তু 'দি গোল্ডেন এজ'-এর ক্ষেত্রে নয়।

একই সমালোচক ছবির ভূমিকাটিকে—বিছে, আর্চবিশপ, এবং দস্যুদলের বন্ধ্যাপ্রান্তরে একত্র অস্তিত্ব—প্রাগিতিহাস থেকে বুর্জোয়া সমাজের আরম্ভ পর্যন্ত সময়ের একপ্রকার ঐতিহাসিক বস্তুগত রূপকরূপে ব্যাখ্যা করেন। যেন ইতিহাস অর্থাৎ বৈপরীত্য সম্বলিত সমাজ শুরু হয় মাজোর্কানদের আবির্ভাবের সঙ্গে।

অবশ্য বুনুয়েলের ছবিকে বামপন্থী বলা সম্ভব। কতকগুলি অনুষঙ্গ জোর করে আরোপ করে কেউ কেউ ভূমিকাটিকে, বিপর্যয়ের সিকোয়েন্সের মত, মার্কসবাদী ব্যাখ্যা করতে পারেন। তথাপি প্রতীকী ভূমিকাটিকে ইতিহাস-বিরোধী পদ্ধতিতেও ব্যাখ্যা করা যায়, সেটি সভ্যতার একটি ভূতাত্ত্বিক ক্রশ সেকশনের বেশি সদৃশ। এই ক্রশ সেকশন সেই সংঘাতগুলির উদ্ভব অনুসন্ধান করে যেগুলো ঐতিহাসিকভাবে অথচ মনের ভিতর এখনো সক্রিয়।

'দি গোল্ডেন এজ'-এ সমাজের প্রকৃত ইতিহাস অপ্রাসঙ্গিক, কারণ তার অচেতন প্রেমিসগুলি চিরন্তন। যৌন কামনাই 'দি গোল্ডেন এজ'-এর একমাত্র গতিশীল শক্তি—যেখানে তা সভ্যতাকে অস্বীকার করে। পরিবর্তে, সভ্যতার সার হচ্ছে, এক কথায়, একজন মানুষের erection-এর প্রতি তার নিবিরোধ প্রতিক্রিয়া। সভ্যতার নিজের কোন ইতিহাস বা শক্তি নেই—ইতিহাস কতকগুলি নিপীড়ক শক্তির সমাহার যাকে সাময়িক অভ্যুত্থান নাড়াতে পারে না। সর্বদা প্যাশনকে দমন করতে করতে বিস্ফোরণ ও স্থবিরত্বের মধ্যে তার চলাচল।

অধুনা, 'দি গোল্ডেন এজ'-কে সভ্যতার দ্বৈতবাদী বস্তুতন্ত্র অপেক্ষা ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যার বেশি কাছাকাছি মনে হয়। বুনুয়েলের ছবির মার্কসীয় আলোচনা আবার আরম্ভ করার উদ্দেশ্যে বামপন্থীরা ব্যাখ্যাক্রিয়া শুরু করতে পারেন। অথচ সেই সময় ছবিটিকে রাজনৈতিক বৈপ্লবিক সৃষ্টিকর্ম হিসেবে বিনাবাধায় স্বীকার করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে বুনুয়েল ও মার্কসবাদের মধ্যে একটি সম্পর্কও রয়েছে; সেটিকে ভাল করে বুঝতে গেলে তিনি যার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন অধিচেতনাবাদী আন্দোলনের রাজনীতিও বুঝতে হবে।

যেহেতু বর্তমানে অধিচেতনাবাদ (Surrealism) বলতে নীতিহীন আত্মমুখীনতা (Subjectivism) বোঝায়, সেই জন্য আমাদের স্মরণ করা দরকার যে প্রথম দিককার অধিচেতনাবাদীরা তাদের কাজকে সনৈতিক যৌথ নিরীক্ষা—একই সঙ্গে বহিঃ ও অন্তর্বাস্তবপ্রধান বিষয়—হিসেবেই দেখেছিলেন। তাদের আবিষ্কারসমূহ যেন সব কিছুর ওপর চমকপ্রদ প্রতিশোধ নিতে মানুষের কল্পনাকে সক্ষম করে তুলবে। আন্দোলনের নেতা আন্দ্রে ব্রেতঁর প্রায়শঃ উদ্ধৃত কথাগুলিই অধিচেতনাবাদের এখনো পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা: বাস্তব ও স্বপ্ন—আপাতবিপরীত এই দুই অবস্থা যে ভবিষ্যতে এক চরম রিয়ালিটিতে, বলা যেতে পারে অধিচেতন্যে (Surreality), মিশে যাবে তা আমি বিশ্বাস করি।" 'দি গোল্ডেন এজ' ছবিতে বুনুয়েল, আমরা দেখেছি, অবজেকটিভ ও সাবজেকটিভ বাস্তবের এই মিলন ঘটিয়েছিলেন।

অধিচেতনাবাদ একটি নৈতিক অ্যাটিচুড, একটি 'Spirit of demoralisation', কোন নান্দনিক ঘরানা নয়। অধিচেতনাবাদীর ক্রীড়াবৈশিষ্ট্যকে (Play element) মুক্ত করার চেষ্টা, অবচেতন চিত্রকল্পের অনুসন্ধান—এগুলিকে তারা শিল্প হিসেবে নয়, চিন্তাপদ্ধতির বৈপ্লবিক বিজ্ঞানে তাদের অবদান এমনকি মানুষের মুক্তি হিসেবেই দেখেছিলেন। যদি তাদের কাজকে অশ্রদ্ধা ও দুর্বোধ্যতার সঙ্গে গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তবে সেটা তাদের মৌলিক গুণেরই প্রমাণ, কারণ অধিচেতনাবাদের সব কিছুই—তার নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ, বৈপরীত্যের ভার, অসম্ভ্রান্ত পরিহাস ও শ্লেষ, যৌনতা, অনুকম্পা, অস্পষ্টতা—দমিত সমাজ-বিরোধী প্রবৃত্তিগুলির মুক্তি থেকে উৎসারিত এবং জনগণের ঐ প্রবৃত্তিগুলির প্রতিই নিবেদিত।

চরম রিয়ালিটি সত্ত্বেও অধিচেতনাবাদ কেবল মানসিক বিপ্লবই ছিল। কিন্তু স্বভাবত স্থিরনীতি অধিচেতনাবাদীরা বৈপ্লবিক শিল্পকে বৈপ্লবিক রাজনীতিতে সম্প্রসারিত করতে গেলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী পাশ্চাত্য শিল্পে avant-garde আন্দোলনের হয় কোন স্পষ্ট রাজনীতি ছিল না—এই চিন্তাধারাটাই রক্ষণশীল—নয়ত ইতালীয় ফিউচারিস্টদের মত দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছিল। একমাত্র সুররিয়ালিস্টরাই বামপন্থীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। মার্কসবাদ

আবিষ্কার করার পর তারা ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টি অনুসৃত বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নটি গভীর ভাবে বিবেচনা করে।

সুররিয়ালিস্টদের মার্কসবাদী রাজনীতি গ্রহণকে কম্যুনিস্টরা প্রথম থেকেই চ্যালেঞ্জ জানায়। ব্রের্ত ও তার অনুগামীরা মার্কসবাদ লেনিনবাদ এবং মগ্নচৈতন্যবাদের তাত্ত্বিক সমন্বয় সাধন করলেও বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী-উত্তর একটি নব্য শিল্প তারা সৃষ্টি করলেও কার্যত তারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ছিলেন, সংগ্রামে তাদের অবদান তাদেরই নিজস্ব শর্ত নির্ভর ছিল।

১৯২৭ সালে মার্কসবাদী ও বামপন্থী মগ্নচৈতন্যবাদীদের মধ্যে একটা ফাটল দেখা গেল, তাদের নীতিকে পরীক্ষার সম্মুখীন করে ব্রের্ত ও অন্যান্যরা কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন যদিও শিল্পগত স্বাতন্ত্র্যকেও তারা প্রাধান্য দেন। স্বাধীন মগ্নচৈতন্যবাদ ও বহির্জাগতিক বৈপ্লবিক আদর্শ—এই দুইয়ের সমন্বয়ের জন্য ব্রের্তর নিরন্তর প্রচেষ্টাকে উপলক্ষ্য করে গোষ্ঠীটি সিরিয়াসলি দ্বিখণ্ড হয়। ব্রের্ত আদর্শ দুটির পারস্পরিক বৈপরীত্য স্বীকার করতেন না।

এই সময় কয়েকজন নতুন কবি ও শিল্পী গোষ্ঠীতে যোগ দেন। তাদের মধ্যে দলের একমাত্র চিত্র-পরিচালক, 'অ্যান আন্দালুসিয়ান ডগ'-এর নির্মাতা, ফ্রান্সের অধিবাসী স্প্যানিশ লুই বুনুয়েলও ছিলেন। শীঘ্রই বুনুয়েল অন্যতম শ্রেষ্ঠ মগ্নচৈতন্যবাদী কীর্তি 'দি গোল্ডেন এজ' সৃষ্টি করেন এবং এই ছবিটির রাজনৈতিক ইতিহাস মগ্নচৈতন্যবাদ ও মার্কসবাদের কঠিন সম্পর্ককে আরো পরীক্ষার সামনে নিয়ে যায়।

ডিপ্রেশনের শুরুতে ১৯৩০ সালে 'দি গোল্ডেন এজ' মুক্তি পায়। ছবিটিকে মগ্নচৈতন্যবাদের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে প্রশংসা করে ব্রের্ত একটি দলীয় ইস্তাহার লেখেন। "(ছবিটি) মানবিক চৈতন্যের প্রতি উপস্থাপিত আত্যন্তিক প্রশ্নগুলির অন্যতম।" 'দি গোল্ডেন এজ' "অস্তাচলের আকাশে—পশ্চিমী আকাশে—সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এক শিকারী পাখি।"

'দি গোল্ডেন এজ' অবশ্য জিজ্ঞাসার চরম বিজ্ঞপ্তি—এত চরম যে মনে হতে পারে কম্যুনিস্টদের ব্যবহারিক রাজনীতির ওপর তার প্রস্তাবিত বিপ্লবের কোন প্রভাবই নেই। সম্পর্কটাকে সহজ করার জন্য ব্রের্ত ছবিটাকে তৎকালীন সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন এবং বামপন্থীদের প্রতি একটি মূল্যবান অবদান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন—

'ব্যাংকব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে, বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে, অস্ত্রাগার থেকে বের করা হচ্ছে বন্দুক—এরকম একটি সময়ে 'দি গোল্ডেন এজ' প্রদর্শিত হচ্ছে। যারা এখনো পর্যন্ত সেন্সরের দয়ায় ছাপা সংবাদপত্রের খবরটুকুনেও বিচলিত হয় তাদের ছবিটি দেখা উচিত। 'সমৃদ্ধির' যুগে, নিপীড়িত শ্রেণীর ধ্বংস করার প্রয়োজনকে তৃপ্ত করে এবং সম্ভবত, অত্যাচারীর ম্যাসোচিস্টসুলভ প্রবৃত্তিকে খুশি করে 'দি গোল্ডেন এজ'-এর সামাজিক যোগ্যতা-মূলক (use-value) প্রতিষ্ঠা দিতে হবে।

এক অর্থে, সুররিয়ালিস্টদের উদ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন ছিল না। 'দি গোল্ডেন এজ' সে সময় একটি বড় কুৎসার জন্ম দেয়—পরিষ্কার রাজনীতি ঘেঁষা কুৎসা। প্যারিসে ছবিটি নির্বিঘ্নে কয়েক সপ্তাহ চলছিল, এক সন্ধ্যায় ক্যাথলিক, জাতীয়তাবাদী অ্যান্টিসেমেটিক 'লীগে'র সদস্য ইত্যাদি দক্ষিণপন্থী বিক্ষোভকারী প্রদর্শনীকক্ষতে ভাঙ্গচুর করে। এখান থেকে শুরু হয় 'দি গোল্ডেন এজ' ও অন্তর্ঘাতমূলক বিদেশী ছবির ওপর সরকারী নিষেধ দাবী করে দক্ষিণপন্থী সংবাদপত্রে আন্দোলন (ঐ বৎসর আইজেনস্টাইনের 'জেনারেল লাইন'ও নিষিদ্ধ হয়)। প্রচার করা হয়, "এগুলি হচ্ছে আমাদের নষ্ট করার এক বিশেষ—সত্য সত্যই বিশেষ—এক বলশেভিক চক্রান্ত।"

বিতর্কটি ১৯৩০ সালের ফ্রান্সে বাম ও দক্ষিণপন্থীদের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের এক প্রকাশ। মগ্নচৈতন্যবাদীরা সেটা জানতেন এবং সেইজন্যই এক দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তারা স্পষ্টতর ভাষায় বামপন্থীদের পক্ষ নিলেন। এই বিজ্ঞপ্তিতে 'দি গোল্ডেন এজ' ও অন্যান্য ছবির ওপর দমন ও ফ্রান্সে ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের প্রকাশ্য মাথা চাড়া দেওয়া এবং ঐ আন্দোলনের সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধপরিকল্পনা এক করে দেখানো হয়েছে।

নিজেদের ছবির পক্ষ সমর্থনে মগ্নচৈতন্যবাদীদের সঙ্গে একদল উদার ও বামপন্থী লেখক যোগদান করেছিলেন। তাদের অন্যতম ছিলেন L' Humanite নামক কম্যুনিস্ট পার্টির সংবাদপত্রের চিত্রপরিচালক Leon Monssinac. "এর আগে কোন সিনেমায় কিংবা এত জোরের সঙ্গে, এত তীব্র ঘৃণা নিয়ে প্রথা, বুর্জোয়া সমাজ ও তার লেজুড়কে—পুলিশ, ধর্ম, সৈন্যবাহিনী, নৈতিকতা, পরিবার স্বয়ং রাষ্ট্র—কেউ কখনো আগাগোড়া আঘাত করেনি। আমাদের ইন্টেলেকচুয়াল স্তর বা সাহিত্যিক অভিজ্ঞতা যাই হোক না কেন, এই ইমেজগুলির প্রত্যক্ষ ধাক্কা আমাদের অনুভব করতে হয়।"

সেন্সরশিপ এড়ানোর মধ্যে পার্টির নিজেরও স্বার্থ ছিল। তবু বুনুয়েলের সমর্থকদের মধ্যে Monssinac-এর উপস্থিতি প্রমাণ করে যে সুররিয়ালিস্ট ও কম্যুনিস্ট পার্টির দৃঢ় আঁতাত জরুরী অবস্থায় সম্ভবপর।

১৯৩০ সালে বামপন্থী শিল্পের বেসরকারী মাপকাঠি বেশ উদার ছিল। Monssinac 'দি গোল্ডেন এজ'কে সেই ননকনফর্মিস্ট ছবির শ্রেণীতে স্থান দিয়েছেন যেগুলি অবশ্য একেবারে শ্রেণীসচেতন না হলেও পুঁজিবাদী সমাজ ও মতাদর্শের সমালোচক (তার উদাহরণে ছিল চ্যাপলিনের 'সিটি লাইটস', ক্লেয়ারের 'A Nons La Liberte'; এবং ভিগোর 'A Propos De

Nice' থেকে পাব্স্টের 'Kameradschaft'; ভুডো এবং ব্রেখ্‌টের 'Kuhle Wampe' ও ইভেন্সের তথ্যচিত্রগুলি)।

এটা প্রমাণিত ছিল যে দক্ষিণপন্থীরা আরো ভালোভাবে সংগঠিত শক্তি। ফ্যাসিস্ট সমর্থক পুলিশপ্রধান Jean Chiappe-এর আদেশে ১৯৩০ সালে 'দি গোল্ডেন এজ'কে সরকারীভাবে নিষিদ্ধ করা হয় (আমলাতান্ত্রিক শৈথিল্য ও চার্চের চাপে আজ পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে নিষেধাজ্ঞাটি বলবৎ আছে)। সুতরাং ছবিটির রাজনৈতিক বিপ্লবাত্মক মহিমা কিছুটা ছবিটি স্বয়ং ও অংশত ছবিটির আবির্ভাবকালের ঐতিহাসিক মুহূর্তের কার্যপরম্পরা দ্বারা সমর্থিত।

মার্কসবাদী ছবি না হলেও, 'দি গোল্ডেন এজ'-এর সঙ্গে মার্কসবাদী ধ্যানধারণার স্পষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। বাস্তব পৃথিবীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকৃতির ওপর ছবিটা প্রাধান্য দিয়েছে। ধর্ম, রোমান্স, বুর্জোয়া যুক্তিবাদ—ইত্যাকার প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শকে ছবিটি আঘাত করে। ছবিটির শ্রেণী সচেতন ও ইতিহাস সচেতন ব্যাখ্যাও করা যেতে পারে।

একই সময়, বুনুয়েলের ছবি, ও সাধারণভাবে শিল্পী হিসেবে তার রাজনীতি, এক অভূতপূর্ব আলোড়নের যুগের তথা রাজনৈতিক ও আসর্শগত সঙ্কটমুহূর্তের ফসল। ১৯৩০ সালেও বৈপ্লবিক শিল্প ও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা সমার্থক ছিল না (সম্পর্কটা ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত সরকারীভাবে অননুমোদিত ছিল)। তখনো পর্যন্ত শিল্পীর বৈপ্লবিক যাথার্থ্যের মার্কসবাদী মাপকাঠি বলতে ছিল এঙ্গেলসের সরল নির্দেশটি ঃ

যদি লেখক আমাদের কোন সমাধান না-ও দেন, কিংবা স্পষ্টভাবে কোন পক্ষ অবলম্বন না-ও করেন, তবু, ঔপন্যাসিক তার কর্তব্য সম্মানজনকভাবে পালন করেছেন—একথা তখনই বলা যায় যখন তিনি, বিশ্বাসজনক সামাজিক সম্পর্কগুলির নিখুঁত চিত্রায়ণের মাধ্যমে, ঐ সম্পর্কগুলি প্রকৃতিসম্পৃক্ত প্রচলিত ধারণাগুলিকে ধ্বংস করেন, বুর্জোয়া জগতের আশাবাদকে চূর্ণ ক'রে বর্তমান সমাজব্যবস্থার চিরস্থায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পাঠককে বাধ্য করেন।

'নন-কনফর্মিস্ট' শিল্পের ব্যাখ্যা এইটিই, এমনকি মগ্নচৈতন্যবাদও-এর অন্তর্গত। কয়েকবছর বাদে, পঞ্চাশের দশকে যখন শিল্পের সমাজতান্ত্রিক ও বুর্জোয়া র‍্যাডিকাল নীতির মধ্যে বিরোধিতা ১৯৩০ সালের থেকেও তীব্র, নিজের নীতি ব্যাখ্যার জন্য বুনুয়েলকে এঙ্গেলসের ফরমূলা উদ্ধৃত করতে হয়।

'দি গোল্ডেন এজ' সংক্রান্ত বিতর্ক যখন চলছিল, ঠিক সেই সময় সুররিয়্যালিস্ট ও কম্যুনিস্টদের মধ্যে একটি অনপনেয় সীমারেখা টানা হচ্ছিল। খারকভে (ইউ. এস. এস. আর) কম্যুনিস্টদের আহূত বিপ্লবী লেখকদের এক আন্তর্জাতিক কংগ্রেস পার্টির সাধারণ নীতি অনুসারে ফ্রয়েডীয়বাদকে বুর্জোয়া আদর্শবাদ ও মগ্নচৈতন্যবাদকে 'অন্তর্বিরোধ' (opposition from within) আখ্যা দিয়ে অভিযুক্ত করে। ফরাসী মগ্নচৈতন্যবাদের দুই মুখপাত্র আরাগঁ ও সাদুল স্বয়ং কম্যুনিস্টপক্ষে চলে যান নিজ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযোগ সমর্থন ক'রে। ১৯২৭-২৯-এর বিবাদ সম্পূর্ণ হল, দুই বৈপ্লবিক মতবাদের ক্ষীণ সমন্বয় রক্ষা করা ব্রেতঁর পক্ষে আর সম্ভব হল না। কম্যুনিস্টরা বাম উদারপন্থী লেখকদের সম্মেলন-গঠন চালিয়ে যেতে লাগলেন (অ্যাসোসিয়েশন অফ রেভোল্যুশনারি রাইটার্স অ্যান্ড আর্টিস্টস ১৯৩১ সালে জঁ ভিগোকে নিজ গোষ্ঠীভুক্ত ক'রে দেখান); ওদিকে কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে অতীত সম্পর্ক সুররিয়্যালিস্টদের কোয়ালিশন রাজনীতি করতে দেয় নি। মগ্নচৈতন্যবাদ ও মার্কসবাদ পরস্পর পৃথক ধারণা রূপে চিহ্নিত হল।

এভাবে চ্যালেঞ্জের সামনে পড়ে মগ্নচৈতন্যবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে এপর্যন্ত সর্বাধিক যন্ত্রণাদায়ক ফাটল ধরে ১৯৩০ থেকে ১৯৩২ সালে। গোষ্ঠীর কয়েকজন মতবাদ ত্যাগ করে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। এদের মধ্যে ছিলেন মগ্নচৈতন্যবাদের অন্যতম প্রবর্তক লুই আরাগঁ, বুনুয়েলের ঘনিষ্ঠ দুজন—দুটি ছবিতে তার সহযোগী পিয়ের উনিক এবং জর্জ সাদুল যিনি পরে চিত্রঐতিহাসিক হয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে এরা বুনুয়েলের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

অবশিষ্ট মগ্নচৈতন্যবাদীরা ব্রেতঁর নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে দূরে থাকেন যদিও বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড থেকে সরে আসেন না। বুনুয়েল ১৯৩২ সালে সরকারীভাবে শুধু গোষ্ঠী ত্যাগ করলেন, তবে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক, অন্তত নিজের, তিনি বজায় রাখেন। একটি আধুনিক জীবনীতে অবশ্য পাওয়া যায় যে যারা কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন তিনি তাদের অন্যতম ছিলেন এবং ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত সদস্যপদ রেখেছিলেন।

ব্রেতঁই 'দি গোল্ডেন এজ' সংক্রান্ত বিতর্কের অবসান ঘটান। ১৯৩৭ সালে এক লেখায়, যে use-value কে তিনি নিজে বহুযত্নে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তাকেই অস্বীকার ক'রে 'দি গোল্ডেন এজ'কে মগ্নচৈতন্যবাদের নামে আবার উদ্ধার করলেন ঃ

"তাৎক্ষণিক প্রচারমূলক লক্ষ্যের কাছে সবকিছু সমর্পণ করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কয়েকজন তুচ্ছ বিপ্লবীদের প্ররোচনায় তিনি 'দি গোল্ডেন এজ'-এর একটি 'শুদ্ধকৃত' সংস্করণ "In the Icy Water of Egotistical Calculation-'এর মত ইঙ্গিতপূর্ণ নামে (কেবলমাত্র ভালো ধারণা সৃষ্টির জন্য) শ্রমিক শ্রেণীর কাছে প্রদর্শনের জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন, কিংবা নিজের নীতি থেকে সরে এসেছিলেন—এসব কথা চিন্তা করে

আমি দুঃখ পাই। 'দি গোল্ডেন-এজ'এর মত একটি সৃষ্টি, যাকে মানুষের প্রকৃত দাবীর পর্যায়ে নামিয়ে আনা যায় না, তার মধ্যে কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোর প্রথম কয়েকটি পাতা থেকে মার্কসের কিছু কথা ঢুকিয়ে দেওয়াটা কিছু লোকের কাছে শিশুসুলভ নিশ্চিন্তি এনে দিতে পারে সম্ভবত—এটা দেখিয়ে দেবার মত নিষ্ঠুর আমি নই।"

যে রহস্যময় ঘটনাটিকে ব্রেত্তঁর স্মৃতি দাবী করছে তার যাথার্থ্য সন্দেহজনক হতে পারে, কিন্তু মোদ্দা বিষয়টি সম্পর্কে তিনি সঠিক—'দি গোল্ডেন এজ' প্রথমত একটি মগ্নচৈতন্যবাদী ছবি এবং কেবল অনুষঙ্গে মার্কসবাদী।

বুনুয়েলের পরবর্তী এবং তার মগ্নচৈতন্যবাদী যুগের তৃতীয় শেষ ছবি 'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড' নামক স্বল্পদৈর্ঘ তথ্যচিত্র (Terre Sans Pain, France 1932)। শ্রেণীটির নির্বাচন বিস্ময়কর ঃ সমস্ত প্রকরণের মধ্যে তথ্যচিত্রই রিয়াল পৃথিবীর বাহ্যিক চেহারাটাকে গুরুত্ব দেয় সর্বাপেক্ষা বেশী ; 'দি গোল্ডেন এজ'-এর ভিত্তি সাবজেকটিভিটির সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতি-ক্রিয়ার কোন স্থান তথ্যচিত্রে নেই। তবু বুনুয়েলের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তথ্যচিত্রকে তার যুক্তিযুক্ত একমাত্র নৈর্ব্যক্তিক data ব্যবহার করে এবং নিজেকে সাংবাদিকের ভূমিকায় আড়াল ক'রে বুনুয়েল রিয়ালিটির এমন একটি ছবি এঁকেছেন যেটি সম্ভবত তার শুদ্ধতম মগ্নচৈতন্যবাদী সৃষ্টি।

'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড'-এর নৈর্ব্যক্তিকতাই ছবিটিকে এক অসহনীয় অভিজ্ঞতা—মগ্নচৈতন্যবাদী অভিজ্ঞতা—করে তোলে। 'দি গোল্ডেন এজ'-এর মত সাবজেকটিভ্ উত্তেজনা আর ছবিটির থিম নয় ; এখানে দর্শকের সচেতনতাই উত্তেজিত হয়।

'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড' ছবিতে বুনুয়েলের সাফল্যের কারণ যেমন বিষয় নির্বাচন—সমাজবিচ্ছিন্ন স্পেনের এক হতদরিদ্র অঞ্চল—তেমন ছবির গঠনও যা দর্শকের লজিকাল প্রতিক্রিয়ার নিয়মানুগ বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে এগোতে থাকে।

১৯৩২ সালে অল্প কয়েকজন কর্মী নিয়ে তিনি স্পেনে গিয়েছিলেন এবং Las Hurdes-এর প্রকৃত ও তার অধিবাসীদের ছবি তুলেছিলেন। মাত্র এক বছর আগে তার স্বদেশভূমি দেশ-ব্যাপী হিংসার মধ্য দিয়ে আধা-সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্র থেকে অস্থির বুর্জোয়া গণতন্ত্রে পরিবর্তিত হয়। নিঃসঙ্গ পাবত্য অঞ্চলটিকে যেটি বুনুয়েলকে আকৃষ্ট করেছিল, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক পালা বদল থেকে বিচ্ছিন্ন মনে হয়। চিরকাল ক্ষুধার্ত দুর্বল কৃষকরা যেন সাময়িক ভাবে প্রাক-ইতিহাসে বাস করে। তাদের কোন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নেই, নিজেদের অবস্থা ভালো করার কোন উপায় নেই, গৃহপালিত পশু অথবা কোন যন্ত্র—কিছুই নেই।

'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড'-এর মূল থিম হচ্ছে শ্রমের চিত্রায়ণ। কিন্তু এ আমাদের পরিচিত সভ্যজগতের সেই শ্রম নয় যা একটি উন্নত সমাজ ব্যবস্থার সমৃদ্ধিতে সাহায্য করে। Las Hurdes -এর কৃষকদের শ্রম হচ্ছে প্রথমবারের জন্য এক বিরোধী প্রকৃতিকে বশ করার প্রচেষ্টা—যে প্রচেষ্টা অনিবার্যভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং তাদের অসম্পূর্ণ সমাজ আবার শূন্যাবস্থায় ফিরে যায়। উদাহরণ স্বরূপ, কৃষকদের বন্ধ্যা নদীতীরে মাটির স্তর বিছিয়ে, আক্ষরিক অর্থে, কর্ষণযোগ্য ভূমি তৈরি করতে হয়. ছবিটি এই অবিশ্বাস্য পদ্ধতিটিকে বৈজ্ঞানিক ডিটেলে ধরে রাখে, এমনকি স্তরগুলির ক্রশ-সেকসানগুলিকে পর্যন্ত আমরা ক্লোজ-আপে দেখতে পাই। কিন্তু ধারাবিবরণীটি যোগ ক'রে দেয়, "মাটি শীঘ্রই নাইট্রোজেন হারিয়ে ফেলে অনুর্বর হয়ে পড়ে।" এছাড়া, শীতকালে নদীগুলি প্রায়ই প্লাবিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে একটা বছরের পরিশ্রম নিশ্চিহ্ন।" বুনুয়েলের ছবিটি প্রকৃতি—যাকে সভ্যতা এখনো বশ করতে পারে নি—এক বিধ্বংসী শক্তি ; অন্নপূর্ণা নয়, কেবল ব্যাধি ও মৃত্যুপ্রদায়িণী।

বুনুয়েলের কাছে কৃষক জীবনের অপরিহার্য উপকরণ হচ্ছে ক্ষুধা। এ সে ক্ষুধা নয় যাকে তৃপ্ত করা যায় কিংবা যা ঐতিহাসিকভাবে রাজনৈতিক সিস্টেমের জন্ম দেয় (এবং সেই সিস্টেম প্রাথমিক প্রয়োজনকে আর মেটাতে না পারলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহও সৃষ্টি করে)। এ ক্ষুধা চিরন্তন, অতৃপ্ত এ ক্ষুধাই জীবন। কৃষকদের দৈন্যদশা বুনুয়েলের অন্য ছবিতে দৃষ্ট কামনার সমতুল্য। অবশ্য কামনার মত এই অসুস্থ অবস্থা কখনো পজিটিভ শক্তি হয়ে উঠে না। কৃষকদের জীবন যেন ক্ষুধা ব্যাধি থেকে পঙ্গুত্ব ও মৃত্যু পর্যন্ত এক ভয়ঙ্কর—যদিও লজিকাল ও স্বাভাবিক—ক্রমপরিণতি। সময় কোন সমৃদ্ধি আনে না, আনে না মৃত্যু ব্যতীত কোন সংবাদ।

এই আগ্রাসী নিয়তিবাদের ওপর বুনুয়েল এমন এক গঠন প্রণালী আরোপ করেন যা আমাদের সেই ভয় থেকে মুক্ত তো করেই না, বরং সেই নীতির অনুধাবনে অবিশ্লেষ্য টেনশন ও বিরোধিতা তৈরী করে। এরকম একটি গঠনপ্রণালী চিত্রকল্প, ভাষ্য ও সঙ্গীতের মধ্যবর্তী টেনশনে তৈরী করা হয়েছে। আবেগহীন ধারাবিবরণী একজন আগ্রহী অথচ নিরপেক্ষ সমাজ-বিজ্ঞানীসুলভ 'মূল্যহীন' ধারণা থেকে কখনোই প্রায় সরে আসে না।

এর বিপরীতে চিত্রকল্পগুলি ভীতিপ্রদ ; আরো বেশি ভীতিপ্রদ এই কারণে যে ক্যামেরা ঘটনাগুলিকে সরল ও দ্ব্যর্থহীনভাবে সম্ভবপর ক'রে দেখায়। একটা গাধাকে মৌমাছি কামড়ে মেরে ফেলে। গয়টার ও অন্যান্য ব্যাধি, সংক্রমণ ও জন্মগত মূর্খতা কৃষকদের পঙ্গু করে দেয়। একটি শিশু মারা যায়—গোরস্থান পর্যন্ত আমরা তার দেহকে অনুসরণ করি।

ছবিটির অসংযত গঠন প্রণালী কিংবা কয়েকটি নাটকীয় দৃশ্য

ও কৌশলকৃত প্রকল্প (যেগুলি অবশ্য সেই যুগের পুনরাভিনীত ডকুমেন্টারীর ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ছিল) সত্ত্বেও সিনেমাটোগ্রাফী যে সর্বগ্রাসী ধারণা রেখে যায় সেটি হচ্ছে এই যে দৃষ্ট বিভীষিকাগুলি বাস্তবই ; ছবিতে বুনুয়েলের 'পরিত্যক্ত' অমসৃণ এডিটিংয়ের কিছু কিছু নমুনা থেকে এই ধারণা আরো জোরদার হয়।

অপরিবর্তনীয়তার বোধ থেকেই ভীতির জন্ম। সুতরাং যে সব দৃশ্যে দেখা যায় যে কৃষকদের আত্মোন্নতির চেষ্টা কেবল তাদের ধ্বংসই দ্রুত ক'রে তোলে—সেগুলিই সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণাদায়ক। নিজের ফোলা ব্যাণ্ডেজ করা হাতটা দেখাতে দেখাতে একজন কৃষক অপ্রতিভভাবে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসে—এই দৃশ্যটির সঙ্গে নির্বিকার ভাষ্যকার জানান : 'সর্পদংশন এমনিতে মারাত্মক নয়, কিন্তু সেটাকে সারাতে গিয়ে কৃষকরা কখনো কখনো ক্ষতিটাতে মারাত্মক সংক্রমণ ঘটিয়ে ফেলে।"

ডকুমেন্টারিটির সঙ্গে রহস্যময়ভাবে ব্যবহৃত ব্রাহ্‌মের সিম্ফনি আমাদের কুৎসিতভাবে মনে করিয়ে দেয় রাজকীয় ইউরোপীয় সভ্যতার কথা—যে সভ্যতা Les Hurdes-এর বিষাক্ত কলঙ্ক নিজের গর্ভে লুকিয়ে রাখে। 'অ্যান আন্দালুসিয়ান ডগ' ও 'দি গোল্ডেন এজ'-এ উনিশ শতকের সঙ্গীত নাটকীয় উপাদান স্বরূপ—কখনো কখনো নিখুঁতভাবে মিশ্রিত, মুড-মিউজিকের প্রায় প্যারডি ; রোমান্টিক সিম্ফনিগুলি ব্যঙ্গাত্মক হয়ে উঠেছে। 'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড' ছবিতে Les Hurdes-এর ভয়ঙ্করতাই ব্রাহ্‌মের মহান সঙ্গীতকে অবক্ষয়ী ব্যঞ্জনায় কলুষিত করে।

নিরপেক্ষ ভাষ্যকারের আড়ালে থেকে বুনুয়েল তার ছবিতে আরেকটি বিশিষ্ট ভঙ্গি আরোপ করেছেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রে, যখনই কৃষকের জন্য কিছু আশা সঞ্চারের সম্ভাবনা দেখা যায়, তখনই সে সম্ভাবনাকে অনিবার্যভাবে পরবর্তী সংবাদ নষ্ট করে দেয়। ফল খেয়েই লোকেরা বাঁচে, আবার ফল খেলে আমাশয়ও হয়। তাদের গাছপালা আছে, কিন্তু পোকামাকড়ে সেগুলো খেয়ে ফেলে। তাদের তৈরি করা ক্ষেত সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট কিংবা অনুর্বর হয়ে যায়। সেখানে মৌচাকও আছে (অপেক্ষাকৃত ভালো অঞ্চল থেকে ধার করে আনা) কিন্তু মৌমাছিরা অত্যন্ত তেঁতো মধু তৈরি করে এবং প্রায়ই জন্তুজানোয়ারের মৃত্যুর কারণ হয়। আপাত-দৃষ্টিতে বিজ্ঞান সম্মত ঘটনা সংগ্রহের বাইরে না গিয়েও দর্শকের বুর্জোয়াসুলভ আশাবাদ—সভ্য মানসিকতার 'স্বাভাবিক' দৃষ্টি-ভঙ্গি—সমূলে তিনি বিনষ্ট করেন।

কিন্তু বাইরের সাহায্য ? চার্চ সেখানে উপস্থিত, কিন্তু তার ক্ষয়িত কীর্তি এখন বহুদিন আগে শেষ হয়ে যাওয়া প্রাচীন উপনিবেশের ধ্বংসাবশেষের মত। চার্চই সমৃদ্ধির বাহক—এই দাবী যেন এক পরিহাস কারণ কৃষকদের জন্য মৃত্যুর অস্তিত্ব প্রকাশ করা ছাড়া চার্চ কিছুই করে না।

আধুনিক সমাজের সঙ্গে কৃষকদের অবশ্য একটি যোগসূত্র আছে—সেটি সদ্যগঠিত স্কুলবাড়ি। আমদানীকৃত এই শিক্ষাকে কৃষক জীবনে সম্ভাবনাপূর্ণ উন্নতি হিসেবে মনে করাই হচ্ছে উদার দর্শকের তাৎক্ষণিক অনুভূতি। কিন্তু সিকোয়েন্সটি একথাই প্রমাণ করে যে, উপবাসী শিশুকে অঙ্ক শেখায় যে শিক্ষাব্যবস্থা তা সম্পূর্ণ অক্ষম। আরো চিন্তার বিষয়, যে বুর্জোয়া শিক্ষা বস্ত্রহীন শিশুর পাঠ্যতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শৌখিন পোষাকপরিহিত মহিলার ছবি দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করে এবং 'অপরের সম্পত্তি শ্রদ্ধা' করতে শেখায়, তা নিষ্ঠুর।

'এই নগ্নপদ জীর্ণ পোষাকপরিহিত শিশুরা পৃথিবীর অন্যান্য শিশুদের মত একই প্রাথমিক শিক্ষা পায়। এই বুভুক্ষু শিশুদেরও শেখানো হয় যে-কোন ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ।' এটিকে বুনুয়েলের মন্তব্যহীন কথকের অন্তর্ঘাতমূলক ব্যবহারের দৃষ্টান্ত বলা যায়। যে বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থাকে বর্ণনা করা হচ্ছে তারই অন্তর্গত বৈপরীত্যকেই ধারাভাষ্য, ছোট করে, স্পষ্ট করে তোলে। মানবতাবাদী সচেতনতা ('শিক্ষা সর্বত্র এক') আবছা জানে যে তা বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় (উপবাস, জীর্ণ পোষাক, নগ্নপদ), কিন্তু বৈষম্যটাকে কখনই প্রত্যক্ষ বৈপরীত্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয় না।

অন্যান্য প্রধান দৃশ্যেও বুনুয়েল একই গঠনকৌশল ব্যবহার করেছেন। ম্যালেরিয়ার উপদ্রব সম্পর্কিত সিকোয়েন্সটি তথ্যচিত্রের ভিতরে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করে—পর্দায় পাঠ্য বইয়ের মশার ছবি, সঙ্গে ক্ষতিকর ও নির্দোষ মশার লক্ষণগুলি সাবধানে বর্ণনা করেন ভাষ্যকার। অন্তর-দৃষ্ট তথ্যচিত্রটি অবশ্য swamp রোগাক্রান্ত কৃষকদের কাছে অপ্রয়োজনীয় কারণ, দর্শক ছাড়া তাদের উদ্দেশ্যেও যদি বলা হয়ে থাকে, তবু এবম্বিধ জ্ঞান কাজে লাগাবার মত বিজ্ঞান তাদের আয়ত্ত নয়। আর একটি সিকোয়েন্সে নির্মাতারা পথে পড়ে থাকা একটি ছোট মেয়ের সাক্ষাৎ পান। তিনদিন ধরে একদম নাড়াচড়া না করে মেয়েটি পড়ে আছে। তার যন্ত্রণা হচ্ছে, সম্ভবত সে অসুস্থ, কিন্তু তার অসুখটা আমরা ধরতে পারছি না। আমাদের একজন মেয়েটির কাছে গিয়ে তার গলাব্যথায় কারণটা বার করতে চেষ্টা করে। তিনি মেয়েটিকে মুখ খুলতে বললেন, দেখা গেল তার মাড়ি আর গলা জ্বলছে।" ক্যামেরার নির্বিকার চোখের সামনে একজন মেয়েটির খোলা মুখটা ধরে থাকেন।

মশক সংক্রান্ত ইনসার্টটির মত বাইরে জগতের এই হস্তক্ষেপ —তাও অন্য কারোর নয়, ছবির নির্মাণদলের—অক্ষম মনে হয়। তার কারণ এটি অপ্রয়োজনীয় বা ইচ্ছাকৃতভাবে নিষ্ঠুর যাই হোক না কেন। অপরিবর্তিত স্বরভঙ্গিতে বিবরণী চলতে থাকে "দুর্ভাগ্যবশত আমরা মেয়েটির জন্য কিছুই করতে পারি না। গ্রামটিতে দুদিন বাদে আমরা ফিরে এসেছিলাম। মেয়েটি কেমন আছে খোঁজ করায় জানতে পারলাম সে মারা গেছে।"

ক্যামেরা মেয়েটির খোলা মুখের ক্লোজ-আপ নিয়েছে বলেই যেমন আমরা তার অসুস্থতার কারণ বার করতে পারি না, তেমনি চিত্র নিমাতারা যদি মেয়েটির মৃত্যুকে আটকাতে না-ই পারলো, তবে তাদের ছবি করার দরকারটা কি? বুনুয়েল তার তথ্যচিত্রটিকে সম্পূর্ণ সামাজিক দিক দিয়ে নিষ্ফল সংস্কৃতি ও মানবজাতির ঐতিহ্যের মধ্যে প্রকাশ করেন এবং তারপরই অলক্ষিতে স্পষ্ট করেন প্রতিপাদ্যটি—তথ্যচিত্রনির্মানসহ সমস্ত ঐতিহ্যটাই অক্ষম। ছবিটি প্রকৃতপক্ষে তার নিজস্ব প্রেমিসটাকে ভেঙে ফেলে এবং সেটা করতে গিয়ে মানবতার আশ্রয়টাকে ধ্বংস করে।

স্পেন ও ইউরোপের সর্বত্র যখন সহিংস রাজনৈতিক অভ্যুত্থান চলছিল এবং বাম ও দক্ষিণপন্থীদের সংঘর্ষ তীব্রতর হচ্ছিল ক্রমশ—সেই অবস্থার মধ্যে নির্মিত 'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড' সমাজের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক চরিত্রটা ভেঙ্গে ফেলে তার প্রাগৈতিহাসিক চেহারাটা—যখন প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই ছিল মানুষের সর্বাত্মক কর্তব্য—পরিস্ফুট করে। তবু তিনি জোর দিয়ে বলেন যে এই সমাজই, যার অ-সভ্য ভয়ঙ্করতা আমরা চেতনা থেকে প্রায় মুছেই ফেলেছি, আমাদের সভ্যতারই অঙ্গ। কৃষকদের জীবনের সঙ্গে নিজেদের জীবন মেলাতে গেলেই আমাদের যে বিচ্ছিন্নতা, অসহায়তা দেখা যায়, তার মধ্যেই বুনুয়েলের ছবির চূড়ান্ত বিভীষিকা। কৃষকরা আমাদের মতই মানুষ, অস্তিত্বের প্রাত্যহিকতায় ব্যস্ত। তবু প্রায় অবিশ্বাস্য কোন বন্য শক্তি তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে স্বাভাবিক লক্ষ্য থেকে সরিয়ে দেয়।

এসব সত্ত্বেও 'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড' ছবিটির সমকালীন রাজনৈতিক ব্যাখ্যা করা যেতে পারে—উদারপন্থী রাজনীতি সমেত বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রগতিবাদী বহিরঙ্গকে অস্বীকার করে ছবিটি র‍্যাডিকাল হয়ে উঠেছে। বস্তুত এই বৈপ্লবিকতা ভুল করে স্পেনীয় রাজনীতিতে অসময়ে আবির্ভূত হয়েছিল। একবছরের পুরনো, ভিতরে ভিতরে ছিন্ন ভিন্ন, প্রতিশ্রুত সংস্কার সাধনে অপারগ, ক্ষমতার জন্য দক্ষিণপন্থী আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত প্রজাতন্ত্র অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছিল বটে। কিন্তু একটি অসাধারণ সংস্কারের কৃতিত্ব সে দাবী করতে পারে—দেশের অনুন্নত অঞ্চলে বহু ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্যালয় স্থাপন। তবু এটি এমন একটি ছবি যা শুধু স্পেনকে সাধারণত অনাকর্ষক আলোকে দেখায় না। নতুন সরকারের অহংকারযোগ্য কীর্তিকেও আঘাত করে।

"স্পেনের পক্ষে অসম্মানজনক' আখ্যা দিয়ে জামোরা প্রশাসন বুনুয়েলের ছবিকে নিষিদ্ধ করে এবং অন্য দেশকেও ছবিটির প্রদর্শন না করতে অনুরোধ করেন। কেবলমাত্র ১৯৩৭ সালে ফ্রান্সে ছবিটি মুক্তি পায়। স্পেনের পরবর্তী প্রজাতন্ত্রী ফ্র্যাঙ্কো সরকারও নিষেধাজ্ঞা চালিয়ে যান।

এখান থেকে বুনুয়েলের অজ্ঞাতবাসের পালা শুরু হয়েছে। নিখুঁত সুররিয়ালিস্ট রীতিতে তিনি নিজের ভবিষ্যতের পায়ে কুঠারাঘাত করলেন। রাজনৈতিক দিক দিয়ে অন্তর্ঘাতমূলক—এই অভিযোগে তার দুটি ছবি নিষিদ্ধ হল। নিজের ছবি প্রযোজনা করার সঙ্গতি তার ছিল না ('দি গোল্ডেন এজ' ও 'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড' একক পৃষ্ঠপোষকের অর্থানুকূল্যে নির্মিত)। সৃষ্টিক্ষম সাহায্যের উৎস হিসেবে দ্বিখণ্ডিত মগ্নচৈতন্যবাদী গোষ্ঠীর কাছে চাইবার কিছু ছিল না। কমার্শিয়াল চলচ্চিত্র শিল্প ক্রমশ প্রতিক্রিয়ার স্তম্ভ হয়ে উঠছিল; চেষ্টা করেও বুনুয়েল ব্যবসায়িক পরিচালক হিসেবেও এমন কোন কাজ পেলেন না যা তার শিল্পীসুলভ নান্দনিক ও রাজনৈতিক সত্তাকে অক্ষুণ্ণ রাখে। অগত্যা বিভিন্ন ফিল্মশিল্পে ছোটখাট কাজ করা ছাড়া তার উপায় ছিল না। পনেরো বছরের আগে তিনি আর কোন ছবি পরিচালনা করেন নি।•

১৯৩২ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত স্পেন, ফ্রান্স, নিউইয়র্ক ও হলিউডে, পরিচয় গোপন রেখে, পর্যবেক্ষক, কার্যকরী প্রযোজক কিংবা সম্পাদক হিসেবে ছবিতে কাজ করেছিলেন, কিন্তু কোন সৃজনশীল ভূমিকা পালন করেন নি। এই যুগে তিনি কয়েকটি ছবি করেছিলেন, তবে সর্বদা অজ্ঞাত পরিচয়ে। ১৯৩৫-৩৬ সালে তিনি যে চারটি স্বল্পায়ু কমেডি প্রযোজনা করেছিলেন তাতে পরিচালক হিসেবে অজ্ঞাত থাকাটা শিল্পীসুলভ অহঙ্কার হতে পারে; তবে প্রজাতন্ত্রপন্থী Spain 1937 ছবিতে নিরুদ্দিষ্ট ক্রেডিট নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক সুবিবেচনার ফল।

'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড'-এর পরে বুনুয়েল ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির গৃহীত নির্দিষ্ট মার্কসবাদের আরো কাছাকাছি চলে আসেন। আমরা আগেই দেখেছি ১৯৩০-৩২-এর ঘটনার ফলে তাদের পরস্পর বিরোধীতে পরিণত হওয়া পর্যন্ত সুররিয়ালিস্ট ও কম্যুনিস্টদের সম্পর্কটা চিড় খাওয়া ছিল। ভাঙ্গনের পরও এককভাবে সুররিয়ালিস্টদের অন্য শিবিরে যাতায়াত অস্বাভাবিক ছিল না (এদের মধ্যে এলুয়ার, বুনুয়েল, উনিক এমন কি ব্রের্তঁও ছিলেন)। 'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড'-এর দুজন সহযোগী লোটার ও উনিক পার্টি সদস্য ছিলেন।

আগে আমরা আরো দেখেছি যে 'দি গোল্ডেন এজ' ও 'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড'-ছবিতে অভিব্যক্ত বুনুয়েলের সমাজ ভাবনা, নান্দনিক অথবা ভাবগত বৈশিষ্ট্য, মার্কসবাদের কাছে ঋণী নয় যদিও উভয় ছবিই মার্ক্সবাদের সঙ্গে অস্বাভাবিক মাত্রায় সহাবস্থান করে। খারকভ ভাঙ্গনের পরও কিংবা নিজে সুররিয়ালিস্টদের ত্যাগ করা সত্ত্বেও, তত্ত্বের দিক দিয়ে বিপ্লবী শিল্পী হবার জন্য একমাত্র মগ্নচৈতন্যবাদের প্রতিই বিশ্বস্ত থাকা বুনুয়েলের প্রয়োজন ছিল। কোন সরকারী মার্ক্সবাদী রসতত্ত্ব—তা সে আইজেনস্টাইন বা সোস্যালিস্ট বাস্তবতার রসতত্ত্ব, যাই হোক

না কেন, কোনটাকেই তিনি অনুমোদন করতেন না—অনুসারে মগ্নচৈতন্যবাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করার কোন প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন নি। ১৯৩৫ সালে Nuestro Cine নামক সাম্যবাদী সাময়িক পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে বিনীত অথচ দৃঢ়ভাবে তিনিই এটা বোঝাতে চেয়েছেন ঃ

আইজেনস্টাইনের মনটি এক বৃদ্ধ আর্ট অধ্যাপকের। তাকে আমি বুঝতে পারি না। তার সৃষ্টিকর্মে যেটি প্রশংসনীয় সেটি হচ্ছে এই যে শ্রেণীশত্রুর হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করেছে এমন এক জাতি দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত। প্রত্যেক শিল্পে, এমনকি বিমূর্ততম শিল্পেও, একটি মতাদর্শ, নৈতিক ধ্যান ধারণার সম্পূর্ণ সিস্টেম থাকে। ১৯১৮ সালে ফিউচারিজম এবং দাদাইজম উভয়ই কলাকৈবল্যবাদ হিসেবে নিন্দিত ছিল। সময় প্রমাণ করেছে যে ফিউচারিজমের মধ্যেই ফ্যাসিস্ট শিল্পের বীজ লুকিয়েছিল এবং দাদাইজম (মগ্নচৈতন্যবাদের পূর্বসূরী) ঐতিহাসিক বস্তুবাদের রূপ নেয়।

প্রশ্ন ঃ আপনার 'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড' ছবিকে আপনি কি হিসেবে দেখেন—রেক্টিফিকেশন না বিবর্তন ?

উত্তর ঃ অবশ্যই আমি ছবিটিকে আমার কর্মজীবনের সম্প্রসারণ হিসেবে দেখি।

কার্যত অবশ্য ব্যাপারটা অন্যরকম। তখন হিটলার জার্মানীতে ক্ষমতা পেয়েছেন এবং ১৯৩৬ সালে ফ্র্যাঙ্কো 'জেনারেলদের বিদ্রোহ' নেতৃত্ব দিলেন যার পরিণতিতে স্পেনে গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। এই হতভাগ্য দেশটি ফ্যাসিস্ট ও কম্যুনিস্টদের আসন্ন যুদ্ধের পরীক্ষাক্ষেত্র হয়েছিল। ছ'বছর আগে নিঃসঙ্গ বামপন্থী মতাদর্শ হয়ত সুররিয়ালিস্টদের পক্ষে গ্রহণীয় হতে পারতো যদিও কম্যুনিস্ট পার্টিও তখন অন্য বক্তব্য রেখেছিল ; এখন এবম্বিধ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্পষ্টতই অপ্রাসঙ্গিক ও সম্ভবত বিভেদ সৃষ্টিকারী।

তবে সুররিয়ালিজম যে স্বভাবতই মার্কসবাদে পরিণত হয় তা নয়—সুররিয়ালিস্টরা বা বুনুয়েল এ বিষয়ে যতই আপত্তি করুন না কেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে সালভাদোর দালির কথা ধরলেই চলবে ; একদা বুনুয়েলের বন্ধু ও সহনির্মাতা দালি বিন্দুমাত্র কম সুররিয়ালিস্ট না হয়েও দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে যোগ দেন। (সুররিয়ালিস্টরা তাকে তার রাজনীতির জন্য বহিষ্কৃত করেন)। এবং, একটি বিশেষ রাজনৈতিক মত তার উদ্দীপ্ট হোক বা না হোক, বুনুয়েলের নিজের 'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড' কি রণক্লান্ত প্রজাতন্ত্রের ক্ষতি করেনি ?

আগে না হলেও অন্তত এই সংকট মুহূর্তে তিনি কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে হাত মেলাতে রাজী ছিলেন এবং তার কর্মজীবনে একমাত্র এই সময়ই তিনি নিজের শিল্প, নিজের মৌলিকত্ব রাজনৈতিক প্রয়োজনে বদলালেন। পার্টিকে অবশ্য নিজেই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হল। স্প্যানিশ পার্টি অবশ্য পপুলার ফ্রণ্টের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ; ফ্রান্সে কম্যুনিস্ট পার্টি উদারপন্থী বুর্জোয়া শ্রেণীকে দক্ষিণপন্থীদের থেকে সরিয়ে আনার জন্য সংগঠিত যুক্তফ্রণ্ট-রাজনীতি সমর্থন করে কিছু সংসদীয় সুবিধা আদায় করে নিয়েছিল—তার বিনিময়ে লড়াকু শ্রেণীচেতনার বিকল্পে 'বামপন্থী' জাতীয়তাবাদ গ্রহণ করতে হয়। ১৯৩৫ সালে নিজের সাধারণ পথের পরিবর্তন করে সোভিয়েত ইউনিয়নও ঐ নতুন রাজনীতির পথ প্রশস্ত করে।

এই অস্পষ্ট যুগের প্রায় কোন ছবিই টিঁকে নেই। লিখিত বিবরণ অত্যন্ত পরস্পর-বিরোধী বলে এর অপ্রত্যক্ষ গুরুত্বও বিচার করা কঠিন। বুনুয়েল ভক্তরা দাবী করেন যে অজ্ঞাতভাবে যে সব বিভিন্ন ছবি তিনি সম্পাদনা করেছিলেন সেগুলি তার নিজের সৃষ্টি হিসেবেই স্থান পাবার যোগ্য। বুনুয়েল অবশ্য বলেন যে ছবিগুলিতে তার ভূমিকা সৃজনধর্মী নয়, প্রশাসনিক। এবং এ কারণেই একটি টিঁকে থাকা ছবি 'স্পেন ১৯৩৭'-এর গভীর নিরীক্ষা প্রয়োজন—বুনুয়েলের সৃজনশীল নির্মাণের মধ্যে ছবিটার স্থান অতিরঞ্জিত না করেও একথা বলা যায়।

বুনুয়েলের দেশে তখন যে গৃহযুদ্ধের ঝড় বইছিল, তার উপর তথ্যচিত্র হচ্ছে 'স্পেন ১৯৩৭' (Espagne, 1937, France, 1937)। ১৯৩৭ সালেও, আমাদের স্মর্তব্য, স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধের প্রকৃত ইস্যুগুলি সাধারণের গোচর থেকে অনেক দূরে। আক্রমণ সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বকে বিশ্বাস করানো যে কতটা কঠিন, তা অবিশ্বাস্য। জাতীয়তাবাদীদের অস্ত্র ও সৈন্য সরবরাহ করা বন্ধ না করেও ১৯৩৭ সালে জার্মানী ও ইটালী সরকারীভাবে আন্তর্জাতিক অনাক্রমণ পর্যবেক্ষক প্যাট্রলে অংশ গ্রহণ করছিল। জোরিস ইভেন্স বলেছেন যে তার 'স্প্যানিশ আর্থ' নামক ছবি, ১৯৩৭ সালে নির্মিত, ইটালী ও জার্মানীর আক্রমণ সম্পর্কিত সমস্ত উল্লেখ ধারাবিবরণী থেকে বাদ দেওয়া পর্যন্ত ইংলণ্ডে নিষিদ্ধ ছিল। বহু দেশের কম্যুনিস্ট এবং যুক্তফ্রণ্টের গোষ্ঠীগুলি এই 'নৈঃশব্দের চক্রান্ত' ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কম্যুনিস্টরা গৃহযুদ্ধকে ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক প্রতিরোধের সংগ্রাম হিসেবে প্রচার করার উদ্দেশ্যে 'স্প্যানিশ আর্থ' এর মত অজ্ঞাত পরিচয় 'স্পেন ১৯৩৭' ছবিটি স্পেনে নির্মাণ করেন।

বর্তমান ফুটেজ থেকে সম্পাদিত একটি সংকলন-চিত্র হচ্ছে 'স্পেন ১৯৩৭' (ভিন্নভাবে সম্পাদিত কিছুটা উপকরণ অবশ্য পাওয়া যায় ১৯৬৫ সালে সংকলিত Frederic Rossif এর 'টু ডাই ইন মাদ্রিদ' নামক ছবিতে)। ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৩৭-এর ফেব্রুয়ারী—এই একবছর ছবিটির ঘটনাকাল ; শুরু হয় পপুলার ফ্রণ্টের বিপুল জয় থেকে যার ফলে Manuel Azana-র শাসন Zamora প্রশাসনের স্থলে অধিষ্ঠিত হয়। ছবির বক্তব্য অনুযায়ী নতুন সরকারের উদারনৈতিক ও জনপ্রিয় সংস্কারগুলিকে দক্ষিণপন্থী প্ররোচনা খারাপ করে দেয়। এর

ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা দেয় ১৯৩৬ সালে ফ্র্যাঙ্কোর Putsch-এর সন্ত্রাসবাদ। প্রজাতন্ত্রী ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে রাস্তার লড়াই ব্যাঙের ছাতার মত গৃহযুদ্ধে ছড়িয়ে পড়ে।

স্থলযুদ্ধ পরিণত হয় আকাশ যুদ্ধে—গৃহযুদ্ধ হয়ে ওঠে বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সংগ্রাম যখন গণসেনার সংগঠন প্রতিহত করে ইটালী ও জার্মানীর তৈরি বোমার বর্ষণ। ১৯৩৬ সালে মাদ্রিদ অবরুদ্ধ হয়, প্রজাতন্ত্রীরা সেই অবরোধ কঠিন মূল্যের বিনিময়ে ছিন্নভিন্ন করেন। এই ঘটনাটিও ছবিতে বর্ণিত। সংঘবদ্ধ জনগণের ওপর সশস্ত্র সংগ্রামের পজিটিভ ফলগুলিও—শিল্পবাণিজ্যের রূপান্তর, শিক্ষা, সাম্য, স্বাস্থ্য ও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি—বিশ্লেষণ করেছে। প্রান্তিক অঞ্চলে ফ্যাসিস্টদের ধ্বংসলীলা ও মাদ্রিদে নিরন্তর প্রতিরোধের বৈপরীত্য ছবিটির শেষ সিকোয়েন্সে ফুটে উঠেছে। ছবিটি শেষ হয় এক আকস্মিক প্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তিতে, যার ফলে গৃহযুদ্ধ প্রকৃত আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গে স্থাপিত হয়। "বিমান ব্যবস্থা, পদাতিক বাহিনী, ট্যাঙ্ক, যুদ্ধ জাহাজ—এসবই এক বছরের মধ্যে নির্মিত হয়েছে। ইউরোপের শান্তি ও ভবিষ্যতের জন্য স্পেন রক্ত দান করছে।"

প্যারিসে অবস্থিত প্রজাতন্ত্রী স্পেনের দূতাবাসের মাধ্যমে 'স্পেন ১৯৩৭' প্রযোজিত। ছবিটির তিনজন নির্মাতাই কম্যুনিস্ট কিংবা তাদের নিকট সমর্থক। সম্পাদক Jean-Paul Dreyfus পরে নিজ ক্ষমতায় Le Chanois নামে চিত্র পরিচালক হন। ১৯২৭ সালে Pierre Unik ব্রেতঁর সঙ্গে পার্টিতে যোগদান করেন। ১৯৩২ সালে সুররিয়ালিস্টদের সঙ্গে বিচ্ছেদ হবার পর, বুনুয়েলের মত, তিনিও বোধ হয় উভয় তত্ত্বের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার চেষ্টা করেছিলেন। 'ল্যান্ড উইদাউট ব্রেড' ও 'স্পেন ১৯৩৭', উভয় ছবিরই বিবরণী তিনি লিখেছিলেন।

ফ্রান্সে রিপাব্লিকান দূত ছিলেন Luis Araquistain, তিনি সংস্কারপন্থী বুর্জোয়া সোস্যালিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। পপুলার ফ্রন্টের শরিক কম্যুনিস্টদের সঙ্গে তার পার্টির সহযোগিতায় তিনি বিক্ষুব্ধ ছিলেন এবং পরে তিনি উগ্র কম্যুনিস্ট বিরোধী হয়ে পড়েন। ১৯৩৭-এর গোড়ার দিকে Araquistain দেখলেন যে প্রজাতন্ত্রের একমাত্র অবলম্বন হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সম্ভবত একারণে সোস্যালিস্ট ও কম্যুনিস্টদের আঁতাত সমর্থন করেছিলেন। এইজন্যই দূতাবাস ছবিটিকে স্পনসর করে।

'স্পেন ১৯৩৭' ছবির রাজনীতি যুক্তফ্রন্টের মতকে প্রতিফলিত করে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নেতৃস্থানীয় ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলন হিসেবে পপুলার ফ্রন্টকে প্রাধান্য দেয়। শ্রেণী সংগ্রামের থিমটিকে সতর্কতার সঙ্গে একটি বিশিষ্ট স্তরে উপস্থাপিত করা হয়। এই স্তরটিই ঐক্যবদ্ধ জনসাধারণকে (ধারাভাষ্যকার অনুসারে, "ছাত্র, কেরাণী, ওয়েটার, চিকিৎসক, ড্রাইভার, লেখক, শিক্ষক, শ্রমিক, সব শ্রেণীর ও অবস্থার মানুষ") সংখ্যালঘু প্রতিক্রিয়াশীল যুদ্ধবাজ থেকে আলাদা করে রাখে। দ্বিতীয়োক্তরাই জুলাইয়ের আগে পর্যন্ত প্রজাতন্ত্রের নামমাত্র সেবক সৈন্যবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করত। ("প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক" এই ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যবাহিনী কুচকাওয়াজ করে। কিন্তু বিশেষ এক শ্রেণীর স্বার্থেই এই বাহিনী তৈরি করেছে......")

সংগ্রাম যখন বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে প্রসারিত, সমস্ত আবেদন থেকেই শ্রেণীসূচক শব্দসম্ভার এবং বস্তুত, জাতীয় পরিভাষাও ত্যক্ত হয়। রাজনৈতিক কারণে বিদেশী হানাদারদের কখনোই মৌখিকভাবে ইতালীয় বা জার্মান বলে চিহ্নিত করা হয় না। বরং 'স্পেন ১৯৩৭' 'দি স্প্যানিশ আর্থ'-এর অনুরূপ একটি সংক্ষিপ্ত এফেক্ট ব্যবহার করে। Guadalajara-তে উৎপাটিত শত্রুদের পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র প্রজাতন্ত্রীরা দখল করে নেয়। ভাষ্যকার বলেন "অবশ্যই সেগুলি বিদেশী অস্ত্র"। ক্লোজ-আপে দেখা যায় অস্ত্রের বাক্সগুলোর লেবেলগুলি ইতালীয় ভাষায় লেখা।

সে যুগের যুক্তফ্রন্টের জন্য প্রচারের সদৃশ দ্বৈত ভাষার প্রয়োগ আরো সাধারণ স্তরে প্রকাশিত। 'প্রগতিবাদী' শব্দটি উদারনৈতিক সংস্কার বোঝায় এবং এইজন্যই সহানুভূতিসম্পন্ন বুর্জোয়া শ্রেণীকে বিচ্ছিন্ন করে না ; আবার সংগ্রামীদের কাছে তার অর্থ ঐতিহাসিক ভ্যানগার্ড, কোয়ালিশনের বামপক্ষ। এমন কি 'প্রজাতন্ত্রী' শব্দটির দ্বৈত অর্থে সমৃদ্ধ—বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র অথবা তারই গর্ভস্থ সর্বহারার প্রজাতন্ত্র। পপুলার ফ্রন্টের সাধিত সংস্কার ও সার্বিক শৈথিল্যগুলির সংখ্যা হিসেব করতে গিয়ে (যার মধ্যে বিশেষ ভাবে বলা হয়, "সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা সরকার মেনে নেয়।") ধারাভাষ্যকার গুপ্ত ডায়ালেকটিক দিয়ে উপসংহার টানেন, "প্রজাতন্ত্র, যাকে সমগ্র স্পেনবাসীর সাংবিধানিক সরকার বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, প্রকৃত প্রজাতন্ত্র হতে আরম্ভ করেছে।"

অবশ্য একই গোপনীয়তায় অধিকাংশ যুক্তফ্রন্টীয় প্রচার 'প্রগতিবাদী' বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র কখন বা কীভাবে সর্বহারার বিপ্লব সৃষ্টি করবে তা নির্দেশ করা এড়িয়ে যায়। বাস্তব ঘটনা থেকে সূত্র নিয়ে 'স্পেন ১৯৩৭' এমন এক কর্মপদ্ধতির চারপাশে গঠিত যার দ্বারা জনগণের গেরিলা যুদ্ধ এক অস্পষ্ট সাম্যবাদী সমাজের জন্ম দেয়। সংগ্রাম সৃষ্টি করে গণসংহতি যার সামরিক ও রাজনৈতিক নেতারা "সাধারণ মানুষের স্তর থেকেই আসেন।" Azana সরকারের 'প্রগতিশীল' নীতির অস্থির সমর্থক প্রারম্ভিক সিকোয়েন্সগুলির বিপরীতে শেষ সিকোয়েন্সগুলি সরকারী নেতৃত্বকে অবহেলা করে প্রকৃত নেতৃত্ব অর্থাৎ আসল প্রজাতন্ত্রের ওপর প্রাধান্য সরিয়ে আনে। এরাই জনগণের মিলিশিয়া—একদিকে সমরাঙ্গনে যুদ্ধরত, অন্যদিকে সুসম এক সমাজের স্রষ্টা।

তাদের নেতাদের মধ্যে বিশিষ্ট হলেন কম্যুনিস্ট রাজনৈতিক কমিশনার যার ভূমিকা, "তাকে এ কাজের কেন্দ্রে স্থাপন করে। তার দায়িত্ব হচ্ছে গণসেনার সচেতনতাকে তৈরী করা।" (কমিশার আন্তনকে নামে পরিচিত করা হয়, কিন্তু কম্যুনিস্ট হিসেবে নয়)।

আসলে এরকম একটা কিছু প্রজাতন্ত্রীদের দখলে থাকা মাদ্রিদে ঘটছিল। অবরুদ্ধ রাজধানী ত্যাগ করে প্রজাতন্ত্রী সরকার ভ্যালেন্সিয়ার দিকে পালিয়ে গিয়েছিল; ইতিমধ্যেই সোস্যালিস্ট পার্টিগুলিকে লিবারালদের থেকে আলাদা করা অসম্ভব হয়ে পড়ছিল, তারা সক্রিয়ভাবে প্রজাতন্ত্রী স্পেনে বিপ্লবকে মন্থর-গতি করতে চাইছিল এবং প্রজাতন্ত্রের কর্তৃত্ব ও জনপ্রিয়তা ভয়ানক কমে গিয়েছিল। কম্যুনিস্টরাই এখন কার্যকরী প্রশাসনিক রাষ্ট্রশক্তি—কেবল মাদ্রিদে নয়, সমগ্র স্পেনে।

'স্পেন ১৯৩৭' ছবিতেই 'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড'-এর ইতিহাস-নিরপেক্ষ গোষ্ঠীর বিপরীতে অবস্থিত এক রাজনৈতিক ইতিহাসের দ্বারপ্রান্তে আমরা উপস্থিত হই। এছাড়া ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি জন্ম নিয়েছে ও গঠিত হয়েছে একটি আদর্শ অনুযায়ী। এই আদর্শ বা প্রগতিবাদী রাজনীতি দ্বারা অস্পষ্টীকৃত মার্কসবাদী বিশ্লেষণ বুনুয়েলের আগের ছবিগুলিতে বাহ্যিক ব্যাপার ছিল।

তবু এছবিতে বুনুয়েলের সৃজনধর্মী ভূমিকা প্রশ্নাতীত। এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত ফুটেজ তিনিই নির্বাচন করেছিলেন। খুব খুঁটিয়ে সম্পাদনা, দেখাশোনা করেছেন, সঙ্গীত নির্বাচন করেছেন এবং তিনিই ধারাবিবরণীর সহ-লেখক। চূড়ান্ত ছবিটিতে (দশ বছর আগে যেটি পূর্বজার্মানীর আর্কাইভে আবিস্কৃত হয়েছে) আগাগোড়া বুনুয়েলের ছোঁয়া পাওয়া যায়।

যেটা বোঝা কঠিন সেটি হচ্ছে ছবিটির আপাত রাজনীতির সঙ্গে বুনুয়েলের সম্পর্ক। পরিহাসমূলক দূরত্বের বৈশিষ্ট্য বা ঘটনা পরম্পরায় পরিপ্রেক্ষিতের অপ্রত্যাশিত মোচড় যোগ করার মধ্যেই ছবিটির প্রতি তার সিনেমাটিক অবদান নিহিত। যদিও এই টাংগুলি রাজনৈতিক বর্ণনার বিরোধিতা করে না কখনো, তবু ধারাভাষ্যে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক রীতি থেকে সেগুলি মাঝে মাঝে সরে আসে।

প্রাথমিকভাবে বুনুয়েল ঘটনার বিশৃঙ্খলায় প্রয়োজনীয় দূরত্ব নিয়ে আসেন। নীরস ধারাভাষ্যটি ভাবাবেগ ত্যাগ ক'রে কেবল ঘটনা বর্ণনা করে এবং 'স্পেন ১৯৩৭' কে 'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড' -এর সঙ্গে সম্পর্কিত করে। নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিটি। অবশ্য বুনুয়েলের পূর্বসৃষ্ট তথ্যচিত্রে প্রযুক্ত নিষ্ঠুরতার মত অতটা তীব্র নয়। কারণ, যাই হোক না কেন, ছবিটির একটি রাজনৈতিক কর্তব্য আছে—গুপ্ত সংঘাতের প্রচার এবং প্রজাতন্ত্রীদের জন্য আমাদের সহানুভূতি ও একতা আদায়। এক্ষেত্রে অস্পষ্ট ধারাবিবরণীই হচ্ছে যুদ্ধের রিয়্যালিটি ও তার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ দর্শকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

তবু মাঝে মাঝে বুনুয়েল আর এক ধরণের—আরো রুক্ষ আয়রনি—দূরত্ব সৃষ্টি করেন অপ্রত্যাশিত কাট্, ইমেজ বা বাগ্‌ধারার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। বর্ণনার সঙ্গে চিত্রের কয়েকটি অসঙ্গতি আমাদের মধ্যে এই ধারণা তৈরী করে সম্পাদক ধারাভাষ্যের সঙ্গে একমত নন এবং তিনি চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে অন্য কিছু বলতে চাইছেন।

ভাষ্যকার জোর দিয়ে বলেন যে, নতুন পপুলার ফ্রণ্ট সরকার প্রগতিবাদী—"প্রজাতন্ত্রের অগ্রগতি আবার আরম্ভ হয়েছে। প্রতিটি দিন নতুন সমৃদ্ধি আনছে, স্পেনবাসীর জন্য খুলে দিচ্ছে নতুন ভবিষ্যতের দরজা।" অবশ্য 'নতুন ভবিষ্যতের' ব্যাপারে আমরা কেবল দেখতে পাই রাজনীতিকদের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসা; এছাড়া সম্পাদকেরাও কয়েকটি জাম্পকাট রেখেছেন যার ফলে রাজনীতিকদের 'অধোগতি' অনন্ত মনে হয়। অনুরূপ কিছু এফেক্ট Azana-এর নির্বাচনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার সমালোচনাই করে। শেষে, যখন ভাষ্যকার আশাবাদের সঙ্গে জোর দিয়ে বলেন যে "নতুন রাষ্ট্রপতি পেয়ে প্রজাতন্ত্র গঠনমূলক কাজ করতে আরম্ভ করেছে....। সমস্ত প্রগতিশীল ব্যবস্থায় জনগণ সরকারকে সমর্থন করেন", তখন অলঙ্কৃত ইউনিফর্ম পরা প্রহরী ও কূটনৈতিক পোষাক পরিহিত রাজনীতিকদের এক সিকোয়েন্সে ঘোড়ায় শহর পরিক্রমারত সম্পূর্ণ রাজকীয় চিহ্নসমেত পালকসজ্জাভূষিত অফিসারদের শটে শেষ হয়। একটাও প্রগতিশীল ব্যবস্থা চোখে পড়ে না।

এটা সম্ভবত ইচ্ছাকৃত স্বাধীনভাষা যা যুক্তফ্রণ্ট তত্ত্বকে তুচ্ছ করে। এটা যেন যুক্তফ্রন্টের বামপক্ষ—তিনি কম্যুনিস্ট চিত্রনির্মাতা যার প্রতিনিধি—বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারিয়ানদের বিদ্রূপ করার সুযোগটা নিয়ে ফেলেছেন অথচ সাউণ্ডট্রাকে তাদের প্রগতিবাদী চরিত্রকে যথাবিহিত শ্রদ্ধাও দেখিয়েছেন।

ফ্র্যাঙ্কোর সন্ত্রাসের উত্তরে বিস্ফোরিত পথযুদ্ধের ভাবাবেগাবিষ্ট দৃশ্যের মধ্যে যে কৌতূহলোদ্দীপক ভাষার মোচড় লক্ষ্য করা যায়—এটাই কি তার কারণ? ব্যারিকেডের পিছন থেকে বন্দুকধারীদের গুলিছোঁড়ার উত্তেজিত যেমন সংক্ষেপে শহরের বাড়িগুলির (তাদের লক্ষ্য?) শান্ত শটের সঙ্গে ইণ্টারকাট করা হয়, যেমনি উত্তপ্ত ধারাভাষ্য রহস্যময়ভাবে এক মুহূর্তের জন্য মৃদু হয়ে আসে, "ব্যারিকেড তৈরী হয়—প্রত্যেক যুগের সামাজিক সংগ্রামের মত।" এরকম সুদূর সরলীকরণের পক্ষে স্থানটি বেয়াড়া। তাছাড়া ব্যারিকেড 'প্রত্যেক যুগের' লক্ষণ নয়। দর্শক, বিশেষত মার্কসবাদী দর্শক, জানেন যে কেবল ১৮৪৮ থেকেই ব্যারিকেড ও সর্বাধুনিক ঘটনা অর্থাৎ বুর্জোয়া রাষ্ট্র ও তার পুলিশের বিরুদ্ধে মেহনতী মানুষের সশস্ত্র অভ্যুত্থান সমার্থক

হয়ে উঠেছে। বুনুয়েল তার অনৈতিহাসিকতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন —এটা সম্ভব মনে হয় না। তাহলে কি তিনি বুর্জোয়া ঐতিহাসিকের আদর্শবাদকে প্যারডি করছেন? এই বৈশিষ্ট্যটি, অন্যান্য অসঙ্গতির মত, মার্কসবাদীদের প্রতি একটি স্বেচ্ছাকৃত গোপন ইঙ্গিত যে এই গৃহযুদ্ধ ১৮৪৮ সালের ব্যারিকেড ও প্যারী কম্যুনের প্রত্যক্ষ উত্তরসূরী এক শ্রেণী সংগ্রাম।

গেরিলাযুদ্ধ ও তার কৌশল ছবিতে ধরতে গিয়ে বুনুয়েল এমন চিত্রকল্প রচনা করেন যাতে সশস্ত্র প্রতিরোধের দায়িত্ব আর সভ্যতার প্রাত্যহিক কর্তব্য মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। এক কৃষক এক হাতে কাপড় সামলায়, অন্য হাতে আঁকড়ে থাকে রাইফেল। ঘোড়ার পিঠেই লোক মেশিনগানে গুলি ভরে নেয়, অন্যমনস্ক, যেন থলেতে আলু ভরছে, তারপর পাথুরে প্রান্তর ধরে এগিয়ে যায়। এই হল গণযুদ্ধের প্রকৃতি; তবু, আদর্শবাদীর চোখে, সর্বত্র-উপস্থিত রাইফেলগুলি সেই হিংসার প্রতীক হয়ে পড়ে যে হিংসা সভ্যতারই অঙ্গ এবং সভ্যতাকে ধরে রাখার জন্য যার প্রয়োজন।

বুনুয়েলসৃষ্ট যুদ্ধের আয়রনির কয়েকটি ইমেজে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ আছে। অতর্কিত বিমান আক্রমণে হতচকিত মানুষজন আশ্রয়ের জন্য দৌড়াদৌড়ি করছে আর 'মডার্ন টাইমস'-এর পোস্টার থেকে উঁকি মারছেন ধাঁধায় পড়া চ্যাপলিন। Torija-তে মাদ্রিদের প্রতিরক্ষা বিষয়ে এই মন্তব্যেও একটি ব্ল্যাক হিউমার আছে: "সৈন্যরা রাগে কাঁদছে কারণ তাদের রক্তাক্ত ফোলা পা শত্রুর আরো পশ্চাদ্ধাবনে বাধা দিচ্ছে।" ফ্যাসিস্টদের Basqine অঞ্চল ধ্বংসের দৃশ্যের বিপরীতে সমান্তরাল সিকোয়েন্সে এক আশ্রয় শিবির দেখা যায় যেখানে জাতীয়তাবাদী মানুষের স্ত্রী ও সন্তানেরা প্রজাতন্ত্রীদের বন্দী; এই সমান্তরাল সিকোয়েন্সেও একই বিকৃত ভাব বুনুয়েলকে প্রভাবিত করে—"প্রজাতন্ত্র তার শত্রুর সন্তানের জীবনের ওপরও লক্ষ্য রাখে।"

বুনুয়েলের জীবনীকার উল্লেখ করেছেন যে 'স্পেন ১৯৩৭' -এর বৃহত্তর মূল ভার্সানে পুরোহিত-শ্রেণী বিরোধী সিকোয়েন্স ছিল, কিন্তু বর্তমান ভার্সানে সেগুলি অদৃশ্য। এক দৃশ্যে ছিল বার্সেলোনার চার্চের লুণ্ঠি। বার্সেলোনার সংঘর্ষে চার্চের প্রতি স্পেনীয় জনগণের প্রচণ্ড ঘৃণা তথ্যচিত্রে তুলে রাখার সময় তিনি নিশ্চয় খুশি হয়ে থাকবেন, কিন্তু ক্যাথলিক প্রজাতন্ত্রীদের চটাবার সময় সেটা নয় বলে সিকোয়েন্সগুলি বাদ দেওয়া হয়ে থাকবে।

বর্তমান ছবিটিতে বিমানবাহিনীর আক্রমণে পুড়ে যাওয়া চার্চের দৃশ্য আছে—চার্চটির ধ্বংসের রোমাঞ্চকর দৃশ্য ধীরগতি ক্যামেরা ও গম্ভীর নীচে চাপে পড়ে। প্রতিক্রিয়াশীলদের দাবী করে ধারাভাষ্য অবশ্য একটি নিরাপদ মন্তব্য করে। "যারা ধর্ম রক্ষক বলে নিজেদের দাবী করে তারাই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করছে।"

কয়েকটি স্বেচ্ছাকৃত বিস্ময় প্রত্যক্ষতর মগ্নচৈতন্যবাদী প্রেরণা থেকে উদ্ভূত, যেমন মাদ্রিদের এক বুলেভার্ডের বৃক্ষশ্রেণীর নীচে—প্রতি গাছের নীচে একজন করে—যুক্তফ্রন্টের বিক্ষোভ দর্শনরত মানুষের শটগুলি। তারা ক্যাজুয়ালি দাঁড়িয়ে, কিন্তু সামঞ্জস্যহীনভাবে নয়। অথবা তাদের বিপরীত শ্রেণীটির শট—চত্বরে ভীড় করে দাঁড়িয়ে থাকা জনতার মাথার ওপর ঝুঁকে পড়া বিরাটাকার স্ট্যাচুর দৃশ্য। (এডিটিংয়ে এই শটটিকে বারান্দা থেকে বিক্ষোভ দর্শনরত কয়েকজন বুর্জোয়া রাজনীতিকের শটের সঙ্গে মিশ্রিত করা হয়)।

ছবির সঙ্গীতও এক সুররিয়ালিস্ট উপাদান। বুনুয়েল বিটোভেনকে ব্যবহার করেছেন। 'ফার্স্ট সিমফনি'র একটি ওয়াল্টজ দক্ষিণপন্থী রাজনীতিকদের সঙ্গে বাজে, ফ্যাসিস্টদের বোমাবর্ষণ জনসাধারণের প্রতি আক্রমণসহ ছবির অবশিষ্টাংশে শোনা যায় Egmont Overture। 'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড' ছবির মত Overture-কে স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করবেন না সঙ্গীতের প্রতীকী ভূমিকা দেবেন সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত নন—প্রায়ই সঙ্গীতকে হানাদারদের সঙ্গে যুক্ত করেছেন (যদিও সর্বদা নয়)। এক দৃশ্যে দেখা যায় Overtureটি সাউণ্ডট্র্যাকে গণসেনার প্যারেডে ড্রামের কুচকাওয়াজের ছন্দের সঙ্গে সত্য সত্যই প্রতিযোগিতা করে (এবং ড্রামই জিতে যায়)।

ফ্যাসিস্টরা বোমা বর্ষণ ক'রে চলে: প্রজাতন্ত্রীরা ডিনামাইট ও রাইফেল দিয়ে তার উত্তর দেয়। বিস্ফোরণের মধ্যে ক্যামেরায় ধরা পড়ে পলায়নপর আত্মগোপনকারী ক্রন্দনরত স্ত্রী-পুরুষ ও শিশুর দল এখন আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী ঘোষিত ধ্বংসের বাস্তব ও প্রামাণ্য আলেখ্য।

ভেঙে পড়া শহরের বৈপরীত্যে, যুদ্ধের মধ্যে আগাগোড়া, আর এক রূপ প্রকাশিত—মানবিক ট্র্যাজেডি সম্পর্কে নির্বিকার অথচ অবিচ্ছেদ্য এক নিষ্ক্রিয় প্রকৃতি দৃশ্যগুলি সামনে ও পিছনে ক্রমশ সমৃদ্ধ হতে থাকে। ক্রাচধারী আহত সৈন্য স্যানাটোরিয়ামে আরোগ্যলাভ করছেন, তার পাশে আন্দোলিত হয় বৃক্ষপর্ণ, "যুদ্ধের মধ্যে শান্তির অস্তিত্ব", ভাষ্যকার মন্তব্য করেন। শেষ দৃশ্যগুলিতে দূরে ঋজু কালহীন বৃক্ষরাজি দোল খায়—সৃষ্টি করে আর এক ধরণের প্রতিরোধ যার কাছে জেনারেল মিয়াজা, কমিশার আন্তন ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উত্তেজিত মুষ্টিকেও অতি ক্ষুদ্র মনে হয়।

'দি গোল্ডেন এজ' ও 'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড' ছবিদ্বয়ে চিহ্নিত সভ্যতার ধ্বংস 'স্পেন ১৯৩৭'-এর অ্যাকচুয়ালিটি ফুটেজের সদৃশ চিত্রকল্পে মূর্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু বুনুয়েল মার্কসবাদের কাছে

তার মানবতাবাদকে অপ্রধান করে রাখেন। জনগণ কেবল বিজিত নয়, বিজয়ীও বটে।

'স্পেন ১৯৩৭'-এর একটি ফরাসী ও স্প্যানিশ প্রিণ্ট টি'কে আছে। শোনা যায় মুক্ত মাদ্রিদে ছবিটি দেখানো হয়েছিল—যদিও মনে হয় প্রদর্শনের মূল লক্ষ্য ছিল বিদেশী দর্শক।

১৯৩৭ সালেই 'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড' ছবিটিও ফ্রান্সে প্রথম মুক্তি পায়। একটি প্রকট পরিবর্তন করা হয়েছিল ছবিটির। সমাপ্তিমূলক একটি টাইটেল যোগ করা হয়েছে যার বক্তব্য Les Hurdes-এর দারিদ্র দূর করা সম্ভব, ফ্র্যাঙ্কোর ক্ষমতা কাড়ার চেষ্টা পর্যন্ত স্পেনের জনগণ তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে আরম্ভ করেছে এবং বর্তমান ফ্যাসি-বিরোধী লড়াই ছবিতে প্রদর্শিত দারিদ্র দূরীকরণের সংগ্রামের সম্প্রসারণ।

অবশ্য, ছবির প্রেমিস-বিরোধী একটি সাম্প্রতিক টাইটেল-এর পক্ষে 'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড'কে 'স্পেন ১৯৩৭' ছবির মত এক যুদ্ধাস্ত্রে রূপান্তরিত করা অসম্ভব। তাহলেও বোধ হয় বুনুয়েল পরিবর্তনটি অনুমোদন করেছিলেন।

১৯৩৭ সালের পর কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে বুনুয়েলের যোগাযোগ শেষ হয়ে যায়। তখনও তিনি প্রজাতন্ত্রীদের পক্ষেই কাজ করছিলেন। তাকে কয়েকটি চিত্র-প্রকল্পের জন্য আমেরিকায় পাঠানো হয়—সেগুলো অবশ্য বাস্তবে কোনদিন রূপায়িত হয়নি। ১৯৩৯ সালে ফ্র্যাঙ্কোর বিজয়ের ফলে তিনি বেকার ও নির্বাসিত হন। কম্যুনিস্টদের সঙ্গে কাজ করার সময় যে নৈরাশ্যকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন, রাজনৈতিক ভাবে, প্রজাতন্ত্রের পরাজয় সেই নৈরাশ্যকেই দূর করল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বুনুয়েলের রাজনীতি ফ্যাসি-বিরোধী ছিল, তবে সে সময় নাৎসি-বিরোধিতার জন্য মার্কসবাদী হওয়ার প্রয়োজন হত না। শেষে নিউ ইয়র্কের ম্যুজিয়ম অফ মডার্ণ আর্ট-এর ফিল্ম বিভাগে তিনি যোগ দেন; 'ইণ্টার আমেরিকান অ্যাফেয়ার্স'-এর 'রকফেলার্স অফিস'-এর যোগাযোগে এই বিভাগটি যুদ্ধের সময় বিভিন্ন তথ্যচিত্রপরিচালককে নিযুক্ত করে। যে সমস্ত অ্যামেরিকান ও বিদেশী বাম-উদারপন্থী চিত্র নির্মাতা স্টুডিওর কাজ পেতেন না অথচ ফিল্মের মাধ্যমে ফ্যাসি-বিরোধী লড়াইয়ে অবদান রাখতে চাইতেন, এই বিভাগটি তাদের কাজ দিয়েছিল।

ম্যুজিয়মে বুনুয়েলের কাজ—সংগ্রহশালার দায়িত্ব, পূর্ণ সম্পাদনা, শিক্ষামূলক স্বল্পদৈর্ঘ ও সংবাদচিত্রের বিদেশী সংস্করণের দেখাশোনা করা—তার এগুলির কোন শিল্পগত বা রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল না। হারিয়ে যাওয়া এই সব ছবির একটির বর্ণনা থেকে অবশ্য আভাস পাওয়া যায় যে তখনো বুনুয়েলের ফ্যাসি-বিরোধী প্রতিশ্রুতি ও মানবতাবাদী ধারণার সহাবস্থান বর্তমান ছিল। প্রচলিত নাৎসী ফুটেজ থেকে একটি প্রতি-প্রচারমূলক ছবি নির্মাণের দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়, তিনি 'ট্রায়াম্ফ অফ দি উইল' (প্রতিশ্রুতি) এবং 'ব্যাপ্টিজম অফ ফায়ার' (বাস্তব)—এর মধ্যে ইণ্টারকাট করে ছবিটি করেন। তবে সাধারণ্যে নিরীক্ষামূলক ছবিটি কখনো দেখানো হয়নি।

রাজনৈতিক হয়রানির ফলে ১৯৪২ সালে ম্যুজিয়মের কাজ তাকে ছাড়তে হয়। হলিউডে ছোটখাট কাজ নেন তিনি, তার কর্মজীবন তখন রাহুগ্রস্ত। তবে বুনুয়েল চলচ্চিত্রের প্রতি বিশ্বস্ত এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন—যে চলচ্চিত্রকে আমরা গণশিল্প হিসেবে জানি। যখন বিস্মৃতপ্রায় এই avant-garde পরিচালক পঞ্চাশের দশকে একজন মহৎ শিল্পী হিসেবে আবার আত্মপ্রকাশ করলেন, তখন পটভূমিটি হল অপ্রত্যাশিত ল্যাটিন আমেরিকার হলিউড মেক্সিকোর স্টুডিও জগৎ! দ্বিতীয় শ্রেণীর চলচ্চিত্র শিল্পে (B-movie industry) কাজ করার সময় বুনুয়েল মানবতাবাদী ও একই সঙ্গে বস্তুবাদী হিসেবে নিজেকে অভিব্যক্ত করেছিলেন—সাধারণ ছবিতে তির্যকভাবে, উল্লেখযোগ্য ফিচারে সোজাসুজি। পরে, চিরকাল যা তার সঙ্গে ছলনা করেছে, সেই সৃজনশীল স্বাধীনতা তিনি ফিরে পান।

সত্যজিৎ চলচ্চিত্র ঃ রবীন্দ্রসাহিত্য ভিত্তিক

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মণিহারা

মূল গল্প 'মণিহারা' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গল্পের মধ্যে পড়ে না, এবং অনেকটা সেই জন্যেও এটি বর্জিত হয়ে 'তিন কন্যা' ছবি 'দুই কন্যা' বা 'টু ডটারস' নামেই প্রথমে বিদেশে প্রকাশিত হয়—অবশ্য অন্য কারণও নিশ্চয় ছিল, যেমন এই ছবির বর্ণনায় এমন একটি রস আছে যা বিদেশী দর্শক শ্রেণীর কাছে ঠিকমত গ্রহণযোগ্য না হবার সম্ভাবনা। অবশ্য এই শেষোক্ত কারণটি বোধ হয় সঠিক নয়। আসল কারণটি ছিল ছবিটির দৈর্ঘ্য সংকোচন করা, কিন্তু তার জন্য অন্য ছবি দুটির তুলনায় 'মণিহারা'র প্রতি সত্যজিৎ রায় যে নির্মম হলেন তার মূল কারণ—এই ছবির বিষয়বস্তু তুলনামূলক ভাবে কম সর্বজনীন।

কিন্তু মূল গল্পটি তবুও বার বার পড়েও অফুরান তৃপ্তিলাভ হয়, তার কারণ গল্পটির অসাধারণ কথন ভঙ্গী। এমন সিরিওকমিক ভঙ্গীতে এমন বুদ্ধি উজ্জ্বল গল্প কখনো ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে আর কেউ লেখেন নি। গল্পটির আর একটি গুণ আশ্চর্য পরিবেশ চিত্রণ, তাছাড়া সন্তানহীন এক স্বচ্ছল-বিত্ত নারীর স্বর্ণালংকারের ওপর প্রবল লোভ বা Obsession-এর একটি মানসিক চিত্র ও সেই লোভের একটি মনোজ্ঞ সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ যা গল্পটির সম্পদ।

মূল গল্পটির মধ্যে আর একটি অসামান্য কৌতুক আছে, সেটি হচ্ছে ভূত-পরলোক ইত্যাদিকে নিয়ে আমাদের অনেকের মনে যে বিশ্বাস আছে সেটি নিয়ে কিঞ্চিৎ ঠাট্টা। গল্পে আছে, গল্পের কথক একজন মুগ্ধ গ্রাম্য স্কুল মাস্টার যিনি স্থানীয় সব ঘটনা সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং তৎকালীন কাল ও নারী মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে বেশ বিজ্ঞ ও বেশ রসবোধ সম্পন্ন। গল্পটি তিনি একজন আগন্তুককে বলেন, গল্প চলাকালীন জানতে পারি যে ভৌতিক কাহিনীটি তিনি বিবৃত করেন তার নায়কের নাম ফণিভূষণ সাহা, এবং সে তার মৃত স্ত্রীর প্ররোচনায় জলে ডুবে মারা গেছে বহু বৎসর আগে। এবং এও জানতে পারি তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল মণি। গল্প শেষ হয় এক অনবদ্য ভৌতিক রহস্যের রসে। গল্প শেষ হবার পর গল্প কথক আগন্তুক শ্রোতাকে প্রশ্ন করেন এই ভৌতিক কাহিনীটি তিনি বিশ্বাস করেন কিনা। তখন শ্রোতা তার সাক্ষাৎ উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেন, গল্প কথক স্বয়ং এই কাহিনীটি বিশ্বাস করেন কি? গল্প কথক যে উত্তর দেন তা বিস্ময়ের, তিনি জানান তিনি নিজেও এটি বিশ্বাস করেন না, কেননা প্রকৃতি কখনো এমন ভূতের গল্প বানায় না—'প্রকৃতি ঠাকুরাণী উপন্যাস লেখিকা নহেন।' তখন শ্রোতা উত্তর দেন, তাছাড়া তাঁর নামই 'ফণিভূষণ সাহা।' গল্প কথক গল্পের সাক্ষাৎ নায়কের কাছেই তাকে নিয়ে বানিয়ে গল্প শোনাবার জন্য লজ্জিত হতে পারতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "তিনি বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হইয়া কহিলেন, তাহলে আমি ঠিকই অনুমান করিয়াছিলাম। তাহলে আপনার স্ত্রীর কি নাম ছিল?" উত্তর এল "নৃত্যকালী"। গল্পের ওপর এখানেই যবনিকাপাত ঘটে।

সমস্ত গল্পটিতে আমরা জেনে এসেছি ফণিভূষণের স্ত্রীর নাম 'মণি'। এবং সন্তানহীনা নিজের রূপে গর্বিতা, এবং কোমল স্বভাবের, স্বামীর ভালবাসায় অপরিতৃপ্তা এই নারী নিজের স্বর্ণালংকার পাছে স্বামীর ব্যবসায়ের লোকসানে নষ্ট হয় ভেবে, স্বামীকে লুকিয়ে সমস্ত অলংকার নিয়ে বর্ষার দিনে নদীপথে পালাতে গিয়ে জলস্রোতে ডুবে মারা যায়। তখন ফণিভূষণ হয়ে যায় মণিহারা—'মণিহারা ফণী' বাংলা ভাষায় একটা বিশেষ প্রবাদ—কেননা উপকথায় শোনা যায় কোন এক সর্পের (ফণীর) মাথায় মণি থাকে এবং তা খোয়া গেলে তার সর্বনাশ হয়। এক্ষেত্রেও হয়েছিল, মৃত মণির আত্মা আরো কিছু অলংকারের লোভে তার ঘরে আসত এবং একদিন সেই প্রেতাত্মার পিছু পিছু গিয়ে কাহিনীর ফণিভূষণও জলে ডুবে মারা যায়। গল্পের পরিবেশে মজে আমরা যখন এই ভৌতিক গল্পটি বেশ বিশ্বাস করে বসেছি, তখনই গল্পকথক ও শ্রোতার সংলাপ থেকে জানতে পারি কাহিনীটি সত্য নয়। এখানেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রেত সম্পর্কীয় বিশ্বাস নিয়ে কিছুটা কৌতুক বা ঠাট্টা করেন। কিন্তু তাহলে কাহিনীর মধ্যে কি কিছুই বিশ্বাস্য বা সত্য নেই? এখানেই গল্পের শেষ সংলাপটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা লক্ষ্য করি গল্পকথক কাহিনীটিতে নিজের কল্পনার রঙ মিশিয়েছেন, কিন্তু ফণিভূষণ নামটি তাঁর সৃষ্ট বা বানানো নয়, সত্যিই সেই লোক ছিলেন ও তার সামনেই বর্তমান, এবং তিনি সেটা কিছুটা আন্দাজও করেছিলেন। তিনি ফণিভূষণে ফণীর সঙ্গে তাৎ-

পর্যতা ও মিল রেখে তার স্ত্রীর নামটি বানিয়ে নিয়েছেন মণি। তার কথিত কাহিনীটির গঠন এবং পরিসমাপ্তিটিও এমনি মিল রাখা কাব্যের মত, অবশ্যই ভৌতিক কাব্য। কিন্তু যখনই তিনি বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়ে ফণিভূষণের স্ত্রীর আসল নাম জানতে চান, তখনই বোঝা যায় কাহিনীটি সম্পূর্ণ মিথ্যে নয়। এর ভৌতিক অংশটি অবশ্যই মিথ্যে, কিন্তু তার আগের ফণী ও তার স্ত্রীর স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ও স্ত্রীর স্বর্ণালংকারের প্রতি লোভ যে একটি ট্রাজেডি ঘনিয়ে তুলেছিল তার ভিতরকার সত্যতা ঠিকই। এবং কাহিনীর সেই অন্তর্সত্তাটি মিলরাখা ভৌতিক কাব্যের মত নয়—অর্থাৎ ঠিক যেমনটি গল্পে শুনতে আমরা ভালবাসি তেমন নয়—বরং সেটি রীতিমত গদ্যধর্মী রূঢ় বাস্তব। এবং তা পরিষ্কার হয়ে উঠে যখন স্ত্রীর মণি বা মণিমালিকার আসল নাম কি জানতে চাইলে উত্তরে শুনি একেবারে গদ্যময় একটি নাম 'নৃত্যকালী'। গল্পটি সেই মুহূর্তে নাটকীয়ভাবে নিছক মনোমত ভূতের গল্প থেকে উত্তীর্ণ হয় একটি গভীর মনস্তত্বমূলক সামাজিক বক্তব্যপ্রধান গল্পে। রবীন্দ্রনাথ গল্পটিকে কলমের এক আঁচড়ে পারলৌকিক বিশ্বাসের ধোঁয়াটে জগৎ থেকে সরিয়ে আমাদের বুদ্ধি ও যুক্তির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দেন এক অসামান্য নব মহিমায়। এ কাজ রবীন্দ্রনাথের মত একজনের কলমের পক্ষেই সম্ভব।

এতো গেল মূল গল্পের সত্য। 'মণিহারা' ছবি কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটি ভূতের গল্পই রয়ে গেছে, যদিও মূল গল্পের মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ ও পরিবেশ চিত্রণ ছবিতে অসাধারণভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে, সিনেমার নিজস্ব ভাষায় তা কিছু কিছু সিকোয়েন্সে অনবদ্য। কিন্তু যে অসাধারণ মুন্সীয়ানায় মাত্র শেষ কয়েকটি সংলাপের মাধ্যমে গল্পটির গুণগত চরিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে—ছবিতে সেটি ঘটেনি। ছবির শেষে অযথা দেখি শ্রোতা (সারাক্ষণ চাদর মুড়ি দেওয়া ছিল) নিজেকে গল্পের নায়ক ঘোষণা করার পর (আমিই ফণিভূষণ) ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যায়, এবং সেই দৃশ্য দেখে গাঁজাখোর গল্প কথক সোজা উঠে চম্পট দেয়—পড়ে থাকে তার লুণ্ঠিত গাঁজার কল্কেটি—ক্যামেরা সেদিকে ক্লোজ আপ করে। অর্থাৎ সমস্ত ঘটনাটি একটি গাঁজা প্রেমিক গল্পবাজ মানুষের স্বকল্পিত কিনা সেটাও সন্দেহ হয়। যাই হোক না কেন, এতে মূল গল্পের শেষ সংলাপের সেই অসামান্য দীপ্তি ও চমক প্রকাশিত হয় না।

অবশ্য সত্যজিৎ রায় এর জন্য ঠিক দায়ী কিনা, অথবা চলচ্চিত্র মাধ্যমে এই জিনিষটি ফুটিয়ে তোলা দুঃসাধ্য—তা সঠিক ভাবে বলা মুশকিল। সাহিত্যে ফণীভূষণকে চাক্ষুষ সামনে দেখান সম্ভব নয়, কয়েকটি লাইনে তার শারীরিক বর্ণনা করা হয়, তাতে ঠিক অবিকল সে কী রকম বোঝান সম্ভব নয়, এক একজন পাঠক এক এক ভাবে কল্পনা করে নেন। কিন্তু চলচ্চিত্রে সে চাক্ষুষ বর্তমান। তাই এই গল্পে আগন্তুকটি যখন শ্রোতা হয়ে শোনে, তখন গল্পের সে যে ওই ভূতুড়ে কাহিনীর নায়ক ফণিভূষণ তা বোঝার উপায় থাকে না, কেননা কাহিনীর নায়ক বা আগন্তুকটি দুজনেরই শারীরিক চেহারা কি রকম সবই পাঠকের কল্পনা নির্ভর। কিন্তু ছবিতে যখনই ভূতুড়ে কাহিনী বলা শুরু হয়, তখনি ফণিভূষণকে চাক্ষুষ দেখি, এবং তখনি চিনতে পারি শ্রোতাই ফণিভূষণ। সুতরাং ছবির শেষে আগন্তুকের আত্মপরিচয় ঘোষণা "আমি ফণিভূষণ সাহা' বলার আর অবকাশ থাকে না। ততক্ষণে আমরা চাক্ষুষ দেখে জেনে গেছি। সুতরাং গল্পের শেষের চমক ছবিতে সৃষ্টি করা দুরূহ। তবে অসাধ্য ছিল কি? ছবিতে আগন্তুক শ্রোতাকে কম্বল জড়ান দেখান হয়েছে তাকে আরো একটু দুর্লক্ষ্য করলে হয়ত বা গল্পের শেষ রসটুকু ফোটান যেতে পারত, তবে আমি নিঃসন্দেহ নই।

যাই হোক, মোট কথাটা হ'ল গল্পের শেষে যে চূড়ান্ত এ্যান্টি-ক্লাইমেক্সটি আছে ছবিতে সেটি পরিহৃত হয়েছে, এবং তাতে কিছুটা রসহানি ঘটেছে। এটুকু বাদ দিলে মূল গল্পের বাকি অন্তর্নিহিত রস ও তাৎপর্য বড় অপূর্বভাবে ছবিতে ফুটে উঠেছে। এছবির অমূল্য সম্পদ পরিবেশ রচনা। ছবিতে যখন গল্পকথক গল্পটি চাদরমুড়ি দেওয়া এক আগন্তুককে বলছে—তখনকার শীতার্ত পরিবেশটি অনবদ্য। কাহিনীর প্রথমেই দেখি ফণিভূষণ ও তার স্ত্রী মণিমালিকা কলকাতা থেকে তাদের পল্লীগ্রামের বৃহৎ বাসভবনে এসেছে। এবং জানালায় দাঁড়িয়ে অদূরবর্তী নদী দেখছে। আমরা শুনতে পাই কোথায় একটি পাখি ডেকে উঠল। মণি তার স্বামীকে জিজ্ঞেস করে "ওটা কি পাখি ডাকছে" অপ্রস্তুত ফণিভূষণ উত্তর দেয় 'আমি জানি না, তুমি বরং ভগীরথকে (ওদের চাকর) জিজ্ঞেস কর"। এই সংলাপটি তাৎপর্যপূর্ণ। বোঝা যায় প্রকৃতির সঙ্গে এদের কোন সংস্রব নেই, এবং ফণিভূষণ স্ত্রীর কৌতূহল মেটাবার দায়িত্বটা ভৃত্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারে। তাদের সম্পর্কটা যেন পারস্পরিক বোঝাপড়ায় নিবিড় নয়। দ্বিতীয়ত পাখির সম্পর্কে এদের কোন জীবন্ত কৌতূহল নেই সংলাপে তা জানানোর পরই—যখন একে একে এদের সাজান ঘর দেখান হয়, বিস্মিত হয়ে দেখি নানান ধরণের পাখির দেহ সংরক্ষিত অবস্থায় সাজান আছে কাঁচের জারের মধ্যে। অর্থাৎ এদের মধ্যে জীবন্ত কৌতূহল না থাক, সব কিছুকে নিজেদের সম্পত্তি হিসেবে সংরক্ষণ করা এদের স্বভাব, এটা এদের চরিত্রের 'পজেসিভ' দিকটিকে প্রকাশ করে। এরা সব কিছু আঁকড়ে ধরতে চায়, এবং যা চায় তা সবই জীবনহীন, সুন্দরী মণি মালিকার মনের খোঁজ না নিতে চাইলেও তাকে স্ত্রী হিসেবে এক দুর্লভ সুন্দর সম্পত্তির মত পেতে চায় ফণিভূষণ; মণিমালিকাও

তার মৃত সম্পত্তি স্বর্ণ-অলংকারগুলির জন্য স্বামীকে ত্যাগ করে। ওদের ঘরে মৃত পাখির দেহ, পুতুল ইত্যাদি যা কিছু আছে সব বড় বড় কাঁচের বেলজার দিয়ে ঢাকা। যেন নিষ্প্রাণ হিসেবেই এরা সব কিছু সংরক্ষণ করে রাখে। খুবই চিত্তাকর্ষক যে এই পাখির মৃত দেহগুলি দিয়েই পরে প্রেতাত্মার আবির্ভাবের রহস্যঘন মুহূর্তে আশ্চর্য ভীতিজনক পরিবেশ রচনা করেছেন পরিচালক—অর্থাৎ যা প্রথম দিকে ছিল চরিত্রের প্রতীকী তাৎপর্যে ভাস্বর, পরে তাই রচনা করে অনবদ্য পারিবেশিক ডিটেল।

এই ছবিতেই প্রথম সত্যজিৎ রায় একটি রবীন্দ্র সঙ্গীতের ব্যবহার করেন—'বাজে করুণ সুরে'। মণিমালিকার প্রেমহীন নিঃসঙ্গতা তাতে বেশ ধরা পড়েছে।

মণিমালিকার নারী মনস্তত্ত্বটি গল্পের মতই ছবিতে বেশ বুদ্ধি-দীপ্ত সরসিত মন্তব্যে উদ্ঘাটিত—গল্পের রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যগুলি প্রায়শঃই রক্ষিত হয়েছে। একজন নারী, যে সুন্দরী এবং সে সম্পর্কে বেশ সচেতন, যার কোন সন্তান হয়নি, হয় বন্ধ্যা না হয় পুরুষটি (স্বামী) সন্তান উৎপাদনে অক্ষম—যার কোন আর্থিক অভাব দারিদ্র নিয়ে কোন চিন্তা নেই, যার স্বামী এমন কোমল স্বভাবের যে তার কাছে নিজের দেহের রূপের যৌবনের বা নারীত্বের মর্যাদা পাওয়ার জন্য কোন কৌতূহলদীপ্ত চেষ্টার দরকার হয় না, সুতরাং দাম্পত্যপ্রেমের লীলাটিও আকর্ষণহীন নিরুত্তাপ—তদুপরি সেই নারীর স্বভাবজ স্বর্ণালংকার প্রীতি একটু বেশি, এবং উপরিউক্ত কারণে ধীরে ধীরে তার মানসিক আগ্রহ শেষ পর্যন্ত স্বর্ণালংকার সংরক্ষণেই অভিনিবিষ্ট,—তার মানসিক অবক্ষয় ও ট্রাজেডি ভারী চমৎকার ভাবে উপস্থাপিত। ছবিতে একটি নূতন উপাদান আছে, মণিমালিকার অন্য একটি প্রেমিক ছিল—গল্পে তা নেই। এটিতে মণিমালিকার মত নারীর স্বামী বিরূপতার কারণটি স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু ছবিতেও মণিমালিকার আসল প্রেম তার স্বর্ণালংকারের সঙ্গেই, প্রেমিক পুরুষটি তার বাহন মাত্র। এবং সেই প্রেমিক পুরুষটির আসল লোভ মণি-মালিকার গয়নার প্রতি। মেঘভারাক্রান্ত সকালে যে ভরা নদীপথে সেই প্রেমিক পুরুষটির সঙ্গে মণি তোর বুকের ধন গয়নার বাক্সটি নিয়ে স্বামীগৃহ ত্যাগ করল—তার ছবিটি অসামান্য ভাবে ফুটে উঠেছে ; এবং আসন্ন এক সর্বনাশের ইঙ্গিত দৃশ্যটি যেন মেঘাবৃত আকাশের মতই থমথমে।

মণিমালিকার প্রেতাত্মার আবির্ভাব দৃশ্যটি গঠিত হয়েছে, শব্দের, আলোক পাতের, ক্যামেরার গতি ও দৃষ্টিকোণের অনবদ্য নির্বাচনে এবং অপূর্ব পারিবেশিক ডিটেলের ব্যবহারে। এমন চমৎকার 'সাসপেন্‌স' ভারতীয় ছবিতে ইতিপূর্বে আমরা দেখিনি। সত্যজিৎ রায়ের নিজের সঙ্গীতের ব্যবহার সীমিত কিন্তু যথোপ-যুক্ত। অর্ধসুপ্ত ফণিভূষণের ক্লোজ শট······হঠাৎ প্রেতাত্মার স্বর্ণা-লংকারের ঝম ঝম শব্দের এগিয়ে আসা, ফণিভূষণের জেগে ওঠা। চূড়ান্ত ক্লাইমেক্স রচিত হয় যখন ক্যামেরার ফ্রেমে ধরা থাকে ফণিভূষণের শয্যাপার্শ্বে স্ত্রীর আরো কিছু ফেলে রাখা গয়নার বাক্সটি। নেপথ্যে শুনি আগের শব্দটি হঠাৎ থেমে যায় কাছে এসে। ক্যামেরা স্থির, ধরে রাখে গয়নার বাক্সটিকে—হঠাৎ জাগ্রত ফণিভূষণ গয়নার বাক্সটি ধরতে চায়, তখনি ফ্রেমের মধ্যে ভীষণ ভাবে প্রবেশ করে একটি কংকালের হাত, অনেক গয়না পরা, এবং সেই হাত প্রচণ্ড লোভে ফণিভূষণের হাত থেকে গয়নার বাক্সটি কেড়ে নিতে চায়। ফণিভূষণ আর্তনাদ করে জ্ঞানহীন হয়ে লুটিয়ে পড়ে। মূল গল্পে ব্যাপারটা অন্যরকম, সেখানে দেখায় মন্ত্রমুগ্ধের মত ফণিভূষণ স্ত্রীর প্রেতাত্মার পিছু পিছু পশ্চাদধাবন করে, প্রেতাত্মা বাড়ীর খিড়কি পেরিয়ে ভরা নদীর মধ্যে নেমে যায়, ভূতে পাওয়া ফণিভূষণ জলে নামে এবং ডুবে মরে। ছবিতে এটি পরিবর্তিত হয়ে ভালই হয়েছে। ছবির শেষাংশ আগেই বিবৃত হয়েছে এবং তার সঙ্গে মূল গল্পের পার্থক্যটি।

ভূতের গল্প সর্বদেশে একটি জনপ্রিয় বিষয়। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় ছেলেবেলা থেকে অনেক মজার ও ভয়ের ভূতের গল্প শুনেছেন, গল্পকার হিসেবে একটি ভূতের গল্প রচনার ইচ্ছাও তাঁর হয়েছিল। কিন্তু 'মণিহারা' তাঁর আশ্চর্য প্রতিভার স্পর্শে হয়ে উঠেছে এক উচ্চস্তরের শিল্প। যদিও এর মধ্যে ভূতের গল্পের সব রহস্য রোমাঞ্চটুকুও ধরা পড়েছে, তবু কি আশ্চর্যভাবে অন্য এক গভীরতার স্তরে উন্নীত করেছেন—তার মুন্সীয়ানা সাহিত্যের ছাত্রদের বিস্মিত করে দেয় আজো।

চলচ্চিত্র মাধ্যমে সেই বিস্ময়টি সত্যজিৎ রায় সৃষ্টি করতে পারেন নি—এটুকু বাদ দিলে 'মণিহারা' একটি অপূর্ব ছবি হয়েছে।

(চলবে)

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের

চলচ্চিত্র • সমাজ ও সত্যজিৎ রায় (১ম খণ্ড)

আসানসোল সিনে ক্লাবের আবেদন

"ফিল্ম সোসাইটিগুলির গঠনতন্ত্রে অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে 'গ্রন্থ প্রকাশনা' একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেলেও, একথা বলতে দ্বিধা নেই যে কেবল দু'একটি ফিল্ম সোসাইটির পক্ষেই এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়েছে। এর মূল কারণ এই লক্ষ্য সাধনের পথটি কুসুমাস্তীর্ণ নয়, এবং এ সম্পর্কে সর্ববিধ বাধার কথা জেনেই আসানসোল সিনে ক্লাব একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছে। গ্রন্থটির নাম 'চলচ্চিত্র, সমাজ ও সত্যজিৎ রায়", লেখক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, যিনি ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি মানুষের কাছে এবং সামগ্রিক ভাবে সাংস্কৃতিক জগতের অনেকের কাছেই চলচ্চিত্র আলোচক হিসাবে পরিচিত (কর্মসূত্রে শ্রীচট্টোপাধ্যায় এক দশকের কিছু বেশীকাল এ অঞ্চলের অধিবাসী এবং আমাদের ক্লাবের সদস্য)। প্রকাশিতব্য গ্রন্থটি নির্বাচনের প্রেক্ষাপট হিসাবে কয়েকটি কথা প্রাসঙ্গিক।

যে প্রতিভাধর চলচ্চিত্র স্রষ্টা অমর 'পথের পাঁচালী' সৃষ্টি করে ভারতীয় চলচ্চিত্রকে সত্যকার ভারতীয় করেছেন যাঁর ছবি নিয়ে বিদেশে অন্ততঃ পক্ষে তিনটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যার একটির বিক্রয় সংখ্যা লক্ষ কপিরও বেশী—অথচ দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরেও তাঁর সুদীর্ঘ চলচ্চিত্র কর্মের কোন দেশজ বাস্তবধর্মী মূল্যায়নের সামগ্রিক চেষ্টা হয়নি (খণ্ড খণ্ড ভাবে কিছু উৎকৃষ্ট কাজ হলেও)—এটি একটি লজ্জাজনক ঘটনা। সেই অক্ষমতা অপনোদনের প্রচেষ্টা এই গ্রন্থটি। সত্যকার বাস্তবধর্মী ও নিজস্ব সাংস্কৃতিক সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কোন দেশীয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্রকারের মূল্যায়নের চেষ্টা না হলে, বিদেশী ও বিশেষ করে পশ্চিমী প্রাতিষ্ঠানিক চলচ্চিত্র আলোচনার দর্পণে তাঁর যে মুখচ্ছবি প্রতিফলিত হয় তাতে যে কত ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত ভুল থাকে, এবং সেই সব ভ্রান্ত প্রচার যে তাঁর চলচ্চিত্র কর্মকে ও চলচ্চিত্রের অনুরাগীদের এবং পরোক্ষভাবে জাতীয় চলচ্চিত্রবোধকে ভুল পথে চালিত করে—এ সবের নিপুণ বিশ্লেষণের জন্য এই গ্রন্থটি প্রত্যেক চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষের অবশ্য পাঠ্য।

প্রকাশিতব্য প্রথম খণ্ডটি সত্যজিৎ রায়ের প্রথম পর্বের ছবিগুলির গবেষণাধর্মী আলোচনায় সমৃদ্ধ। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মহৎ 'অপুচিত্রত্রয়ী'। এই গ্রন্থের অর্ধাংশ জুড়ে 'পথের পাঁচালী' সহ এই চিত্রত্রয়ী আলোচনায় দেখান হয়েছে পশ্চিমের 'দিকপাল' ব্যাখ্যাকারদের দৃষ্টিভঙ্গী কোথায় সীমাবদ্ধ, এবং দেশজ সাংস্কৃতিক সামাজিক ভূমিকায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এই চিত্রত্রয়ীর ব্যাখ্যা কত গভীর ও মৌলিক হতে পারে—যার ফলে ছবিগুলি আবার নতুন করে দেখার ইচ্ছে করবে। অবিস্মরণীয় 'পথের পাঁচালী'র ২৫তম বর্ষপূর্তি হিসাবে ১৯৮০ সালটি ভারতের ফিল্ম সোসাইটিগুলির দ্বারা বিশেষ মর্য্যাদা সহকারে পালিত হচ্ছে—এই প্রেক্ষাপটে এই বৎসর এই গ্রন্থটির প্রকাশ এক তাৎপর্যমণ্ডিত ঘটনা বলে স্বীকৃত হবে বলে আমরা আশা রাখি। ভারতীয় চলচ্চিত্রের এক পবিত্র বৎসরকে আমরা উপযুক্ত কর্তব্য পালন দ্বারা চিহ্নিত করতে চাই। আশা করি এই কাজে আমরা ক্লাব সদস্য সহ সমগ্র চলচ্চিত্রানুরাগী মানুষের সহযোগিতা পাব।

গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি আমরা প্রকাশে উদ্যোগী, যার আনুমানিক পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫০, বহু চিত্রশোভিত এবং সুদৃশ্য লাইনো হরফে ছাপান এই খণ্ডটির আনুমানিক মূল্য ২৫ টাকা। কিন্তু আমরা ঠিক করেছি চলচ্চিত্র অনুরাগী মানুষ যাঁরা অগ্রিম ২০ টাকা মূল্যের কুপন কিনবেন—তাঁদের গ্রন্থের মূল্যের শতকরা ২০ ভাগ ছাড় দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে যাঁরা উৎসাহী তাঁরা সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার অফিসে

(২, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩, ফোন: ২৩-৭৯১১) যোগাযোগ করুন।

গণদেবতা

চিত্রনাট্য : রাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দৃশ্য—২৮৪

স্থান—বায়েনপাড়া।

সময়—সকাল।

বায়েনপাড়ার বিধ্বস্ত বাড়ীগুলোর ওপর দিয়ে ক্যামেরা প্যান্ করলে দেখা যায় জগন নোটবুক হাতে ক্ষয়-ক্ষতির হিসেব করছে। সঙ্গে রয়েছে যতীন।

জগন : এ ঘর কার ?

সতীশ : আজ্ঞে আপনার !

জগন : ফের গ্যাছে ?…বা বা বা…

একটা বাউড়ি মেয়ে ফ্রেমের মধ্য দিয়ে চলে যায়। তার মাথায় রয়েছে একগোছা টাটকা নারকেল পাতা।

জগন [illegible]কে নিয়ে এলি রে !

মেয়েটি বাঁধের গা থেকে।

জগন (যতীনকে) উঁ, ভাগ্যিস ঐ মান্ধাতার আমলের জমিদারী গাছগুলো ছিল !

কাট্ টু

দৃশ্য—২৮৫

স্থান—নদীর বাঁধ।

সময়—সকাল।

বাঁধের ওপর সারি সারি নারকেল গাছ। বাউড়িরা গাছে উঠে পাতা কাটে, মেয়েরা নীচে দাঁড়িয়ে কুড়িয়ে নিচ্ছে।

ভ্যাকা একটা গাছ থেকে নেমে বৌ সুন্দরীকে বলে—

ভ্যাকা : লে, চল্ !

হঠাৎ তারা দূরে কার যেন চীৎকার শুনে সেদিকে তাকায়।

কাট্ টু।

ভূপাল আরও চার-পাঁচজন পাইকেরকে নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসে।

ভূপাল : খবদ্দা—র !…খবদ্দা—র !…এ্যাই— !

কাট্ টু।

সুন্দরী : অ-মা !

ভূপাল : খবদ্দার, একটা পাতাতেও হাত দিবি না !…চল্ আমাদের সঙ্গে—

ভ্যাকা : কুথাকে ?

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৮৬

স্থান—নতুন চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।

সময়—দিন।

ক্লোজ শট্—ক্যামেরা ছিরু পালকে অনুসরণ করে। রাগ, বিরক্তি আর প্রতিশোধের চাউনি তাঁর চোখে মুখে। এক বোঝা নারকেল পাতার সামনে বাউড়িরা দাঁড়িয়ে।

ছিরু : কি রে ?…চণ্ডীমণ্ডপে নাকি ব্যাগার খাটবি না কেউ ?…ওগুলো কার ?…কার হুকুমে কেটেছিস্ ?

পাতু : ইয়ার আবার হুকুম কিসের মাশায় ? বরাবর বাপ-পিতেম'র আমল থেকে যা কেটে আসছি—

ছিরু : সেটা চুরি !…তোদের বাপ পিতেম' তো চোর ছিল রে ব্যাটা !…তাই বলে এখনো তাই করবি ?…আমার আমলে ?

ছিরু পালের এই কথায় বাউরিরা আঘাত পায়। গুন্‌গুন্ করে ওঠে তারা। এমন সময় দেখা যায় দেবু পণ্ডিত এগিয়ে আসছে। পেছনে পেছনে জগন ডাক্তার।

দেবু : কি হয়েছে ছিরু ?

ছিরু : শুধোও !…শুধোও ক্যানে ?…পে-ন্না-স-মি-তি !! (ভূপালকে) এ্যাই ! বেঁধে ফেল সব কটাকে !

দেবু : একে বোধ হয় ঠিক চুরি বলে না ছিরু ! আগে জমিদার আপত্তি করত না—ওরা কাটত। এখন তুমি গোমস্তা হিসেবে আপত্তি করছ… (বাউরিদের) ঠিক আছে…এরপর থেকে আর কাটিস না রে তোরা !

জগন : মানে ?…কাটবে না মানে ? তিন পুরুষ ধরে কেটে আসছে !…তিন বছর ঘাট সরলো, পারে কেউ সে ঘাট বন্ধ করতে—না পথ বন্ধ করতে ?

ছিরু : (হিসহিসে গলায়) বেশী বাজে বোকো না ! ও গাছতো দূরস্থান, নিজের বাগানে যে শখ করে গাছ লাগিয়েছে, শুধু ফলটুকু ছাড়া তার

আর কিছুতে হাত দিয়ে দেখো দিকি !…ফাঁকা কলসীর মতো বক্‌বক্‌ করতে শিখেছ !… জমিদারী আইন একেবারে ছেলের হাতের মোয়া—না ?

দেবু : ছিরু, আমি বলছি এবারকার মতো—

ছিরু : না খুড়ো ! বেধে যখন গ্যাচে তখন ভালো করে বাধাই ভালো ! …ভুপাল !

দেবু : ধরো ওরা যদি দাম দিয়ে দেয়—

ছিরু : দাম ?

জগন : ঠিক আছে। তাই সই। (বাউরিদের) এ্যাই, শোন্ তো ! যার যার পাতা গুনে ফ্যাল তোরা।

বাউরিরা পাতা গুনতে শুরু করে।

হঠাৎ ছিরু গর্জন করে ওঠে।

ছিরু : ব'স ! রাখ তালপাতা। এক পা নড়বি না আমার হুকুম ছাড়া !…এ্যাই ভুপাল হারামজাদা !…আটক কর্ ব্যাটাদের।

ভুপাল ও চৌকিদাররা বাউরিদের দিকে এগিয়ে যায়।

দেবু : দাঁড়াও !

সবাই তার দিকে তাকায়। দেবু পায়ে পায়ে বাউরিদের দিকে এগিয়ে আসে।

দেবু : (বাউরিদের) ওগুলো পড়ে থাক্ ! আয় তোরা, উঠে আয় তোরা ওখান থেকে !…আমি বলছি, ওঠ্। আয় আমার সঙ্গে।

ছিরু : খুড়ো !

দেবু : (ছিরু পালের দিকে একবার তাকিয়ে) আমার গায়ে হাত না দিয়ে কেউ ওদের ছুঁতে পারবে না। চলে আয় !

কাট্ টু।

ক্লোজ আপ। ছিরু পাল।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্। বাউরিরা।

কাট্ টু।

ক্লোজ আপ। দেবু পণ্ডিত।

কাট্ টু।

জগন ডাক্তার হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে।

জগন : বলো, পেজা—সমিতির—

বাউরিরা : জ-য় !

জগন : পেজা-সমিতির—

বাউরিরা : জ-য় !!

জগন : পেজা-সমিতির—

বাউরিরা : জ-য় !!!

জগন বাউরিদের নিয়ে গাঁয়ের দিকে ধ্বনি দিতে দিতে যেতে থাকে। ক্যামেরা প্যান্ করে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা অনিরুদ্ধকে কম্পোজ করে। সে উল্লাসের হাসি হেসে চিৎকার করে ওঠে—

অনিরুদ্ধ : "হরি হরি বোলো
হরি হরি বোল্—"

কাট্ টু।

ছিরু পাল ও তার দল।

কাট্ টু।

অনিরুদ্ধ : "ছি-হরি ছি-হরি বোলো
ছি-হরি ছি-হরি বোল্—

নাচতে নাচতে সে চলে যায় ফ্রেমের বাইরে।

জগন ডাক্তার আর দেবু পণ্ডিত বাউরিদের দুটো দলে ভাগ করে দু-পথে নিয়ে যায়।

ছিরু : ষষ্ঠী !

ষষ্ঠী : এজ্ঞে !

ছিরু : এখুনি একবার কঙ্কনা যাবি ?…দাশজীকে বলবি—নাদের শেখের ছেলে কাহু শেখ আছে,—আমার চাই !

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৮৭।

স্থান—দেবু পণ্ডিতের বাড়ির সামনের রাস্তা।

সময়—দিন।

দেবু পণ্ডিত একদল বাউরিকে নিয়ে এসে বাড়ির সামনে দাড়ায়।

দেবু : দাঁড়া তোরা, আমি আসছি—

দেবু পণ্ডিত বাড়ির মধ্যে ঢুকে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৮৮।

স্থান—দেবু পণ্ডিতের বাড়ির উঠোন ও বারান্দা।

সময়—দিন।

বাড়ির উঠোনের এক কোণে ক্যামেরা। বিলু ঢেঁকিতে পার দিচ্ছে। দুর্গা একটা ঝুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে।

ফোর-গ্রাউণ্ডে দেখা যায় দেবু পণ্ডিত উঠোনে ঢুকে বারান্দায় যাচ্ছে।

দেবু : বিলু!…বিলু…

বিলু সঙ্গে সঙ্গে ঢেঁকিতে পার দেওয়া বন্ধ করে দেয়। ঠোঁটে আঙুল চেপে ইশারায় দুর্গাকে চুপ করতে বলে এবং লুকিয়ে পড়তে অনুরোধ করে। দুর্গা লুকিয়ে পড়ে।

বিলু শাড়ির খুঁট দিয়ে কপালের ঘাম মুছে তাড়াতাড়ি ঘরে আসে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৮৯।

স্থান—দেবু পণ্ডিতের ঘর।

সময়—দিন।

দেবু ঘরের চারদিকে তাকায়।

দেবু : বিলু!…বিলু!

বিলু ঘরে ঢোকে।

বিলু : কি গো?

দেবু : এই যে! বড় মুসকিলে পড়ে গেছি!

বিলু : কি হয়েছে?

দেবু : ঝড়ে ঘর পড়ে গ্যাছে—তাই ওরা বাঁধে পাতা কাটছিল।…ছিরু সে পাতা আটক করেছে। আমি ওদের উঠিয়ে নিয়ে এসেছি। এখন… ঘর ছাইবার একটা ব্যবস্থা না হলে তো—

বিলু দেবু পণ্ডিতের দিকে তাকিয়ে থাকে।

দেবু : (বিপন্ন মুখে) আমার ওপর ভরসা করে উঠে এসেছে ওরা।

বিলু : (একটু থেমে) কতো?

দেবু : যা হোক্…চার…পাঁচ…হবে?

বিলু কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবে। তারপর হেসে বলে—

বিলু : দাঁড়াও…

বিলু পাশের ঘরে চলে যেতে দেবু পণ্ডিত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

দেবু : সত্যি, তুমি, নইলে…যখন তখন হুট্‌হাট্ করে যা খুশী এসে—চাই, আর তুমি…

বলতে বলতে থেমে যায় দেবু পণ্ডিত। পাশের ঘরে বিস্ময়ের কিছু ঘটছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৯০।

স্থান—বিলুর ঘর।

সময়—দিন।

দেবু পণ্ডিতের ভিউ পয়েন্ট থেকে দেখা যায় পাশের ঘরে বিলু ঘুমন্ত তার ছেলের হাতে থেকে সোনার বালাটা খুলছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৯১।

স্থান—দেবু পণ্ডিতের ঘর।

সময়—দিন।

ক্লোজ আপ দেবু পণ্ডিত বিলুর বালা খোলা দেখছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৯২।

স্থান—বিলুর ঘর।

সময় দিন।

বালা খুলতে গিয়ে বাচ্চাটি জেগে ওঠে। পিঠ চাপড়িয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয় বিলু। তারপর বালাটি নিয়ে বেরিয়ে আসতে গিয়েই দেবু পণ্ডিতকে দেখে চমকে ওঠে।

কাট্ টু।

ক্লোজ আপ দেবু পণ্ডিত।

কাট্ টু।

বিলু কয়েক মুহূর্ত অস্বস্তিতে পড়ে। তারপর যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসে।

বিলু : নাও, ধরো।

দেবু : না…না…বিলু…

বিলু : কেন?

দেবু : এ বালা…এ বালা আমি—

বিলু : ছি!…ওরা না তোমায় দেখে উঠে এসেছে! নাও ধরো!

দেবু : তাই বলে খোকার বালা—

বিলু : হ্যাঁ, খোকার বালা!…আবার যখন হবে তোমার, গড়িয়ে দেবে তুমি।

দেবু : সবই তো বোঝো বিলু। যদি আবার না হয়?

বিলু হেসে গর্বের সঙ্গে বলে—

বিলু : না হলে ছেলে আমার পড়বে না।

কাট্ টু।

দেবু পণ্ডিতের ক্লোজ আপ।

কাট্ টু।

ঘরের মধ্যে বাচ্চাটা আবার কেঁদে উঠতেই বিলু ছুটে যায়।

বিলু : ও-ও,…ও-ও…কি হয়েছে?…কি হয়েছে?

দেবু পণ্ডিত বাইরে চলে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৯৩।

স্থান—দেবু পণ্ডিতের বাড়ির উঠোন ও বারান্দা।

সময়—দিন।

বাউরিরা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। দেবু পণ্ডিত সেখানে এসে সতীশ বাউরির হাতে বালাটা তুলে দেয়।

দেবু : নাও।…সবার চলার ব্যবস্থা করে নিয়ো।

কয়েক মুহূর্ত সতীশ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

নারাণ : (হঠাৎ, চেঁচিয়ে) বলে, পেঁজা-সমিতির—

বাউরিরা : জয়!

নারাণ : পেঁজা-সমিতির—

বাউরিরা : জয়!

নারাণ : আমাদের নেতা দেবু পণ্ডিতের—

বাউরিরা : জয়!

দেবু পণ্ডিতকে দরজার কাছে রেখে বাউরিরা সবাই চলে যায়।

কাট্ টু।

স্লোগান দিতে দিতে চলেছে একদল বাউরি।

ভ্যাকা : আমাদের নেতা দেবু পণ্ডিতের—

বাউরিরা : জয়!

কাট্ টু।

দেবু পণ্ডিত দরজার কাছে দাঁড়িয়েই আছে। হঠাৎ সে বাচ্চাটার কান্না শুনতে পায়। বিলু বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে ফোর-গ্রাউণ্ডে দেবু পণ্ডিতের সামনে এসে দাঁড়ায়। কান্না থামানোর চেষ্টা করে।

বিলু : কি হয়েছে?…খিদে পেয়েছে?…ও ও ও… আয়…পাখি…আয় পাখি—

কাট্ টু।

বাউরিদের মিছিল দূরে চলে যাচ্ছে।

কাট্ টু।

ক্যামেরা দেবু পণ্ডিতের ওপর চার্জ করলে বোঝা যায় সে দ্বিধাগ্রস্ত, চিন্তামগ্ন।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৯৪।

স্থান—ছিরু পালের বাগান বাড়িতে একটা ঘর।

সময়—রাত্রি।

একটা হ্যারিকেনের ওপর থেকে ক্যামেরা লো এঞ্জেল শটে প্যান করে দেখায় ছিরু পালকে।

ছিরু : শালার পণ্ডিত…ঢ্যামনা সাপেরও ফণা গজাইছে!

গরাই এর দিকে একটা হিসাবের খাতা ছুঁড়ে দেয়। বলে—

ছিরু : শালার বকেয়া খাজনা কতো হইচে ত্যাকো তো?

কালু : (off) সালাম হুজুর!

ছিরু পাল ও গরাই দরজার দিকে তাকায়।

কাট্ টু।

দরজা। বিশ্রী চেহারার একটা লোক সেখানে দাঁড়িয়ে। সারা মুখে কাটা দাগ। সঙ্গে রয়েছে ষষ্ঠী।

কাট্ টু।

ছিরু : কে রে?

ষষ্ঠী : কালু এসেচে!

ছিরু : ও!…এসে গেছিস?…আয়, ভেতরে আয়!

কালু : (আসতে আসতে) বেপার কি?…বড়া জোর তলব? কুছু হাঙ্গামা উঙ্গামা নাকি?

ছিরু : তোর হাতে সব শুদ্ধু কতো লোক রে কালু?

কালু : ক্যানে? কতো চাই?

ছিরু : (এদিক ওদিক তাকিয়ে, চাপা গলায়) দোরটা দিয়ে দে!

কাট্ টু।

কালু ঘুরে দরজাটা বন্ধ করতে উদ্যত হয়। দূরে বাঁশির মত কিছুর শব্দ শুনে থমকে যায়।

কালু : কিসের আবাজ?

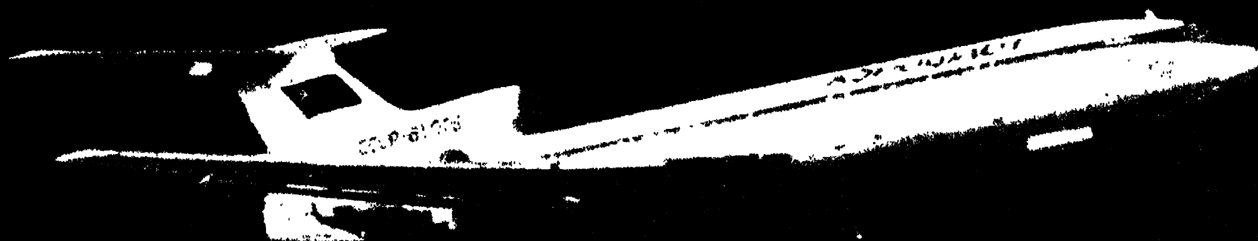
কাট্ টু।

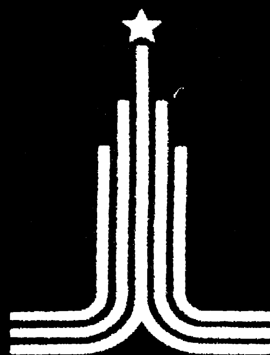
(চলবে)

CHITRA-BIKSHAN

Regd. No. 13949/67 Rs 1.25 January 1980 Vol. 13 No. 5







Published by Alok Chandra Chandra from Cine Central, Calcutt
2 Chowringhee Road, Calcutta-13. Phone : 23-7911 & Printed by him

মাসিক চলচ্চিত্র পত্রিকা
সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র

ত্রয়োদশ বর্ষ
পঞ্চম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারী '৮০



চিত্রবীক্ষণ

বিষয়সূচী

প্রচ্ছদচিত্র : মধু বসু নির্দেশিত 'আলিবাবা'
প্রচ্ছদশিল্পী : দীপক দে

সম্পাদক : অনিল সেন

শিলিগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সুনীল চক্রবর্তী
প্রযত্নে, বোবিজ স্টোর
হিলকার্ট রোড
পোঃ শিলিগুড়ি
জেলা ঃ দার্জিলিং-৭৩৪৪০১

আসানসোলে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সঞ্জীব সোম
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জি. টি. রোড ব্রাঞ্চ
পোঃ আসানসোল
জেলা ঃ বর্ধমান-৭১৩৩০১

বর্ধমানে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
শৈবাল রাউত্
টিকারহাট
পোঃ লাকুরদি
বর্ধমান

গিরিডিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এ, কে, চক্রবর্তী
নিউজ পেপার এজেন্ট
চন্দ্রপুরা
গিরিডি
বিহার

দুর্গাপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দুর্গাপুর ফিল্ম সোসাইটি
১/এ/২, তানসেন রোড
দুর্গাপুর-৭১৩২০৫

আগরতলায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অরিন্দ্রজিত ভট্টাচার্য
প্রযত্নে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
হেড অফিস বনমালিপুর
পোঃ অঃ আগরতলা ৭৯৯০০১

গৌহাটিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
বাণী প্রকাশ
পানবাজার, গৌহাটি
ও
বিমল শর্মা
২৫, খারঘুলি রোড
উজান বাজার
গৌহাটি-৭৮১০০৩
এবং
পবিত্র কুমার ডেকা
আসাম ট্রিবিউন
গৌহাটি ৭৮১০০৩
ও
ভূপেন বরুয়া
প্রযত্নে, তপন বরুয়া
এল, আই, সি, আই, ডিভিসনাল অফিস
ডাটা প্রসেসিং
এস, এস, রোড
গৌহাটি-৭৮১০১৩

বাঁকুড়ায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
প্রবোধ চৌধুরী
মাস মিডিয়া সেন্টার
মাচানতলা
পোঃ ও জেলা ঃ বাঁকুড়া

জোড়হাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অ্যাপোলো বুক হাউস,
কে, বি, রোড
জোড়হাট-১

শিলচরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এম, জি, কিবরিয়া,
পুঁথিপত্র
সদরঘাট রোড
শিলচর

ডিব্রুগড়ে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সন্তোষ ব্যানার্জী,
প্রযত্নে, সুনীল ব্যানার্জী
কে, পি, রোড
ডিব্রুগড়

বালুরঘাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অন্নপূর্ণা বুক হাউস
কাছারি রোড
বালুরঘাট-৭৩৩১০১
পশ্চিম দিনাজপুর

জলপাইগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দিলীপ গাঙ্গুলী
প্রযত্নে, লোক সাহিত্য পরিষদ
ডি. বি. সি. রোড,
জলপাইগুড়ি

বোম্বাইতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সার্কল বুক স্টল
জয়েন্দ্র মহল
দাদার টি. টি.
(ব্রডওয়ে সিনেমার বিপরীত দিকে)
বোম্বাই-৪০০০০৪

মেদিনীপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটি
পোঃ ও জেলা ঃ মেদিনীপুর
৭২১১০১

নাগপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
ধূর্জটি গাঙ্গুলী
ছোটি ধানটুলি
নাগপুর-৪৪০০১২

এজেন্সি ঃ

* কমপক্ষে দশ কপি নিতে হবে।
* পঁচিশ পার্সেণ্ট কমিশন দেওয়া হবে।
* পত্রিকা ভিঃ পিঃতে পাঠানো হবে, সে বাবদ দশ টাকা জমা (এজেন্সি ডিপোজিট) রাখতে হবে।
* উপযুক্ত কারণ ছাড়া ভিঃ পিঃ ফেরত এলে এজেন্সি বাতিল করা হবে এবং এজেন্সি ডিপোজিটও বাতিল হবে।

এই রাজ্যের ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সমস্যা ও সম্ভাবনা

পশ্চিমবাংলায় সম্প্রতি ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের বিস্তার বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, এ বিষয়ে যেমন কোন সন্দেহ নেই, তেমনি নতুন নতুন সম্ভাবনার পথও এই আন্দোলনের সামনে ক্রমশঃই প্রশস্ত হয়ে উঠছে।

ফিল্ম সোসাইটি কার্যক্রমে সমস্যা অনেক, বিশেষ করে এই রাজ্যে যে সমস্ত ফিল্ম সোসাইটি নতুন কাজকর্ম শুরু করেছেন তাঁরা এখনো ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজের সদস্যপদ না পাওয়ায় নিয়মিত ছবি পাওয়ার ব্যাপারে বিস্তর বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। এছাড়া এই নতুন সোসাইটিগুলির পক্ষে ছবির প্রদর্শনীর জন্য নিয়মমাফিক বিভিন্ন সরকারি অনুমতি সংগ্রহের ব্যাপারটিও যথেষ্ট কষ্টকর।

নতুন সংস্থাগুলির যেমন বিশেষ সমস্যা রয়েছে তেমনি সাধারণভাবে ফিল্ম সোসাইটিগুলির সমস্যাবলী একই রকম রয়েই গেছে দীর্ঘদিন ধরে। ফেডারেশন থেকে পাওয়া ছবির সংখ্যা এমন নয় যা অবাধ এবং নিয়মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর পক্ষে পর্যাপ্ত হতে পারে এবং এই ব্যাপারে মফঃস্বল ফিল্ম সোসাইটিগুলির সমস্যা অনেক বেশী। বেশীর ভাগ জায়গায় রবিবার সকালে কোন সিনেমা হলে মর্ণিং শো করা ছাড়া ফিল্ম সোসাইটিগুলির পক্ষে বিকল্প কিছু নেই। এবং এজাতীয় প্রায় সব সোসাইটিই রবিবার ছবি দেখাতে চাওয়ায় কিছু বাড়তি সমস্যার সৃষ্টি হয় স্বাভাবিকভাবেই। বিশেষ করে মফঃস্বল সোসাইটিগুলির আর্থিক সমস্যা অত্যন্ত তীব্র। একমাত্র আয় সদস্য চাঁদা থেকে ছবি দেখানোর খরচ সামলে উঠে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজকর্ম, যেমন সভা-সমিতি, আলোচনা ইত্যাদির অনুষ্ঠান, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদি মফঃস্বল ফিল্ম সোসাইটিগুলির পক্ষে আর সম্ভবপর হয়ে ওঠেনা।

কলকাতা ও আশেপাশের সোসাইটিগুলির অবস্থাও কিন্তু সমস্যামুক্ত নয়। এখানেও ছবি দেখানোর হলের সমস্যা অত্যন্ত তীব্র। সন্ধ্যেবেলা ছবি দেখানোর জন্য যে দু-একটি স্কুলের হল পাওয়া যায় তা বিশেষ উপযোগী নয় এবং সব কটি সোসাইটি এই দু-একটি হলে শো করা ছাড়া বিকল্প কিছু পাননা বলে এখানে হল পাওয়াই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মর্ণিং শো করতে গেলেও নুন শো চালু হওয়ার ফলে শো-এর সময় খুব আগিয়ে দিতে হয় যার ফলে সদস্যদের যথেষ্ট অসুবিধা, এছাড়া কলকাতার সোসাইটিগুলির ক্ষেত্রেও ছবি পাওয়ার সাধারণ সমস্যা তো রয়েইছে।

এছাড়া সর্বত্র সরকারি অনুমতির ব্যাপারে কিছু সময়সাপেক্ষ পদ্ধতি এখনো রয়ে গেছে। যদিও সাম্প্রতিক কালে কর্পোরেশন, পুলিশ বা কমার্শিয়াল ট্যাক্স কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমতি সংগ্রহের ব্যাপারটি আগের থেকে যথেষ্ট সরল হয়েছে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তবুও কিছু কিছু অযৌক্তিক পদ্ধতি এখনো রয়ে গেছে, যেমন কমার্শিয়াল ট্যাক্স কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিটি শো-এর কার্ড স্ট্যাম্প করানো, যে কার্ডগুলির কোন মূল্য নেই, কেননা সদস্য কার্ড দেখিয়েই ফিল্ম সোসাইটি সদস্যরা ছবি দেখে থাকেন। এ সমস্ত পদ্ধতিগুলির পুরো অবসান হওয়াই ভালো, না হলে অন্তত আরো সরলীকরণ প্রয়োজন। এছাড়া ভারতীয় ভাষার ছবির ক্ষেত্রে প্রমোদকর অব্যাহতির ব্যাপারটাও এখনো আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে আদায় করে উঠতে পারিনি। এই সব প্রশ্ন নিয়ে ফেডারেশনকে আরো উদ্যোগী হতে হবে। এছাড়া ফেডারেশনের সদস্যপদ পাননি এমন সমস্ত সহযোগী সংগঠনও যাতে সরকারি অনুমতি পেতে অসুবিধা বোধ না করেন সেটাও ফেডারেশনকেই দেখতে হবে। এটা ফেডারেশনের নৈতিক দায়িত্ব।

ছবির ব্যাপারে সর্বভারতীয় চিত্রটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে পূর্বাঞ্চলীয় ফিল্ম সোসাইটিগুলি তুলনামূলকভাবে কম ছবি পাচ্ছেন। ছবির সুসম বন্টন এই রাজ্যের ফিল্ম সোসাইটিগুলির ক্ষেত্রে ছবির সমস্যাকে কিছুটা সহজ করে তুলবে। ছবি বাড়ানোর ব্যাপারে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে হবে যাতে কেন্দ্রীয় সরকার ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভলাপমেন্ট কর্পোরেশন মারফৎ ফিল্ম সোসাইটিগুলির জন্য বেশী সংখ্যক এবং উপযুক্ত মানের ছবি আমদানী করেন। ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভও যাতে এই রাজ্যের ফিল্ম সোসাইটিগুলির জন্য বেশী সংখ্যায় ছবি যোগান দেন সে ব্যাপারেও প্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টির জন্য ফেডারেশনকে উদ্যোগী হতে হবে।

ফিল্ম সোসাইটিগুলির হল পাওয়ার সমস্যাকে কেন্দ্র করেও কিছু ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালানো প্রয়োজন। কলকাতা এবং বিশেষ করে মফঃস্বলে সিনেমাহল মালিকদের সঙ্গে ই, আই, এম, পি, এ মারফৎ আলোচনা করে হলের ভাড়া কমানোর প্রচেষ্টা করতে হবে। এছাড়া মফঃস্বল অঞ্চলে যেখানে যেখানে রবীন্দ্রভবন, কমিউনিটি সেন্টার ইত্যাদি আছে সেগুলিতে যাতে ফিল্ম সোসাইটিগুলি নামমাত্র ভাড়ায় ছবি দেখাতে পারেন তার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে দাবী জানাতে হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের অধীনে যেসব প্রোজেক্টর রয়েছে সেগুলি ঐ সমস্ত হলে বসানোর ব্যবস্থা করলে ফিল্ম সোসাইটিগুলি নিয়মিত ভিত্তিতে ছবি দেখাতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতায় একটি আর্ট থিয়েটার স্থাপন করছেন, এটা অত্যন্ত আশাপ্রদ ঘটনা। এই কাজকে ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন। এছাড়া সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটাও নিজস্ব প্রয়াসে কলকাতায় আর একটি আর্ট থিয়েটার গঠনের চেষ্টা চালাচ্ছেন। সিনে সেন্ট্রালের এই প্রচেষ্টায় সমস্ত ফিল্ম সোসাইটিগুলিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে যাতে এই প্রচেষ্টা ফলবতী হয়।

বিশেষ করে মফঃস্বল অঞ্চলের ফিল্ম সোসাইটিগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেয়ার প্রশ্নটি আজ অত্যন্ত জরুরী। আমরা এর আগেও বলেছি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ফেডারেশনকে কেন্দ্রীয়ভাবে অর্থ সাহায্য না দিয়ে সরাসরি ফিল্ম সোসাইটিগুলিকে অর্থ সাহায্য দিন। যদি এব্যাপারে কোন টেকনিক্যাল অসুবিধা থাকে তাহলে এই ফেডারেশনের মাধ্যমেই এই সাহায্য বিতরণ করা হোক। এই আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ যদি সোসাইটি পিছু ৫০০ বা ১০০০ টাকাও হয় তাহলে এই আর্থিক সাহায্য নিয়ে ঐ সংস্থাগুলি পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করতে পারেন বা আলোচনা সভা ইত্যাদির অনুষ্ঠান করতে পারেন। তাহলে মফঃস্বল অঞ্চলের ফিল্ম সোসাইটি কার্যক্রম যথেষ্ট প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।

আজকে পশ্চিমবাংলায় প্রায় পঞ্চাশটি ফিল্ম সোসাইটি, যার সম্মিলিত সদস্য সংখ্যা প্রায় পঁচিশ হাজার; এই সংখ্যা খুব বেশী না হলেও এটি আজ অত্যন্ত সংগঠিত শক্তি। পশ্চিমবাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে আগন্তুক হিসেবে না থেকে শরিক হিসাবে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনকে স্বাধীন ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সেই রকম একটি সম্ভাবনাময় পরিস্থিতি সর্ববিধ সমস্যার মধ্যেও বিদ্যমান। সুস্পষ্ট কার্যক্রম এবং সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী এই আন্দোলনকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারে। এবং এই ব্যাপারে আশু উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন একান্ত জরুরী।

এই সংখ্যায় যাঁদের লেখা রয়েছে

চিদানন্দ দাশগুপ্ত, কবিতা সরকার, ইকবাল মাসুদ, শান্তি চৌধুরী, জগন্নাথ গুহ, সত্যজিৎ রায়, (সাক্ষাৎকার), রেইনার্ড হফ (সাক্ষাৎকার), উৎপল দত্ত, গৌতম কুণ্ডু ও অজয় দে।

সত্যজিৎ চলচ্চিত্র ঃ রবীন্দ্রসাহিত্য ভিত্তিক

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সমাপ্তি

'তিন কন্যার' ছবির শ্রেষ্ঠ অংশ 'সমাপ্তি'। এই গল্পটিও নারীমনস্তত্ব নিয়ে রচিত। গল্পটি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পের অন্যতম।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়া ছবিটি মূল গল্পের অন্তর্সত্তাটি ঠিকই পরিস্ফুট করেছে। মৃণ্ময়ীর চরিত্রে কিশোরী অপর্ণাকে দিয়ে, এবং অপূর্বর চরিত্রে অপুখ্যাত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে দিয়ে পরিচালক দুটি অনবদ্য চরিত্রায়ণ করিয়েছেন। ছবিটি এমনই সুন্দর এবং এত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চলচ্চিত্রীয় শিল্প কর্মে সমৃদ্ধ যে এর বিশদতর ব্যাখ্যা জরুরি, কিন্তু স্থানাভাবে ততখানি সম্ভব নয়।

ছবিটির একটি অসামান্য নূতনত্ব ঃ ছবিটির চেখভীয় স্বাদ। বিষয়বস্তুতে সম্পূর্ণভাবে রাবীন্দ্রিক হয়েও ছবির কথন ভঙ্গীতে যেন আন্তন চেখভের গল্প-কথন ভঙ্গী এসে মিশে গেছে। ফলে ছবিতে এসেছে নূতনতর স্বাদ; চেখভের মতই অনাসক্ত ভাবে বলা, অনুচ্চারিত বা স্বল্পোচ্চারিত ইঙ্গিত অপ্রত্যক্ষভাবে দু'একটি শব্দ ও চিত্রকল্পের মধ্যে দিয়ে অনেক কিছু বলা এবং চরিত্রগুলির মানুষী দুর্বলতাগুলির ওপর তেমনি একটি চেখভ সুলভ হাস্য বিকিরণ। এগুলি যে রবীন্দ্রনাথের লেখায় নেই তা বলার স্পর্দ্ধা আমার নেই, কিন্তু গল্প কথনের নিজস্ব ভঙ্গীটি রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যেমন কিছুটা বেশি প্রত্যক্ষ, গল্পের মধ্যে তাঁর নিজের অনন্য উপস্থিতিটি যেমন মাঝে মাঝে টের পাইয়ে দেন তাঁর অসামান্য মন্তব্যগুলির মাধ্যমে, চেখভের ক্ষেত্রে প্রায় সমস্তটাই অ-প্রত্যক্ষ, চেখভের গল্পের চরিত্রগুলি যেন চেখভ ছাড়া, তারা তাদের নিজস্ব নিয়মে নিয়ন্ত্রিত, চেখভ শুধু নেপথ্য থেকে তাদের লক্ষ্য করেন ও প্রত্যক্ষভাবে দু'একটি ব্যঞ্জনায় নিজের মন্তব্যগুলি ইঙ্গিতে বোঝান। চেখভের অনাসক্তি (detachment) সুবিদিত। (অবশ্যই এটা তাঁর পদ্ধতি, মূলত তিনি নিরপেক্ষ নন, সে বিষয়ে আগেই 'জলসাঘর' প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।) চলচ্চিত্রে এই চেখভীয় অনাসক্তি বোঝাবার সুবিধে বেশি, এবং সেটি হয় ক্যামেরা নামক যন্ত্রের অনাসক্ত উপস্থিতি সম্ভব বলে; চলচ্চিত্রের ভাষা ক্যামেরার মাধ্যমে দেখান হয় বলে চলচ্চিত্র রচয়িতার নেপথ্যবাসী হবার যে সুযোগ থাকে, (যা চেখভ তাঁর অনন্য পদ্ধতিতে তাঁর সাহিত্য মাধ্যমে দেখিয়েছেন) এখানে সেই গুণটি 'সমাপ্তি' ছবিতে এসে গেছে। যেমন নব্য শিক্ষিত অপূর্বর মানসিকতা দেখাতে তার দেওয়ালে 'নেপো-লিয়নে'র ছবি দেখান হ'ল—এটুকুতেই অনেক কিছুর ইঙ্গিত রয়ে গেল—এটি যেন চেখভীয় বলার রীতি। ফলে 'সমাপ্তি' ছবিটি যেন চেখভীয় পদ্ধতিতে বলা রবীন্দ্রনাথের অন্যতম স্নিগ্ধ শ্রেষ্ঠ গল্পের ছবি হয়েছে নূতনতর নান্দনিক স্বাদে।

শ্রীযুক্ত অপূর্ব রায়, নব্য যুবক, কলকাতা শহরে থেকে গ্রাজুয়েট হয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করে গ্রামে ফিরছে, বিজয়ীর মত, কিন্তু তার এই আত্মস্ফীত গৌরব একটি সামান্য কিশোরীর হাতে পর্যুদস্ত হবে—এ ইঙ্গিত গল্পে ও ছবিতে প্রথমেই পাই অপূর্বর নদীপথে নৌকা থেকে গ্রামের মাটিতে অবতরণ মুহূর্তে। নব্য গ্রাজুয়েটবাবু (তখনকার দিনে আজ থেকে ৭০/৮০ বছর আগে গ্রাম্য সমাজে গ্রাজুয়েট একটা বিষম ব্যাপার) নৌকো থেকে কর্দমাক্ত জমিতে পা দিয়েই কুপোকাৎ, এবং তাকে ঠাট্টা করে একটি কিশোরীর অমল মধুর হাস্যধ্বনি। মেয়েটি দস্যি ছেলের মতই দুরন্ত, বেপরোয়া। সেই মৃণ্ময়ী।

কিছুকাল শহরে থেকে বাবু হবার পর অপূর্ব যেন নিজের গ্রামে নবাগত। তার স্বেচ্ছাসৃষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলির, কৃত্রিম পার্থক্য রচনার চেষ্টাগুলির প্রতি স্রষ্টা যেন চেখভসুলভ মৃদু হাস্য বিকীরণ করেছেন। চশমা পরা অতিশয় সুদর্শন আমাদের অপূর্ববাবু এখন গ্রামে চোঙা দেওয়া গ্রামোফোনে রেকর্ডে গান শোনে। যখনি বের হয় তার পায়ে চকচকে পামসু—এবং তার এই 'পদমর্যাদার', প্রতি সে বেশ সচেতন, নিজে এই গ্রামেরই সন্তান হলেও এবং পথ শত কর্দমাক্ত হলেও সে উজ্জ্বল জুতো ছাড়া পায়ে হাঁটে না। তার দেওয়ালে সযত্নে সজ্জিত হয় নেপোলিয়নের ছবি, কালী দুর্গা বা কোন অবতারের নয়। ক্যামেরার বিশেষ দৃষ্টিকোণে একই শটে অপূর্ব ও দেওয়ালে নেপোলিয়নের ছবির বিশেষ কম্পোজিশন আমাদের অনিবার্যভাবে মনে করিয়ে দেয় আইজেনস্টাইনের 'অক্টোবর' ছবির কেরেনস্কি ও নেপোলিয়নের মূর্তির কথা। মারী সীটন তাঁর 'সত্যজিৎ রায়' গ্রন্থে লিখেছেন "This (Apurba's) vision of himself is summed up in the picture of Napoleon (Portrait of a Film Director—page 178). 'অক্টোবর' ছবিতেও নেপোলিয়নের মূর্তির ব্যবহার একই কারণে, তার

মধ্যেও কেরেনিষ্কি তার আত্মস্ফীত ব্যক্তিত্বটির মূর্তি দেখেছিল। হতে পারে 'অক্টোবর'-এর এই দৃশ্যটি সত্যজিৎ-এর প্রেরণা। কিন্তু তাহলেও 'সমাপ্তি'তে নেপোলিয়নের ছবির ব্যবহার 'অক্টোবর'-এর অনুকরণ নয়, কেননা পদ্ধতিটি অনেকটা এক হলেও এবং নেপোলিয়নের ইমেজ দুটি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলেও—ছবির উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ আলাদা। প্রথমটিতে কেরেনিষ্কিকে তীব্র ব্যঙ্গ করার জন্য, আর দ্বিতীয়টিতে আমাদের অপূর্ববাবুর দুর্বলতার প্রতি মৃদু স্নেহার্দ্র কৌতুক বিকীর্ণ করার জন্য, কেননা আমাদের অপূর্ব প্রচুর কেরেনিষ্কির মত কোন রাজনৈতিক বাসনা নেই, এবং একটু পরেই এই বন্য বাঙালী 'নেপোলিয়ন'টি একটি দুরন্ত কিশোরীর কাছে হৃদয়ের সবচেয়ে মনোরম আঘাতটি খাবে ও পরাভূত হবে।

অপূর্বর মেয়ে দেখতে যাওয়ার দৃশ্যটি অবিস্মরণীয়। এখানে অনবদ্য বহির্দৃশ্যের ব্যবহার আছে। নদীমাতৃক বাংলা দেশের বর্ষণসিক্ত রূপটি তার শ্যামল সবুজ সজল ও প্রচুর পরিমাণে কর্দমাক্ত চেহারায় ধরা পড়েছে। সেই হাঁটু পর্যন্ত কাদার মধ্যেও সুদর্শন অপূর্ব কোঁচান ধুতি পাঞ্জাবীর সঙ্গে তার সযত্নে পালিশ করা পাম্পসু পরে মেয়ে দেখতে গেল। মেয়ে দেখার পর্বটি খুঁটিনাটিতে যথাযথ—একেবারে পুঁটলির মত জড় মেয়েটি থেকে ঘরের আসবাবপত্র মানুষজন সমস্ত কিছু। অবশ্য মূল গল্পেই ডিটেলের মজুত ভাণ্ডার আছে, তৎসহ সত্যজিৎ রায় সেকালটি কিছুটা চিহ্নিত করার জন্য এবং গ্রাম্য রুচির স্থূলত্ব বোঝাবার জন্য আরো কিছু ডিটেল যোগ করেছেন, যেমন দেওয়ালে পঞ্চম জর্জ ও রাণী মেরীর ছবি। গল্পের মেয়ে দেখার কমিক দৃশ্যটি যেন হুবহু ছবিতে প্রতিফলিত, কিন্তু একটি ব্যাপারে সত্যজিৎ রায় একটু নূতনত্ব সৃষ্টি করেছেন। গল্পে পড়ি, যখন সেই বিচিত্র জড়বস্তুর মত কন্যাটি দেখে অপূর্ব বেশ বিপদাপন্ন, তখন হঠাৎ দস্যি মৃণ্ময়ী অবিবেচকের মত কন্যার ভাই রাখালকে খেলার জন্য ডাকতে ঢুকল, অপূর্বর দিকে দৃকপাত না করে রাখালের হাত ধরে টানাটানি করেও রাখাল যখন উঠল না, রেগে কনের মাথার ঘোমটা টেনে খুলে ফেলল এবং সব কেমন লণ্ডভণ্ড করে চলে গেল। সত্যজিৎ রায় এখানে ছবিতে দেখিয়েছেন মৃণ্ময়ীর পোষা কাঠবিড়ালি 'চরকি' হঠাৎ সেখানে ঢুকে পড়ে, এবং তাকে খুঁজে ধরে নিয়ে যায়। 'চরকি'কে এই ভাবেই উপস্থাপিত করা হয় এবং এটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা পরে দেখব ছবিতে 'চরকি' কাঠবিড়ালীটির একটি প্রতীকী তাৎপর্য আছে, 'চরকি' মৃণ্ময়ীর বিবাহের পূর্বের জীবনটির সঙ্গে প্রতীকী তাৎপর্যে যুক্ত। নিজের জন্যে পাত্রী পছন্দের আসরে, ভাগ্য অপূর্বর জন্যে যে মেয়েটিকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে ঠিক করে রেখেছে—তাকে বিচিত্রভাবে ঢুকিয়ে তাকে দিয়ে 'বসনভূষণাচ্ছন্ন লজ্জাস্তূপের' মত কন্যাটির ঘোমটা খুলিয়ে রবীন্দ্রনাথ গল্পে যে কাব্যিক পূর্বাভাসের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন, সত্যজিৎ তার সঙ্গে ব্যবহার করলেন মৃণ্ময়ীর তখনকার জীবনের প্রতীকটিকে, যার সর্বনাশ সমাসন্ন। উপযুক্ত হাতে পড়লে সাহিত্যভিত্তিক ছবিতে চলচ্চিত্র ভাষার ব্যবহার মূল সাহিত্য অংশকে কেমন ঐশ্বর্যশালী করে দেয়—এটি তার প্রমাণ।

মেয়ে দেখার নিদারুণ অভিজ্ঞতার পর প্রস্থানোদ্যত অপূর্ব বাইরে এসে দেখল তার সাধের 'বার্নিশ করা' জুতো জোড়া অদৃশ্য। অগত্যা সবাইকার সামনেই শহর ফেরৎ নব্য গ্র্যাজুয়েট অপূর্বকৃষ্ণ খালি পায়ে ক্রুদ্ধ মনে পদমর্যাদাহীন অবস্থায় গ্রাম্য পথে ফিরতে লাগল। এবং এখানেই সত্যজিৎ একটি অসামান্য রোম্যান্টিক সিকোয়েন্স রচনা করলেন : হঠাৎ কিছুদূর যেতেই একটি নির্জন স্থানে জুতোহীন ক্রুদ্ধ বাবুর সামনে গাছের আড়াল থেকে তার অপহৃত জুতো জোড়া এসে পড়ল। এবং চোরও ধরা পড়ে গেল। মৃণ্ময়ী ধরা পড়ে গিয়ে একে বেঁকে হাত ছাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু অপূর্ব এই দস্যি মেয়েটাকে আজ শাস্তি দিতে বদ্ধ পরিকর। তবু কী যেন ঘটে গেল। সেই সদ্যসিক্ত স্নিগ্ধ গাছপালা ঘেরা নির্জনতায় স্নিগ্ধ নরম আলোকে একটি দস্যি অযত্ন লালিত শ্যামা কিশোরীর অবাধ্য দুষ্টু কিন্তু আপাতত কাতর মুখের ও চাহনির মধ্যে আমাদের সুদর্শন নব্য গ্র্যাজুয়েট অপূর্ব কী দেখতে পেল ? সেই দৃশ্যটির গঠন—নীচের দিকে মৃণ্ময়ীর দুটি বড় বড় কাতর চোখ এবং ওপরের দিকে অপূর্বর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—দুটি তরুণ মুখের একটি অনির্বচনীয় রোম্যান্টিক মুহূর্ত ধরা পড়েছে সেই আশ্চর্য শটগুলিতে। সমস্ত বর্ষণস্নিগ্ধ প্রকৃতি, ছায়াহীন নরম আলো, শব্দ, দুটি মানুষের দুজোড়া বাঙ্ময় চোখ নিয়ে চলচ্চিত্রের মাধ্যমটি যেন একটি যাদু রচনা করেছে। মৃণ্ময়ীর দুটি চোখে অপূর্ব জীবনে প্রথম এক অনির্বচনীয়তাকে দেখতে পেল, শাস্তি উদ্যত হাত দুটি শিথিল হয়ে পড়ল, বরং নিজেই এক মনোরম শাস্তি ও যন্ত্রণা নিয়ে ঘরে ফিরল। আমাদের নব্য নেপোলিয়ন দুটি তরল চোখের চাহনির কাছে হল পরাভূত। এই সিকোয়েন্সটি যেন মোর্জাটের ভালোবাসার ম্যাজিক ফ্লুটের বংশীধ্বনির মত।

ছবিতে কতকগুলি বিশুদ্ধ সত্যজিতীয় 'হিউমার' আছে। বিয়ের পাকা কথা স্থির হবার পর, দস্যি মেয়ের বাইরে টো টো করে ঘুরে বেড়ান বন্ধ করার জন্য মৃণ্ময়ীকে ঘরে তার মা বন্ধ করে রাখেন। 'বিবাহ' ব্যাপারটার প্রতিবাদে মৃণ্ময়ী নিজের চুলগুলি কেটে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল, নীচে বসে চুল কাটাচ্ছিল এক অশীতিবর্ষীয় ধবধবে পাকাচুল বুড়ো, কাটছিল আর এক সত্তর বছরের বুড়ো নাপিত। প্রথম বুড়োর সাদা চুলের ওপর হঠাৎ এসে পড়ল মৃণ্ময়ীর কালো কেশগুচ্ছ, সেই দেখে দ্বিতীয় বুড়োর (নাপিতের) সে কী বিভ্রম !

ছবির শ্রেষ্ঠ অংশ বিয়ের পর ফুলশয্যার রাত্রে মৃণ্ময়ীর ঘর

থেকে প্রকৃতির বুকে পালানোর সিকোয়েন্সটি—অসাধারণ কাব্যিক সর্বজনীন আবেদনে সমৃদ্ধ—এমন রোম্যান্টিক দৃশ্য বোধকরি একমাত্র 'অপুর সংসার'-এর ফুলশয্যার রাত্রিটিতে ছাড়া সত্যজিৎ রায়ের এযাবৎকালের কোন ছবিতে নেই। এবং এ দুটি ফুলশয্যার রাত্রির দুটি নায়িকার কত তফাৎ! রবীন্দ্রনাথ মৃণ্ময়ীর সম্পর্কে মূল গল্পে লিখেছেন, "যে দেশে ব্যাধ নাই বিপদ নাই সেই দেশের হরিণ শিশুর মতই সে নির্ভীক।" ঠিক তাই। সে রাত্রে সবাই ঘুমুলে বস্ত্রালংকার সজ্জিতা নববধূ মৃণ্ময়ী শয্যাদ্বার খুলে বাইরে চলে এল, বাইরে তখন জ্যোৎস্নালোকে নিশীথ রাত্রি ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের মত। নির্ভীক হরিণীর মত মৃণ্ময়ী প্রকৃতির বুকে ছুটে চলল, এবং নদীতীরে সেই পুরানো মন্দিরের কাছে পৌঁছল। আমরা দেখলাম তার সেই পোষা কাঠবিড়ালীটি সেখানে একটি খাঁচায় লুকান, মৃণ্ময়ী তার পুরানো সঙ্গীটির কাছে ব্যক্ত করল অব্যক্ত ভালোবাসা। তারপর বরাবর সে যেমন করে এসেছে, আজ বিয়ের পরও, যেন তার বিবাহই হয়নি, তেমনি ভাবেই গাছতলার তার দোলনাটিতে বসে দুলতে লাগল। নিশীথ রাত্রিবেলা নববধূ সজ্জায় সজ্জিতা মৃণ্ময়ীর সেই মুক্তির আনন্দ, চারিদিকে অম্লান জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত্রির মুক্তির নিঃশ্বাস, প্রকৃতির মুক্ত বক্ষে প্রকৃতির মেয়ের সেই অপূর্ব দোলা—সমস্ত গ্রামটি সুপ্ত, গাছপালা নদীতীর নিদ্রাভিভূত, শুধু জ্যোৎস্নালোকে জাগ্রত আকাশ লক্ষ্য করছে পৃথিবীতে একটি আশ্চর্য মেয়ে ফুলশয্যার রাত্রে তার ঘর থেকে বের হয়ে এসে জনহীন প্রকৃতির বুকে দোল খাচ্ছে। শয্যার নিশীথ রাত্রির সুরগুচ্ছ—'নকটুর্ন'-এর দৃশ্যটি এক নিমেষে এক রোম্যান্টিক সর্বজনীন স্মিত আনন্দের অনির্বচনীয়তায় আমাদের হৃদয় মন ভরে দেয়।

এই জায়গায় ছবিটি তার মূল গল্প থেকেও উন্নত হয়ে গেছে। এই মুহূর্ত মূল গল্পে নেই। অথচ মূল গল্পের কাঠামোয় এবং ভয়মুক্ত মৃণ্ময়ীর চরিত্রের সঙ্গে এই দৃশ্য কী অপূর্ব সামঞ্জস্যে বিবৃত। প্রচণ্ড দুঃসাহসের সঙ্গে সত্যজিৎ মূল গল্পের এই পরিবর্তনে অসামান্য কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। গাছ পালা, নদী, চন্দ্রালোক, আকাশ ও তার মধ্যে দোল খাওয়া একটি মেয়ে—এক অসামান্য হার্মনিতে ধরা পড়েছে তাঁর ক্যামেরায়।

কিন্তু মৃণ্ময়ীকে আবার ঘরে রুদ্ধ হতে হয়—সে এখন গৃহস্থ বাড়ীর বধূ, সুতরাং আগেকার বন্ধনহীন জীবন তার জন্য খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। অন্যেরা তাকে শুধরাতে চায় জবরদস্তি করে, স্বামী অপূর্বর পন্থা সম্পূর্ণ বিপরীত, সে চায় তাকে শুধরাতে ভালোবাসার দ্বারা, সে চায় তার নারীত্বের বিকাশ। কিন্তু অক্ষম সে। তার নববধূটি এখনো মনে প্রাণে কুমারী, কিশোরী, এখনো তার বন্ধু বালক রাখাল ও কাঠবিড়ালী চরকি। সে এখনো থাকতে চায় গ্রাম প্রান্তর নদীতীরে অবাধ ভ্রমণ ও ছুটোছুটির খেলাধূলোর জগৎটি নিয়ে। স্বামী যে কী বস্তু তা সে বোঝে না, প্রেম ভালবাসা যে কী তাও তার অজানা। অক্ষম অপূর্ব অবশেষে, ব্যথিত মনে স্ত্রীকে মায়ের কাছে রেখে কলকাতায় ফিরে গেল। আমরা এরপর দেখলাম মৃণ্ময়ীর অতীত কিভাবে তার বর্তমান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, কিভাবে মনের অগোচরে তার মধ্যে নারীত্বের বিকাশ ঘটল।

ব্যক্তিগতভাবে 'সমাপ্তি' আমার কাছে সত্যজিৎ রায় রচিত সব রবীন্দ্র সাহিত্যভিত্তিক ছবির মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়, 'চারুলতা'র চেয়েও—এমন অমল আনন্দ আর কোন রবীন্দ্র সাহিত্য ভিত্তিক ছবি থেকে পাইনি, কিন্তু সেই সঙ্গে এই ছবির একটি বিরাট ত্রুটি আমার গভীর বেদনারও কারণ। এই ত্রুটি ভয়ানক ত্রুটি। সেই প্রসঙ্গটি বিশদ আলোচনার যোগ্য, কেননা এই ত্রুটিই আজকের সত্যজিৎ রায়ের ছবিগুলির একটা দীন বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে।

Art is always and everywhere the secret confession, and at the same time the immortal movement of its time. —*Karl Marx*

'কবিরা শুধু নিজেদের সঙ্গেই গোপনে কথা বলে, বাইরের জগৎ আড়ি পেতে তা শোনে,' বার্নার্ড শ-এর এই কথাটির মধ্যে আছে একটি স্পষ্ট বক্তব্য। সব কবিতাই কবির স্বগতোক্তি, কিন্তু বাইরের জগৎ আড়ি পেতে তা শোনে কেন? কেননা তার মধ্যে জগৎ তার নিজের হৃৎস্পন্দন শুনতে পায়—সমকালীন তথা চিরকালীন হৃৎস্পন্দন। এখানে স্পষ্টত একটা কথা বলে নেওয়া দরকার যে 'সমকালীন' ও 'চিরকালীন' এ দুটি ধারণা (concept) একেবারে পৃথক কিছু নয়। প্রথমতঃ, যে চিরকালের মধ্যে সমকাল নেই তাকে কোন যুক্তিতেই চিরকাল বলা চলে না, সমগ্রের মধ্যে অংশের অস্তিত্বের মতই এটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য। দ্বিতীয়ত মহৎ সমকালীন শিল্প সৃষ্টির মধ্যে চিরকালীনতা থাকেই, সেটাই তার মহত্বের ও শিল্পের প্রমাণ। যদিও এক ধরণের দুরভিসন্ধিমূলক প্রচার এদেশে চালান হয় যেন, সমকালীনতার চরিত্র বা কোন সমকালীন সমস্যার প্রতিফলন শিল্পে পড়লেই শিল্পের জাত গেল। তাঁদের মতলবটা কোন ক্ষমতাবাজ দক্ষ শিল্পী যেন, কিছুতেই সমকালীন সমাজের সমস্যার ছবি না তুলে ধরে। অতএব প্রচার চলে এই বলে যে, বড় শিল্পী সর্বদা চিরকালকে প্রতিফলিত করবেন তাঁর শিল্পে, সমকালকে নয়। এরা বহুল প্রচারের দ্বারা এমন একটা ধারণা চালু করতে চায় যেন সমকাল ছাড়া এক আজগুবি 'চিরকাল' সম্ভব। অথচ আমরা চোখ খুললেই দেখি মানব সভ্যতার প্রাঙ্গনে অ-বিমূর্ত শিল্পের চিরায়ত সৃষ্টিগুলির সবকটি হয় তাদের সৃষ্টিকালের সমকালীন সত্যকে প্রকাশ করেছে, পরে সত্যের ও শিল্পরূপের দীপ্তিতে যেগুলি 'চিরায়ত' শিল্প হিসেবে

পেয়েছে স্বীকৃতি, নয়তো তারা কখনো কখনো যে বিগত কালের ছবি এঁকেছে তার মধ্যে সমকালের সত্যও বিরাজমান।

মার্কস সেই জন্যেই বলেছিলেন শিল্প ব্যক্তি মানুষের সৃষ্টি—যেন তার 'গোপন স্বীকারোক্তি' কিন্তু সেই সঙ্গে তা তার সমকালের অমর গতিভঙ্গ। শিল্প যে ব্যক্তি মানুষের গোপন ধ্যানের ফল, সেটা মার্কস জানতেন, কিন্তু প্রথমতঃ ব্যক্তি মানুষটির সমস্ত জ্ঞান অভিজ্ঞতা সবই তার সামাজিক সমকাল থেকে আহৃত, দ্বিতীয়ত সেই ব্যক্তি মানুষটি তার একক ধ্যানের মুহূর্তে যে শিল্প সৃষ্টি করেন, তার সার্থকতা তখনি যখন তার সামাজিক মূল্য থাকে—তাই যে সামাজিককালে সেটি রচিত হচ্ছে ও বহুজনের গ্রহণে সার্থকতা পাচ্ছে—সেই সামাজিক কালের অমোঘ পদচিহ্নগুলি তার শিল্পে পড়বেই। যেমন দর্পণের মধ্যে আমাদের মুখচ্ছবি যখন নিখুঁত ভাবে ধরা পড়ে তখনই দর্পণের সার্থকতা, তেমনি সে শিল্পকেই বহু জন অবিস্মরণীয় করে রাখে যার মধ্যে ধরা পড়ে তার সমকালের গতিভঙ্গ। বস্তুতঃ শিল্পের যতগুলি উপমা এযাবৎকাল মানুষ ব্যবহার করে এসেছে তার মধ্যে দর্পণের উপমাটি সবচেয়ে উপযুক্ত। তার কারণ একই, শিল্পের মধ্যে প্রতিফলিত হয় কালের মুখচ্ছবি। টলস্টয়ের সাহিত্যকে যখন লেনিন বলেছিলেন 'বিপ্লবের দর্পণ' তখনই টলস্টয় সাহিত্যের মূল্যায়ন সবচেয়ে স্পষ্ট হয়েছে।

শিল্পের মধ্যে এই 'দ্বৈততা' একদিকে একটি শিল্পকম একজন স্রষ্টা শিল্পীর 'গোপন আত্মকথন' অন্যদিকে সেটি একটি 'সামাজিক সত্তা'—তার সমকালের হয় সাক্ষাৎ নয় প্রক্ষিপ্ত গতিভঙ্গীর দর্পণ। আমার মনে হয়, শিল্পের নন্দনতত্ত্বের সবচেয়ে মূল্যবান সূত্র বিবৃত হচ্ছে এই 'দ্বৈততা'র মধ্যে, যার কথা কার্ল মার্কস লিখে গিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অমর ছোট গল্পগুলি রচনার সময়, নিজের শ্রেণীগত দূরত্ব সত্ত্বেও, অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, কল্পনাশক্তি ও সর্বোপরি অসামান্য মানবিকতাবোধের শক্তিতে আশেপাশের সাধারণ মানুষের জীবনস্রোতের মধ্যে যা কিছু দেখেছেন, শুনেছেন—তার থেকে চিহ্নিত করেছেন সমকালের মৌলিক সত্যগুলি, এবং অসামান্য প্রতিভার স্পর্শে তার চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেছেন তাঁর গল্পগুলির মধ্যে। তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি ছোট গল্পে সেই সময়কার বাংলার সামাজিক সত্যের ছবিটি পাই আশ্চর্য সজীব সতেজতায়। এবং সেই 'সমকালীন' সত্যের এক একটি প্রকাশ এত বৎসর পরেও আজো আমাদের হতবাক করে দেয় সত্য উপলব্ধির তীব্রতায়। 'সমাপ্তি' গল্পের মধ্যে এর একটি অবিস্মরণীয় উদাহরণ আছে।

মূল গল্প 'সমাপ্তি'তে একটি চরিত্র আছে 'ঈশান', মৃণ্ময়ীর বাবা—ছবিতে সে চরিত্রটি একেবারে বাদ দেওয়া হয়েছে। অথচ চরিত্রটি (১) ছবিটির শৈল্পিক গঠনের দিক থেকে, এবং (২) সমকালীন সত্যের দিক থেকে এত গুরুত্বপূর্ণ যে সেটি বাদ দেওয়ার অর্থ মূল সাহিত্য কর্মটির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন, সচেতন অথবা অসচেতন যে ভাবেই হোক। এবং মহৎ সাহিত্য ভিত্তিক চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে আইজেনস্টাইনীয় সর্বজন গ্রাহ্য সূত্র অনুযায়ী তা অবশ্যই অশ্রদ্ধেয়।

মূল গল্পে ঈশান কী ভাবে উপস্থাপিত তা লক্ষ্যণীয়। মৃণ্ময়ীর বিয়ের সম্বন্ধ যখন অপূর্বর সঙ্গে পাকাপাকিভাবে স্থির হ'ল, তখনকার কথা লিখে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন, মৃণ্ময়ীর বাপ ঈশান মজুমদারকে যথাসময়ে সংবাদ দেওয়া হইল। সে কোন একটি স্টীমার কোম্পানীর কেরানিরূপে দূর নদীতীরবর্তী একটি ক্ষুদ্র স্টেশনে একটি ছোটো টিনের ছাদ বিশিষ্ট কুটীরে মাল ওঠানো নামানো এবং টিকিট বিক্রয় কর্মে নিযুক্ত ছিল। তাহার মৃণ্ময়ীর বিবাহ প্রস্তাবে দুই চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল।....কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে ঈশান হেড অফিসের সায়েবের নিকট ছুটি প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দিল। সায়েব উপলক্ষটা নিতান্তই তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ছুটি নামঞ্জুর করিয়া দিলেন।"

এই শেষ একটি বাক্যে রবীন্দ্রনাথ সে সময়ের শ্রমজীবী মানুষের জীবনের অমানুষিক অবস্থার এক যন্ত্রণার প্রেক্ষাপট এঁকে দিলেন। আজকের মার্কসীয় চিন্তার বিশ্লেষণের আলোকে জানি পুঁজিবাদের আরম্ভপর্বে, যখন বণিক সভ্যতা সবে গেড়ে বসেছে তখন যদিও সামন্ত যুগের একেবারে বেগার খাটার দিন কিছুটা পাল্টেছে, কিন্তু শোষণ অন্য চেহারায় আবির্ভূত—সে চেহারা মর্মান্তিক ক্রূর। পুঁজিবাদের সেই আদিপর্বে শ্রমিক কর্মচারীকে মালিকেরা তাদের মুনাফা লুন্ঠনের 'যন্ত্র' ছাড়া আর কিছু ভাবত না, একটি যন্ত্রকে বা পশুকে টিঁকিয়ে রাখার জন্য যেটুকু দরকার তার বেশী দেওয়া ছিল নিষিদ্ধ। সে দিনের কথা মার্কস, এঙ্গেলসের লেখায় আছে। সাহিত্যিকদের মধ্যে চার্লস ডিকেন্স থেকে এমিল জোলা সেই মর্মান্তিক ছবি এঁকে গেছেন। 'ছুটি দেওয়ার অধিকার' একমাত্র মালিকের প্রয়োজনে, ছুটি পাবার অধিকার কোন শ্রমজীবির নেই, সে কটি টাকা মজুরির বিনিময়ে 'মানুষ' হিসেবে বিক্রীত—এখন সে মালিকের হাতে মুনাফা লুন্ঠনের 'যন্ত্র' মাত্র। এটা সর্বদেশে সে সময়ে ঘটেছে, তখন শ্রমজীবি মানুষ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন করে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। উপরন্তু যে দেশ বিদেশী শক্তির অধীন সে দেশের অবস্থাটা আরো মর্মান্তিক। শ্রমিক কর্মচারীর মানবিক প্রয়োজনগুলি আদৌ 'প্রয়োজন' বলে স্বীকৃত হ'ত না। সায়েব সুবারা নিজের মেয়ের জন্মদিনে কোম্পানীর ছবি রাখত, গড়ের বাদ্য বাজত, বাজি পুড়ত, উৎসব হ'ত—কিন্তু গরীব কেরানির একমাত্র সন্তান কন্যার বিয়েতে 'উপলক্ষটা নিতান্তই তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ছুটি নামঞ্জুর করিয়া দিলেন।'

পুঁজিবাদের প্রারম্ভ পর্বের শোষণের এই মর্মান্তিক ছবিটি এঁকেই সমাজ সচেতন মানবতাবাদী কবি থামলেন না, তিনি শাসনের জবরদস্তির আর একটি দিকও দেখালেন নির্ভীক সাহসিকতার সঙ্গে—এবং সেটি হচ্ছে আমাদের পুরুষ প্রধান সমাজের ভিতরকার শাসনের চেহারা। যখন সায়েব ঈশানের ছুটি নামঞ্জুর করে দিলেন, তখন ঈশান "পূজার সময় এক হপ্তার ছুটি পাইবার সম্ভাবনা জানাইয়া সে-পর্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখিবার জন্য দেশে চিঠি লিখিয়া দিল, কিন্তু অপূর্বর মা কহিল, এই মাসে দিন ভাল আছে আর বিলম্ব করিতে পারিব না।"

যেহেতু আমাদের দেশে আজো পাত্র পক্ষই প্রায় ডিক্টেটার, তাদের ইচ্ছাই সব কিছুর নিয়ামক তাই পাত্রপক্ষও মেয়ের বিয়েতে মেয়ের বাপের (যে মেয়ে তার একমাত্র সন্তান) অনুপস্থিতিটা তুচ্ছ জ্ঞান করে বাপের আবেদন (অনেকটা সেই সায়েবের মতই) নামঞ্জুর করে দিল। বিদেশী শাসকের শোষণ ও নিজের সমাজের মধ্যে পাত্রপক্ষের শাসন, এদুটিকে এক সঙ্গে মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ অতএব পরের ছত্রেই সেই অবিস্মরণীয় লাইনগুলি লিখলেন, "উভয়তঃই প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে পর ব্যথিত হৃদয়ে ঈশান আর কোন আপত্তি না করিয়া পূর্বমতো মাল ওজন ও টিকিট বিক্রয় করিতে লাগিল।"

সমকালীন সত্যের এই জ্বলন্ত স্পর্শে 'সমাপ্তি' এক অসাধারণ মহৎ শিল্পে উত্তীর্ণ হয়েছে।

এবং এছাড়াও গল্পটির শৈল্পিক গঠনের দিক থেকেও—বিশেষ করে মৃণ্ময়ীর মনস্তত্ত্বগত পরিবর্তনই যখন গল্পটির কেন্দ্রীয় বিষয়, সেদিক থেকেও ঈশান চরিত্রটি ও ঈশানের কর্মস্থান কুশীগঞ্জকে নিয়ে সংক্ষিপ্ত কুশীগঞ্জ পর্বটি মূল গল্প থেকে অবিচ্ছেদ্য। গল্পে পড়ি মৃণ্ময়ীর মানস সত্তায় তার বাবা যতখানি স্থান নিয়ে আছে ততখানি আর কেউ নয়, গল্পে বারে বারে 'বাবার' উল্লেখ আছে। বিশেষতঃ যখন যে যন্ত্রণাক্ষুব্ধ কাতর তখনি সে বাবার কাছে পালাতে গেছে—একবার পালিয়েও ছিল, কিন্তু পৌঁছতে পারেনি।

কিন্তু পরে অপূর্ব যখন মৃণ্ময়ীকে তার মায়ের কাছে রেখে কলকাতা চলে গেল, সেই বিরহাবকাশে সেই কুশীগঞ্জের কটি দিনের স্মৃতিই যে মৃণ্ময়ীর সুপ্ত নারীত্বকে জাগরিত করার কাজে সবচেয়ে বড় উপাদান হয়ে উঠেছিল তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। অবশ্য একথা ঠিক রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে কিছু বলেননি, কিন্তু ইঙ্গিতে বলেছেন। কুশীগঞ্জ পর্বের পরে অপূর্ব কলকাতায় চলে যাবার পর মৃণ্ময়ী তার বিরহাবকাশে যে পরিবর্তন অনুভব করেছিল, সে পরিবর্তন অগোচরে ঘটেছিল আগেই— সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "নিপুণ অস্ত্রকার এমন সূক্ষ্ম তরবারি নির্মাণ করিতে পারে যে, তদ্দ্বারা মানুষকে দ্বিখণ্ডিত করিলেও সে জানিতে পারে না, অবশেষে নাড়া দিলেই দুই অর্ধখণ্ড ভিন্ন হইয়া যায়।" বিরহকালে যা ঘটেছিল তা ছিল এই নাড়া দেওয়া ও দুই অর্ধখণ্ডের ভিন্ন হওয়া, কিন্তু এই কল্পিত তরবারিটি চালিত হয়েছিল কুশীগঞ্জ পর্বে—যে কোন সচেতন পাঠকই তা অনুভব করতে পারেন। সুতরাং কুশীগঞ্জ পর্ব বা ঈশান গল্পের এপেনডিক্স নয়, এটি গল্পের কেন্দ্রীয় থীমের একটি অংশ, অবিচ্ছেদ্য অংশ। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির সব কটিই অত্যন্ত সুসংবদ্ধ, এগুলির কোন অংশই অতিরিক্ত নয়, প্রত্যেকটি এক অখণ্ড সামগ্রিকতায় বিধৃত। 'সমাপ্তি'-র কুশীগঞ্জপর্বও তাই।

এই পর্বটি ছবিতে বাদ দেওয়ায় পরবর্তীকালে মৃণ্ময়ীর পূর্ণ নারীত্বের উত্তরণ পর্বে যা ঘটেছে—তার মধ্যে অনিবার্যভাবে একটি 'ফাঁক' থেকে গেছে—সেটাও নিরপেক্ষ দর্শকের চোখ এড়াবার কথা নয়। এই ফাঁকটি হচ্ছে কারণ থেকে কার্যে রূপান্তরনের ফাঁক—Causation-এর ফাঁক। এই Causation প্রত্যক্ষ না হতে পারে, স্পষ্ট না হতে পারে—কিন্তু তার ক্রিয়া থাকবে, সেই কল্পিত তরবারির মত। তাই Causation-এর একটি সূত্র থাকা সঙ্গত ছিল। অবশ্য এই Causation শুধু দেহের স্তরেও হতে পারে, একটি কিশোরী মেয়ের নারীত্ব বিকাশের উত্তরণ পর্বে শুধু দৈহিক Causation থাকতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে কী ব্যাপারটা খুব মোটা দাগের হয়ে যায় না। একটি কিশোরী একজন তরুণ সুন্দর পুরুষের সঙ্গে ছিল, মানসিক দিক থেকে বিযুক্ত হয়েই ছিল, স্পষ্টতঃ তেমন কোন শারীরিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়নি (মৃণ্ময়ী অপূর্বকে চুম্বনটুকুও দেয়নি)। কিন্তু তবু কিশোরীটির দেহ তার মনের অগোচরে দেহের স্পর্শ নিয়ে থাকতে পারে এবং পরে স্বাভাবিক ভাবেই দেহে আসন্ন নবযৌবনের আবির্ভাবে একাকীত্বের মধ্যে সে যে একটা অভাব অনুভব করবেনা এমনও নয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে মেয়েটির রূপান্তরের কারণ হয়ে যায় শুধুমাত্র দৈহিক—বিজ্ঞানের ভাষায় বলা চলে অমুক অমুক যৌন গ্ল্যাণ্ডগুলির রসক্ষরণ জনিত। এটি অবশ্য মৃণ্ময়ীর ক্ষেত্রেও ঘটেছে, কেউই দেহের এই নেপথ্য প্রতিক্রিয়ার কথা অস্বীকার করবে না। কিন্তু মৃণ্ময়ীর ক্ষেত্রে তাছাড়া যেটি ঘটেছে সেটি মানসিক—'সাইকিক' আর সেটিই এই গল্পের উপাদান। এবং সেই মানসিক রূপান্তরের ভূমিকা রচিত হয়েছিল কুশীগঞ্জ পর্বে, স্বামীর অকুণ্ঠ প্রেমধন্য বধূত্বের দিনগুলিতে, তার জীবনের প্রথম গৃহিনীপনার দিনগুলিতে। গল্পটিতে এটি এত বেশি স্পষ্ট যে এই নিয়ে বিশদতর ব্যাখ্যা ক্লান্তিকর।

ছবিতে মৃণ্ময়ীর রূপান্তর ঘটে যাওয়াটি দেখান হয়েছে অবশ্য অসামান্য চলচ্চিত্র ভাষার কুশলতায়, কিন্তু রূপান্তরের Causation-এর মূল মনস্তাত্বিক সূত্রটি না দেখানোতে যে ফাঁক রয়ে গেছে তা পূর্ণ হয়নি। মূল গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে ছবিটি

দেখলে বোঝা যায় এই রূপান্তর পর্বটি ছবিতে দরিদ্র হয়ে গেছে।

এবং সেই সমকালীন সত্যের জীবন্ত স্পর্শ, যা ছবিটিকে অসামান্যতার স্তরে উত্তীর্ণ করেছে তার দিক থেকে কুশীগঞ্জে তিন দিনের সেই আশ্চর্য দিনগুলি ফুরিয়ে যখন মৃণ্ময়ী অপূর্বর সঙ্গে ফিরে যায়, রবীন্দ্রনাথ তখনকার বর্ণনায় গল্পটির সমকালের হৃৎস্পন্দনটির অমর চিহ্ন রেখে যান। তিনি লিখছেন, "মৃণ্ময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর সঙ্গে বিদায় লইল। এবং ঈশান সেই দ্বিগুণ নিরানন্দ সংকীর্ণ ঘরের মধ্যে ফিরিয়া দিনের পর দিন মাসের পর মাস নিয়মিত মাল ওজন করিতে লাগিল।"

তিনটি মানবিক অমল আনন্দের দিন গত হবার পর, পুঁজি-বাদের আরম্ভ পর্বের এই শ্রমজীবিটি 'মানুষ' থেকে পুনশ্চ 'যন্ত্রে' পরিণত হল, বিদেশী কোম্পানীর মুনফা অর্জনের ওয়েইং মেশিন—ওজন করা যন্ত্র। (লক্ষ্যণীয় আগেও ঈশান সম্পর্কে এই ধরণের কথা রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু এবারে উল্লেখিত লাইনটিতে 'দিনের পর দিন, মাসের পর মাস' কথাকটি যুক্ত করে, এবং আগের মাল ওজন ও টিকিট বিক্রয়-এর শেষেরটি বাদ দিয়ে, ঈশানের সম্পূর্ণ যন্ত্রীকরণ সার্বিক যন্ত্রীকরণকে ভয়ানক ভাবে চিহ্নিত করেছেন)। এই অব্যর্থ অমোঘ লাইনটি লেখার জন্য রবীন্দ্রনাথের কার্ল মার্কস পড়ার দরকার হয়নি, অন্তর্দৃষ্টি, পর্যবেক্ষণ ও গরীব মানুষের প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসা থাকলেই এটি লক্ষ্য করা যায়। এখানে রবীন্দ্রনাথ গল্পের সমকালের এই শাসন শোষণের ভিতরকার সত্যে আমাদের নিয়ে যান। সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের বিনিময়ে একটা মানুষকে কিভাবে তার আপন সংসারের সুখ দুঃখ আনন্দ থেকে নির্বাসিত হতে বাধ্য করা হয়, এবং তাকে ব্যবহার করা হয় যন্ত্রের মত—তার মর্মান্তিক সত্যরূপ এত ছোট পরিসরে এত কাল আগে বাংলা সাহিত্যে আর কে লিখেছিলেন? এই হচ্ছে নব্য পুঁজিবাদ পর্বের একটি মেহনতি মানুষের অসহায় 'বিচ্ছিন্নতা বোধ'—'এ্যালিয়েনে-শন', যার কথা তরুণ কার্ল মার্কস তত্ত্ব হিসেবে প্রথম উদ্ঘাটিত করেছিলেন তাঁর প্রথম মৌলিক থীসিসে Economic and Philosophic Manuscript 1884—'আপন শ্রমের ফল থেকে বিযুক্ত মানুষের বিচ্ছিন্নতা বোধ'—যা তাঁর পরবর্তী যুগান্তকারী অর্থনৈতিক চিন্তাগুলির উৎস বিশেষ। সেই সময়ের ভারতের শ্রমজীবির ছবিটি আমাদের কবি কী অসামান্য ভাষায় ঈশানের মধ্যে প্রকাশ করেছেন—ঈশান "দিনের পর দিন, মাসের পর মাস নিয়মিত মাল ওজন করিতে লাগিল।"

'সমাপ্তি' ছবি থেকে এই ঈশান পর্ব বাদ দেওয়ার কী যুক্তি সঙ্গত কারণ থাকতে পারে তা আজো বুঝে উঠতে পারিনি। কিন্তু তাতে যে এমন অসামান্য সুন্দর ছবিটি বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঈশানপর্ব বাদ দেওয়ার পক্ষে দুটি যুক্তির কথা শুনে থাকি। দুটিই অক্ষম যুক্তি। (১) ছবিটি নাকি যে ঝিরিঝিরি সুরে বাঁধা তাতে ঈশানের প্রচণ্ড বাস্তবতার কর্কশ স্বর খাপ খায় না। প্রশ্ন তাহলে এমন ঝিরিঝিরি গল্পে রবীন্দ্রনাথ কি করে ঈশানের কর্কশ সত্যকে এনেছেন, এবং কেনই বা এই রূঢ় বাস্তবতার জীবন্ত স্পর্শে গল্পটি এতটুকু তরল হয়ে উঠতে পারেনি? (২) দ্বিতীয় যুক্তি, ছবি দীর্ঘতর হয়ে যেত। অবশ্যই যেত, কিন্তু অন্য কোন অংশকে কিছু সংক্ষিপ্ত করে সামান্য দশ মিনিটের দৃশ্য হলে সেটা কিছু মহাভারত অশুদ্ধ গোছের ব্যাপার হত না। ঈশান পর্বটি ইঙ্গিতময় করে যথাযোগ্যতার সঙ্গে সংক্ষেপে প্রকাশ করার ব্যাপারে, আর যার কোন সন্দেহ থাকুক, আমার কোন সন্দেহ নেই যে তা 'অপরাজিত'র স্রষ্টা পারতেন না। অবশ্যই পারতেন, যদি ইচ্ছা করতেন। কিন্তু গোলমাল হচ্ছে ওই 'ইচ্ছা'টি নিয়েই সত্যজিৎ রায়ের সেই 'ইচ্ছার' অভাব তখন হয়ত বোঝা সম্ভব ছিল না, কিন্তু আজ বোঝা যায় এই 'ইচ্ছা'র ও 'সচেতনতা'র অভাবই সত্যজিৎ রায়ের ছবিকে আজ 'অপরাজিত' থেকে 'অশনি সংকেতে' নামিয়ে এনেছে।

রবীন্দ্রনাথ যে কল্পিত তরবারির কথা লিখেছেন যারা দ্বারা মানুষকে দ্বিখণ্ডিত করলেও মানুষ টের পায় না, সেই তরবারি চালনার কথাটি মূল গল্পে কুশীগঞ্জ পর্বে ইঙ্গিতময়তার সঙ্গে আছে, এবং ছবিতে নেই—সেজন্য ছবির এই অংশ দরিদ্র হয়েছে। কিন্তু তার পর 'একটু নাড়া দিলেই দুই অর্ধখণ্ড ভিন্ন হয়ে যায়'—সেই ভিন্ন হয়ে যাওয়াটি, মৃণ্ময়ীর বর্তমান থেকে অতীতটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি ছবিতে শুধু তিনটি ডিসলভ -এর মাধ্যমে সত্যজিৎ রায় বড় সুন্দর ভাবে দেখিয়েছেন। এবং তার একটিতে কাঠবিড়ালি চরকি আশ্চর্য প্রতীকী তাৎপর্য লাভ করেছে।

ছবিতে দেখি, মৃণ্ময়ীর মধ্যে ভালবাসা ও নারীত্ব জাগ্রত না করতে পেরে অপূর্ব দুঃখে কলকাতায় ফিরে যায়। তখন সেই বিচ্ছেদের দিনগুলোয় মৃণ্ময়ী কি যেন অভাব অনুভব করে, অথচ ছবিতে তো কুশীগঞ্জ পর্ব নেই, স্বামীকে সে তো সখা বন্ধু হিসেবেও নিতে পারে নি, তাহলে হঠাৎ এই অভাব বোধ—কেমন যেন নিঃসঙ্গতা ও পরিবর্তন কোথা থেকে আসে? এই ফাঁকটি ছবিতে রয়ে গেছে। ছবিতে ধরে নেওয়া হয়েছে যে একটা বয়সের পর সব কিশোরীর মধ্যে এই পরিবর্তন আসবে, বিবাহিত কিশোরীর তো বটেই। গল্পে এই ধরে নেওয়াটি কোথাও নেই, গল্পে মৃণ্ময়ীর রূপান্তরের প্রতিটি মনস্তাত্বিক ধাপ সুস্পষ্ট। ছবিতে তা নয়।

যাই হোক ছবির দর্শক হিসেবে আমরাও তা ধরে নিই। তারপর তিনটি অসামান্য ডিসলভের মধ্যে দেখি মৃণ্ময়ী তার অতীতটাকে

কিভাবে তার বর্তমান থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। প্রথম দৃশ্যতে দেখি সে আর তার বালক বন্ধু রাখালের খেলার ডাকে সাড়া দিতে পারছে না, সে অন্যমনস্ক—কী যেন ভাবে। ডিসলভ। দ্বিতীয় দৃশ্য ফেড ইন করে দেখি—চরকি কাঠবিড়ালি মরে গেছে তাকে একটা লাঠি ঝুলিয়ে এনেছে রাখাল মৃণ্ময়ীর কাছে। মৃণ্ময়ীর মধ্যে আগেকার ভাব আর নেই, তার আচরণগত পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়—সে নিস্পৃহ কণ্ঠে বলে, "ওকে নদীর ধারে নিয়ে যা, নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দে।" ব্যস, এটুকুতেই চলচ্চিত্র ভাষায় যা বলা হল তা ঠিক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের ভাষায় ছিল এই রকম "গাছের পক্ক পত্রের ন্যায় আজ যে সেই বৃন্তচ্যুত অতীত জীবনটাকে ইচ্ছাপূর্বক অনায়াসে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল।" ডিসলভ। তৃতীয় দৃশ্য ফুটে ওঠে ঃ মৃণ্ময়ী চেষ্টা করছে অপূর্বকে একটি চিঠি লিখতে. সে সময়ে তার ভঙ্গীটির মধ্যে বেশ একটি নারীসুলভ রমণীয় ভাব আছে। সামনে শ্লেট, খাতা পত্রের ডিটেল—সে লেখা পড়া শিখছে। শটটির ফ্রেমের মধ্যে চোখে পড়ে মেঝেতে ছড়ান আছে বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগের কটি পাতা, স্পষ্ট ভাবে চোখে না পড়লেও লক্ষ্য করলে চোখে পড়ে তাতে দুটি শব্দ মুদ্রিত 'রমণী' ও 'জননী'। অনবদ্য ও অব্যর্থ এ ডিটেল। বহিরঙ্গের ডিটেল নয়, অন্তরঙ্গের ডিটেল। মৃণ্ময়ীর পরিবর্তনের ওপর এ যেন একটি অনবদ্য মন্তব্য। এই তিনটি ডিসলভ কি অসামান্য ভাবে চেখভীয়। 'শত্রু' গল্পে চেখভ যে এমনি করেই একবার ডাক্তারটির কার্বলিক এসিডে পোড়া পরিশ্রমী রুক্ষ হাতের ছবিটি দিয়ে পরে যখন জমিদারের গোলাপী পরিচ্ছন্ন নরম আয়েসী হাতের বর্ণনার ইঙ্গিতটুকু দেন তখন কি তাদের শত্রুতার মূল উৎসটা আমরা বুঝে যাই না!

মূল গল্পে 'সমাপ্তি' গল্পের নামকরণের সার্থকতা আছে এই ভাবে, সদ্য বিবাহের পর বিদ্রোহিনী মৃণ্ময়ীকে বশ করতে না পেরে দুঃখিত হয়ে কলকাতায় চলে যাবার আগের রাতে নব বিবাহিত অপূর্ব তার জেদী কিশোরী স্ত্রীর কাছে একটি হাসিয়া স্বেচ্ছায় দেওয়া চুম্বন চেয়েছিল, কিন্তু পায় নি, অবুঝ মৃণ্ময়ী এমন অদ্ভুত প্রস্তাবে হাসির চোটে তা দিতে গিয়েও পারে নি। ছবির শেষে নারী মৃণ্ময়ী আনন্দাশ্রুধারায় সেই কাজটি সমাপ্ত করল।

ব্যাপারটি যখন 'চুম্বন' নিয়ে এবং যখন ভারতীয় সেন্সর প্রথা এব্যাপারে অহেতুক বিরূপ—অতএব গল্পের মত এমন আশ্চর্য 'সমাপ্তি'—Finale সত্যজিৎ রায় রচনা করতে পারলেন না, সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য। কিন্তু তার পরিবর্তিত রূপ যা সত্যজিৎ রায় দিলেন তাও বড় অপরূপ। বৃষ্টিভেজা চশমাপরা অপূর্ব তার শোবার ঘরে যখন দেখল তার গ্রামাফোনের পাশে কে যেন দাঁড়িয়ে—তখন ক্যামেরা তার চোখে রূপান্তরিত। বাহ্য কারণ, অপূর্বর চশমায় জল, কিন্তু আন্তরিক কারণ—তার অন্তরের দুরু দুরু আশা ও আশাভঙ্গ জনিত ভয়। অপূর্বর এই মনোভাবটুকু কি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে—এই দৃশ্যে সফ্‌ট ফোকাস পদ্ধতির মধ্যে। পরে দ্বিধা কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে (বাহ্যত চশমার জল মুছে ফেলার পর) সে দেখতে পেল তার সেদিনের দস্যি কিশোরী বিদ্রোহিনী মৃণ্ময়ী বাল্পিছুতা নববধূ বেশে দেহ মনের সব আকুলতা নিয়ে স্বামীকে গ্রহণ করতে অপেক্ষমানা—আজ সে যুবতী, পূর্ণা নারী।

ছবিটি দেখার পর বড় দুঃখ থেকে যায়, এমন অসামান্য সুন্দর ছবিটিতে একটি বেদনাদায়ক অপূর্ণতা রয়ে গেল—কুলীগঞ্জ পর্ব বাদ দেওয়ায়।

'তিন কন্যা' ছবির মধ্যে সমাজ চেতনার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ও সত্যজিৎ রায়ের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য এখানে লক্ষ্যণীয়।

'তিন কন্যা' ছবিতে তিনটি কন্যা সমাজের শ্রেণীগত তিনটি স্তর থেকে নেওয়া—(১) 'পোস্টমাস্টার'-এ রতন দরিদ্র সর্বহারা শ্রেণীর মেয়ে, (২) 'মণিহারা'র মণিমালিকা উচ্চবিত্ত শ্রেণীর রমণী, (৩) 'সমাপ্তি'র মৃণ্ময়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়ে। লক্ষ্যণীয় মূল গল্পে রবীন্দ্রনাথ এদের চরিত্রায়ণে এদের শ্রেণীগত অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপারে কি রকম নির্ভুল! কিন্তু ছবি করার সময় চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় রতনের ক্ষেত্রে একেবারে ব্যর্থ।

পুরুষ চরিত্র তিনটির দুটিই—পোস্টমাস্টার ও অপূর্ব—মধ্যবিত্তশ্রেণীর। ফণীভূষণ উচ্চবিত্তশ্রেণীর। এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ একেবারে নির্ভুল। এখানেও যখন মধ্যবিত্ত চরিত্রটি তার স্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে—তখন সত্যজিৎ রায় তাদের ঠিকই ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু যখন সে বিবেকের সংকটে দ্বিধাবিভক্ত—যেমন 'পোস্টমাস্টার'-এ, তখন তার পলায়নপরতার বিশ্লেষণে সত্যজিৎ রায় একেবারে উদাসীন, নীরব। রবীন্দ্রনাথের সমাজ চেতনার সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের এখানেই পার্থক্য।

এমিলি ডি আন্তোনিও ঃ সাক্ষাৎকার

এ্যালান রোজেনথাল

ডি আন্তানিও আমেরিকার একজন ডকুমেণ্টারী ফিল্ম স্রষ্টা। নিক্সনের হোয়াইট হাউজ শত্রু তালিকায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্তি তাঁকে বিরল সম্মান এনে দিয়েছে। তাঁর ফিল্মে ফুটে ওঠা রাজনৈতিক অভিমত অস্বাভাবিক রকমের তেজস্বী ও অকাট্য। তিনি অত্যন্ত কৌতুকপূর্ণ কথাবার্তা বলেন। তাঁর নেপথ্যের জীবন বিচিত্র সব ঘটনায় সমৃদ্ধ।

প্রশ্ন ঃ আপনি কিভাবে ডকুমেণ্টারী ফিল্মের জগতে প্রবেশ করলেন? আপনার যাত্রা শুরু কোথা থেকে?

উত্তর ঃ ১৯৬১ সালে Point of Order ফিল্মের মাধ্যমে আমার যাত্রা শুরু। তার আগে পর্যন্ত অনেকটা আমার উইট (Wit) এর দ্বারা আমার জীবিকা চলতো। অধিকাংশ চলচ্চিত্রকারের মত না হয়ে আমি ছিলাম একজন ইণ্টেলেকচুয়াল। আমি হার্ভার্ডে যাই এবং কলাম্বিয়ায় গ্রাজুয়েশন কোর্স করি। কলেজে আমি ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ এবং জন রীড সোসাইটীতে যোগ দেই। আমি যতদূর পেরেছি রাজনৈতিক সব কিছুতেই যোগ দিয়েছি। পরে আমি দশন পড়ি, কিন্তু, আমার মনে হল এতে কোন ফায়দা নেই। সুতরাং আমি হয়ে গেলাম ওয়ান-ডে-এ-ইয়ার বিজনেস পার্সন। বছরে একদিন প্রচুর টাকা কামাই। পুঁজিবাদীদের মধ্যে আমি ছিলাম একজন মার্কসবাদী। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন আমার সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতা আমাকে অরাজনৈতিক করে তোলে। আমি এ্যালকোহল আর মেয়েমানুষে আসক্ত হয়ে পড়ি। আমি পাঁচ পাঁচবার বিয়ে করি। এ ছাড়াও অগুণতি মহিলার সাথে রাত কাটাই। আমি পড়াশুনা করি প্রচুর এবং সাধারণতঃ এলোমেলো বোহেমিয়ান জীবন যাপন করি।

পার্টির সাথে নিজেকে না জড়িয়েই ১৯৫৯ সালে আবার আমি কমিউনিস্ট হয়ে পড়ি এবং বরাবর আমি যা অপছন্দ করতাম—সেই চলচ্চিত্রের প্রতি ইণ্টারেস্টেড হই। মার্কস ব্রাদার্স, ডব্লিউ সি ফিল্ডস এবং গোড়ার দিকের সোভিয়েত সিনেমা আমার ভালো লাগতো। তবে আমেরিকানদের মত আমি সিনেমায় যেতাম না। এমনও হতো পুরো একটা বছর চলে যেতো অথচ একটাও ফিল্ম দেখা হতো না।

প্রশ্ন ঃ ১৯৫৯ সালে হঠাৎ আবার রাজনীতিক হয়ে উঠলেন কেন?

উত্তর ঃ বাতাসে গন্ধ শুঁকে আমি টের পাই রাজনীতি আবার কাজ দেবে। আমি কেনেডীকে চিনতাম। আইজেনহাওয়ার অথবা ট্রুম্যানের চেয়ে তার নির্বাচন আমাকে অস্বস্তিতে ফেলে। রাজনীতিতে নবাগত তরুণ র‍্যাডিক্যালদের সাথে আমি বৈঠক শুরু করি। পঞ্চাশের দশকে আমার কিছু হোমোসেক্চুয়াল আভা-গার্দ বন্ধু ছিলো। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল জন কেইজ, রজেনবার্গ এবং জ্যাসপার জোন্স্। তারা আমার গ্রামের বাড়িতে আসতো, ড্রিঙ্ক করতো আর বকতো।

প্রশ্ন ঃ ফিল্মের জগতে এসে শুরুতেই ম্যাককার্থীর ব্যাপারটি বেছে নিলেন কেন?

উত্তর ঃ অবশ্যই পঞ্চাশের দশকে তিনি ছিলেন সবচেয়ে শক্তিশালী এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। বিলীয়মান ওই দর্শকটির সঠিক বর্ণনা দিয়েছিলেন তিনি। শূন্য-গর্ভ টিভি শো ছাড়া ফিল্মে তাক নিয়ে কিছুই করা হয়নি। আর শোগুলোও তৈরী হয়েছে তার বিদায়ের চার বছর পরে।

চরিত্র পছন্দের ব্যাপারটা ছিল পরিষ্কার। তারপর ডেড ফুটেজ নিয়ে কাজ করার আইডিয়া এলো মাথায়—এক ধরণের কোলাজ জাঙ্ক আইডিয়া, আমার পেইণ্টার বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া।

সিবিএস টেলিভিশনকে প্রথম যখন ম্যাককার্থী ফুটেজের কথা বললাম, তারা জানালো এটা তাদের কাছে নেই। তারা মিথ্যে বলেনি। নিউ জার্সির ফিল্ম গুদামে একটার সাথে আরেকটা মেশানো, এলোমেলো প্রচুর ফুটেজ গুদামজাত করা ছিল যার কথা তারা ভুলেই গিয়েছিলো। যাহোক, সি বিএস-এ কর্মরত আমার বন্ধুরা অনেক খোজা-খুঁজি করে আমার জন্যে ১৮৮ ঘণ্টার কাঁচামাল উদ্ধার করে।

এবারে ফিল্মের কথা। আমার ইচ্ছে ছিল একটা রাজনৈতিক ডকুমেণ্টারী তৈরী করা। এর প্রাথমিক আইডিয়াটা এসেছিল ডন টলবোটের কাছ থেকে। ডন ছিল দি নিউইয়র্কার থিয়েটারের মালিক। তার প্রেক্ষাগৃহে ব্যতিক্রমী ধারার ফিল্ম প্রদর্শন করে সে মার্কিন দর্শকদের রুচি গড়ে তোলে। একদিন ডন বললো ঃ পঞ্চাশের দশকের টেলিভিশনে সবচেয়ে ইণ্টারেস্টিং বিষয় কোনটি? দু'জনই বলে উঠলাম "আর্মী-ম্যাককার্থী শুনানী"। ফিল্ম তৈরী ডনের উদ্দেশ্য ছিল না—সে চেয়েছিলো শুনানীগুলো অথবা তার সংক্ষিপ্তসার জড়ো করে ম্যাককার্থীর ওপর একটা প্রোগ্রাম তৈরী করতে।

ফিল্ম সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না, তবু আমি ফুটেজগুলো থেকে একটা ফিল্ম তৈরী করতে চাইলাম। ডন আমার চেয়েও বেশী ভীরু। সে বললো ঃ ফিল্ম সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না। বরং অরসন ওয়েলসকে ডাকা যাক ফিল্মটি তৈরীর জন্যে, ওয়েল্‌সের কাছে সে তারবার্তা পাঠালো। ওয়েল্‌স এতে কোন আগ্রহ দেখালেন না। আমরা তখন একজন পেশাদার চলচ্চিত্রকার ডেকে আনলাম। সে কাজ শুরু করলো। পরে তাকে সরিয়ে আমি নিজেই দায়িত্ব নিলাম। ফিল্মটির ব্যাপারে মৌলিক আইডিয়া ছিল এতে কোন বর্ণনা থাকবে না। আমার মনে হয় এ ছবির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, একবাক্যও বর্ণনা ছাড়া এটাই প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য রাজনৈতিক ডকুমেণ্টারী ফিল্ম। ফিল্মটি পুরোপুরি অর্গানিক।

প্রশ্ন ঃ ডনেরও ফিল্মটি তৈরী করার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে এটা আপনার উপর বর্তালো কিভাবে ?

উত্তর ঃ আমি ডনকে বললাম, হয় তুমি ফিল্ম তৈরী করবে নয়তো আমি। আমরা টস্ করবো। টসে যে জিতবে সে ফিল্ম তৈরী করবে। অন্য কেউ তাতে নাক গলাতে পারবে না। ফিল্মটি যখন শেষ হবে, তখন দু'জন একসাথে বসে দেখবো। শুনে ডন বললো ঃ এটা ঠিক নয়। আমি এটা করতে পারবো না। আমি এই থিয়েটারের মালিক। তা'ছাড়া আমার বউ-বাচ্চা রয়েছে। তখন আমি বললাম ঃ আমি এটি তৈরী করবো। ও কে। এই হল ঘটনা।

প্রশ্ন ঃ টাকা জোগাড় করলেন কিভাবে ?

উত্তর ঃ টাকা জোগাড়ের ব্যাপারে আমি বরাবরই ওস্তাদ। বামপন্থী ফিল্ম তৈরীর জন্যে আমি দশ লাখ ডলারের বেশী অর্থ সংগ্রহ করেছিলাম। আমি গরীব পরিবার থেকে আসিনি। বিত্তবানদের সাথে আমার বরাবরই জানাশোনা ছিল। এলিয়ট গ্র্যান্ট নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন লাখপতি, লিবারেল, এবং তিনি ম্যাককার্থীকে ঘৃণা করতেন। আমি তার সাথে দেখা করি। আমরা তার বাড়িতে, সেখান থেকে সেভেনটি থার্ড এবং থার্ড-এ এ্যালেন্‌স্ নামক স্থানে মিলিত হই। হামবারগার ও ড্রিঙ্ক নিতে নিতে আমি আমার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করি। একটু ভেবে এলিয়ট বলেন ঃ এতে কত খরচ পড়বে ? আমি বলি ঃ আমি জানি না। আমি কখনো ফিল্ম তৈরী করিনি। তিনি বলেন ঃ শুরুতে এক লাখ ডলার দিলে কেমন হয় ? আমি বলি একটু সবুর করুন। আগে একটা করপোরেশন গঠন করে নিই। পরে খাবারের বিল এলে তিনি বয়কে টিপ্‌স্ দেন কুড়ি সেণ্ট, আমাকে এক লাখ ডলার। শেষে অবশ্য ফিল্মটিতে অনেক বেশী খরচ হয়েছিল।

বিষয়বস্তুর কপিরাইট বাবদ সিবিএস পঞ্চাশ হাজার ডলার দাবী করে বসে (ফুটেজগুলো নষ্ট ও অকেজো হয়ে গেলো—এ নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই)। তাছাড়া লাভের পঞ্চাশ শতাংশ পাবে তারা। Point of Order থেকে আর কারো চেয়ে সিবিএস সবচেয়ে বেশী অর্থ কামিয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ফুটেজগুলো কাটার শুরুতে আপনার লক্ষ্য অথবা নির্দেশক বিষয় কি ছিল ?

উত্তর ঃ আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু দুটোর ওপরই আমি জোর দিয়েছিলাম। আঙ্গিকগত দিকটি ছিল বেশী মুগ্ধকর। খোলাখুলি-ভাবে আমি বাণিজ্যসফল ফিল্ম তৈরী করতে চেয়েছিলাম। এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর Point of Order-ই প্রথম রাজনৈতিক নন-টিভি ডকুমেন্টারী যেটা আর্থিক সফলতা অর্জন করেছে এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হয়েছে। আমি চেয়েছিলাম বাইরের কোন শব্দ ছাড়া, কোন কিছু বর্ণনা ছাড়াই কাহিনীর কাঠামো হবে পরিপূর্ণ এবং সুসংহত। আমি চেয়েছিলাম বিষয়টি হবে সেল্‌ফ্-এক্সপ্ল্যানেটরি রাজনৈতিক বিবৃতি। বর্ণনার মাঝে এমন কিছু রয়েছে যা আমার কাছে সহজাতভাবে ফ্যাসিস্ট বলে মনে হয়—এই অর্থে যে দর্শকরা যখন একটা জিনিস দেখছে তখন তাদেরকে বলা হচ্ছে তারা কি দেখছে। ফিল্মের যদি নিজস্ব আবেদন থাকে তাহলে বর্ণনার কোন দরকার নেই—সে নিজেই নিজের বর্ণনা দেয়।

প্রশ্ন ঃ সিবিএস যখন তাদের আর্কাইভের ফিল্ম দিতে সম্মত হয়, তখন তারা কি আপনার রাজনৈতিক পটভূমি অথবা ফিল্মগুলো যে কাজে ব্যবহার করবেন তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়েছিল ?

উত্তর ঃ আমরা কারা এবং আমি একজন কমিউনিস্ট একথা জেনে সিবিএস এতই নার্ভাস হয়ে পড়েছিল যে, তাদের সাথে আমাদের চুক্তির ১৪ নং ধারায় লেখা ছিল সিবিএস-এর নাম যদি কোথাও উল্লেখ করি তাহলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং পঞ্চাশ হাজার ডলারও গচ্চা যাবে। ফিল্ম যখন মুক্তি পেলো আর সব সমালোচকরাই পছন্দ করলো, 'টাইম' ম্যাগাজিন লিখলো ঃ 'এ সাইকেডেলিক এক্সপেরিয়েন্স—' ইত্যাদি ইত্যাদি—সিবিএস তখন ওইসব সমালোচনা সংগ্রহ করে একখানা সুশোভন পুস্তিকা প্রকাশ করলো। আর সেটা হচ্ছে আমার জন্যে চূড়ান্ত অপমান। কারণ, সমালোচকরা এবং সিবিএস—কেউই আসল পয়েন্টটা ধরতে পারেনি। ফিল্ম দেখে, সে সময়ে নিজেদের ভূমিকার কথা ভেবে সহসা উক্তি করে ওঠা লিবারেলরাও পয়েন্টটি ধরতে পারেনি।

ফিল্মটি ম্যাককার্থীর ওপর আক্রমণ নয়। এটা মার্কিন সরকারের ওপর আক্রমণ। আমার যা অনুভব, মনোযোগ দিয়ে ফিল্মটি দেখলে ওয়েল্‌চ্‌কেও ম্যাককার্থীর মত অসৎ মনে হবে। সে একজন প্রতিভাধর, অশুভ, ধূর্ত আইনজীবী যে ম্যাককার্থীকে ধ্বংস করার জন্যে ম্যাককার্থীরই কৌশল অবলম্বন করেছে। ম্যাককার্থী বুঝতে পেরেছিলো সে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি ম্যাককার্থীর ধ্বংস

চেয়েছিলাম, তবে এও চেয়েছিলাম যে পুরো সিস্টেমটা অনাবৃত হোক। আর তাছাড়া ফিল্মটি যারা দেখেছে তাদের খুব কম সংখ্যকই ছিল মার্কসবাদী। বুর্জোয়া সমালোচকরা ফিল্মটিকে পছন্দ করেছে এবং সাফল্য এনে দিয়েছে।

প্রশ্ন : প্রথম ফিল্ম তৈরী করতে গিয়ে, ফিল্ম সম্পর্কে আপনার 'অজ্ঞতা' কি কি অসুবিধা সৃষ্টি করেছিল? আপনি কি কি ভুল করেছিলেন?

উত্তর : মোটের ওপর এটা ছিল একটা তৃপ্তিদায়ক অভিজ্ঞতা। এই প্রথম ফিল্মটিতে যা করেছি, তা থেকে ভিন্ন রকম কিছু করতে পারতাম না। তার পরে অন্য ফিল্মে অবশ্যই। জীবনে আমি এতো কঠোর পরিশ্রম করিনি। এটা ছিল আমার আসল কাজের ভূমিকা। মানে, আমি সব ধরণের দৈহিক পরিশ্রম করেছি এবং তা উপভোগও করেছি। কিন্তু সপ্তাহের প্রতিদিন ১০৷১২ ঘণ্টা এবং এইভাবে পুরো দু'বছর ফুটেজের ওপর নজর বুলানো থেকে সেটা ছিল ভিন্ন।

প্রশ্ন : আপনি কি খুঁজছিলেন? ১৮০ ঘণ্টার ফুটেজ থেকে কি করে আপনার ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট বেছে নিলেন?

উত্তর : আমার কাছে ফিল্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে এর কাঠামো। দেখার আগেই বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমার ভালো জানা ছিল। কারণ, আমি শুনানী দেখেছিলাম আর এসব ব্যাপারে আমার স্মৃতিশক্তি বড় প্রখর। শুনানীতে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ছিলো। তবে মূল আইডিয়া ছিল কি ঘটেছে সে কাহিনীটা বলা এবং সিস্টেমের দুর্বলতা তুলে ধরা। কিভাবে একজন রাজনৈতিক নেতা একটা মেশিনের দ্বারা বন্দি হয়ে যায় সেটা তুলে ধরা। কারণ, সে কোন নিয়মবদ্ধ প্রতিরোধ অথবা নৈতিকতা কিংবা কোন প্রতিপক্ষের দ্বারা ধ্বংস হয়নি।

প্রশ্ন : আমার মনে হয়েছে, ফিল্মটির শেষের দিকে আপনি ব্যাপকভাবে কথা ও ছবি ব্যবহার করেছেন।

উত্তর : যথেচ্ছভাবে। উপাদান পুরোপুরি ব্যবহার করা হয়েছে। সিনেমা ভেরিতে প্রথমতঃ একটা মিথ্যা, দ্বিতীয়তঃ ফিল্মের চরিত্র সম্পর্কে এটা একটা শিশুসুলভ ধারণা। সিনেমা ভেরিতে একটা তামাশা। অনুভূতিহীন অথবা দৃঢ় বিশ্বাস যাদের নেই কেবলমাত্র তারাই সিনেমা ভেরিতে তৈরীর কথা ভাবতে পারে। আমার তীব্র অনুভূতি আছে, স্বপ্ন আছে এবং আমি যা-ই করি তার সম্পর্কে আমার পূর্ব-ধারণা আছে।

প্রশ্ন : সিনেমা ভেরিতে-র ওপর আপনি এত ক্ষ্যাপা কেন?

উত্তর : প্রথমে ধরা যাক এই নামটা। সিনেমা ভেরিতের কারিগরি উপাদান, মানুষ যার উন্নয়নসাধন করেছে, যেমন—হালকা ক্যামেরা, সিনক্রনাইজড সাউণ্ড সিস্টেম—এসব আমি মেনে নিতে রাজি। কিন্তু এই নির্বোধ ভাণ—পূর্ব থেকে ধারণার অভাব—এই বিশ্বাস আমাকে ক্ষেপিয়ে তোলে। ক্যামেরা চালনা ছাড়া কোন ফিল্মই তৈরী হয়না। আর এই ক্যামেরা চালানো, এক অর্থে, অনুভবের পূর্ব ধারণার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। পূর্ব ধারণা ছাড়া এক টুকরো ফিল্মও কাটা এবং সম্পাদনা করা যায় না। সিনেমা ভেরিতের বিশ্বাসীরা অবশ্যই সুচতুর—তারা আসল মুহূর্তটির অপেক্ষায় থাকে। কেউকি এখনো নিজেকে সিনেমা ভেরিতে বলে? না, বলে না। আমি মনে করি এটা এখন মৃত। লীকক আর ফিল্ম তৈরী করে না, পেনবেকার ব্যবসায়ে ব্যস্ত আর মেজল বলে তাদের ফিল্ম ফিকশন অথবা ডকুমেণ্টারীর চেয়েও ভালো। সুতরাং এদেশের কে সিনেমা ভেরিতে ফিল্ম তৈরী করে আমার জানা নেই। তবে ওইসব ভেরিতে ফিল্মের এমন একটাও নেই যার বিশ্বাস সিনেমা ভেরিতে ছিল বলে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। আমি মনে করি, আমি কোন অবস্থানেই নেই এ ভাণ করার চেয়ে, সত্যি সত্যি যে অবস্থানে আছি সেখান থেকে ফিল্ম তৈরী করা অনেক ভালো। কারণ কোন অবস্থানেই না থাকাটা একটা দৈহিক অবাস্তবতা।

প্রশ্ন : আপনি নির্দিষ্ট কোন দর্শকগোষ্ঠীর জন্যে ফিল্ম তৈরী করেন নাকি নিজের জন্যে, অথবা এ দুয়ের মিশ্রণই অপনার লক্ষ্য? আমরা কাকে দর্শক বলবো?

উত্তর : আমি একজন মার্কসবাদী এবং একজন খারাপ মার্কসবাদী, কারণ, আমি দর্শকের জন্যে ফিল্ম তৈরী করি না—করি নিজের জন্যে। দর্শকের জন্যে ফিল্ম তৈরী করছি—এ ধারণা টেলিভিশনের মতই আমার কাছে ঘৃণাই মনে হয়। আমার কাছে কোন পরিমাপ যন্ত্র নেই এবং দর্শকের শ্রেণী মাপার যন্ত্রেও আমি বিশ্বাসী নই।

আমি সাধারণতঃ ক্রোধ অথবা সুযোগের কারণে ফিল্ম তৈরী করি। যেমন আমি Millhouse তৈরী করি কারণ ১৯৪৬ সালে নিক্সনের রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই আমি তার ওপর ক্ষ্যাপা ছিলাম। কিন্তু সুযোগ না আসা পর্যন্ত আমি কিছুই করিনি।

প্রশ্ন : কি সেই সুযোগ?

উত্তর : আমি তখন মুভিল্যাবে কাজ করছি, এমন সময় ফোন এলো। ফোনের অজ্ঞাত কণ্ঠ জানালো : শুনুন, নিক্সনের ওপর একটা নেটওয়ার্কের সবগুলো ফুটেজ আমি চুরি করে এনেছি। আপনি যদি তাকে নিয়ে ফিল্ম করেন তাহলে এগুলো আপনাকে দিতে পারি। বিনিময়ে আমি কিছুই চাই না। আমি বললাম : এই মুহূর্তে জবাব দিতে পারছিনে। আমাকে দশ মিনিট সময় দিন। সে আবার টেলিফোন করলে আমি বললাম : ঠিক আছে, আমি নিক্সনের ওপর ফিল্ম তৈরী করবো, হাতের কাজ (Painters Painting) সরিয়ে রাখবো, তবে আমি আপনাকে দেখতে চাই না আর এজন্যে আপনাকে টাকা পয়সা দিতে পারবো না। সে বললো : আমি টাকা-পয়সা চাই না।

আমি তখন বললাম : আজ মাঝ রাতে মুভিক্যাম জমনে আসুন। আমার সুপারিন্টেন্ডেন্ট আপনাকে ভিতরে নিয়ে আসবে। আপনার সব কিছু রুমের মাঝখানে রেখে যাবেন।

সকাল সাতটায় এসে দেখি—সে দুশো ক্যান ফিল্ম রেখে গেছে। এসব এখন বলতে আর কোন বাধা নেই, কারণ, আইনের মেয়াদ পেরিয়ে গেছে। এটা ছিল ১৯৭০ সালের ঘটনা।

আমিই একমাত্র চলচ্চিত্রকার যে ফিল্ম তৈরীর জন্যে নিক্সনের 'শত্রুর' তালিকাভুক্ত হয়েছিলাম। আমার ওপর দশ দশটি হোয়াইট হাউজ স্মারকলিপি রয়েছে যার শুরু এরকম : 'দি হোয়াইট হাউজ, ওয়াশিংটন ডিসি সাবজেক্ট : এমিলি ডি আন্তোনিও।' আমি যে সব পুরস্কার পেয়েছি তার চেয়ে ওই স্মারকলিপিগুলো আমার কাছে বেশী ইন্টারেস্টিং। ওই দশটি পৃষ্ঠাই আমার চরম পুরস্কার।

প্রশ্ন : ষাটের দশকে আপনার কি মনে হয়েছে আপনার ফিল্মের চরিত্রের জন্যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা সরকার আপনার ওপর নজর রাখছে ?

উত্তর : আমার দ্বিতীয় ফিল্মটিতে হস্তক্ষেপ হয়েছিল, তার আগে নয়।

প্রশ্ন : দ্বিতীয় ফিল্ম মানে Rush to Judgement ?

উত্তর : হ্যাঁ

প্রশ্ন : কি ঘটেছিল ?

উত্তর : আমরা যখন ডালাসে শুটিং-এ যাই, শেরিফের বাহিনী রাইফেল আর পিক-আপ ট্রাক নিয়ে আমাদের অনুসরণ করেছিলো।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন ঘটনাটা রাজনৈতিক নাকি চলচ্চিত্রকারদের বেলায় সচরাচর এরকম ঘটে থাকে ? আমার এক বন্ধু সাউথে শুটিং-এ গেলে তার ঠিক একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। অথচ সেটা কোন রাজনৈতিক ফিল্ম ছিল না।

উত্তর : রাজনৈতিক কারণেই এরূপ ঘটেছিল। কারণ, ওখানেই সীমিত থাকেনি, আরো অনেক কিছু ঘটেছিল। সরকারের বিরুদ্ধে আমার দুটো মামলা রয়েছে—একটা এফ বি আই-এর বিরুদ্ধে, জর্জ সিরিকার কোর্টে এবং অপরটি সিআই-এর বিরুদ্ধে ব্রীয়ান্টের কোর্টে। এটা ছিল এফ বি আই এর কাজ। ওয়ারেন কমিশন খুঁজে পায়নি এমন অনেককেই মার্কলেইন আর আমি খুঁজে বের করেছিলাম।

তখনকার অবস্থার একটা দৃষ্টান্ত দিই। কেনেডী গুলিবিদ্ধ হবার সময় জাঁ ছিল সম্ভবত আর কারো মতই তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিল। এবং আমরা যেসব লোককে ডাকি সে ছিল তার অন্যতম। প্রথম যখন তাকে টেলিফোন করি, সে বলে : 'অবশ্যই, কেন নয়।' আমরা মিথ্যে বলিনি—বলিনি আমরা সি বি এস অথবা এনবিসি থেকে এসেছি। আমরা বলি : ওয়ারেন কমিশনের ধারণাকে সন্দেহ করে আমরা এমন একদল স্বাধীন লোক, আমরা একটা ফিল্ম তৈরী করছি।

আমরা যখন তার ছবি তুলতে গেলাম—দেখি সে সত্যি সত্যি ঘাবড়ে গেছে। তার সাথে আমাদের টেলিফোন ও আমাদের উপস্থিতির মাঝে স্পষ্টতঃই একটা শর্ট সার্কিট কাজ করেছে। এরকম ঘটেছে অনেক ক্ষেত্রেই। সে বললো 'দেখুন, আমার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে। আমার দু'টো বাচ্চা আছে, আমি সরকারী স্কুলে পড়াই। আমাকে বলা হয়েছে আপনাদের সাথে কথা বললে আমাকে বরখাস্ত করা হবে। প্লিজ, আপনারা যান'। এরূপ ঘটেছে ভিন্ন ভিন্ন রূপে। লোক জানতো আমরা কোথায় যেতে পারি, জানতো আমরা কার কাছে যাচ্ছি। আর এটা কেবল টেলিফোনে আড়িপাতা অথবা আড়িপাতা ও অনুসরণ—এ দুইয়ের সমন্বয়েই সম্ভব।

ডালাসে আমার ,প্রথম রাতের ঘটনা। আমার দলবল এসেছে সানফ্রান্সিসকো থেকে। আমি একা তাদের ব্রীফিং করছি। হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। দুই সুদর্শন তরুণ এসে হাজির। পরনে স্টেটসন লাগানো স্যুট ও টাই। তারা হলুদ ভিজিটিং কার্ড বের করে দেখালো। দু'জনই ডালাস হোমিসাইড স্কোয়াডের সদস্য। অত্যন্ত ভদ্র। তখন মনস্থির করবার সময়—শাসনতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্ন তুলে শহর থেকে বিতাড়িত হবো নাকি তাদের সাথে বিশ্বস্ত আচরণ করবো। আমি বললাম : আমি জাজমেন্ট ফিল্ম কর্পোরেশনে কাজ করি (ওই ফিল্মটি তৈরী করবার জন্যে আমি কর্পোরেশনটি গঠন করেছিলাম)। তাদেরকে আমাদের আগ্রহের কথা জানালাম। তারা অত্যন্ত মধুর ব্যবহার করলো যে পর্যন্ত না বেনেভাইড্সের নাম এলো। অফিসার টিপেট-এর হত্যার সময় সম্ভবতঃ বেনে-ভাইড্স তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ছিল। এ প্রসঙ্গে পুলিশ বললো : তোমরা বেনেভাইড্সের সাক্ষাৎকার নিতে পারবে না। আমরা কখনো তা নেইনি। ভয় দেখিয়ে তাকে টাউন থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। অনেকের বেলায়ই এরকম ঘটেছে।

প্রশ্ন : In the Year of the Pig-এর উৎস ও ফিল্ম তৈরীর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কিছু বলবেন কি ? সে সময় পর্যন্ত মিডিয়া কি করেছে বা করেনি এ সম্পর্কে আপনার কি ধারণা ?

উত্তর : মিডিয়া কখনো স্বতন্ত্র বা সমালোচনামূলক কিছুই করেনি। মার্কিন জনগণ কদাচিৎ মিডিয়ায় ভুগেছে। প্রতিদিন আমরা যুদ্ধ দেখছি। প্রতিদিন দেখছি মৃত আমেরিকান, মৃত ভিয়েতনামী, বোমাবর্ষণ—বিভিন্ন ধরণের সব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। কিন্তু কেন এইসব ঘটছে তার ওপর একটা প্রোগ্রামও তৈরী হয় নি। এর ইতিহাস নিয়ে কোন প্রোগ্রাম হয়নি, এটাকে তার প্রেক্ষিতে স্থাপন করার চেষ্টায় একটা প্রোগ্রামও তৈরী হয়নি। আমি চেয়েছিলাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে

ফরাসী অভিজ্ঞতা হয়ে টেট আক্রমণ পর্যন্ত পুরো ব্যাপারটার একটা ইন্টেলেকচুয়াল ও ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ।

ভিয়েতনামের ব্যাপারে আমি খুব ক্ষ্যাপা ছিলাম এবং একটা কিছু করতে চাচ্ছিলাম। এমন সময় দু'জন ছাত্র এসে বললো : আমরা আপনার অন্যান্য ফিল্ম দেখেছি। আমরা মনে করি ভিয়েতনাম নিয়ে আপনার একটা ফিল্ম তৈরী করা উচিত। এসব আমাকে অকস্মাৎ কাজ শুরু করতে উৎসাহিত করলো। এন এল এফ (ন্যাশন্যাল লিবারেশন ফ্রন্ট) এবং ডিআরভি (ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব ভিয়েতনাম) উভয়ের সাথে এবং ইস্টার্ণ ইউরোপের সাথে আমার ভালো যোগাযোগ ছিল। আমি প্রকৃত প্রচুর অর্থ জোগাড় করে পুরো ইউরোপ সফর করি এবং সোভিয়েত ফুটেজ, ইস্ট জার্মান ফুটেজ, চেক ফুটেজ সংগ্রহ করি। তারপর আমি বিভিন্ন ধরণের লোক যেমন, জাঁ ল্যাকোতুর, ফিলিপ ডি ভিলারস এবং অনেক আমেরিকানের ছবি তুলি। সিনেটর মর্টনের মত কিছু ছিটগ্রস্তেরও ছবি তুলি আমি। মর্টন হো চি মিনকে ভিয়েতনামের জর্জ ওয়াশিংটন বলে অভিহিত করেছিল।

প্রশ্ন : আপনি কি আপনার ফিল্মে ইন্টেলেকচুয়াল অভিজ্ঞতার সাথে আপনার মানসিক অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন? যেমন, Year of the Pig ফিল্মে বরাবরই হো চি মিন ও ভিয়েতনাম ঈশ্বর ও ভাবী সাম্রাজ্যের মত এসেছে। কিন্তু আপনি কখনো উত্তর ভিয়েতনামে যাননি, প্রকৃত যোগাযোগের মাধ্যমেও সে সমাজকে আপনি জানেন না। আপনার কি মনে হয়, একদিকে আপনি সমাজ বা পুঁজিবাদী সমাজকে চ্যালেঞ্জ করছেন এবং অপরদিকে আপনার রাজনীতির কারণে উত্তর ভিয়েতনামের দোষত্রুটিগুলো খুব কম সমালোচনার চোখে দেখছেন? আপনি কি এ ব্যাপারে সচেতন?

উত্তর : এ যুদ্ধকে আমি গোড়া থেকেই ফ্রান্সের পক্ষে এবং আমাদের পক্ষে অন্যায় বলে অভিহিত করে এসেছি। পলিন কায়েল সমালোচনায় বলেছেন হো চি মিন ফিল্মের নায়ক। তিনি পুরোপুরি ঠিক। হো চি মিনই ফিল্মের নায়ক। এটা কোন উদ্দেশ্যমূলক বিবৃতি নয়—এটা মিথ্যাও নয়। যা নিয়ে কাজ করা যায় এবং যা বিশ্বাস করা যায় তার সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়া আর মিথ্যে বলার মাঝে তফাৎ রয়েছে। ফিল্মে কোন মিথ্যে নেই—সেখানে পক্ষপাত রয়েছে। আমি চেয়েছিলাম ভিয়েতনামীরা যুক্তরাষ্ট্রকে হারিয়ে দিক এবং তারা হারিয়েছে। ভিয়েতনাম সরকার দি ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব ভিয়েতনাম, নিখুঁত সরকার নয়। সচরাচর বিপ্লবোত্তর যে বাড়াবাড়ি ঘটে থাকে তারা তা করেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। সন্দেহ নেই নানা প্রতিক্রিয়াশীল লোকদের দমন করাটা কঠিন কাজ। আমি যাকে অগ্রাধিকার দিই সেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বিলাসিতার সাথে এটা খাপ খায় না—এতেও কোন সন্দেহ নেই।

মার্কস্ বলেছিলেন : 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি মার্কসবাদী নই।' একজন মার্কসবাদী হিসেবে মার্কসের এই কথায় আমি বিশ্বাস করি। কেউ নয়, এমন কি মার্কস, লেনিন কেউ-ই ধর্মগ্রন্থ রচনা করেননি। স্থান, কাল, পরিবেশ ভেদে পরিবর্তনের ধারাও বদলায়। মার্কস পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন। এটার প্রয়োগ এবং প্রয়োগের মাধ্যমে এর পরিবর্তন সাধন আমাদের ওপর। আমার মনে হয় অধিকার আইন রদ না করেও যুক্ত-রাষ্ট্রে প্রকৃত মার্কসীয় বিপ্লব সম্ভব। আমি গাস হল পার্টির অধীনে কমিউনিজম এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিজমের কথা বলছি না। প্রতিটি দেশের পরিবেশ ভিন্ন। আর্টের বেলায়ও এটা প্রযোজ্য। ১৯৫৯ সালে কিউবার বিপ্লবের পর থেকে আমি মনে করি, অন্য যে কোন মার্কসবাদী দেশের চেয়ে বেশী ইন্টারেস্টিং ফিল্ম সে তৈরী করেছে। প্রাচ্যে এমন কোন ফিল্ম নেই যা Memories of Underdevelopment এবং অন্যান্য কতিপয় কিউবার ফিল্মের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। এবং এটা আকস্মিক নয়। আমি ওই প্রাচ্য দেশ-গুলোতে ছিলাম। সেগুলো খুবই কষ্টকর, পীড়াদায়ক, শ্বাসরুদ্ধকর।

প্রশ্ন : পলিন কায়েল বলেছিলেন, আমেরিকার মৌলিক পচনশীলতা দেখাবার উদ্দেশ্যেই আপনি ফিল্ম বানাই করেছেন।

উত্তর : অবশ্যই।

প্রশ্ন : তিনি আরো বলেছিলেন পুরো পশ্চিম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বলে আপনি থিসিস পেশ করেছেন।

উত্তর : পশ্চিমে পচন ধরেছে। তবে ধ্বংস হওয়াটা তার কথা। আমার মনে হয় আমাদের জার্মান এবং জাপানী মিত্রদের নিয়ে আমরা বরং শক্তিশালী।

প্রশ্ন : আইভেন্সের কাজ এবং Newsreel-এর পাশাপাশি ভিয়েতনামের ওপর দুটো গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টারি হচ্ছে In the Year of the Pig এবং পিটার ডেভিসের Hearts and Minds. আপনার এবং ডেভিসের ফিল্মের মাঝে প্রধান পার্থক্যগুলো কি?

উত্তর : পার্থক্য অনেক। প্রথম পার্থক্য তাদের নির্মাণকালে। যুদ্ধের পরে ভিয়েতনামের ওপর ফিল্ম তৈরী করা কিছুটা বিলাস এবং অনেকটা নিরাপদ। এটা ভিন্ন পরিবেশ এবং এটা ভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থারও সৃষ্টি করে। তবে ডেভিসের ফিল্মের এটাই সবচেয়ে বড় দুর্বলতা নয়। কারণ, একটা যুদ্ধ শেষ হবার একশো বছর পরেও তার ওপর গ্রন্থ রচনা করা যেতে পারে এবং তা পুরোপুরি যুক্তিসিদ্ধ হতে পারে। ফিল্মটির সবচেয়ে, বড় দুর্বলতা হচ্ছে এর স্নাইডনেস (Snideness), যুদ্ধে অংশ

গ্রহণকারী হিসেবে নিউজার্সির লিনডেনের সেই পাইলটের ট্রিট-মেণ্টের প্রতি আমি খুব একটা সহানুভূতিশীল হতে পারি না। পরিষ্কার জুল রুম সিকোয়েন্স থেকে ধরনের ব্যাঙ্গাত্মক বেভারলী হিলসীয় দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে ওঠে। যে লোকটি যুদ্ধে ফিরে গিয়ে আবার ভিয়েতনামে বোমা ফেলবে বলে জানায় তার মূর্খতাও আমাদের নজর এড়ায় না।

আমার কাছে ওই সিকোয়েন্সটি পুরো অভিযানের রাজনৈতিক শূন্যতা এবং মানবিক শূন্যতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে।

পতিতালয়ের দৃশ্যের মত Hearts and Minds-এর পোষাকী দৃশ্যগুলো নেহাতই সস্তা। এটা হচ্ছে ফিল্মের বদলে মানুষকে ব্যবহার করার পুরনো মানসিকতা। যেমন ফুটবল সিকোয়েন্স কোচ খেলোয়াড়দের কোন ধারণাই নেই তারা একটা ওয়ার ফিল্মে ব্যবহৃত হতে যাচ্ছে। তাদের ধারণা তারা হাইস্কুল ফুটবল বিষয়ক কোন ফিল্মে ব্যবহৃত হতে যাচ্ছে। এরূপ পদ্ধতি প্রয়োগের পক্ষপাতি আমি নই। এগুলো বিশেষ ফলপ্রদ বলেও আমি মনে করি না।

প্রশ্ন ঃ ঘটনা সংঘটিত হবার পরে অর্থাৎ ভিয়েতনাম যুদ্ধ যখন প্রায় শেষ তখন তা নিয়ে ফিল্ম তৈরী করার জন্যে আপনি পিটার ডেভিসের সমালোচনা করছেন। আপনার ম্যাককার্থী ফিল্মও কি অনেকটা তাই নয়? নাকি ম্যাককার্থীজন এবং অন্যান্য বাড়াবাড়িগুলো এখনো বজায় রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর ঃ আর্মী-ম্যাককার্থী শুনানীর সাত বছর পরে Point of Order তৈরী হয়। এটা তৈরী হয় কারণ, এর শিক্ষা সবাই ভুলে গিয়েছে ; কারণ, এটা ছিল একটা নতুন বিষয় ; টেলিভিশনের পুরোনো এবং ওয়েভী ইমেজ থেকে তৈরী এটাই প্রথম 'ফিল্ম'। Point of Order-এর আসল পয়েণ্ট হচ্ছে শুনানীর একটা সমাপ্তি ঘটেছিল যা মাকিন জনগণ কখনো দেখতে পারেনি। এর অর্থ ম্যাককার্থীর অন্তিম। কারণ, এস্টাবলিশ-মেণ্ট তার পায়ের তলা থেকে মই সরিয়ে নিয়েছিল।

Hearts and Minds সম্পর্কে আমার আপত্তি হচ্ছে যুদ্ধ যখন প্রায় শেষ তখন ফিল্মটি তৈরী হলেও মাকিন টেলি-ভিশনের চেয়ে এর পারস্পেকটিভ বেশী নয়। এবং মাকিন টেলিভিশনের পারস্পেকটিভ সামান্যই।

Hearts and Minds-এর পর্যালোচনায় আমি বলেছিলাম ঃ ডকুমেণ্টারীর ব্যাপারে নেটওয়ার্ক টেলিভিশন এবং হলিউড বরাবরই অস্বস্তি অনুভব করে। নেটওয়ার্কগুলো তাদের বমি করে এবং পরস্পরকে National 4-H Clubs, White Papers-এর মত পুরস্কার দেয়। ট্রটস্কির ডাস্টবিনে তাদের ঠাঁই এমন বিষয় বস্তু, এমন ধোলাইকরা জীবন। এদের বিষয়-বস্তু যথেষ্ট নির্বোধ, যাতে কোন বাবা মা অথবা তাদের নাতি নাতনিরা ক্ষুণ্ন না হয়। হলিউডের অস্বস্তি আরো বাস্তব, সে এসব এড়িয়ে চলে। তার জন্যে Godfather, Airports, Poseidon জাতীয় ফিল্ম এবং ফিটজিরাল্ড, হেমিংওয়ে ও জেন গ্রে-এর রচনা বেশী লাভজনক। Hearts and Minds হচ্ছে ডকুমেণ্টারীর Godfather। তবে আমার অনুমান, এর মাঝে একটা পার্থক্য হচ্ছে এটা কখনো দর্শক পাবে না। দু'টা ফিল্মকেই আমার মনে হয়েছে হৃদয়হীন এবং নির্বোধ। হৃদয়হীন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র বা ভিয়েতনাম কাউকেই বুঝতে পারার অক্ষমতার কারণে। হৃদয়হীন কারণ, এটা মধ্যবিত্ত-সুলভ লিবারেল সুপিরিয়রিটি ও ঠাট্টামিশ্রিত অবজ্ঞা প্রদর্শন করে—যা তার করা উচিত নয়, উচিত বিপরীত কিছু করা। বেভারলি হিলসের পশ্চাৎদেশ এবং নিউজার্সির লিণ্ডেন-এর মাঝে দূরত্ব অনেক। Hearts and Minds-এর স্রষ্টারা এটা বুঝতে অক্ষম।

প্রশ্ন ঃ দীর্ঘ সতেরো বছর যাবৎ ফিল্ম তৈরীর পর আপনার কি মনে হয় এই সব ফিল্ম বা আপনার ধরনে তৈরী ফিল্মগুলো কোন পরিবর্তন আনতে সক্ষম হচ্ছে নাকি সেগুলো শুধু বিবৃতি দিয়ে যাচ্ছে? আপনি এ ব্যাপারে আশাবাদী নাকি সিনিক্যাল?

উত্তর ঃ আমি মোটেই সিনিক্যাল নই। তবে একক ফিল্মের দুনিয়া বদলানোর ব্যাপারে সন্দেহপ্রবণ। এদেশে সংগঠিত ধর্মাচারণসহ কখনো কোন কিছু ছিল না যার সাথে মিডিয়ার তুলনা চলতে পারে। দিনের ২১ ঘণ্টা টিভি চালু রয়েছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জঞ্জাল কিভাবে আমাদের জনগণের মনটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ আমি যখন এখানে আসি আপনি তরুণ চলচ্চিত্র-কারদের বিকাশ সম্পর্কিত একটি রচনার ওপর নজর বুলা-চ্ছিলেন। মনে হয় তরুণ চলচিত্রকারদের প্রতি আপনার যথেষ্ট সমর্থন রয়েছে। আপনি তাদের কি সাহায্য দিয়ে থাকেন?

উত্তর ঃ রাজনৈতিক। Attica-এর স্রষ্টা সিণ্ডা ফায়ার-স্টোন প্রথম আমার সাথে কাজ করতো। আমার সাথে কাজ শুরু করেছিল, চলচ্চিত্র অঙ্গনের এমন অনেকেই এখন নিজেদের কাজ করছে। আমি নিজে নিজে কাজ করতে শিখেছি এটা তাদের জন্যে একটা উৎকৃষ্ট অভিজ্ঞতা। অতীতে আমি এক জন কৌতূহলী নিয়োগকর্তা ছিলাম। আমার চারপাশের লোকজন কাজ করছে না। এটা আমি দেখতে পারতাম না। আমি বলতাম ঃ তোমরা কেন সিনেমায় যাচ্ছো না অথবা বাড়ি যাচ্ছো না অথবা কিছু করছো না। তবে আমি চাইতাম তারা কাজ করুক, শনিবার, রবিবার কাজ করুক, সারারাত কাজ করুক—যদি অবস্থা ভালো থাকে।

প্রশ্ন ঃ যে সব তরুণ চলচ্চিত্রকাররা টাকা খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদেরকে আপনি কি পরামর্শ দেন? আপনি বলেছিলেন আপনি

একজনকে অন্ততঃ ৮৪ হাজার ডলার অনুদান পেতে সাহায্য করেছিলেন।

উত্তর ঃ পাবলিক ব্রডকাস্টিং সার্ভিস থেকে সে সেটা পেয়েছিল। এটা পাওয়া অত্যন্ত কঠিন এবং আরো কঠিনতর হচ্ছে। এদেশে র‍্যাডিক্যাল ফিল্ম-স্রষ্টাদের অর্থের উৎস হচ্ছে লিবারেল মুভমেন্ট যা এ ব্যাপারে উৎসাহী নয়। র‍্যাডিক্যাল এবং রাজনৈতিক ফিল্ম আগ্রহীদের পক্ষে অর্থ যোগাড় করা অত্যন্ত কঠিন। Hearts and Minds-এর মত ভুয়া রাজনৈতিক ফিল্মগুলোর বক্স অফিস ব্যর্থতা অন্যান্যদের জন্যে অর্থপ্রাপ্তি আরো কঠিন করে তুলেছে।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু আপনার বেশীর ভাগ ডকুমেণ্টারী তাদের খরচ তুলে এনেছে।

উত্তর ঃ খরচ ফিরিয়ে এনেছে এবং সেগুলো সীমিত সংখ্যক শহরে প্রদর্শিত হয়েছে। সেগুলো হাজার হাজার প্রেক্ষাগৃহ প্রদর্শিত হবে এমন উচ্চাশা আমাদের কখনোই ছিল না—যা ঘটেছে Hearts and Minds-এর বেলায়। Hearts and Minds ১৬ মিলিমিটারে তার খরচ ফিরিয়ে আনতে পারবে, তবে এর ক্ষতিপূরণ সময়সাপেক্ষ। Ophuls-এর Memories of Justice কোনদিনও টাকা ফেরৎ পাবে না।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি ডকুমেণ্টারীতেই থেকে যেতে চান?

উত্তর ঃ ডকুমেণ্টারীকে আমার বরাবরই ইণ্টারেস্টিং মনে হয়েছে। তবে আমার নিজের জীবন নিয়ে একটি কাহিনী চিত্র তৈরীর ইচ্ছে আছে। এক অব্‌সেশন রূপে এর শুরু এবং Weather ফিল্ম তৈরীর আগে থেকেই আমি এ নিয়ে ভাবছি। Freedom of Information-এর অধীনে সরকারের বিরুদ্ধে আমার মামলা থেকে এর আরম্ভ। আমি তখন Weather ফিল্মে কাজ করছি। তখনো স্যুটিং শুরু হয়নি। হঠাৎ ২৪ বছর বয়স পর্যন্ত আমার জীবনের উপর এফবিআই সংগৃহীত প্রায় তিনশো পৃষ্ঠার এক দলিল এলো এফ বি আই-এর কাছ থেকে। অবশ্য তার পরে সংগ্রাম করা এবং দুইজন আইনজীবী নিয়োগ করা ছাড়া কোন দলিল পাওয়া যায়নি। সৌভাগ্যবশতঃ আইনজীবি দুজন ছিল আমার বন্ধু।

প্রথমদিনের পৃষ্ঠাগুলো খুবই ইণ্টারেস্টিং। টেপরেকর্ডার এবং কম্পিউটারের সামনে সংগৃহীত তথ্যগুলো যখন আমি একাকী বসে পড়ি, আমার তখনকার অনুভব বর্ণনা করা কঠিন। তথ্যগুলো সংগ্রহ করেছে এফ বি আই-এর লোকেরা। তারা তাদের ছোট্ট সবুজ প্যাডে এগুলো লিখে হোটেলে গিয়ে পুরোটা টাইপ করেছে। ফ্লাইং স্কুলে ভর্তি এবং কমিশনের জন্যে আমার আবেদন থেকে এর সূচনা। এবং এই কয়েকশো পৃষ্ঠা, অতীতে আমার বারো বছর বয়স, আমার প্রিপারেটরি স্কুলে ভর্তি হওয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। তারা আমার মায়ের কাছে গেলে তিনি বলেন ঃ এমিলি একজন নাস্তিক, কাজেই তার নৈতিক দ্বিধা সঙ্কোচের কোন বালাই নেই। একজন কর্ণেলের মুখেও ওই একই কথা শোনা যায়। এটা আমার ভিতরে এক ভুতুড়ে, এক ক্রুদ্ধ অনুভবের জন্ম দেয়। পরে ক্রোধ মিলিয়ে যায়।

অতএব, আমি এই গল্প-কাম-ফিল্মটি তৈরী করছি অত্যন্ত আবেগহীনভাবে এবং মানহানি মামলার কারণে করছি ফিক্‌শন হিসেবে। আমার উকিল আমাকে এভাবেই করার পরামর্শ দিয়েছে কারণ, আমার সম্পর্কে যারা বলেছে, তাদের মধ্যে অনেকেই আমার বন্ধু। এখন অবশ্য এটা তার চেয়েও বৃহৎ। গোড়ায় আমি এর শিরোনাম দিয়েছিলাম ঃ "A Middle-Aged Radical as Seen Through the Eyes of the Government" কিন্তু এখন এটা প্রকৃতই আমার জীবন—দ্য হোল ড্যাম্‌ড্‌ থিং।

প্রশ্ন ঃ আপনার ফিল্মের একটা দৃঢ় বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। আপনি বলেছেন প্রথম দিকে আপনি মার্কস্‌বাদী ছিলেন। আপনি এখন কোথায় আছেন বলে মনে করেন? আপনি কি কোন স্বীকৃত দলভুক্ত?

উত্তর ঃ না, কৈশোর থেকেই আমি কোন স্বীকৃত দলভুক্ত ছিলাম না। এবং আমার মনে হয়, আমার জীবদ্দশায় কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখে যেতে পারবো না, এরূপ ভাবার ব্যাপারে আমি এখন যথেষ্ট সিনিক্যাল। এদেশে পরিবর্তনের ব্যাপারে আমি সবচেয়ে বেশী উদ্বিগ্ন এবং সম্ভবতঃ আমি কতকটা নৈরাজ্যবাদী হয়ে উঠেছি। আমি তীব্র, হিংস্র সাড়ায় বিশ্বাসী। আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকে যে স্প্যানিশ কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে ইউরোপের সবচেয়ে ইণ্টারেস্টিং কমিউনিস্ট পার্টি এবং সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে সবচেয়ে মৃতপ্রায় এবং অত্যাচারী। এখানে স্থানাভাব এবং এখানে নির্জনতা খুব বেশী। বামপন্থী রাজনীতি করে এমন লোক এখানে খুবই কম। জনসাধারণ Left-negativism-এর অংশীদার, এবং নেগেটিভিজম ও প্রকৃত বামপন্থী রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য বিরাট। বাইরের মার্সিডিস-আরোহী তিনশো ডলারের জ্যাকেট গায় অনেককে আমি চিনি যারা গীনাউ সম্পর্কে, এদেশ সম্পর্কে নাকসিঁটকানো মন্তব্য করবেন,—সেটা খুবই সহজ। আমার মনে হয় উপযুক্ত কারণে ওই একই মন্তব্য করা এবং তারচেয়ে বেশী কিছু বলা অত্যন্ত কঠিন। আর এখানে, এই ক্ষুদ্র নো-ম্যান্‌স্‌ নো-ওম্যান্‌স্‌-ল্যাণ্ড আটকে থাকে মানুষ, সেখানে খুব কম নারী-পুরুষই রয়েছে যারা প্রকৃতই কিছু ঘটছে দেখতে পায়।

প্রশ্ন ঃ আপনার মতে এই মুহূর্তে একজন ডকুমেণ্টারী নির্মাতার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো কি?

উত্তর ঃ আমার মতে টেলিভিশন নিয়ে সবচেয়ে ইণ্টারেস্টিং ডকুমেণ্টারী হতে পারে। এটাই আমার চরম পলায়ন, তবে

এর কোন বাজার নেই। মনে রাখবের এর জন্য কোন টাকা পাওয়া যাবে না। এটা প্রেক্ষাগৃহে চলতে পারে। কিন্তু কোন টিভি এটা কখনো দেখাবে না। কারণ, তাহলে এর প্রয়োগ, পরিকল্পনা, মিথ্যে প্রচার কঠিন হবে। এসবের তুলনায় Network কিছুই নয়। Network হচ্ছে পুরা বিষয়টির পরিহার : দরকষাকষি নিয়ে লড়াই, অর্থব্যয়ের পরিমাণ বারবারা ওয়াল্টারস এবং ছেলেমেয়ে ও নারীকল্পনা।

নারী আন্দোলন যদি একজন নারী হিসেবে পাঁচ মিনিটের জন্যে টেলিভিশনের দিকে তাকাতো, তাহলে তারা টিভি স্টেশনে আগুন লাগিয়ে ছারখার করে দিত। আইডিয়াটা হচ্ছে নারীরা জড়বুদ্ধির মানুষ, সুতরাং সারাদিন গেইম শো, সোপ অপেরা এবং এই ধরণের কাজ তাদের। খবর প্রচারিত হয় ছ'টায়, বড় খবর সাতটায়, কারণ ঐ সময় পুরুষ ঘরে থাকে; ঐ সময় ক্রয়ক্ষমতাধারী এবং পরিবারের রাজা বাড়িতে।

খবর এখন ইন্ডাস্ট্রী হয়ে গেছে। আধ ঘণ্টা থেকে বেড়ে হয়েছে দেড় ঘণ্টা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দুই ঘণ্টা। কারণ, অন্য কিছুর চেয়ে খবর এখন বেশী লাভজনক। আর একারণেই খবর কিছুই বলতে পারে না। খবর কাউকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে না। খবর কিছু বিশ্লেষণও করতে পারে না। খবর ঘষেমেজে এমন করা হয় যে শেষে কেবলমাত্র ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনা ছাড়া তাতে আর কিছুই থাকে না। একারণেই ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজমের অভাব।

আপনি ২০৭৮ সালের জন্য ভূগর্ভে পুঁতে রাখার উদ্দেশ্যে একটি টিউব তৈরী করুন। আর এর সাথে সাকুল্যে আপনার যা দরকার তা হচ্ছে টিভি সরঞ্জামসহ এক সপ্তাহের 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এর টিভি পৃষ্ঠা। আপনি এটা করুন এবং আপনি দেখতে পাবেন কেন এই কালচার পাকা ফলের মত ঝরে যাবে, যদি গাছটাতে ঝাঁকি দেবার মত কেউ থাকে। বিষয়টি হচ্ছে আমরা এতই ক্ষ্যাপা যে ঝাঁকি দিয়ে গাছ থেকে ফলটি ঝেড়ে ফেলার সাহসটুকু আমাদের নেই। এটা বুড়ি গাছটাতে লটকেই আছে।

অনুবাদ : সুমন রহমান

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ প্রকাশিত 'ক্যামেরা যখন রাইফেল' থেকে

পত্র-পত্রিকা থেকে

নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির মুখপত্র 'চিত্রভাষ'-এর সাম্প্রতিক সংখ্যার সম্পাদকীয়

শিশুবর্ষ এবং ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষ বিরাট এক দেশ এবং বিরাট এর জনসংখ্যা। স্বভাবতই এ দেশে শিশুর সংখ্যাও বেশী। ১৯৭১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী ভারতবর্ষে সমগ্র জনসংখ্যার ৪২ শতাংশই ১৪ বছরের নীচে শিশু। বর্তমানে এই হার আরও বেশী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

রাষ্ট্রসংঘ ১৯৭৯ সালকে শিশুবর্ষ হিসাবে চিহ্নিত করেছে— উদ্দেশ্য জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সব শিশুর শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক উন্নতির পাকা ব্যবস্থা করা ; পরিবার বহির্ভূত দুর্গত পরিবারের শিশুদের ভার যাতে সমাজ ও রাষ্ট্র নিতে পারে তার বন্দোবস্ত করা ; শিক্ষা ও স্বাস্থ্যহানিকর এবং নৈতিক উন্নতির পরিপন্থী কোন কাজ যেন শিশুদের না করতে হয় এমন ব্যবস্থা নেওয়া ; এক কথায় শিশুকে 'জাতির ভবিষ্যত' হিসাবে গড়ে তোলার সমস্ত রকম ব্যবস্থা করা। যে দেশে অপুষ্টিতে ভোগে এমন শিশুর সংখ্যা ৬ কোটি ও বছরে মৃত্যুর হার ১ লক্ষ, দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে ১১ কোটি শিশু এবং শিশু শ্রমিকের সংখ্যার দিক দিয়ে যে দেশের স্থান প্রথম সে দেশে শিশুবর্ষের উদ্দেশ্যগুলো যে সহজে পূর্ণ হতে পারে না সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বলা হয়, ভারতবর্ষ উন্নতিকামী দরিদ্র দেশ ; এর সামনে সমস্যা অনেক। সেই কারণেই সমস্ত লক্ষ্য পূর্ণ করা এই দেশের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু এই কথাটা কি পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য ? সব কিছু একসঙ্গে হবে, এটা কেউই আশা করে না ; কিন্তু কিছু করার উদ্যোগ কোথায় ? বিরাট জনসংখ্যার নানা সমস্যা নিয়ে দু-একটা উদ্যোগ যদিও বা কোথাও দেখা যায়, শিশুদের কথা আলাদা করে কেউ ভাবে বলে মনে হয় না। এ দেশে শিশুদের নিয়ে যেখানে যতটুকু হয় ততটুকুর অংশীদার সেই সব শিশুরা যাদের জন্য রাষ্ট্রকে আলাদা করে কিছু ভাববার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

ভারতবর্ষের মত দেশে বিরাট সংখ্যক শিশুর আর্থিক উন্নতির প্রশ্নটাই প্রধান। এখানে মানসিক উন্নতির জন্য করণীয় ব্যবস্থাটা যে গৌণ হয়ে দাঁড়াবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বর্তমান যুগে চলচ্চিত্র শিশুদের মানসিক উন্নতির ক্ষেত্রে বিরাট এক ভূমিকা পালন করতে পারে। এর দৃষ্টান্ত সমাজ-তান্ত্রিক দেশে অনেক এবং উন্নত পশ্চিমী দেশগুলিতেও এই দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। যদিও বিশ্বের মধ্যে সব চাইতে বেশী চলচ্চিত্র তোলা হয়ে থাকে আমাদের দেশে তবু শিশুদের জন্য কোন ছবি এ দেশে তোলা হয় না বললেই চলে। আমাদের দেশে চলচ্চিত্রের পুরো ব্যাপারটাই মুনাফাভিত্তিক। যেহেতু শিশু-চলচ্চিত্রে মুনাফার সম্ভাবনা কম সেহেতু শিশু-চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্যবসায়ীদের প্রচণ্ড অনীহা। মিশ্র অর্থনীতির নামে শিল্প জগতের (Industry) কোন কোন অংশ সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত—সরকারের কিছু করণীয় আছে, হোক না কোটি কোটি টাকা ক্ষতি। কিন্তু চলচ্চিত্র শিল্পের পুরোটাই চলে বেসরকারী নিয়মে। শিশু চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য সরকারী উদ্যোগে গঠিত সংস্থা মাঝে মধ্যে দু-একটা চলচ্চিত্র অবশ্য নির্মাণ করে আসছে। কিন্তু সে সব ছবির অধিকাংশই না হচ্ছে শিশু চলচ্চিত্র, না ব্যবসায়ী (!) চলচ্চিত্র, ফলে এই সমস্ত সংস্থার উদ্যম অঙ্কুরেই বিনষ্ট হচ্ছে। আসল কথা, সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না ঘটিয়ে শুধুমাত্র সরকারী উদ্যোগে দু-একটা ছবি তৈরী করে অবস্থার পরিবর্তন আনা যায় না। আমাদের দেশে উন্নতির লক্ষ্য সমাজের শতকরা ১০ ভাগ লোককে সামনে রেখে, শতকরা ৯০ ভাগই থাকে বঞ্চিতের দলে। এই অবস্থার পরিবর্তন যতদিন না হচ্ছে ততদিন কার্যকর কোন কিছু হবে বলে মনে হয় না।

গণদেবতা

চিত্রনাট্য : রাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দৃশ্য—২৯৫
নদীর ধারের বাঁধ।
সময়—দিন (?)

একজন দারোগা কয়েকজন পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে বাঁধের ওপর দিয়ে হন্ হন্ করে আসছে। মাঝে মাঝে তাদের হাতের টর্চ জ্বলছে। দারোগাও বাঁশি বাজাচ্ছে।

কাট্ টু।

দুর্গা বেরিয়েছে অভিসারে। বাঁধের ওপর দিয়ে যেতে যেতে ওদের দূরে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ায়।

কাট্ টু।

দূরে টর্চের আলো জ্বলছে-নিবছে। হঠাৎ একটা লোক দৌড়তে দৌড়তে দুর্গার সামনে এসে দাঁড়ায়।

কাট্ টু।

উৎসুক দুর্গা কয়েক পা এগিয়ে লোকটাকে ভালো করে দেখে।

কাট টু।

লোকটা দুর্গাকে দেখে থেমে যায়। তার হাতে একটা দেশী রিভলভার। ডান হাত দিয়ে রক্তাক্ত বাঁ হাতটিকে সে চেপে ধরে আছে।

হঠাৎ দুর্গাকে রাস্তার মাঝে দেখতে পেয়ে সে বিস্মিত। এই লোকটির নাম বিশু।

বিশু : আঃ ও—।

শট্‌টি স্থির হয়ে যায়।

কাট্ টু।

দুর্গার প্রতিক্রিয়া সহ ফ্রিজ্ শট্।

কাট্ টু।

বিশুর ফ্রিজ্ শট্।

কাট্ টু।

দূরে পুলিশের গলা—

পাকড়ো—পাকড়ো—

বিশু : চুপ্! কোনও ভয় নেই—এ গাঁয়ে, এ গাঁয়ে যতীন মুখুজ্জে বলে কোনও নজরবন্দী থাকে? আমি তার বন্ধু।

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৯৬
স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর বৈঠকখানা।
সময়—রাত্রি।

ক্লোজ শট্—যতীন। দরজার দিকে তাকিয়ে সে বলে—

যতীন : (অবাক হয়ে) একি!…তুই!!

কাট্ টু।

দুর্গা বিশুকে ধরে নিয়ে ঘরে ঢোকে।

কাট্ টু।

বিশু : সব বলছি!…দোরটা দিয়ে দে!

দুর্গা দরজা বন্ধ করে দেয়।

যতীন : কিন্তু এভাবে কোত্থেকে এলি তুই?

বিশু : (ফিরে) কুসুমপুর।

যতীন : কুসুমপুর?

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৯৭
স্থান—কুসুমপুরের জমিদার বাড়ীর সামনে।
সময়—দিন।

বিশু একদল চাষীর জমায়েতে বক্তৃতা করছে।

বিশু : হুঁশিয়ার ভাইসব! জমিদারের দল বেঁধে সরকারের কাছে আর্জি ধরেছে—প্রজাদের ওপর নতুন করে খাজনা বাড়াবার অধিকার চাই। কিন্তু, একেই তো দুবেলা খেতে পায় না গরীব মানুষ। তার ওপর নতুন করে খাজনা বাড়লে তারা বাঁচবে কি করে? তাই ভাইসব, যতক্ষণ না এ হুকুম রদ হচ্ছে—আমরা কেউ নড়বো না এখান থেকে!…ধর্মঘট!

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৯৮
স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর বৈঠকখানা।
সময়—রাত্রি।

যতীন : তারপর?

বিশু : (চেয়ারে বসতে বসতে) তারপর…হঠাৎ…

কাট্ টু।

দৃশ্য—২৯৯।

স্থান—কুসুমপুরের জমিদারের বাড়ীর সামনে।

সময়—দিন।

ক্যামেরা জুম্ ব্যাক্ করলে দেখা যায় কয়েকজন পুলিশকে নিয়ে একজন দারোগা ঐ জমায়েতের দিকে ছুটছে।

দারোগা : পাক্‌ড়ো—! পাক্‌ড়ো—!

হৈ-চৈ শুরু হয়ে যায়। দুজন মুসলমান চাষী বিশুর কাছে ছুটে আসে।

রহম : —আপনি চলে যান—

বিশু : —এ্যাঁ ?

রহম : আপনি চলে যান বাবু !

বিশু : কিন্তু…

ইরশদ : কোন কিন্তু নাই। আমরা আছি !…আপনি ধরা পল্লে… (হাত জোড় করে) চলে যান বাবু।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩০০

স্থান—গ্রামের রাস্তা।

সময়—দিন।

বিশু ছুটতে আরম্ভ করলে ক্যামেরা তার পা-কে অনুসরণ করে।

বিশু : (off) এ গ্রাম…সে গ্রাম…হন্যের মতো ছুটতে ছুটতে…শেষ অব্দি বল্লার জঙ্গলে এসে…আর উপায়—না দেখে—

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩০১

স্থান—বল্লার জঙ্গল।

সময়—চন্দ্রালোকিত রাত্রি।

ব্যাক গ্রাউণ্ডে ঘন জঙ্গল।

বিশু ছুটে ফ্রেমের মধ্যে ঢোকে, একটা গাছের আড়ালে লুকোয়। পরের মুহূর্তেই রিভলভার থেকে গুলি ছোঁড়ে।

কাট্ টু।

লং শট্। দারোগা ও পুলিশরা ছুটে আসছে। তারাও গাছের আড়ালে লুকোয়।

কাট্ টু।

বিশু গুলি ছোঁড়ে।

কাট্ টু।

দারোগাও নলা বন্দুক থেকে গুলি ছোঁড়ে।

কাট্ টু।

বিশু।

কাট্ টু।

বিশুর রিভালভারটি গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে গুলি ছোঁড়ে।

কাট্ টু।

দারোগা।

কাট্ টু।

লং শট্। বিশু।

কাট্ টু।

পাখিদের লো-এঙ্গেল শট্।

কাট্ টু।

বিশু।

কাট্ টু।

দারোগা।

কাট্ টু।

বিশু ঘোড়াকলে চাপ দিয়ে বুঝতে পারে পিস্তলের গুলি শেষ। সঙ্গে সঙ্গে সে পেছন ফিরে উঁচু নীচু পথে দৌড়তে শুরু করে।

কাট্ টু।

দারোগা ও পুলিশরা তাকে তাড়া করে। বিশুর দিকে তাক্ করে দারোগা গুলি ছোঁড়ে।

কাট্ টু।

বিশু ক্যামেরার দিকে ছুটে আসছে। গুলির শব্দ হতেই সে বাঁ হাত চেপে ধরে।

বিশু : আঃ হ্—!!

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩০২

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ির বৈঠকখানা।

সময়—রাত্রি।

বিশুর মুখের ওপর থেকে ক্যামেরা ট্র্যাক ব্যাক্ করে। সে যন্ত্রণায় কাতর। পকেট থেকে পিস্তলটি বার করে আনে।

বিশু : আমার যা হয় হোক্ ।…এটা বাঁচানো দরকার।…চলি

যতীন : কোথায় ?

হঠাৎ সবাই-ই জানলা দিয়ে কিছু পায়ের শব্দ ও বাঁশির আওয়াজ শুনে চমকে যায়।

কাট্ টু।

বিশু।

কাট্ টু।

যতীন।

কাট্ টু।

দুর্গা জানলার কাছে ছুটে গিয়ে বাইরেটা দেখে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩০৩

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ির সামনে।

সময়—রাত্রি।

যতীনের ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বড় ও ছোট দারোগা কয়েকজন পুলিশ নিয়ে ছুটে আসছে। অনিরুদ্ধর বাড়ির সামনে এসে তারা দাঁড়ায়।

বড় দারোগা : আশ্চর্য্য !…গেল কোথায় বলুন তো ?

কাট্ টু।

ছোট দারোগা অস্বস্তিতে পড়ে।

ছোট দারোগা : এক সেকেণ্ড !

সে যতীনের ঘরের বারান্দায় উঠে এসে কড়া নাড়ে।

ছোঃ দারোগা : যতীনবাবু !…যতীনবাবু !

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩০৪

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ির বৈঠকখানা।

ছোট দারোগার গলা শুনে দুর্গা, বিশু ও যতীন সবাই-ই দরজার দিকে তাকায়।

হঠাৎ দুর্গা বিশুকে টেনে নিয়ে ঘরের একটা কোণে দরজার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে বলে।

দুর্গা : থাকেন !

ছোট দারোগা : (off) যতীনবাবু শুনছেন ?

দুর্গা যতীনের কাছে ছুটে গিয়ে কানে কানে কি যেন বলে।

দুর্গা : কুনো ভয় নাই…

যতীন : কিন্তু—

দুর্গা : দেখি ! (বলে, হাত ধরে চৌকির কাছে টেনে নিয়ে দরজার দিকে পেছন ফিরিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলে) নড়বেন না।

যতীনের হাতটা নিজের হাতে নিয়ে তারই চোখ বন্ধ করে দেয়।

দুর্গা : শুধু চোখ দুটো খুলবেন না বাবু !

কাট্ টু।

দরজায় শব্দ হয়েই চলে।

দুর্গা : কে গো ?

দরজার দিকে অর্ধেক এগিয়ে হঠাৎ সে শাড়ি খুলতে শুরু করে। শাড়ি মাটিতে পড়ে যায়। ক্যামেরা দুর্গার—পা অনুসরণ করে দেখায় সে দরজা খুলছে।

দরজার বাইরে দেখা যায় দুজোড়া পুলিশের পা।

কাট্ টু।

ফোর গ্রাউণ্ডে দুর্গার অনাবৃত কাঁধ। ছোট ও বড় দারোগা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে।

বড় দারোগা : এ কি ?

কাট্ টু।

দুর্গা আবেশের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। দু হাত দিয়ে বুক ঢাকে সে।

দুর্গা : হেই মা ! দারোগাবাবু, আপনি ইথানে ?

কাট্ টু।

ছোট দারোগা : আসুন…চলে আসুন !…ও কিছু নয়— বলছি আপনাকে—

তারা কয়েক পা পিছিয়ে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩০৫

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ির সামনে।

সময়—রাত্রি।

ছোট দারোগা বড় দারোগার কানে ফিস্ ফিস্ করে কি সব বলে। তারা দুর্গার দিকে তাকিয়ে চলে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩০৬

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ির বৈঠকখানা।

সময়—রাত্রি।

দুর্গা এই সময় গান গাইতে থাকে।

দুর্গা : "কচি ভাতার লাগর আমার
কচ্ কচ্ করে মাথা চিবাইছি—"

পুলিশ ও দারোগাকে আড় চোখে চলে যেতে দেখে সে দরজা বন্ধ করে দেয়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩০৭

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ির সামনে।

সময়—দিন।

ক্লোজ শট—সংবাদপত্রের শিরোনামা

কৃষককুল সাবধান
খাজনাবৃদ্ধি আসন্ন

কাট্ টু।

দেখা যায় জগন ডাক্তার একদল গ্রামবাসীকে কাগজ পড়ে শোনাচ্ছে। দলে আছে তারিনী, হেলারাম, মথুর, রহম আর ইরশাদ্।

জগন : "গ্রামে গ্রামে প্রতিরোধের ঢেউ"

রহম : আমাদের কুসুমপুরের নাম দিয়েছে ?

জগন : না। তা কিছু দেয় নাই।

ইরশাদ্ : দিবে দিবে, এইবার দিতে হবে !…কুসুমপুর, দেখুড়িয়া, মহেশপুর—সব জায়গায় আগুন জ্বলছে।—এখন আপনারা কি করবেন বলেন ?

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩০৮

স্থান—ছিরু পালের বাড়ির বারান্দা।

লং শট্। গরাইকে সঙ্গে নিয়ে ছিরু পাল ক্যামেরার দিকে আসছে। অনিরুদ্ধর বাড়ির সামনের জমায়েতকে দুজনে বেশ গভীর ভাবে লক্ষ্য করে।

ছিরু : ব্যাপার কি ? জোটান কিসের ?

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩০৯

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ির সামনে।

সময়—দিন।

লং শট্। যতীন একদল গ্রামবাসীকে কি যেন বোঝাচ্ছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩১০

স্থান—ছিরু পালের বাড়ির বারান্দা।

সময়—দিন।

গরাই : (ছিরুকে) নজরবন্দী ভাষণ দিচ্ছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩১১

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ির সামনে।

সময়—দিন।

যতীন : পড়শীর চালায় যখন আগুন, তখন তো আর চোখ বুজে থেকে লাভ নেই !…আজ হোক, কাল হোক—সে আগুন এখানেও জ্বলবে—

হেলারাম : কিন্তু ফের আবার হাঙ্গামা—

সতীশ : কিসের হাঙ্গামা !…ল্যাংটার আবার বাটপারের ভয় !

মথুর : এমনিতে শ্যাল কুকুরে ছিঁড়ে খেত…তার চেয়ে না হয় আগুনেই পুড়ে মরব।…মরণ তো দুবার হবে না !

ইরশাদ্ : সাবাশ !

তারিনী : ঠিক !…সবই তো গেইছে, কি কত্তে হবে শুধু তাই বলেন।

সতীশ : ক্যানে ! তুর গলায় তো গান আছে রে ! গান বাঁধবি !

তারিনী : গান ?…ধম্মঘটের ?

ইরশাদ্ : হ্যাঁ, এখন গান যে খুন একবারে টগ্‌বগ্ টগ্‌বগ্ টগ্‌বগ্ করে ফুটবে !

ক্যামেরা এবার তারিনীর ওপর চার্জ করে।

তারিনী : ঠিক্ !…ঠিক্ বলছ ইরশাদ্ ভাই !…বাটি বাজিয়ে ভিক্ষের গান তো অনেক হল !…(অন্যান্যদের প্রতি) দেখিস…দেখিস তুরা কি গান বাধি ! (যতীনকে) আপনি শুধু এট্টু দেখে দিবেন বাবু !

ইরশাদ্ : আরে, যে গাঁয়ে দেবু ভাইয়ের মতো লোক আছে—কাউকে কিছু দেখতে হবে না।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩১২

স্থান—দেবু পণ্ডিতের ঘর।

সময়—দিন।

দেবু পণ্ডিত একটা কাঁথা নিয়ে এসে খাটে শুয়ে থাকা অসুস্থ বিলুর শরীর ঢেকে দেয়।

দেবু : ইস্ দ্যাখো দিকি ! (কপালে হাত দিয়ে) আমি এক্ষুনি ঘুরে আসছি জগনের কাছ থেকে।

দেবু পণ্ডিত দরজার কাছে এগিয়ে যেতেই বিলু বলে—

বিলু : বলছি তো কিছু হয়নি !…ম্যালেরিয়া।

দেবু : বাঃ !…সাত খুন মাপ !…খবরদার, আজ উঠবে না বিছ্‌না থেকে !…ঠিক তো ?

বিলু : (কাঁচুমাচু মুখে) আচ্ছা…

দেবু পণ্ডিত চলে যায়।

কুসুম : (off) বৌদি !…অ বৌদি !

কুসুমের গলা শুনে বিলু রি-অ্যাকট্ করে, আর ইঙ্গিতে কুসুমকে চুপ করতে অনুরোধ করে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩১৩

স্থান—দেবু পণ্ডিতের বাড়ির উঠোন ও বারান্দা।

কুসুম একটা ঝুড়ি নিয়ে বারান্দার দিকে আসে।

দেবু পণ্ডিত ক্যামেরার দিকে পেছন করে ফ্রেমে ঢোকে।

দেবু : কি রে ?…বৌদির জ্বর ?…যা না !

দেবু পণ্ডিত উঠোন পেরিয়ে দরজার কাছে যায়।

হঠাৎ কুসুম সামনে কিছু দেখে যেন রি-অ্যাকট্ করে।

কাট্ টু।

খাটের ওপর বিলু শুয়ে। সে ঠোঁটে হাত দিয়ে তাকে চুপ করতে বলে এবং ঘরে ঢুকতে অনুরোধ করে।

কাট্ টু।

কুসুম পা টিপে টিপে নীরবে ঘরে ঢোকে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩১৪

স্থান—সজনে তলায় গ্রামের রাস্তা।

সময়—দিন।

ক্যামেরা ভূপালের গতির সঙ্গে প্যান্ করে দেখায় অন্য দিক থেকে আসা দেবু পণ্ডিতের সামনে সে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে।

ভূপাল : পেন্নাম গো !…আপনার কাছেই যেছিলাম।

দেবু : কেন ?

ভূপাল : ঘোষ মশাই পাঠিয়ে দিলে। বল্লে, দু-সনের খাজনা বাকি, ওটা যদি এবার…

দেবু : (এক মুহূর্ত ভেবে) ঠিক আছে…দেখছি…

ভূপাল : আজ্ঞে আচ্ছা—

ভূপাল ফ্রেম থেকে বেরিয়ে গেলে দেখা যায় জগন ডাক্তার এগিয়ে আসছে।

জগন : আরে !…তুমি এখানে ?…আর আমি তোমায় খুঁজে খুঁজে—

দেবু : আমিও যাচ্ছিলাম তোমার কাছে—

জগন : তাহলে চলো !…ওদিকে সাংঘাতিক ব্যাপার !

সে দেবু পণ্ডিতের হাত ধরে।

দেবু : কেন ?

জগন : ধর্মঘট !…তুম্ তুমা তুম্…মরুক না ব্যাটারা, খাজনাবৃদ্ধি দিচ্ছেটা কে ?…যতীন ভায়া বসে আছে তোমার জন্যে—

কুসুম : (off) পণ্ডিত দাদা—! পণ্ডিত দাদা—!

তারা দুজনেই ওদিকে তাকায়।

কাট্ টু।

কুসুম ছুটে আসছে।

কুসুম : পণ্ডিত দাদা—।

দেবু : কি হয়েছে রে কুসুম ?

কুসুম : শিগ্গির এসো ! বৌদি বেহুঁস হয়ে পড়েছে !

দেবু : এাঁ ?

তারা সবাই দেবু পণ্ডিতের বাড়ির দিকে দৌড়ায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩১৫

স্থান—দেবু পণ্ডিতের বাড়ির উঠোন ও বারান্দা।

সময়—দিন।

ঢেঁকি শালের কাছে অজ্ঞান অবস্থায় শুয়ে আছে বিলু। রাঙাদিদি সহ আরও কয়েকজন গ্রামের বৌ তার শুশ্রূষা করছে।

রাঙাদিদি দরজার দিকে তাকায়।

রাঙাদিদি এই যে !

কাট্ টু।

দেবু পণ্ডিত, জগন ডাক্তার ও কুসুম দৌড়ে এসে ঢোকে।

কাট্ টু।

রাঙাদিদি : (উঠে দাঁড়িয়ে)…সাত পাকের সোয়ামী হইছে ! ছাখ্, ছাখ্, ছাখ্ কি হাল করেছিস বৌটার !

দেবু : কি হয়েছে ?

রাঙাদিদি : কি হইছে !…অরে অ কানা পণ্ডিত—নিজে না হয় বলে না, দুবেলা যে পিণ্ডি গিলিস,—একবারও ভেবে দেখেছিস, আসে কোত্থেকে—কে জুটায় ? জেহেলে বসে কখনো ভেবেছিস—কি খেছে বৌটা ?…ন্যাতা হইছে দেশোদ্ধারের 'ন্যাতা' !…ঘরের মাগ মুখের রক্ত তুলে পরের বাড়ির ধান ভানবে…অদ্ধেক দিন উপোষ করবে …আর মদ্দ আমার সেই রোজগারের ভাত খেয়ে 'ন্যাতা' গিরি ফলাবে ! থুঃ থুঃ তোর 'ন্যাতা' গিরির মুখে। তোর দেশোদ্ধারের মুখে থুঃ—থুঃ রে। একটা মেয়ের উদ্ধার যে করতে পারে না—সে করবে দেশোদ্ধার দে, দে, দে ক্যানে গলা টিপে—একেবারে জুড়োক।

রাঙাদিদি এবার বিলুর কাছে এগিয়ে যায়।

রাঙাদিদি : অ বিলু !…অ মা !…একবার চোখ খোল মা।…ডাকা—

ক্যামেরা দেবু পণ্ডিতের মুখের ওপর চার্জ করে। তাকে খুব ছোট্ট আর নীচু মনে হয়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩১৬

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর সামনে।

সময়—দিন।

অনিরুদ্ধর বাড়ীর সামনে একদল গ্রামবাসীর জমায়েত।

ক্লোজ শট্—যতীন।

যতীন : সে কি ?

কাট্ টু।

জগন : (হাঁপাতে হাঁপাতে) হ্যাঁ। এখন থেকে সে আর গাঁয়ের কোনও ব্যাপারে নেই।

সতীশ : কি বলছেন গো ডাক্তারবাবু ?

হরশাদ : দেবু ভাই এ কথা বলেছে ?

জগন : হ্যাঁ,…বলেছে, সে চাষীর ছেলে—মাস্টারী খুইয়েছে। এখন থেকে তার কাছে ঘর সংসারই বড়—

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩১৭

স্থান—দেবু পণ্ডিতের ক্ষেতভূমি।

সময়—দিন।

ক্লোজ শট্। লাঙল দিয়ে চাষ করা হচ্ছে। ক্যামেরা টিল্ট-আপ্ করে দেখায় দেবু পণ্ডিতই চাষ করছে।

হঠাৎ দূরে কিছু শব্দ শুনে দেবু পণ্ডিত সেদিকে তাকায়।

কাট্ টু।

লং শট্। কালুর লোকজন লাঠিসোঁটা কুড়ুল নিয়ে ছুটছে।

কাট্ টু।

দেবু পণ্ডিত এগিয়ে আসে।

কাট্ টু।

কালুর লোকজন চারিদিকেই ছুটছে।

কাট্ টু।

দেবু পণ্ডিত স্তম্ভিত।

কাট্ টু।

(চলবে)

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND OTHER PARTICULARS ABOUT

Chitra-Bikshan

(From No. IV/Rule 8)

1.	Place of Publication	...	Cine Central, Calcutta, 2. Chowringhee Road, Cal-13
.	Periodicity of its Publication	...	Monthly.
3.	Printer's Name	...	Alok Chandra Chandra
	Whether citizen of India	...	Indian
	Address	...	2, Chowringhee Road, Calcutta-700 013
4.	Publisher's Name	...	Alok Chandra Chandra
	Whether citizen of India	...	Indian
	Address	...	**2, Chowringhee Road, Calcutta-700 013**
5.	Editor's Name	...	Anil Sen
	Whether citizen of India	...	Indian
	Address	...	2, Chowringhee Road, Calcutta-700 013
6.	Name & Address of the Owner	...	Cine Central, Calcutta, 2, Chowringhee Road, Cal-13

I, Alok Chandra Chandra, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd/- ALOK CHANDRA CHANDRA
Signature of Publisher

Dated : 26-2-80

Regd. No. 13949/67 Rs. 1.25 February 1980 Vol. 13 No. 5

Published by Alok Chandra Chandra from Cine Central, Calcutta
2 Chowringhee Road, Calcutta-13. Phone : 23-7911 & Printed by him a·

মাসিক চলচ্চিত্র পত্রিকা
সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র

ত্রয়োদশ বর্ষ
ষষ্ঠ সংখ্যা
মার্চ '৮০



চিত্রবীক্ষণ

বিষয়সূচী

সম্পাদক : অনিল সেন

প্রচ্ছদচিত্র : সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা'
প্রচ্ছদশিল্পী : দীপক দে

শিলিগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সুনীল চক্রবর্তী
প্রযত্নে, বেবিজ স্টোর
হিলকার্ট রোড
পোঃ শিলিগুড়ি
জেলা : দার্জিলিং-৭৩৪৪০১

আসানসোলে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সঞ্জীব সোম
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জি. টি. রোড ব্রাঞ্চ
পোঃ আসানসোল
জেলা : বর্ধমান-৭১৩৩০১

বর্ধমানে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
শৈবাল রাউত
টিকারহাট
পোঃ লাকুরদি
বর্ধমান

গিরিডিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এ, কে, চক্রবর্তী
নিউজ পেপার এজেন্ট
চন্দ্রপুরা
গিরিডি
বিহার

দুর্গাপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দুর্গাপুর ফিল্ম সোসাইটি
১/এ/২, তানসেন রোড
দুর্গাপুর-৭১৩২০৫

আগরতলায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অরিন্দ্রজিত ভট্টাচার্য
প্রযত্নে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
হেড অফিস বনমালিপুর
পোঃ অঃ আগরতলা ৭৯৯০০১

গৌহাটিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
বাণী প্রকাশ
পানবাজার, গৌহাটি
ও
কমল শর্মা
২৫, খারঘুলি রোড
উজান বাজার
গৌহাটি-৭৮১০০৪
এবং
পবিত্র কুমার ডেকা
আসাম ট্রিবিউন
গৌহাটি-৭৮১০০৩
ও
ভূপেন বরুয়া
প্রযত্নে, তপন বরুয়া
এল, আই, সি, আই, ডিভিসনাল
অফিস
ডাটা প্রসেসিং
এস, এস, রোড
গৌহাটি-৭৮১০১৩

বাঁকুড়ায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
প্রবোধ চৌধুরী
মাস মিডিয়া সেণ্টার
মাচানতলা
পোঃ ও জেলা : বাঁকুড়া

জোড়হাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অ্যাপোলো বুক হাউস,
কে, বি, রোড
জোড়হাট-১

শিলচরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এম, জি, কিবরিয়া,
পুঁথিপত্র
সদরহাট রোড
শিলচর

ডিব্রুগড়ে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সন্তোষ ব্যানার্জী,
প্রযত্নে, সুনীল ব্যানার্জী
কে, পি, রোড
ডিব্রুগড়

বালুরঘাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অন্নপূর্ণা বুক হাউস
কাছারী রোড
বালুরঘাট-৭৩৩১০১
পশ্চিম দিনাজপুর

জলপাইগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দিলীপ গাঙ্গুলী
প্রযত্নে, লোক সাহিত্য পরিষদ
ডি. বি. সি. রোড,
জলপাইগুড়ি

বোম্বাইতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সার্কল বুক স্টল
জয়েন্দ্র মহল
দাদার টি. টি.
(ব্রডওয়ে সিনেমার বিপরীত দিকে)
বোম্বাই-৪০০০০৪

মেদিনীপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটি
পোঃ ও জেলা : মেদিনীপুর
৭২১১০১

নাগপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
ধূর্জটি গাঙ্গুলী
ছোটি ধানটুলি
নাগপুর-৪৪০০১২

এজেন্সি :
* কমপক্ষে দশ কপি নিতে হবে।
* পঁচিশ পার্সেণ্ট কমিশন দেওয়া হবে।
* পত্রিকা ভিঃ পিঃতে পাঠানো হবে, সে বাবদ দশ টাকা জমা (এজেন্সি ডিপোজিট) রাখতে হবে।
* উপযুক্ত কারণ ছাড়া ভিঃ পিঃ ফেরত এলে এজেন্সি বাতিল করা হবে এবং এজেন্সি ডিপোজিটও বাতিল হবে।

সিনেমা শ্রমিক-কর্মচারীদের সংগ্রামের সমর্থনে

চিত্রবীক্ষণের এই সংখ্যা যখন বেরোচ্ছে তখন কলকাতা, শুধু কলকাতা কেন পশ্চিমবাংলার প্রায় সমস্ত সিনেমা হাউস বন্ধ। সিনেমা কর্মচারীরা বেঙ্গল মোশন পিকচার এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সংগ্রামী পতাকার তলায় দাঁড়িয়ে দীর্ঘদিন পরেই দাবী তুলছিলেন বন্ধ সিনেমাহলগুলি খুলতে হবে। এছাড়া মূল্যমান অনুযায়ী ডি, এ, প্রয়োজন ভিত্তিক ন্যূনতম বেতন ইত্যাদির প্রসঙ্গও তাঁদের দাবী হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে উচ্চারিত হচ্ছিল। স্বাভাবিকভাবেই আসন্ন উৎসবের পরিপ্রেক্ষিতে বোনাসের প্রশ্নটিও এখন দাবীর তালিকায় যুক্ত হয়েছে।

এই দাবীগুলি নিয়ে সিনেমা কর্মচারীরা বেশ কিছুদিন আগে প্রতীক ধর্মঘটও করেছিলেন—তিনদিন ধর্মঘটের পরিকল্পনা নিয়েও তাঁরা এগোচ্ছিলেন আগস্ট মাসে। সরকারী হস্তক্ষেপে সে সময় সেই ধর্মঘটের আহ্বান শ্রমিক কর্মচারীরা ফিরিয়ে নেন। অথচ মালিকপক্ষ সম্পূর্ণ অনড় হয়ে বসে রইলেন, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার কোনরকম উদ্যোগ দেখালেন না এবং সরকারের কাছে নিজেদের দেয়া প্রতিশ্রুতি থেকেও পিছু হঠতে শুরু করলেন।

কাজেই শ্রমিক-কর্মচারীদের পক্ষে লাগাতার ধর্মঘটে সামিল হওয়া ছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিলনা। সেই সংগ্রাম সেই আন্দোলনের পথেই শ্রমিক কর্মচারীরা এগিয়েছেন। আর মালিক পক্ষ বিরোধের ক্ষেত্র প্রশস্ত করার জন্য লক-আউটের আশ্রয় নিয়েছেন। মালিকপক্ষ অত্যন্ত অন্যায়ভাবে দীর্ঘদিন ধরে বেশ কয়েকটি হল বন্ধ রেখেছেন নানান অজুহাতে। ফলে সেখানকার শ্রমিক-কর্মচারীরা এবং তাদের পরিবার পরিজন দীর্ঘদিন ধরে অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশার সম্মুখীন, এছাড়া এই হলগুলি বন্ধ থাকার ফলে বেশ কিছু বাংলা ছবির রিলিজও আটকে রয়েছে, সরকারও প্রমোদকর পাচ্ছেন না। কাজেই বন্ধ হল খোলার দাবী শ্রমিক-কর্মচারীর স্বার্থে, বাংলা ছবির মুক্তির প্রয়োজনেও বন্ধ হল খোলার প্রশ্নটি অত্যন্ত জরুরী।

মালিকপক্ষের একগুঁয়েমি, অর্থহীন আবদারকে উপেক্ষা করে সরকারকে দৃঢ় হাতে এগিয়ে আসতে হবে যাতে এই বন্ধ হলগুলি অবিলম্বে খোলা যায়। মালিকপক্ষের নপুংসক সংগঠন ই, আই, এম, পি, এ আলাপ-আলোচনায় কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখতেই অপারগ কাজেই মীমাংসার আশু লক্ষণ এখনো দেখা যাচ্ছে না।

শ্রমিক কর্মচারীদের এই ন্যায্য আন্দোলনে ব্যাপক জনসমর্থনকে সংহত করার প্রয়োজন তাই আজ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। শ্রমিক-কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের জমে থাকা উপেক্ষিত অবহেলিত দাবী-দাওয়াগুলির আশু মীমাংসার প্রশ্নটিও আজ এই সংগ্রামের ফলে জনমানসের সামনে চলে এসেছে। মালিকপক্ষের খামখেয়ালি, একগুঁয়েমি বাংলা ছবির গতিকে রুদ্ধ করে রেখেছে। পরিবেশক-প্রদর্শকদের মধ্যে একচেটিয়া পুঁজির ক্রমবর্দ্ধমান একাধিপত্য বাংলা ছবির প্রযোজকদের ক্রমাগতই কোনঠাসা করে চলেছে। অথচ ই, আই, এম, পি-এর মধ্যে বিরোধের কণ্ঠস্বর কই? সিনেমা কর্মচারীদের সংগ্রামের সমর্থনে বাংলা ছবির প্রযোজকদের এগিয়ে আসতে অনীহা কেন?

এই প্রথম সিনেমা হাউসের শ্রমিক কর্মচারীদের সংগ্রামের সঙ্গে পরিবেশক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারীরাও এককাট্টা হয়ে লড়ছেন। এই সংগ্রাম মূলত পশ্চিমবাংলার চলচ্চিত্র শিল্পে বৃহৎ পুঁজির বিরুদ্ধে, কাজেই এই আন্দোলনের সমর্থনে চলচ্চিত্র শিল্পের প্রগতিশীল অংশকে জমায়েত করতে হবে। বাংলা ছবির অসহায় প্রযোজকদের কালো টাকার আক্রমণের বিরুদ্ধে জড় করতে হবে এক, ব্যাপক ঐক্যের মঞ্চ তৈরী করতে হবে। আশার কথা একাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন সিনেমা হাউস ও পরিবেশন সংস্থার শ্রমিক-কর্মচারীরা। শিল্পী-কলাকুশলীদের সংগঠনসমূহ, চলচ্চিত্র সাংবাদিক এবং ফিল্ম সোসাইটিগুলিকেও প্রত্যক্ষভাবে এগিয়ে এসে সংগ্রামী দায়িত্ব পালন করতে হবে এই ঐতিহাসিক সময়ে।

আর রাজ্য সরকারকেও এই একচেটিয়া পুঁজির আক্রমণ থেকে চলচ্চিত্র শিল্প এবং এই শিল্পের সর্বস্তরে যে শ্রমিক-কর্মচারীরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন তাদের রক্ষা করার জন্য দৃঢ়ভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

আসুন আমরাও সিনেমা শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলি বন্ধ সিনেমা হল খুলতে হবে, নাহলে সরকারকে এই সব হল অধিগ্রহণ করতে হবে।

বোনাস, পে-স্কেল ইত্যাদি দাবীর সুমীমাংসা করতে হবে।

ওয়ার্কিং কণ্ডিশন সংক্রান্ত সরকারী সুপারিশকে আইনে পরিণত করতে হবে।

সত্যজিৎ চলচ্চিত্র ঃ রবীন্দ্র সাহিত্য ভিত্তিক

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চারুলতা

'চারুলতা' একটি গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র, এবং তার কারণ যে সাহিত্য কর্মের ওপর ভিত্তি করে ছবিটি রচিত, সেই সাহিত্য-কর্মটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু মূল গল্প 'নষ্টনীড়' রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভার অতি উৎকৃষ্ট সৃষ্টি, এবং বিশেষ করে এই গল্পের মধ্যে কবির নিজের জীবনের গভীরতম প্রণয় ইতিহাসের কিছু সত্যের অপরূপ কাব্যিক প্রকাশ ঘটেছে, যে প্রণয়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফসল কবির সারা জীবনের অজস্র গানে, কবিতায় পুষ্পিত যার আনন্দ বেদনার সৌগন্ধ শিক্ষার সুযোগপ্রাপ্ত অধিকাংশ বাঙালীর জীবনে মননে অনুভূতিতে নানাভাবে সঞ্চরমান তাই 'নষ্টনীড়' আমাদের কাছে এক ঐতিহাসিক মূল্যে মূল্যবান— অতি প্রিয় গল্প। অর্থাৎ কোন মতেই শুধুমাত্র 'গল্প' নয়, আরো অনেক কিছু। গল্পটি এমন এক রক্ষণশীল সামাজিক পরিমণ্ডলে এবং এমন একটি সামাজিক যুগে (১৯০১ সালে প্রথম প্রকাশ) এবং এমন একটি সামাজিক ভাবে স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে রচিত যে কবির পক্ষে তুলনাহীন পরিমিতি বোধ, রুচিশীল সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা ছাড়া গল্পটি লেখা সম্ভব হ'ত না। ফলে গল্পটি কবির অন্যান্য অনেক গল্পের তুলনায় অনেক বেশী সংহত, সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা-ধর্মী ও কাব্যিক ; গল্পের একটি পরিচ্ছদ দূরে থাক একটি লাইনও বাড়তি নয় (যে ভুল সত্যজিৎ রায় স্বয়ং করেছেন, পরে যথাস্থানে আলোচিত)। এই সব কারণে 'নষ্টনীড়'-এর চলচ্চিত্রায়ন এক দুরূহ শিল্পকর্ম হতে বাধ্য। চলচ্চিত্র ভাষার ওপর অসাধারণ দক্ষতা, গভীর সাহিত্যবোধ, মানুষের মনস্তত্ত্ব বিশেষত নারী মনস্তত্ত্ব বিষয়ে যথেষ্ট বিশ্লেষণী মনোভঙ্গী না থাকলে এ ছবি ঠিক ভাবে রচনা করা সম্ভব নয়। এ ছবি সত্যজিৎ রায়ের কাছেও ছিল চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। তিনি কতটা উত্তীর্ণ হয়েছেন তা আমাদের আলোচ্য।

বলা বাহুল্য মাত্র, যে গল্প আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রিয় মহান কবির ব্যক্তিজীবনের উৎস থেকে উচ্ছ্বলিত যার মধ্যে এক ঐতিহাসিক সত্যের স্পন্দন, তার চলচ্চিত্রায়নের প্রথম কথা মূলানুগতা। অর্থাৎ গল্পটিকে শুধুমাত্র একটি 'স্প্রিং বোর্ড' মাত্র ভেবে কোন চলচ্চিত্রকার তাঁর নিজের মৌলিক সৃষ্টির খেয়াল চরিতার্থ করার মত কোন কাজ করবেন—তা বরদাস্ত করা সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নাম গ্রহণের কোন অধিকার তাঁর থাকবে না। শিল্পের কোন অসাধারণ মুন্সীয়ানাই তাঁকে সে অধিকার দেবেনা। সুখের বিষয় স্বয়ং সত্যজিৎ রায় নিজেই 'চারুলতা প্রসঙ্গে' নামক নিবন্ধে জানিয়েছেন যে ছবিতে যে পরিবর্তন তিনি করেছেন তা "পরের কাহিনীর ভিত্তিতে ছবি তৈরী করে মৌলিক রচনার বাহবা নেবার জন্য নয়। "(বিষয় ঃ চলচ্চিত্র," পৃষ্ঠা ৫৮)।

সুতরাং 'চারুলতা' প্রসঙ্গে যে কোন প্রশ্নের প্রথমটি হচ্ছে মূলানুগতা। এবং সুখের বিষয় এদেশে 'চারুলতা' প্রসঙ্গে যত তর্ক বিতর্ক হয়েছে তা এই মূলানুগতা নিয়েই। সত্যজিৎ রায়ের 'বিষয় ঃ চলচ্চিত্র' গ্রন্থের দীর্ঘতম নিবন্ধটিই এই মূলানুগতার স্বপক্ষে।

কিন্তু যেহেতু শিল্প প্রসঙ্গে যে কোন রকম যান্ত্রিকতাই পরিহার্য, এক্ষেত্রেও মূলানুগতার প্রশ্নটি এই ভাবে চারটি ভাগে ভাগ করে দেখা দরকার—

১। 'চারুলতা' 'নষ্টনীড়' গল্পের সারসত্তাটি রক্ষা করেছে কিনা —(যেমন 'পথের পাঁচালী' ছবি মূল উপন্যাসটির সারসত্তা রক্ষা করেছে)।

২। সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্রায়নের মাধ্যম পরিবর্তনের জন্য যে সব পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে সেগুলি কোন অনিবার্য নান্দনিক প্রয়োজনে সাধিত হয়েছে কি হয়নি। (যেমন 'পুনশ্চ' 'পথের পাঁচালী' ছবি)।

৩। মূল গল্পটির থীমের ভিন্নতাগুলি বা ভেরিয়েশনস্ কোন নূতন মাত্রা যোগ করেছে কিনা, যা মূলের সারসত্তাকে অক্ষুণ্ণ রেখেই যার ওপর যুগোপযুগী নূতন আলোকপাত করেছে (যেমন কোজিনৎসভের 'ডন কুইকজোট' অথবা কুরোশোয়ার 'থ্রোন অব ব্লাড' বা 'ম্যাকবেথ')।

৪। মূল গল্পের সারসত্তার একটি অপরিণত দিক থেকে কিছু সরে এসে বা তাকে পরিবর্তিত করে এমন কিছু শিল্প সৃষ্টি হয়েছে কিনা যাতে শিল্প হিসেবে চলচ্চিত্র কর্মটি মূলের চেয়েও শ্রেষ্ঠ (যেমন 'অপরাজিত' ছবি মূল উপন্যাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত)।

স্মর্তব্য, মূলানুগতার প্রশ্নে এখানেও ইভর মণ্টেগু লিখিত আইজেনস্টাইনের দিগনির্দেশক সূত্রের ওপর নির্ভর করা হয়েছে।

'চারুলতা' ছবির আলোচনায় সত্যজিৎ রায়ের নিজের যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এ আলোচনায় পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হবে— সেগুলির উৎস তাঁর স্বরচিত নিবন্ধ 'চারুলতা প্রসঙ্গে' যা তিনি

লিখেছিলেন 'পরিচয়' পত্রিকার শারদ সংখ্যায়, ১৩৭১ (বঙ্গাব্দ), এবং পরে তাঁর 'বিষয় ঃ চলচ্চিত্র' নামক গ্রন্থে গ্রন্থবদ্ধ।[১] (বিষয় ঃ চলচ্চিত্র ; চারুলতা প্রসঙ্গে' পৃষ্ঠা—৪৩—৫৯)।

(ক) 'চারুলতা' ছবিতে মূল গল্পের সারসত্তা রক্ষিত হয়েছে কিনা।

সত্যজিৎ রায়ের দৃঢ় বক্তব্য—সারসত্তা রক্ষিত হয়েছে এবং যে পরিবর্তনগুলি মাধ্যমগত কারণে অপরিহার্য্য ছিল, শুধু সেই পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে। সেই কারণগুলির পিছনে, সত্যজিৎ রায়ের মতে সুদৃঢ় নান্দনিক ও চলচ্চিত্র শিল্পের মাধ্যমগত অকাট্য যুক্তি আছে। যথা—(১) গল্পে নির্বিশেষ দিন রাত্রির ছিন্ন ছিন্ন ঘটনার কথা অনায়াসে বলা চলে। কিন্তু চলচ্চিত্রে—সত্যজিৎ রায় লিখেছেন, 'যেখানে চরিত্র, পরিবেশ, ঘটনার স্থান কাল—সবই একটা কংক্রীট চেহারা নেয় এবং একটা সময়ের সূত্র ধরে কাহিনীর সূত্র এগুতে থাকে"—সেখানে তা চলে না। (উক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা—৪৬) যুক্তিটি বলিষ্ঠ নয়, কেননা এ্যালান রেনে বা গোদারের অনেক ছবিতে সময়ের সূত্র ধরে ছবির কাহিনীর সূত্র এগিয়ে যায় নি। এটা বুঝেছিলেন বলেই সত্যজিৎ রায় তিনটি পৃষ্ঠার পরে তার পদ্ধতিকে 'চিরায়ত পদ্ধতি' বলে সবিশেষ উল্লেখ করেছেন। সত্যজিৎ রায় লিখেছেন, "মূল কাহিনীর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন সময়ের টুকরো টুকরো ঘটনা ও সংলাপের পরিবর্তে চিত্রনাট্যরচনার চিরায়ত পদ্ধতিতে গোটা গোটা দৃশ্য মারফৎ বিবৃত হবে" (পৃষ্ঠা ৪৯)। 'চিরায়ত পদ্ধতি' কথাটি লক্ষ্যণীয়। এখন অবশ্যই কথাটা ঠিক। এবং 'নষ্টনীড়' ধরণের গল্পের ক্ষেত্রে ছবির শৈলীটি চিরায়ত বা ক্লাসিক ধরণের হওয়া উচিত, সুতরাং যুক্তিটি গ্রাহ্য।

দ্বিতীয় যুক্তিটি (২)—গল্পে যেখানে নির্বিশেষভাবে 'কোন ব্যক্তি' বা কোন আত্মীয়, ইত্যাদির উল্লেখ করা সম্ভব, ছবিতে তা নয়। "সিনেমায় এ ধরণের কোন অস্পষ্টতার কোন স্থান নেই" (পৃষ্ঠা ৪৫)। সুতরাং এ সমস্ত ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন অপরিহার্য। এটিও সঠিক যুক্তি।

দুটি সাধারণ ধরণের যুক্তির পর সত্যজিৎ রায়ের তৃতীয় যুক্তিটি ঠিক যুক্তির আকারে দেননি, একটি বিশেষ সমস্যার সমাধানের চেহারায় দিয়েছেন, এবং সেটি গল্পটির একটি বিশেষ জরুরি প্রশ্ন সংক্রান্ত। প্রশ্নটি হচ্ছে ; অমল কি ভূপতির বাড়ীতে আগে থেকেই থাকত, অথবা ভূপতি-গৃহে বধূরূপে চারুলতার আগমনের অনেক পরে অমলের আগমন ? রবীন্দ্রনাথ সঠিক জানান নি অমল ঠিক কখন থেকে ভূপতি-গৃহে আশ্রিত। কিন্তু গল্প পড়লেই বোঝা যায় অমল আগে থেকেই ভূপতির গৃহে থাকত। রবীন্দ্রনাথের অমল সংক্রান্ত প্রথম উক্তিটি এই রকম "ভূপতির পিসতুতো ভাই অমল থার্ড ইয়ারে পড়িত।" এবং এটি আছে গল্পের একেবারে প্রথম দিকেই। তার আগের লাইন গুলিতেই অবশ্য আছে চারুলতার নিঃসঙ্গতার কথা—তার কোন 'কর্ম ছিল না' "ফল পরিণামহীন ফুলের মত পরিপূর্ণ অনাবশ্যকতার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া ওঠাই তাহার চেষ্টাশূন্য দীর্ঘ দিন-রাত্রির একমাত্র কাজ ছিল"—একথাও আছে। এখন সত্যজিৎ রায় প্রশ্ন তুলেছেন—(ক) তাহলে কি চারুলতার এই নিঃসঙ্গতার পর্বে অমল ভূপতি-গৃহে ছিল না ? অথবা (খ) অমল তখনো ছিল, কিন্তু জনৈক নির্বিশেষ আশ্রিত আত্মীয়ের মত, অর্থাৎ চারুলতার কাছে অমল তখন একজন 'নির্বিশেষ' মানুষ, বাড়ীর একজন আশ্রিত আত্মীয় মাত্র। পরে অগোচরে সে 'বিশেষ' হয়ে ওঠে।

সত্যজিৎ রায় জানাচ্ছেন তাঁর মতে প্রথমটিই ঠিক, অর্থাৎ চারুলতার নিঃসঙ্গতার পর্বে অমল ছিল না। সত্যজিৎ রায়ের যুক্তিটি হচ্ছে ঃ অমলের প্রথম উল্লেখের পরেই রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন চারুলতার ওপর অমলের কেমন 'স্নেহের দাবীর অন্ত ছিল না' চারুলতাকে অমলের 'কত রকম স্নেহের উপদ্রব সহ্য করিতে হইত' এবং এতে করে চারুলতার নিঃসঙ্গতা থাকত না, সুতরাং আগে অমল ছিল না। এই মনে হওয়াটা আমার মতে, যুক্তি-গ্রাহ্য নয় কেননা প্রথমতঃ (ক) অমল আগে থাকলেও তখন তার সঙ্গে চারুর ব্যক্তিগত পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত না হলে চারুর নিঃসঙ্গতা থাকতে পারে—এক্ষেত্রে একটা কথা অনুমান করে নিতে হয় যে, অমল প্রথমেই চারুর কাছে 'বিশেষ' হয়ে ওঠে নি, হতে সময় লেগেছিল—এবং সেই সময়টুকুই চারু ছিল নিঃসঙ্গ, এবং নিঃসঙ্গ হয়ে উঠেছিল বলেই পরে যখন অমল ঘনিষ্ঠ হ'ল, ঘনিষ্ঠতা হ'ল দ্রুত। এ রকম হওয়া খুবই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত ঃ (খ) যদি সত্যই চারুর নিঃসঙ্গতার পরে অমলের আবির্ভাব হত—তাহলে তা সুস্পষ্টভাবে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় লিখতেন, যেমন মন্দার প্রসঙ্গে লিখেছেন। অমলের প্রথম উল্লেখের সময়, "ভূপতির পিসতুতো ভাই অমল থার্ড ইয়ারে পড়িত" এই বাক্যটি থাকায় যেটা স্বাভাবিক অর্থ সেটি হচ্ছে, অমল ভূপতি-গৃহে অবস্থানরত অবস্থায় কাল থেকেই

'বিষয় ঃ চলচ্চিত্র [১] গ্রন্থের উক্ত নিবন্ধটিতে জনৈক অশোক রুদ্রের নাম পাই যার প্রতি প্রচুর কটূক্তি বর্ষিত হয়েছে, অথচ খুবই অসৌজন্যসূচক ভাবে তাঁর সম্পূর্ণ বক্তব্যটি উদ্ধৃত হয়নি। দুঃখের বিষয় সাধারণ পাঠকের পক্ষে বারো বছর আগের 'পরিচয়'-এর কোন এক সংখ্যায় উক্ত অশোক রুদ্র মশায় কী লিখেছিলেন যে সত্যজিৎ রায় তাঁকে 'রাম, শ্যাম, যদু' 'সিনেমার কিছু জানেন না' 'আসলে তার বাতিক লেখা' ইত্যাদি বলেছেন—তা জানার উপায় নেই। অর্থাৎ আমরা দেখলাম না। সবটা দুর্ভাগ্যজনক।

গল্পের শুরু। এটা এত স্পষ্ট যে আমার মনে হয় না এ নিয়ে কোন তর্কের অবকাশ আছে। তাছাড়া অমলের উপস্থিতি যে আগে থেকেই ছিল, তার পিছনে আমার তৃতীয় (গ) যুক্তি হচ্ছে, গল্পটির পিছনের ঐতিহাসিক ঘটনা বা সত্য। আজ এটি সর্বজনবিদিত যে 'নষ্টনীড়'-এর নেপথ্যে কিশোর ও পরে তরুণ রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর মেজবৌদিদি কাদম্বিনীর আত্মিক রোম্যান্টিক ও কাব্যিক সম্পর্কগত ঘটনার এক অনির্বচনীয় বেদনা বিধুর ছায়া প্রলম্বিত হয়ে আছে। এবং তার এক একটি মুহূর্তের উজ্জ্বল বেদনার ও আনন্দের চিহ্ন রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায়, গানে, 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা'র আত্মজীবনীমূলক রচনায়, চিঠি পত্রে ও ঘনিষ্ঠ প্রিয়জনের সঙ্গে কথোপকথনে (যা লিপিবদ্ধ) রয়ে গেছে। এগুলি থেকে (যেমন 'আকাশ প্রদীপ' কাব্যগ্রন্থের অতুলনীয় 'শ্যামা' কবিতাটি এবং 'ছেলেবেলা'র নবম পরিচ্ছেদ) এটা জানা গেছে যে, কবি যখন কিশোর তখন নববধূরূপে কাদম্বিনী দেবী এলেন ঠাকুর বাড়ীতে, তখন তিনি 'নব কৈশোরের মেয়ে।' কিন্তু যেহেতু তিনি বাড়ীর বধূমাতা তাই সামাজিক সম্পর্কে গুরুজন—এবং শ্রদ্ধেয়। দূরত্ব ছিল অনেকখানি। প্রথম দিকে বালক ভেবে 'রবিকে' যে কাদম্বিনী দেবী 'বিশেষ' ভাবে দেখেন নি, বাড়ীর আর পাঁচটি 'বালকে'র মত দেখেছিলেন সে কথাও রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্য থেকে জানতে পারি। "ও যে বসেছে আদরের আসনে, আমি যে হেলাফেলার ছেলেমানুষ।"('ছেলেবেলা' নবম পরিচ্ছেদ)। 'তার পর একদিন/চেনাশোনা হ'ল বাধাহীন' ('আকাশ প্রদীপ'—'শ্যামা')। সুতরাং মূল ঘটনাটা হ'ল এক আশ্চর্য নারীর নববধূরূপে গৃহে আগমন, যে গৃহে ছিল তার চেয়ে কিছু কম বয়সী ('কাছাকাছি বয়স') দেওর, সে ছিল হেলাফেলার মানুষ 'নির্বিশেষ', ধীরে ধীরে বধূর জীবনের নিঃসঙ্গতার পটভূমিতে সেই নির্বিশেষ মানুষটি তার সমরুচি, সমান আকৃতি ও একই ধরণের কল্পনাময় জগতের মধ্যে হয়ে ওঠে সেই শ্রদ্ধেয়া নারীর কাছে 'সবিশেষ'। এটাই হ'ল ঘটনা। সুতরাং এই ঘটনাটি হঠাৎ 'নষ্টনীড়' লেখবার সময় রবীন্দ্রনাথ একেবারে পাল্টে ফেলবেন এটা ভাবাও কষ্টকর।

ভূপতি-গৃহে অমলের উপস্থিতি যে আগেও ছিল, এই বক্তব্যের পিছনে আমার চতুর্থ যুক্তি হচ্ছে ঃ 'নষ্টনীড়' পড়লে বোঝা যায় এই গল্পের একটি অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য হচ্ছে কাহিনীর মধ্যে যা ঘটছে, ক্ষণে ক্ষণে যে নাটক সৃষ্টি হচ্ছে যার পরিণতি এক অমোঘ ট্র্যাজেডিতে—তা চূড়ান্ত ভাবে স্বাভাবিক এবং এই স্বাভাবিকতার অন্যতম কারণ কাহিনীর অন্তর্নিহিত নাট্য উপাদানগুলির প্রত্যেকটি 'অন্তস্থায়িত', এর কোন একটিও 'বহিরাগত' নয়। যা গল্পের শুরু থেকে ছিল অর্থাৎ যে পরিস্থিতিটি তার মধ্যেই গোপনে লুকিয়েছিল ট্র্যাজেডির অমোঘ উপাদান। এক কাজ-পাগল অ-রোম্যান্টিক গৃহস্বামী যে তার সুন্দরী কল্পনাপ্রবণ স্ত্রীর সম্পর্কে ছিল অসচেতন (এবং সম্ভবতঃ সন্তান উৎপাদনে অক্ষম—যদিও কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই সত্যিই কার অক্ষমতায় চারু ভূপতির সন্তান হয়নি, তবু যেন ভূপতির চারুর প্রতি প্রেমহীন মনোভাব ভূপতির দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে ; তবে 'চারুলতা' ছবিতে এই নির্দেশ খুব সুস্পষ্ট, যখন সেই বিখ্যাত বাগানের দৃশ্যে দেখি দোলনা-দোলায়রত চারু তার বায়নাকুলারে চোখ রেখে একবার তরুণ অমলকে দেখছে ও পরে বাগানের অন্যত্র একটি শিশুকে দেখছে—এবং তখন তার মুখচ্ছবিতে সন্তান-আকাংখা, এর থেকে মনে হয় সত্যজিৎ রায়ের ব্যাখ্যা হচ্ছে, চারুর সন্তানহীনতার কারণ ভূপতির অক্ষমতা।) এবং এক সুন্দরী আশ্চর্য কল্পনাশক্তি-সম্পন্না ব্যক্তিত্বময়ী গুণবতী নারী, শরীরে মনে যে পূর্ণ নারীত্বের আকাঙ্খায় স্পন্দিত, এবং এক আশ্চর্য তরুণ, একদিকে মানসিক গঠনে যে উক্ত নারীর (যে সম্পর্কে বৌদিদি অর্থাৎ শ্রদ্ধেয় গুরুজন,) সমমনোভাবাপন্ন, কিন্তু অন্য দিকে সেই নারীর স্বামীর (যে সম্পর্কে দাদা) প্রতি কর্তব্যবোধে অচঞ্চল—এই পরিস্থিতি 'নষ্টনীড়' গল্পে প্রথম থেকেই ছিল—এর মধ্যেই রয়ে গেছে ট্র্যাজেডির উপাদান—গল্পটি আর কিছু নয়, সেই যা ছিল তারই ক্রমিক বিকাশ। এমনকি বাকি যে দুটি চরিত্র নাট্যগতিতে 'ক্যাটালেটিক' এজেন্ট রূপে কাজ করেছে তার মধ্যে প্রধান চরিত্রটি, উমাপতি, সেও গল্পের শুরু থেকেই আছে। শুধু মাত্র মন্দাই পরে এসেছে, এবং মূল গল্পে তার বিদায়ও অনেক আগে। মন্দাই সবচেয়ে অপ্রধান চরিত্র।

সুতরাং 'নষ্টনীড়' গল্পের অনিঃশেষ সৌন্দর্যের একটি প্রধান কারণই হচ্ছে, যা গল্পের প্রাথমিক পরিস্থিতির মধ্যেই লুকানো ছিল আপাত শান্তি ও সুখের শ্যামচ্ছায়ায়, তারই ক্রমবিকাশ কিভাবে ঘনায়িত মেঘমণ্ডল সৃষ্টি করল, এবং কিভাবে সেই মেঘ-নিঃসৃত বজ্র নীড়টিকে করে দিল দগ্ধ বা 'নষ্ট'—তারই অপরূপ বর্ণনা। এর বিকল্প হিসেবে যদি দেখান হয় এক অমনোযোগী গৃহস্বামীর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ভালোবাসা না পেয়ে তার সুন্দরী স্ত্রী নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল, এবং সেই অবস্থায় এক আসন্ন ঝড়ের ইংগিত নিয়ে গৃহে আবির্ভূত হল পরিবারের এর দূর সম্পর্কের তরুণ দেওর ইত্যাদি—তাহলে তা কি 'নষ্টনীড়'-এর মূলগত সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে? মূল গল্পেও এমন কিছুর ইংগিত নেই, গল্পের নেপথ্যে যে ঐতিহাসিক ঘটনা আছে তাতেও এমন হওয়াটা অসঙ্গত। এবং আমার পঞ্চম যুক্তি (ঙ) আমাদের সমাজে দেওর-ভাজ সম্পর্ক যে-সব ক্ষেত্রে রোম্যান্টিক হয়ে ওঠে (তার প্রেক্ষাপটে থাকে হয় স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর সজ্ঞান বা অজ্ঞানকৃত অনাদর অবহেলা, নয় স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর বয়সের অনেক পার্থক্য, নয় স্ত্রীর মানসিক গঠন ও মূল্যবোধের

জন্য দেওরের সঙ্গে মানসিক ভাবে একাত্ম হয়ে যাওয়া ইত্যাদি), অর্থাৎ যেখানে এই সম্পর্ক বিশেষ করে শরীর অবলম্বিত বা যৌন বিষয়ক নয় (নেপথ্যে শরীরের বৃত্তিগত ক্রিয়া অবশ্যই সর্বদা থাকবে, কিন্তু সেটাই মূল নিয়ন্ত্রক নয়)—যে সব ক্ষেত্রে যে দেওর গৃহে আগে থেকেই আছে এবং প্রথমে যাকে ছোট ভাই বা স্নেহের বন্ধুর মত মনে হয়েছে, কিভাবে সেই স্নেহের রঙ পাল্টে যায় প্রীতিতে ও পরে প্রেমে—সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব ঘটনা। এখানেও হঠাৎ বাহির থেকে একদিন এক দেওর এল 'ঝড়ের ইংগিত সঙ্গে করে', এবং সেই দিন থেকে ট্রাজেডির জাল বোনা শুরু হ'ল—এটা বে-মানান।

বস্তুতঃ 'চারুলতা' ছবিতে এক 'ঝড়ো হাওয়াকে' সঙ্গে করে অমলের প্রথম আবির্ভাবের দৃশ্যটি মূল গল্পের দিক থেকে রীতিমত প্রক্ষিপ্ত ও গল্পের মূল সুরের পরিপন্থী। এটি সেই 'বহিরাগত একজন এসে সংসারে জটিলতা সৃষ্টি করল'—ধরণের হয়ে গেছে। একটি পরিস্থিতির ক্রমিক বিকাশ নয়। লক্ষ্যণীয়, ওই দৃশ্যের ঝড়ো হাওয়ার প্রতীকী ব্যবহার পশ্চিমী সমালোচক দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত, এদেশেও তার প্রতিধ্বনি মুখরিত। ব্যঞ্জনাটি হচ্ছে, চারুলতার জীবনে যে আত্মিক ঝড় উঠবে এ তারই পূর্বাভাস। ছবিতে যে মির্শাসেন-এ এই ঝড়ো হাওয়ার দৃশ্যটি এবং 'হরে মুরারে' বলতে বলতে অমলের প্রবেশ ও চারুর উপস্থিতি উপস্থাপিত—তাতে একটা প্রচণ্ড ত্রুটি রয়ে গেছে—সেটা কেউ উল্লেখ করেন না এটা খুবই আশ্চর্যের! এখানে মনে হয়, চারুর জীবনে যে আত্মিক ঝড় উঠবে তার বীজ নিয়ে এল অমল, এবং শুধুমাত্র অমল। কিন্তু বাস্তবিক ঘটনাটা হচ্ছে, এই ঝড় সৃষ্টিতে ভূপতির অগৌণ ভূমিকা আছে। ঝড়ের জন্য প্রয়োজন একটি নিম্ন চাপের প্রশস্ত অঞ্চল (আবহাওয়া বিজ্ঞান যা বলে), চারুলতার মনের বায়ুমণ্ডলে সেই নিঃসঙ্গতার নিম্নচাপ সৃষ্টি করে রেখেছে ভূপতি—নববধূর প্রতি অমনোযোগ ইত্যাদির দ্বারা। চারুলতার মনের নিম্নচাপের প্রশস্ত অঞ্চলটি এইভাবে ভূপতি অজ্ঞানতঃ সৃষ্টি না করে রাখলে, পরবর্তী কালে অমলের কাব্যিক ব্যক্তিত্বের ঘর্ষণে যে-বিদ্যুৎ-দীপ্ত ঝড়ের সৃষ্টি হয়েছিল—তা হতে পারত না একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। সুতরাং আলোচ্য দৃশ্যের ঝড়ো হাওয়াকে যদি পরবর্তীকালে চারুর জীবনের ঝড়ের পূর্বাভাস বা প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে তাহলে সেই দৃশ্যে তির্যকভাবে কোথাও ভূপতির উপস্থিতি ছিল অপরিহার্য। কিন্তু দর্শকরা জানেন তা দৃশ্যে ছিল না।

(খ) পরিবর্তনগুলি নান্দনিক প্রয়োজনের ফল কিনা ঃ

মূল গল্প থেকে ছবির কিছু পরিবর্তনের অপরিহার্যতার স্বপক্ষে সত্যজিৎ রায়ের চতুর্থ যুক্তি হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হচ্ছে তাঁর এই উক্তিটি "মূল গল্প 'নষ্ট নীড়'-এর নানান দুর্বলতা।" অর্থাৎ মূল গল্পের দুর্বলতাকে পরিবর্তনের মাধ্যমে তিনি নাকি সবল করেছেন ছবিতে। সত্যজিৎ রায়ের মতে এই দুর্বলতার প্রথম চিহ্ন আছে উমাপতির (বা উমাপদর) চরিত্রায়ণে। (মূল গল্পে চরিত্রটির নাম 'উমাপতি'—রবীন্দ্র রচনাবলী, প. বঙ্গ সরকার প্রকাশিত শতবার্ষিকী সংস্করণ, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৩—৪৭৪। শুধু ৪৫৫ পৃষ্ঠার একটি জায়গায় 'উমাপদ' কথাটি আছে, সম্ভবতঃ মুদ্রণ প্রমাদ বশতঃ। কিন্তু সত্যজিৎ রায় ছবিতে এবং আলোচনার সর্বত্র তাকে 'উমাপদ' বলে উল্লেখ করে গেছেন।) সত্যজিৎ রায় লিখেছেন যে মূল গল্পে উমাপতি (বা উমাপদ) বিশ্বাসঘাতকতা করে ধরা পড়েছে, সেটা এমন ভাবে করেছে যেন সে জানত সে ধরা পড়বে, "সে যেন তার জন্য প্রস্তুত ছিল। এতে তাকে মূর্খ বা নির্বুদ্ধিমান বলে মনে হয়। অথচ সে যে শঠতার সঙ্গে তলায় তলায় কাজ গুছিয়ে নিয়েছে তাতে তাকে বোকা বলে মনে হয় না।" সত্যজিৎ রায় লিখেছেন, "মূল কাহিনীতে এই সমন্বয়ের (অর্থাৎ শঠতার সংগে নির্বুদ্ধিতার সমন্বয়ে) এই বিশেষ পর্যায়ে ভূপতি উমাপদকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে দৃশ্য রচনা করেছেন সেটা সজীব হতে পারেনি, উমাপদও একটি মেরুদণ্ডহীন মাংস পিণ্ডে পরিণত হয়েছে।" (বিষয় ঃ চলচ্চিত্র, পৃষ্ঠা ৫৪)।

সত্যজিৎ রায়ের মন্তব্য পড়লে বোঝা যায়, উমাপতির বিশ্বাসঘাতকতা গল্পের নাট্যসংস্থানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর, কেননা "এই বিশেষ ঘটনাটি আশ্রয় করে এ কাহিনীকে পরিণতির পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।" এবং তাঁর মতে, "এই ঘটনাটি আকস্মিক ও আরোপিত মনে হতে বাধ্য—কারণ উমাপদর বিশ্বাসঘাতকতার কোন পূর্বাভাস গল্পের কোন ঘটনায় বা সংলাপে রবীন্দ্রনাথ দেননি।" (উক্ত গ্রন্থ পৃষ্ঠা ৪৪)।

সত্যজিৎ রায়ের ছবির উমাপদ কেন 'নষ্টনীড়'-এর উমাপতির থেকে অনেকটা আলাদা হয়ে গেছে তার পিছনে সত্যজিৎ রায়ের যুক্তি ওপরের কথাগুলি থেকে বোঝা গেল। এর পর এর ন্যায্যতা সম্পর্কে বিচার করা যাক।

প্রথমেই বলা যাক, উমাপতির বিশ্বাসঘাতকতার গুরুত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু মূল গল্প ও ছবিতে এই বিশ্বাসঘাতকতার অভিঘাত দুভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে এটিকে কাজে লাগিয়েছেন, সত্যজিৎ রায় সেভাবে লাগান নি, অন্যভাবে লাগিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কাজটি অনেক সঠিক ও সূক্ষ্ম। অভিঘাতটি যতটুকু দুটি ক্ষেত্রেই এক সেটুকু হচ্ছে, এই বিশ্বাসঘাতকতার আঘাতে পর্যুদস্ত ও প্রায় সর্বস্বান্ত হওয়ার ফলে কাতর ভূপতি সান্ত্বনা লাভার্থে গৃহাভ্যন্তরে স্ত্রীর দিকে চায়, এবং তারই ফলে জানতে পারে ইতিমধ্যে তাঁর 'স্বর্ণলতা'ই (সম্বাদ) অপহৃত হয়নি, তার চারুলতাকেও সে প্রায় হারিয়ে বসেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাছাড়াও দেখিয়েছেন, এই আঘাতে পর্যুদস্ত কাতর ভূপতির করুণ মুখচ্ছবির সামনে

দাঁড়িয়েই অমল যখন দেখতে পেল স্ত্রী হিসেবে চারুলতার সেদিকে লক্ষ্য নেই, সে অমলের প্রতি বেশি মনোযোগী তখনই অমল বুঝতে পারল চারুর সঙ্গে তার সম্পর্ক কোন বিপদ্জনক স্তরে পৌঁছেছে। রবীন্দ্রনাথ সেই গভীর মুহূর্তটির অনবদ্য বর্ণনায় লিখেছেন, "অমল একবার তীব্র দৃষ্টিতে চারুর মুখের দিকে চাহিল—কি বুঝিল, কি ভাবিল জানিনা। চকিত হইয়া উঠিয়া পড়িল। পর্বত পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ একসময় মেঘের কুয়াশা কাটিবা মাত্র পথিক যেন চমকিয়া দেখিল, সে সহস্রহস্ত গভীর গহ্বরের মধ্যে পা বাড়াইতে যাইতেছিল" (রবীন্দ্র রচনাবলী, সরকারী শতবার্ষিকী সংস্করণ, সপ্তম খণ্ড, 'নষ্টনীড়' দশম পরিচ্ছেদ : পৃষ্ঠা ৪৫৮)। এর কিছু পরে দ্বাদশ পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ আবার লিখেছেন, "অমল ভূপতির বিষণ্ণ ম্লান ভাব দেখিয়া সন্ধান দ্বারা তাহার দুর্গতির কথা জানিতে পারিয়াছিল।" ভূপতি যে একলা কারুর কাছ থেকে সাহায্য ও সান্ত্বনা না পেয়ে একলাই আপন দুঃখ দুর্দশার সঙ্গে লড়ছে, সে কথাও অমল ভাবল। এর পরেই রবীন্দ্রনাথ সেই সাংঘাতিক কথাটি লিখেছেন, "তারপর সে চারুর কথা ভাবিল, নিজের কথা ভাবিল, কর্ণমূল লোহিত হইয়া উঠিল।" (উক্ত রচনাবলী, পৃষ্ঠা ৪৬২)।

সুতরাং মূল গল্পে ট্রাজিক সত্য দর্শনের দিক থেকে ভূপতি ও অমলের ওপর এই উমাপতির বিশ্বাসঘাতকতার অভিঘাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু 'চারুলতা' ছবিতে এটা কি ততটা গুরুত্বপূর্ণ? ভূপতির দিক থেকে ছবিতে যা ঘটেছে তা অবশ্যই মূলানুগ। কিন্তু অমলের দিক থেকে? অমলের ট্রাজিক সত্য দর্শন, অর্থাৎ তার সঙ্গে চারুর সম্পর্ক কি স্তরে পৌছে গেছে, সে যে 'সহস্র-হস্ত গভীর গহ্বরে পা বাড়াইতে যাইতেছে'—এই অনুভূতিটি ছবিতে কখন প্রথম ঘটেছে স্মরণ করুন। এটি ঘটেছে অনেক আগে সেই প্রচণ্ড নাটকীয় দৃশ্যে, যেখানে চারুর প্রথম লেখা প্রকাশিত হবার পর সেই লেখা অমলের বুকে ছুঁড়ে ফেলে, স্বামীর জন্য তৈরি চটি জুতো অমলকে দিয়ে, মন্দার হাত থেকে পানের পাত্র ছিনিয়ে নিজে হাতে পান সেজে অমলকে দিয়ে প্রচণ্ড আবেগে অমলের বুকের ওপর পড়ে ও অমলের জামা আঁকড়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে (জামাটি ছিঁড়ে যায় সেই প্রবল আবেগে)। পরে চারু সংবৃত হয়ে চলে গেলে, আমরা দেখি অমল স্তব্ধ, বিস্ময়াভিভূত, পাথরের মূর্তির মত বাইরে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সত্যজিৎ রায় স্বয়ং এই দৃশ্যের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, "মূলে অমলের উপলব্ধি—'গহ্বরের মধ্যে পা বাড়াইতে যাইতেছিল'—এ দৃশ্য তারই চিত্র সংস্করণ।" (বিষয় : চলচ্চিত্র, পৃষ্ঠা ৫৪)। সুতরাং ট্রাজিক সত্য দর্শনের জন্য উমাপতির বিশ্বাসঘাতকতার অপেক্ষা করতে অন্ততঃ ছবির অমলকে হয়নি। গল্পে যে ভাবে ঘটনার বিশ্লেষণ করতে করতে অমল এই সত্য দর্শনের উপলব্ধিতে পৌঁছেছে—তা ছবিতে করা কঠিন ছিল অবশ্যই, কিন্তু ছবিতে সেভাবে দেখালে তা যে 'Clairvoyance' বলে মনে হ'ত বলে সত্যজিৎ রায় মন্তব্য করেছেন (বিষয় : চলচ্চিত্র, পৃষ্ঠা ৫৫)—তা সত্য বলে মনে করার পিছনে কোন যুক্তি নেই। মূল গল্পে অমলের এই উপলব্ধি এসেছে কোন Clairvoyance বা পরাদৃষ্টির ফলে নয়, অত্যন্ত বাস্তবসিদ্ধ প্রত্যক্ষ কয়েকটি ঘটনার বিশ্লেষণে। বিশ্লেষণ বস্তুটা 'পরাদৃষ্টি'র ফল বলে মনে হওয়ার কোন কারণ নেই।

যাই হোক, এ থেকে বোঝা গেল উমাপতির বিশ্বাসঘাতকতার অভিঘাতের কার্যকারিতা ছবিতে কিছুটা লঘু হয়ে গেছে (যেহেতু অমল অন্যভাবে ট্রাজিক অনুভূতিতে পৌঁছেছে)। এবার চারুলতার দিক থেকে এর অভিঘাত মূল গল্পে এবং ছবিতে কি ভাবে পৃথক হয়ে গেছে লক্ষ্যণীয়। গল্পে যা আছে তা হচ্ছে, এই বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনাটি এমন ভাবে ঘটান হয়েছে যে চারুলতা বহুদিন তা জানতে পারেনি। অর্থাৎ যদিও তখন তার স্বামীর বিপর্যয় ঘটে গেছে, অথচ তা জানতে না পারায় চারুর অমল-মুখী মনের গতি অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে, এবং এই দুটির বৈপরীত্যই অমলকে ট্রাজিক সত্য দর্শনে সাহায্য করে। (এই ভাবে ব্যাপারটা ঘটান খুবই প্রয়োজনীয় ছিল, সে কথা পরে আলোচিত হবে)। কিন্তু ছবিতে উমাপদর বিশ্বাসঘাতকতা এমন ভাবে ঘটান হ'ল যে, চারুলতা তৎক্ষণাৎ ঘটনাটা জানতে পারল এবং তবুও সেই বিষণ্ণ হতাশাগ্রস্ত রাত্রিতে স্বামীর জন্য দুর্ভাবনায় চেয়েও সে অনেক বেশি করে ভাবল গৃহস্বামীর আর্থিক বিপর্যয়ের কারণে আশ্রিত অমল যদি বাড়ী ছাড়া হয়—অমলকে হারাবার আশংকায় অর্থাৎ অমলের আসন্ন বিরহে কাতর চারু তখনি অমলের হাত চেপে ধরে ঠিক প্রেমিকার মতই বলে ওঠে "যাই ঘটুক না কেন, কথা দাও তুমি এখান থেকে যাবে না।" (ছবিতে)

অর্থাৎ মূল গল্পে যেখানে উমাপতির বিশ্বাসঘাতকতার উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, চারুলতার প্রেমের অসচেতন প্রকাশ, যা উমাপতির বিশ্বাসঘাতকতার পটভূমিকায় প্রথম উদ্ঘাটিত হল অমলের চেতনায়—সেখানে ছবিতে চারুলতার প্রেমের প্রকাশ আরো অনেক আগে (অমলের জামা আঁকড়ে ধরে চারুর কান্নার দৃশ্যে)—এবং পরে (ছবিতে) উমাপতির ঘটনার উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, স্বামীর সর্বনাশের খবর পেয়েও, ইতিমধ্যে যে বৌদি প্রেমিকা রূপে প্রকাশিতা, তার প্রেমের পাত্র অমলকে হারানোর আশংকায় পূর্ণ প্রেমিকাসুলভ কাতর আচরণ। যার উত্তরে অমলকে কিছুটা রূঢ় ভাবে বলতে হয় "ছাড় বৌঠান, দেখি দাদার কি হ'ল?" প্রশ্ন, এটি কি মূল গল্পের সূক্ষ্ম রসের বিকৃতি নয়?

মূল গল্পে অমলের কাছে প্রেমের 'সহস্র হস্ত গহ্বরের, অভিজ্ঞতা উদ্ঘাটিত হয়েছে অনেক পরে, এবং তার পরই দাদার প্রতি কর্তব্য বশতঃ আর সে সেই সংসারে থাকেনি, কিছুটা রূঢ় ভাবে চারুর কাছ থেকে সরে গেছে চিরতরে। কিন্তু ছবিতে যে

অমলকে দেখি সে অমল সেই প্রেমের 'সহস্র হস্ত গহ্বরের' অভিজ্ঞতার পরও অনেক দিন সেই সংসারে থাকে, চারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখে, তাকে সঙ্গ দেয় (বিলেতের প্রসঙ্গে আলোচনার দৃশ্যটি ও 'ব'-অনুপ্রাসের খেলার দৃশ্যটি স্মরণ করুন) এবং সঙ্গ দিয়েছে সেই সময় পর্যন্ত যখন স্বামীর সর্বনাশের খবর পেয়েও স্বামীর জন্য না ভেবে চারু প্রায় একেবারে খোলাখুলি প্রেমিকার মত আচরণ করেছে। কেবল তখনি অমল দাদার প্রতি কর্তব্য বশতঃ গৃহত্যাগ করেছে। এতে কি ছবির অমল মূল গল্পের অমলের থেকে গুণগত ভাবে ভিন্ন হয়ে যায় নি? যে অমল ঐতিহাসিক দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের নিজের তারুণ্যের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি! সত্যজিৎ রায় তাঁর 'চারুলতা প্রসঙ্গে' আলোচনায় একবার (১) অমলের জামা আঁকড়ে ধরে চারুর কান্নায় ভেঙে পড়ার দৃশ্যে লিখছেন মূল গল্পের 'সহস্র হস্ত গহ্বরের দিকে পা বাড়াইয়া দিতেছিল'—এই উপলব্ধির কথা। পুনশ্চ অনেক পরে ভূপতির সর্বনাশের রাত্রির দৃশ্যে চারুর অমলের হাত ধরে 'কথা দাও যাবে না' বলার সময়ও আবার বলেছেন চারুর প্রেমিকাসুলভ মনোভাবের কথা—আমাদের প্রশ্ন এর মধ্যবর্তী সময় কালটির মধ্যে তা হলে কী দেখান হয়েছে? আগেই প্রেম উদ্ঘাটিত, অমলের কাছে চারুর মনোভাবের রূপটি আগেই পরিষ্কার—অনেক পরে এবার দাদার সর্বনাশের পটভূমিকায় চারুর প্রেমিকা রূপটি আরো ব্যগ্র—এর মধ্যবর্তী অংশটি কি তাহলে প্রেমের বিস্তার পর্ব? অমলের চোখে প্রেমের উদ্ঘাটন শেষাশেষি (তুলনামূলক ভাবে) তাকে এতটা আগেই উদ্ঘাটিত করে সত্যজিৎ বাবু ছবিতে যা এনেছেন তা কি মূলানুগ? অবশ্যই নয়। এতে অমল চরিত্রটি পাল্টে যায়, চারুলতা তো অবশ্যই পাল্টে গেছে। এটি ফ্রয়েড সায়েবের মনোমত ব্যাখ্যা হতে পারে, কিন্তু গল্পটির মূলগত সত্য এত মোটা দাগের ফর্মুলা ধর্মী নয়, কিছুতেই নয়। এবং যেহেতু এই গল্পের পিছনে এক মহান কবির ব্যক্তি জীবনের কথা আছে—তাই এই চ্যুতি আমার মত অনেকের কাছেই অসহনীয়।

'নষ্টনীড়' গল্পটির আসল সৌন্দর্যটি হচ্ছে (১) চারুলতার মনে প্রেমের অসচেতন বিস্তার। চারুলতা যে সত্যই অমলের ভালোবাসায় পড়ে যাচ্ছে দিনে দিনে তা সে অমল থাকার সময় নিজেও ততটা বুঝতে পারে নি, (২) পারলো যখন অমল আর কাছে নেই, প্রেমের সেই ভয়ংকর রূপটি ধরা দিল প্রচণ্ড বিরহ জ্বালার মধ্যে, এবং এই জন্যই চারুর বিরহ পর্ব মূল গল্পে এতটা দীর্ঘ, যার প্রত্যেকটি লাইন অব্যর্থ, প্রত্যেকটি শব্দ অপরিহার্য (শেষের ছয়টি পরিচ্ছেদ)। প্রেমের সেই 'অসচেতন' বিস্তারকে সংক্ষিপ্ততর করে, অমলের উপস্থিতিকালীন চারুর প্রেমকে সচেতন করে তুলে, মূল গল্পের সত্যটিকে পাল্টে ফেলা হয়েছে ছবিতে।

এটি হয়েছে যে ঘটনাটির বিশেষ উপস্থাপনার গুণে (ছবিতে), সেটি হচ্ছে উমাপতির বিশ্বাসঘাতকতার মেলোড্রামাটিক উপস্থাপন। উমাপতি একেবারে সিন্দুক ভাঙার মত রোমহর্ষক কাণ্ড করে বৌকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে এমন একটি সোরগোল করল, যে ছবিতে চারুর অমলমুখী মনোভাবের স্বপ্নঘোর গেল কেটে এবং তখন আসন্ন সর্বনাশের ছায়ায় অসচেতন প্রেমিকা নয়, সচেতন প্রেমিকার মতই অমলের হাত চেপে ধরে বলল "কথা দাও, যাবে না" ইত্যাদি। মূল গল্পে উমাপতির চুরি নিঃশব্দ কোলাহলহীন—সে সময়ে অনেক অবস্থাপন্ন সম্পন্ন গৃহে গৃহস্বামীর উদারতার সুযোগে তার দুষ্ট আত্মীয় স্বজনেরা ঠিক যেভাবে চুরি করত এবং ধরা পড়ার পর শুধু গলার জোরে পার পেত, কেননা জানত তাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া উদার গৃহস্বামী আর কিছু করবে না—ঠিক উমাপতির চুরি সমাধা হয়েছে এমন ভাবে যে তার চুরির ইতিবৃত্ত বহুদিন ছিল শুধু ভূপতির গোচরে, ভূপতি তা চারুকেও বলে নি। ফলে সেই অজ্ঞানতার পরিপ্রেক্ষিতে চারুর অচেতন প্রেমের প্রকাশ আরো বিচিত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে—অনেক বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে যা গল্পটির সম্পদ। ছবিতে তা অনুপস্থিত।

গল্পে উমাপতি 'মেরুদণ্ডহীন মাংসপিণ্ড' হয়ে গেছে বলে সত্যজিৎ রায়ের অভিযোগের উত্তরে বলতে হয়, এই অদ্ভুত মন্তব্যের যে কারণ তিনি দেখিয়েছেন তাঁর নিবন্ধে ('চারুলতা প্রসঙ্গে') সেটি হচ্ছে 'শঠতার সঙ্গে নির্বুদ্ধিতার সমন্বয়'—এই বক্তব্যটিই ভ্রান্ত। গল্পের উমাপতি কখনোই নির্বোধ নয়, তার গভীর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এই যে সে ভূপতির মনস্তত্ত্বটি ঠিক বুঝেছিল এবং জানত চুরি ধরা পড়বে, ভূপতি তিরস্কার করবে এবং সে চড়া গলায় 'সব শোধ দেব' বলে পার পাবে, ভূপতি আহত হবে কিন্তু বড় কুটুম্বটিকে আর কিছুই করবে না। যেখানে এত সহজেই চুরি করে পার পাবার পথ আছে, সেখানে সিন্দুক ভাঙার মত রোমহর্ষক কাণ্ড ও বৌকে নিয়ে রাতারাতি পলায়নের মত হঠকারিতা কোন মূর্খ করতে যায়? বরং ছবির উমাপদই তো বেশি নির্বুদ্ধি বলে মনে হয়। আমার ধারণা উমাপতির বুদ্ধির আসল দিকটিই সত্যজিৎ রায় লক্ষ্য করেন নি, সেটি হচ্ছে অন্যের অর্থাৎ আশ্রয়দাতা—আত্মীয় ভূপতির মনস্তত্ত্বটি বুঝবার ক্ষমতা, যাতে গল্পের উমাপতি ষোল আনা সফল। সুতরাং শঠতার সঙ্গে 'নির্বুদ্ধিতা'র নয় বরং 'বুদ্ধি'র সমন্বয়ই সাধিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ উমাপতির চরিত্রায়ণে, যে জন্য উমাপতি বাস্তবসম্মত হয়েছে, সেকালের এই ধরনের বিশ্বাসহন্তা আত্মীয়দের 'টাইপ' চরিত্র হয়েছে। এবং নষ্টনীড় গল্পের নাট্য ক্রিয়ার স্বাভাবিকতার ধারায় কোন মেলোড্রামার চড়া সুর এনে সুরচ্যুতি ঘটাতে হয়নি রবীন্দ্রনাথকে। সত্যজিৎ রায় উমাপদকে করেছেন হঠকারী, ছবিতে অ-শৈল্পিক ভাবে এনেছেন মেলোড্রামা,

ঘটিয়েছেন সুরচ্যুতি। এবং তার পরেও অভিযোগ করেছেন রবীন্দ্রনাথের উমাপতি 'মেরুদণ্ডহীন মাংসপিণ্ড'। আশ্চর্য এবং অত্যন্ত অবিবেচকের মত উক্তি।

মূল গল্প থেকে ছবির পরিবর্তনের মূলে সত্যজিৎ রায়ের সবচেয়ে যে যুক্তিটি প্রতিবাদযোগ্য সেটি হচ্ছে তাঁর মতে মূল গল্পের "নানান দুর্বলতা"—বলেছেন "এই শেষের ছয়টি অধ্যায়ে ……যে সব ঘটনার মধ্য দিয়ে যে ভাবে লেখক ভূপতির উপলব্ধির মুহূর্তে পৌঁছে দিয়েছেন, বিশ্লেষণকালে তাতে নানান দুর্বলতা প্রকাশ পায়।" এই দুর্বলতাগুলি সত্যজিৎ রায় যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। পাঠক 'বিষয় ঃ চলচ্চিত্র' গ্রন্থে 'চারুলতা প্রসঙ্গে' নিবন্ধের পৃষ্ঠা ৫৭ থেকে ৫৯ পড়ে দেখতে পারেন। ভূপতির আর্থিক বিপর্যয়ের পর চারুর প্রতি মনোনিবেশ করার কালে চারুর হৃদয়ে স্থান পাবার চেষ্টাকে Poignant বলেছেন, কিন্তু সেটার প্রয়োজন যে গল্পে নেই তা প্রমাণিত করতে পারেননি, এ ব্যাপারে নীরব রয়ে গেছেন। সত্যজিৎ রায়ের মতে মূল গল্পের আর একটি ত্রুটি অমলের চিঠি ও তজ্জনিত চারুর প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটি। চারু কর্তৃক লুকিয়ে অমলকে প্রি-পেড টেলিগ্রাম পাঠানোর ব্যাপারটা প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। সত্যজিৎ রায়ের বক্তব্য ঃ "অমল যে চিঠি লেখেনি তা নয়, তিনটি চিঠি লিখেছে এবং তাতে চারুকে প্রণাম পাঠিয়েছে—একবার নয়, তিন বার।" এবং চারু জেনেছে দু হপ্তার আগের চিঠিতে যে অমল ভাল আছে ও পড়াশুনায় ব্যস্ত। সত্যজিৎ রায় লিখেছেন, "তা যদি হয় তাহলে চারু অমলকে প্রি-পেড্ টেলিগ্রাম পাঠিয়ে কি আশা করছে? অমলের ব্যস্ততার কারণ সে জানে। অমলের কুশল সংবাদ ভূপতিকে লেখা অমলের চিঠিতে পেয়েছে। প্রি-পেড টেলিগ্রামের উত্তর থেকে কি চারু এমন কিছুর ইঙ্গিতের আশা করে যে তার প্রতি অমলের আকর্ষণ অটুট রয়েছে? দাদার অনুরোধে বিয়ে করে এবং বিলেতে গিয়ে তো সে স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছে যে সে চারুর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে চাইছে।" এই হচ্ছে সত্যজিতের বিস্ময়।

আমার কাছে সত্যজিৎ রায়ের এই বিস্ময়টিই বিস্ময়কর। প্রশ্ন, তিনি একজন সংবেদনশীল বড় মাপের শিল্পী হয়েও কি বুঝতে পারেননি যে চারুর সে সময়ের মনস্তত্ব কি ভাবে কাজ করছিল, চারুর মত বিচ্ছেদাতুর নারীর হৃদয় কি চায়? সত্যজিৎ রায়ের ভ্রান্তির একটি কারণ সহজবোধ্য, কিন্তু বাকিটা খুবই দুর্বোধ্য। সহজবোধ্য যে, সত্যজিৎ রায় বুঝে নিয়েছেন অমল থাকাকালীনই চারু ও অমল দুজনেই দুজনের প্রেমিক সত্তা উদ্ঘাটিত করে ফেলেছে, চারুরটা প্রকাশ্য, অমলেরটা প্রকাশ্য নয়, কিন্তু তবুও চারু দেখিয়ে ফেলেছে তার মনোভাব ও অমল যে তা বুঝেছে সেটাও চারু বুঝেছে। এই হচ্ছে সত্যজিৎ রায়ের ব্যাখ্যা—এবং ছবিতে এটা এভাবেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এটাই মূল গল্পে নেই, মূল গল্পে অমল থাকাকালীন চারু কখনোই বুঝতে পারেনি যে অমল চারুর স্নেহ প্রীতির আড়ালে তার প্রেমকে দেখে ফেলেছে, এমনকি তখন চারু নিজেও তার প্রেমের উপলব্ধি কতটা করতে পেরেছে—সেটাও অনুমানের। সুতরাং প্রথম ক্ষেত্রে অমলের চলে যাওয়া ও পরে চারুকে ব্যক্তিগত ভাবে চিঠি না দেওয়ার (স্মরণ রাখবেন অমল তিনটি বা দশটি চিঠি যাই দিক না, তার একটিও ব্যক্তিগত ভাবে চারুকে দেয়নি) এই পার্থক্যটি কেন যে সত্যজিৎবাবু বুঝতে পারলেন না, সেটাই বিস্ময়ের)। অর্থ একরকম। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (গল্পে যা আছে) তাতে এর অর্থ অন্য রকম। প্রথম ক্ষেত্রে, অমলের চিঠি না দেওয়ার অর্থ স্পষ্টই বোঝানো যে সে চারুর সঙ্গে সম্পর্কে ছেদ টানতে চায় এবং চারুর সেটা না বোঝার কথা নয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও অমলের মনোভাব বস্তুতঃ তাই, কিন্তু এক্ষেত্রে চারুর পক্ষে সেটা বোঝা একটু কষ্টকর, কেননা সে তো তখনো জানে না অমল সত্যিই চারুর প্রেমকে বুঝে ফেলে তবেই সরে যাচ্ছে। মূল গল্পে তখন পর্যন্ত চারু নিজের মনকে চোখ ঠারিয়ে যেতে পেরেছে, কিন্তু ছবিতে সে তখন তার নিজের কাছে এবং অমলের চোখে পূর্ণ প্রেমিকা। এই দ্বিতীয় ব্যাপারটিই মূল গল্পের যথেষ্ট বিকৃতি।

তাহলেও সত্যজিৎ রায়ের বিস্ময় বিস্ময়কর। কেননা প্রথমতঃ, তিনটি চিঠির ব্যাপারটি চারুকে ক্ষান্ত করবে এটা সত্যজিৎ রায় কি করে ভাবলেন। চিঠিগুলি তো একটাও চারুকে লেখা নয়, ভূপতিকে লেখা তিনটি চিঠিতে, বৌদিকে 'প্রণাম দেবার' মত একটা সামাজিক সৌজন্যমূলক মাত্র। এটাই তো নারীর পক্ষে অপমানজনক। বিরহাতুর নারী সব সহ্য করতে পারে কিন্তু উপেক্ষাকে নয়। অমলের চিঠিতে সেই চরম উপেক্ষা ও অবহেলা প্রকট। এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই 'উপেক্ষা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, অথচ সত্যজিৎ সেটা লক্ষ্য করলেন না চারুর চরিত্রটি কি? চারু, প্রথমতঃ, নিজের অধিকার সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন, দ্বিতীয়ত অত্যন্ত একগুঁয়ে জেদী রমণী—যখন অমলের সাহিত্যিক খ্যাতিই তার কাছে শত্রুরূপে দেখা দিল, চারু নিজে পাল্লা দিয়ে সেই খ্যাতিকে নিজের সাহিত্য খ্যাতির কাছে হার মানিয়েছে; যখন মন্দাকে শত্রু ভেবেছে তাকে নির্দয়ের মত বাড়ী থেকে সরিয়ে দেবার জন্য স্বামীর কাছে অভিযোগ করে সরিয়েছে। সুতরাং অমল চলে গিয়ে বিবাহিত হয়ে তাকে 'উপেক্ষা' করছে এটা সে কি করে চুপ করে মেনে নেবে, যখন ভূপতিকে লেখা চিঠিগুলি এক অর্থে তার প্রতি চরম ঔদাসীন্যসূচক। যে নারী খুব নিরাসক্ত বুদ্ধি ও যুক্তি দ্বারা চালিত (সে রকম নারী কজন আছেন?) তাঁর ক্ষেত্রে আলাদা, কিন্তু চারু এমন মেয়ে যার বুদ্ধির সঙ্গে আছে প্রবল আবেগ প্রচণ্ড হৃদয়ানুভূতি। এই রকম

প্রেমের অবস্থায় কোন মানুষ সম্পূর্ণ যুক্তি দ্বারা চালিত হয়, বিশেষতঃ কোন নারী ? চারু তখন একটা প্রচণ্ড হৃদয়াবেগের মধ্যে চলেছে, একটা ভয়ানক অনুভূতির ঘোরে আছে—যার বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংযত লেখনীর সমস্ত শক্তি ও সৌন্দর্য ঢেলে দিয়েছেন। এর পরেও 'কেন চারু প্রি-পেড টেলিগ্রাম পাঠাল'—এটা কি কোন প্রশ্ন হতে পারে ?

বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, অমল চলে যাবার পর তার বিচ্ছেদটাও চারু অনেকটা মানিয়ে এনেছিল—মূল গল্প—১৫ শ এবং ১৬ শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। কিন্তু ১৭ শ পরিচ্ছেদে দেখা গেল—অমলের চিঠি এল কিন্তু ভূপতিকে লেখা, চারুকে একটিও নয়, ভূপতির চিঠিতে চারুর জন্য একটা সামাজিক 'প্রণাম' ছাড়া কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "প্রণাম জ্ঞাপন ছাড়া কোথাও তাহার সম্বন্ধে আভাস মাত্র নাই। চারু এই কয়দিন যে একটি শান্ত বিষাদের চন্দ্রাতপচ্ছায়ায় আশ্রয় পাইয়াছিল, অমলের এই উপেক্ষায় তাহা ছিন্ন হইয়া গেল।" 'উপেক্ষা' কথাটি লক্ষ্যণীয়। তখন নারীর অবস্থা কি রকম ? রবীন্দ্রনাথই লিখছেন, "তাহার অন্তরের হৃৎপিণ্ডটা লইয়া আবার যেন ছেঁড়াছেঁড়ি আরম্ভ হইল।.... তাহার সংসারের কর্তব্যস্থিতির মধ্যে আবার ভূমিকম্প আরম্ভ হইয়া গেল।" এই কথাগুলি কি সত্যজিৎ রায় লক্ষ্য করেন নি ? ভূপতিকে লেখা চিঠিগুলিতে অমলের মনোভাব বুঝে চারু ক্ষান্ত হবে কি, এই চিঠিগুলিই তো চারুর জেদ্ অহংকারকে আরো জাগিয়ে তুলল, তাকে মানসিক ভাবে রণরঙ্গিনী করে তুলল। এবং সেটাই তো স্বাভাবিক। আশ্চর্য অমল যে ভূপতিকে তিনটি চিঠি লিখেছিল—তা গুনে গুনে সত্যজিৎ রায় উল্লেখ করলেন, কিন্তু এই চিঠির মধ্যে যে 'উপেক্ষা' আছে, এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তা উল্লেখ করেছেন, তার প্রতিক্রিয়া চারুর মত নারীর মনস্তত্ত্বে কি ভাবে কাজ করতে পারে সেটা লক্ষ্যই করলেন না! চারুর তখন মনোভাব কি হবে—কি হওয়া বাস্তবোচিত ? চারু চাইবে, যে ভাবেই হোক অমলকে দিয়ে লেখাবেই একটা অন্ততঃ চিঠি বা টেলিগ্রাম, যা শুধু তাকে লেখা। কেননা, এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে সে 'উপেক্ষার' জ্বালা নিবারণ করতে পারে না। চারুর মনোভাবের কথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই লিখেছেন, "অমলের শরীর ভাল আছে, তবু সে চিঠি লেখে না। একেবারে এরকম নিদারুণ ছাড়াছাড়ি হইল কি করিয়া! একবার মুখোমুখি এই প্রশ্নটার জবাব লইয়া আসিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু মধ্যে সমুদ্র—পার হইবার পথ নাই।" এক্ষেত্রে চারুর মত গৃহবধূর পক্ষে প্রি-পেড টেলিগ্রাম পাঠানোর মত একটা দুঃসাহসিক কিন্তু সম্ভাবনীয় কাজ করা ছাড়া উপায় কি ? এই সব অংশে গল্পে বর্ণিত পরিচ্ছেদগুলিতে কোনমতেই 'নানান দুর্বলতার প্রকাশ' ঘটেনি। লক্ষ্যণীয় চারুর ওই মনোভাব, 'এমন নিদারুণ ছাড়াছাড়ি হইল কি করিয়া' বলে বিস্ময় এই জন্যে যে, (মূল গল্পে) চারু তখনো নিজের মনকে চোখ ঠারিয়ে চলেছে, তখনো তার অনুভূতি যে প্রেম 'পসেসিভ' ভালোবাসা—তা সে নিজেও সম্পূর্ণ অনুভব করতে পারে নি, এবং অমলের কাছে সে যে ইতিমধ্যেই উদ্ঘাটিত—'এক্সপোজড্'—এটা সে একেবারেই জানে না। এবং এটাই মূল গল্পের সৌন্দর্য। যদি ভুল করে ধরে নেওয়া হয়, যেমন সত্যজিৎ রায় করেছেন, তখন চারু ও অমল পরস্পর পরস্পরের কাছে পূর্ণ উদ্ঘাটিত, তাহলে চারুর প্রি-পেড টেলিগ্রাম করাটার অর্থ অন্য রকম হয়ে যায়—এবং গল্পের মূল ভাবধারা থেকে বিচ্যুত হয়। কিন্তু তবু সেটাও অস্বাভাবিক নয়।

সুতরাং 'চারুলতা' ছবির সবচেয়ে বড় ত্রুটি, যেখানে মূল গল্পের সত্যটি প্রায় নিহত হয়ে বসেছে—সেটি হচ্ছে—চারু অমলের প্রেমের পারস্পরিক উদ্ঘাটনকে গল্পের যেখানে যেভাবে করা হয়েছে ছবিতে তার অনেক আগে ও অন্য ভাবে (খোলা খুলিভাবে) ঘটানো হয়েছে। এতে গল্পের মধ্যে যে সামঞ্জস্য ছিল, তা বিঘ্নিত হয়েছে। ছবির চারু রবীন্দ্রনাথের চারুর চেয়ে যেন অন্য কারুর (সত্যজিৎ রায়ের না ফ্লবেয়ারের ?) চারুতে পরিণত হয়েছে। চারুর অমলকে ভালোবাসা প্রচণ্ডভাবে বাস্তব, কিন্তু উদ্ঘাটন, প্রকাশ বৈচিত্র্য, গল্পের যা মূল সত্তা, তা ছবিতে ভয়ানক ভাবে গেছে পাল্টে।

অতঃপর সত্যজিৎ রায়ের অভিযোগ মূল গল্পে শেষাংশে ভূপতির আচরণ নিয়ে। সত্যজিৎ রায় লিখছেন ভূপতির আর্থিক বিপর্যয়ের পর, "তার যেখানে কাজ নিয়ে মেতে থাকার কোন প্রশ্ন ওঠে না, চারুকে সঙ্গ দেবার জন্যই যখন সে ব্যস্ত এবং চারুর মনোভাব যেখানে তার আচরণে এতই স্পষ্ট যে 'লোকে' তার সম্পর্কে কানাকানি করে, সেখানে ভূপতির দীর্ঘকাল ব্যাপী এই marathon incomperhension-এর মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি কোথায় ?"

সত্যজিৎ প্রথমে ভুল করেছেন 'লোকের' উপলব্ধির সঙ্গে ভূপতির উপলব্ধির তুলনা করে। 'লোকে' অনেক কিছুই বুঝতে পারে, এবং অনেক সব ভুলই বোঝে, এটা 'লোকেদের' একটা কাজ। কেননা 'লোকেরা' অনেক বেশী কানাকানি নির্ভর। কিন্তু স্বামীর পক্ষে অতখানি কানাকানি নির্ভর হওয়া সম্ভব নয়। আর ভূপতির আচরণের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি ? সে তো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই দিয়েছেন গল্পের ১৩শ পরিচ্ছেদে : "বোধ করি ভূপতির একটা সাধারণ সংস্কার ছিল, স্ত্রীর প্রতি অধিকার কাহাকেও অর্জন করিতে হয় না, স্ত্রী ধ্রুব তারার মত নিজের আলো নিজেই জ্বালাইয়া রাখে—হাওয়ায় নেভে না, তেলের অপেক্ষা রাখে না। বাহিরে যখন ভাঙচুর আরম্ভ হইল, তখন অন্তঃপুরে কোন খিলানে ফাটল ধরিয়াছে কিনা তাহা একবার পরখ করিয়া দেখার কথা ভূপতির মনে স্থান পায় নাই।" এরপর ভূপতির marathon incomprehension-এর মনস্তাত্ত্বিক

ভিত্তি সম্পর্কে আর নূতন করে কিছু বলার প্রয়োজন আছে কি? অত্যন্ত ভালো মানুষ, কোথাও 'মন্দ' দেখলেও তাতে দৃষ্টি না ফেলা, তাকে বিশ্বাস না করা—এটা এক ধরণের স্বল্প সংখ্যক উদার স্বামীর স্বভাব—ভূপতি তাদের একজন। এটাই ভূপতি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য—এবং এটাই গল্পের আর একটি সৌন্দর্য।

'চারুলতা' ছবির আর একটি বিশেষ দৈন্য প্রসঙ্গে আলোচনা করতে চাই—যেটি ছবির বোধ করি সবচেয়ে বড় দৈন্য। আমরা ছবিতে দেখি অমলের চলে যাওয়ার পরবর্তী অংশটি খুব সংক্ষিপ্ত: ছবিতে তার পরবর্তী পর্বগুলি—চারু ভূপতির বিষণ্ণতা, চারু ভূপতির পুরী ভ্রমণ, সেখানে সমুদ্র তীরে ভূপতির নৈরাশ্য ত্যাগ করে আবার নূতন উদ্যমে নূতন কাগজ বার করার সংকল্প ঘোষণা—এবং তাতে এইবার স্বয়ং চারুলতাকে যুক্ত করা। চারুর সানন্দ সম্মতি। কিন্তু কলকাতায় স্বগৃহে এসেই অমলের চিঠি প্রাপ্তি, সেই চিঠি পেয়ে চারুর নির্জনে ভেঙে পড়া—ও অমলের উদ্দেশ্যে প্রেমিকার মত কাতর স্বগতোক্তি—ভূপতির দ্বারা সেই দৃশ্য দেখে ফেলা। ভূপতির ট্রাজিক সত্য-দর্শন, বাড়ী থেকে ঘোড়ার গাড়ীতে করে চলে আসা, প্রত্যাবর্তন—চারুকে গ্রহণ করতে যাওয়া—সমস্তটা 'ফ্রিজ' হয়ে যাওয়া—'নষ্টনীড়'।—এই হচ্ছে শেষাংশ।(১)

কিন্তু মূল গল্পে অমলের বিদায়ের পর ছয়-ছয়টি পরিচ্ছেদ আছে। এবং যদিও সত্যজিৎ রায় বলেছেন, "এই অংশটিকে প্রায় বলা যেতে পারে Variations on the theme of incompatibility। এই অংশের দরদ, এর কাব্যময়তা, এর আবেগ অনস্বীকার্য। কিন্তু.........বিশ্লেষণ করে তাতে নানান দুর্বলতা প্রকাশ পায়। আমার বিশ্বাস মূলের হুবহু অনুসরণ করলে এ সব দুর্বলতা অতিমাত্রায় প্রকট হয়ে উঠত।" মূলতঃ সত্যজিৎ রায় ভূপতির উপলব্ধিতে পৌঁছানর ঘটনার প্রসঙ্গে উক্তিটি করেছেন—কিন্তু সেটি ছাড়াও এই ছয়টি পরিচ্ছেদে যেটি আসল থীম সেটির সম্পর্কে কিছুমাত্র ভাবেনও নি, এটাই বিস্ময়ের !!

আমার মতে 'নষ্টনীড়'-এর আসল সৌন্দর্যটি ধরা পড়েছে এই ছয়টি পরিচ্ছেদেই বিশেষ করে। সত্যজিৎ রায়ের এই ছয়টি পরিচ্ছেদ সম্পর্কে অবজ্ঞা যতই বিপুল হোক না কেন, যে কোন সচেতন পাঠক বুঝবেন, চারুলতার বিশেষ একটি রূপ, তার চরিত্রের একটি বিচিত্র প্রকাশ—এই অংশে আছে, যা 'নষ্টনীড়'কে গভীরতর করেছে, অসামান্য করেছে। একে বাদ দিলে 'নষ্টনীড়'-এর একটি প্রধান দিকই বাদ চলে যায়। এ কথা কে বিশ্বাস করবে যে ছয় ছয়টি পরিচ্ছেদ রবীন্দ্রনাথ 'ফালতু' লিখেছেন? বরং প্রত্যেকটি লাইন অপরিহার্য—একটি শব্দ পর্যন্ত পাল্টানো যায় না।

এই অংশের মূল সারসত্তাটি কি?(১) প্রচণ্ড বিরহজ্বালার মধ্যে চারুর প্রেমের পূর্ণ উপলব্ধি, (২) একদিকে সকালের গৃহস্থ-বধূর অপরিবর্তনীয় জীবন, অন্য দিকে এই ভালোবাসা, এ দুয়ের অন্তর্দ্বন্দ্বে যন্ত্রণা বিক্ষুব্ধ চারু, (৩) কি ভাবে এক অসামান্য কল্পনা শক্তিসম্পন্না এই নারী এই দুয়ের মধ্যে একটি দুঃসাধ্য সামঞ্জস্য বিধান করেছিল, পরে অমলের চিঠির 'উপেক্ষা' যাকে ছিন্ন করে দেয়। বিশেষ করে এই তৃতীয়টি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ—যার বর্ণনার তুলনা বিশ্বসাহিত্যে বিরল। রবীন্দ্রনাথ এই অবস্থার বর্ণনায় লিখেছেন, "এই ভাবে চারু তাহার ঘরকন্না তাহার সমস্ত কর্তব্যের অন্তঃস্তরে.........সেই নিরালোক নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে অশ্রুমালা সজ্জিত একটি গোপন শোকের মন্দির নির্মাণ করিয়া রাখিল।....সেখান হইতে বাহির হইয়া মুখোসখানা আবার মুখে দিয়া পৃথিবীর হাস্যালাপ ও ক্রিয়া-কর্মের রঙ্গভূমির মধ্যে উপস্থাপিত হয়।....এই ভাবে মনের সহিত দ্বন্দ্ব বিপদ ত্যাগ করিয়া চারু তাহার বৃহৎ বিষাদের মধ্যে এক প্রকার শান্তি লাভ করিল এবং একনিষ্ঠ হইয়া স্বামীকে ভক্তি ও যত্ন করিতে লাগিল।" (পাঠক গল্পের ১৫শ পরিচ্ছেদের শেষাংশ ও ১৬শ পরিচ্ছেদের প্রথমাংশ স্মরণ করতে পারেন)।

এই হচ্ছে আমাদের দেশের যে সব বিবাহিত রমণীর জীবনে অন্য পুরুষের প্রতি প্রেমের প্লাবন আসে এবং যার ছেদ হয় বিপুল বিরহে, তাদের অন্তরের চিত্র। এর সর্বজনীনতা অনস্বীকার্য। এখানে পুরুষ চরিত্র একই সঙ্গে ব্যক্তি চরিত্র ও সেই সময়কার এই ধরণের গৃহস্থবধূর 'টাইপ' চরিত্র হয়ে ওঠে—পায় ঐতিহাসিক মাত্রা। চারু চরিত্রের অবিস্মরণীয়তার মূল ভিত্তি এখানেই।

(১) এখানে চলচ্চিত্র ভাষার এক অনবদ্য ব্যবহার আছে। সমুদ্রতীরে ভূপতি বলে তারা তিনজন, চারু ও বন্ধু নিশিকান্ত নূতন কাগজ বার করবে। ভূপতি তিনটি আঙুল দেখায়। দৃশ্য ফেড্ আউট। ফেড ইন করে একটি তেপায়া টেবিলের তিনটি পায়া। সমস্ত দৃশ্যে সেই টেবিলটি থাকে 'ফোর গ্রাউণ্ডে'। প্রথমে পা দেখায় তারপর টেবিলের ওপরের অংশ। 'ব্যাক গ্রাউণ্ডে' দেখি ভূপতি-চারু ফিরেছে, জিনিষ পত্র নামাচ্ছে, ঘরে ঢুকছে, কথা বলছে. ক্যামেরা ততক্ষণে একটু একটু করে টেবিলের ওপরে দৃষ্টি ফেলছে, এবং ব্যাক গ্রাউণ্ডে যখন শব্দপথে শুনছি ভূপতি-চারুর আনন্দিত কথাবার্তা, টেবিলের ওপরে দেখি পড়ে আছে একটি খাম—অমলের চিঠি, ভবিষ্যতের বিস্ফোরণের ইঙ্গিত। ক্যামেরা সেই ভাবে থেকে যায়। সামনে অমলের হস্তাক্ষরে ঠিকানা লেখা খাম। পিছনে ভূপতি বের হয়ে যায়। দেখি চারুর একটা হাত এসে চিঠিটা তুলে নেয়, কিছুক্ষণ নীরবতা, তারপর নেপথ্যে চারুর ক্রন্দনের শব্দ।....অসাধারণ সিনেমার ভাষা।

এটি ছবিতে বেবাক বাদ। এ কথা অবশ্য ঠিক এটি সংক্ষিপ্ত করে ছবিতে ফুটিয়ে তোলা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার, কিন্তু তার জন্য এই অংশটিকে অবজ্ঞা করা কোন চিত্র পরিচালকের বা ব্যাখ্যাকারের শোভা পায় না।

এতক্ষণ যা দেখা গেল, তাতে বলা চলে ছবির পরিবর্তনের পিছনে সত্যজিৎ রায়ের বেশির ভাগ যুক্তিই ধোপে টেঁকে না—এবং ছবিটি, সঠিক অর্থে, মূলানুগ হয়নি।

(গ) ছবির ভিন্নতা মূলের সারসত্তাকে রক্ষা করে কোন নূতন মাত্রা যোগ করেছে কিনা?

বলাবাহুল্য মাত্র, যেখানে মূলের সারসত্তাই রক্ষিত হয়নি, সেখানে এ প্রশ্নই ওঠে না।

(ঘ) মূলের সারসত্তার অপরিণত দুর্বল অংশ থেকে সরে এসে, বা তাকে পরিবর্তিত করে মূলের চেয়েও উন্নততর শিল্প সৃষ্টি হয়েছে কিনা!

এ ক্ষেত্রে মূলানুগতার প্রশ্ন কিছু কম। যেমন 'অপরাজিত' ছবি মূল উপন্যাসের অনেক দুর্বলতা—বিশেষত বিভূতিভূষণের আধ্যাত্মিক মিস্টিক ভাবধারাগুলি পরিহার করে অনেক উন্নততর শিল্প হয়েছে। কিন্তু 'চারুলতা'র ক্ষেত্রে তা কি বলা চলে? অমলের প্রতি চারুর স্নেহ প্রীতি বন্ধুত্ব কি ভাবে ধীরে ধীরে রঙ পাল্টাল—এটাই বিষয়। কিন্তু সেই প্রেম দুজনের কাছে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হবার আগেই (কেবল মাত্র যার পরের স্তরে দেহের সম্পর্ক স্বভাবতঃ আসেই) অর্থাৎ অমলের তার বৌঠানের প্রতি অনুরাগের চরিত্র বোঝবার সঙ্গে সঙ্গে একতরফাভাবে রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগ এবং চারু তখনো তার আত্মাকে ঠিকমত বুঝতে পারছে না—পরে প্রচণ্ড বিরহজ্বালার মধ্যে তার প্রেমের পূর্ণ উপলব্ধি—এটাই মূল গল্পের বক্তব্য। ছবিতে এই থীমটি পরিবর্তিত, সেখানে অনেক আগেই দুজনে দুজনের কাছে উদ্ঘাটিত 'এক্সপোজড' এবং তারপরেও অমলের ও চারুর এক সঙ্গে সহাবস্থান, পরে স্বামীর সর্বনাশের ভূমিকায় চারুর প্রেমিকাসুলভ আচরণ যখন বিসদৃশ একমাত্র তখনি অমলের গৃহত্যাগ—এটা মূল থেকে নিশ্চয় রীতিমত সরে আসা—এবং এতে করে কিছু মাত্র উন্নততর শিল্প সৃষ্টি হয়নি। বরং প্রবল বিরহজ্বালার মধ্যে চারুর প্রেমের পূর্ণ উপলব্ধি, একদিকে গৃহস্থবধূর জীবন, অন্যদিকে অশ্রুমালা সজ্জিত গোপন বিরহ মন্দিরে প্রেমের পূজা—এ দুয়ের সামঞ্জস্য বিধান করা এক নারীর অনবদ্য যে 'ইমেজ' গল্পের ১৫শ ও ১৬শ পরিচ্ছেদে আছে—যে 'ইমেজ' আমাদের দেশের এই ধরণের গৃহস্থবধূর সর্বজনীন 'ইমেজ' বা 'টাইপ' তা ছবিতে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে ছবি যে নিশ্চিত নিকৃষ্টতর হয়েছে—এ বিষয়ে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে? কয়েকটি বিশেষ দৃশ্যে যেমন সেই বাগানের অপূর্ব দৃশ্যে চারুর চরিত্রে কিছু নূতন আলোকপাত করা হয়েছে, যেমন চারুর সন্তান আকাঙ্খা ইত্যাদি। কিন্তু সামগ্রিক ক্ষতির পর স্থানে স্থানে আলোকপাতে মূল্য কতটুকু?

নূতন আলোকপাত প্রসঙ্গে একটা কথা ব্রিটিশ 'সাইট এণ্ড সাউণ্ড' পত্রিকার লেখক দ্বারা উচ্চস্বরে বিজ্ঞাপিত, এদেশেও এক ধরণের সমালোচকরা তার প্রতিধ্বনিতে মুখরিত। তাঁদের মতে, মূল গল্পে যেখানে 'তৎকালীন কাল'কে রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র প্রেক্ষাপট হিসেবে দেখিয়েছেন, সত্যজিৎ রায় সেখানে নাকি সেই 'কাল'কে বিষয়বস্তু হিসেবে দেখিয়েছেন, অর্থাৎ সেই কালের বোধ, তার সামাজিক রাজনৈতিক বিস্তারকে ধরা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ভূপতির সঙ্গে তার বন্ধুদের নৈশ আড্ডাটির প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখিত হয়। সেই আড্ডায় রামমোহনের আলোচনা হয়, তাঁর গান গাওয়া হয়, বিলেতে নির্বাচনে গ্লাডস্টোন না ডিসরেলী, লিবারেল না টোরী কারা জিতবে এ নিয়ে তর্ক হয়—ইত্যাদি। জন রাসেল টেলর লিখেছেন "Charulata it is tempting to say, Ray's most Western film" (Directors & Directors—by J. R. Taylor, page 193) পেনেলোপ হাউস্টন, 'সাইট এণ্ড সাউণ্ড' পত্রিকার সম্পাদিকা, উক্ত পত্রিকার ১৯৬৫/৬৬ সালের শীতকালীন সংখ্যায় 'চারুলতা' নামক নিবন্ধে শুরুতেই প্রবল উচ্ছ্বাসে লেখেন, যাঁর নাম 'সট্রোজিট রে' নয়, 'সাটোজিৎ রায়' ও নয়—অর্থাৎ যাঁর নামই 'Elusive'—তাঁর ছবি তো হবেই ইত্যাদি। যেন যে কোন বিদেশীর নাম এই রকম Elusive নয়। যেন একজন চৈনিক চিত্রপরিচালকের নাম তিনি সঠিক উচ্চারণ করতে পারবেন! এ রকম ছেলেমানুষি উচ্ছ্বাসের কারণ কি? সেটা তিনি লুকোন নি। এই বাংলা ছবিটির মধ্যে তিনি তাঁর স্বদেশের ভিক্টোরিয়ান যুগকে দেখতে পেয়েছেন—অর্থাৎ ছবিটিতে ভিক্টোরিয়ান সেট আপটি তাঁদের মনে এক গৌরবময় যুগের নস্টালজিয়া সৃষ্টি করে। ইংরেজদের যুগটি কি মহিমান্বিত রূপে সেই ১৮৮০ দশকের বাঙালীর জীবনে মননে, এমন কি দেওয়ালে, আসবাবপত্রে বিরাজ করত—তা দেখে তাঁরা পুলকিত, গর্বিত। এবং আপনি ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকার পাতা ওল্টালে দেখবেন সর্বত্র আনন্দ-উচ্ছ্বাস। "চারুলতা সবচেয়ে পশ্চিমী ছবি।"

শ্রীমতী মারী সীটনের 'সত্যজিৎ রায়' জীবনী গ্রন্থ থেকে জানতে পারি সত্যজিৎ রায় সেই ১৮৮০ দশকের কলকাতার উচ্চবিত্ত সমাজের 'ভিক্টোরিয়ান সেট-আপ'টি কি পরিমাণ গভীর যত্ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন। এবং তার তারিফ করার ব্যাপারে সায়েব মেমসায়েবদের উৎসাহের সীমা নেই। এবং সেটা নাকি 'নূতন আলোকপাত'! কিন্তু আমার প্রশ্ন এই 'ভিক্টোরিয়ান সেট-আপ' ব্যাপারটা কি? এই উচ্চবিত্ত শ্রেণীর 'সেট-আপ'টি কার চোখ দিয়ে দেখা, সে দেখার সত্যতা কতটুকু?

স্পষ্টতঃ এটা দেখান হয়েছে এমন একজনের দৃষ্টিকোণ থেকে যিনি এর উজ্জ্বল দিকই শুধু দেখেছেন, তাও দেশের সামগ্রিক তৎকালীন ঐতিহাসিক বাস্তবতার সঙ্গে না মিলিয়ে—যেমন (ইংল্যাণ্ডের) গণতন্ত্র নিয়ে তর্ক, সাহিত্যচর্চা, সাংবাদিকতার চর্চা, স্ত্রী শিক্ষা ইত্যাদি। এগুলির ভাল দিক নিশ্চয় আছে, কিন্তু এর প্রায় সমস্তটাই যে একই সঙ্গে শিক্ষিত উচ্চাবিত্ত শ্রেণীকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে (বৃটিশ শাসক কর্তৃক) একটা বিশেষ 'মর্য্যাদায়' বসাবার ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত, যাতে একটি বিশেষ 'এলিট' শ্রেণী সৃষ্টি হয়, গ্রাম্য সামন্ত শ্রেণীর সঙ্গেও তার কিছু পার্থক্য থাকে, জনগণকে শাসন শোষণ ও সামলে রাখার জন্য সামন্ত শ্রেণীর বেশে দক্ষতর শ্রেণী তৈরী হয়—যা বিশেষভাবে সে সময়ের বৃটিশ একাধিপত্যের তথা সাম্রাজ্য-শক্তির অনুকূলে যায়—এটাও বিস্মৃত হবার নয়। কেননা বাংলার 'নবজাগরণ' বলে 'বিরাট' একটা ব্যাপারকে ওষুধের পিলের মত শিশুকাল থেকে শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমাদের গেলান হয়েছে, তার মধ্যে 'জাগরণ' কতটুকু ছিল এবং কতটা ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা কৌশলে একটা লেজুড় 'এলিট' শ্রেণী তৈরীর প্রচেষ্টা—তা আজ অনেক বেশী স্পষ্ট। সেদিন যে বাবুরা রামমোহনের গান গেয়ে, বিলেতের নির্বাচনে লিবারেলদের জয়ে বাগান বাড়ীতে ভোজ দিতেন, তাঁরা খবরও রাখতেন না,[১] ঠিক সেই সময়েই কলকাতা থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে বসিরহাট অঞ্চলে 'তিতুমীর' নামক এক দেশ-প্রেমিক মানুষ ইংরেজের বিরুদ্ধে কৃষক বাহিনী তৈরী করে এক প্রশস্ত অঞ্চলকে বৃটিশ শাসন থেকে মুক্ত করেছিলেন, এবং নানান কারণে পরে পরাজিত হয়ে প্রাণ বিসর্জন দেন—কলকাতায় যখন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কৃপালাভের জন্য রামমোহনের সম্বর্ধনা করার আয়োজন হচ্ছে সে সময়ে কলকাতায় বসে তিতুমীরের লড়ায়ের বিরুদ্ধে ইংরেজের তোপধ্বনি পর্যন্ত শোনা গেছে—অথচ 'বাবুদের' সংবাদপত্রে এক কোণে তিতুমীরকে "ধর্মান্ধ এক ব্যক্তি" বলে একটি টুকরো খবর ছাড়া কিছু বের হয়নি। শুধু তিতুমীর কেন তখনকার কলকাতার 'ভিক্টোরিয়ান সেট-আপ'-এর বাবুরা দেশের নীচের তলার সংখ্যাধিক্য মানুষের কোন খবরটা রাখতেন?

. সত্যজিৎ রায় তাঁর 'চারুলতা' ছবিতে কোথাও কিন্তু তৎকালীন 'ভিক্টোরিয়ান সেট-আপ'টির এই জনগণ বিমুখ চিন্তাধারার দেউ-লিয়াপনার এতটুকুও তুলে ধরে নি, চেষ্টাও করেননি—করলে শ্রীমতী হাউস্টনেরা এত পুলকিত হতে পারতেন না—অবশ্যই 'চারুলতার' জয়ধ্বনি কিছু স্তিমিত হত। অথচ রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই ব্যক্তি কেন্দ্রিক গল্পেও এতটা সমাজ-অসচেতন নন। মূল গল্পে গল্পের শুরুতেই ভূপতির কাগজ বের করার বর্ণনায় একটা মক্-সিরিয়াসনেসের সুর পাওয়া যায়। যেমন গল্পের শুরুতেই আছে, "ভূপতির কাজ করিবার দরকার ছিল না। তাহার টাকা যথেষ্ট ছিল—দেশটাও গরম। কিন্তু গ্রহবশতঃ তিনি কাজের লোক হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এজন্য তাহাকে একটি ইংরাজী কাগজ বাহির করিতে হইল।" এই কথা কয়টির মধ্যে যে একটি প্রচ্ছন্ন ঠাট্টা আছে, মৃদু বিদ্রুপ আছে তা চোখ এড়ায় না। ভূপতির সাহিত্য বোধ ছিল না, দেখা যাচ্ছে কোন দেশপ্রেম বা রাজনীতির তাগিদেও কাগজ সে বের করে নি, করেছিল একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য—এবং বের করেছিল এলিট শ্রেণীর জন্য ইংরাজী কাগজ। এই হচ্ছে সেকালের ভিক্টোরিয়ান সেট-আপের কাজের লোকের নমুনা। ঠাট্টাটা এইখানেই! এই মক-সিরিয়াস সুর গল্পের অন্যত্রও আছে। মনে রাখা দরকার রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' গল্প কয়েকজন ব্যক্তিকে নিয়ে, সামগ্রিক সামাজিক বিষয় তাঁর এই গল্পের বিষয়বস্তু নয়। ভূপতিকেও তাঁর কোন 'টাইপ' চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়োজন ছিল না। তবু যখনই ভূপতির কাজ কর্মের সামাজিক রাজনৈতিক দিকটি তির্যক ভাবে এসেছে, তখনি তাকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ মৃদু ঠাট্টা করে গেছেন। যার ফলে রবীন্দ্রনাথের শিল্পের জাদুতে তার মধ্যে সেকালের 'টাইপ' চরিত্র ফুটে উঠেছে। সেই ১৯০০ সালে কবি যা করেছেন, তার চৌষট্টি বছর পরে (১৯৬৪ সালে) যখন সেই পর্বটি অনেক বেশী বিশ্লেষিত, যখন সেই 'সেট-আপ'টি নিয়ে অনেক অনেক নিরপেক্ষ বস্তুবাদী বিশ্লেষণ হয়ে গেছে, তখনও সত্যজিৎ রায় এই সামান্য ঠাট্টার সুরও রাখেন নি। এবং তিনি এই 'সেট-আপ'টিকে তেমনি একটা মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছেন ও তুলে ধরেছেন, যেমন মুগ্ধ দৃষ্টিতে বৃটিশ ভক্তরা দেখে থাকেন, সম্ভবতঃ তাঁর 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র রায় বাহাদুর ইন্দ্রনাথ রায়ও এই যুগটিকে এই ভাবে দেখে থাকবেন!

সুতরাং যাঁরা স্বদেশে কি বিদেশে বলে থাকেন, 'চারুলতা'র কালটির ওপর সত্যজিৎ রায় আলোকপাত করেছেন, তাঁরা একটু দেশজ মৌলিক বাস্তববাদী আলোকে যদি সমস্তটা বিশ্লেষণ করেন, দেখবেন সমস্তটাই ফাঁপা—অর্থহীন।

একজন সার্থক পীরিয়ড ফিল্ম রচয়িতার মত সেকালের কলকাতার পথ, তার সকাল দুপুরের শব্দগুলি, চরিত্রগুলির

---

১ বিনয় ঘোষ লিখিত "তিতুমীরের ধর্ম এবং বিদ্রোহ" দ্রষ্টব্য। 'এক্ষণ' পত্রিকা, শারদ সংখ্যা ১৩৮০ বঙ্গাব্দ। তিনি লিখেছেন "শহর কলকাতার তোপধ্বনির সীমানার মধ্যে প্রায় অবস্থিত তিতুমিঞার বিদ্রোহাঞ্চল, অথচ কলকাতার নাগরিক জীবনে তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়নি....যখন রাজা রামমোহন রায় ও তাঁর অনুগামীদের মত সমাজ সংস্কারের সম্ভ্রান্ত প্রবক্তারা কলকাতা শহরেই বসবাস করছিলেন এবং তজ্জন্য তাঁদের খানাপিনা ভোজ সহ ইংরেজের শুভেচ্ছাশ্রিত সংস্কার কর্মে উৎসাহ আদৌ মন্দীভূত হয়নি।"

আচরণ, বেশবাস আসবাবপত্র—সব নিখুঁত ভাবে ধরেছেন সত্যজিৎ রায়। কিন্তু তাকে কালটির ওপর নূতন আলোকপাত বলা চলে না। ক্লাসিক সাহিত্যের ওপর অতীত দিনের ওপর ভিত্তি করে রচিত চলচ্চিত্রের সেই বিগত কালের ওপর নূতন আলোকপাতের ব্যাপারে শিল্পের অন্যতম পরাকাষ্ঠা হয়ে আছে 'ম্যাকবেথ' নিয়ে রচিত কুরোশোয়ার 'থ্রোন অব ব্লাড' ছবি। যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন, এটা শুধু 'ম্যাকবেথে'র ওপর নূতন আলোকপাতই নয়, দেখান হয়েছে বিদেশী সাহিত্যের সত্যকে কিভাবে নিজের দেশের দ্বাদশ শতকের পরিমণ্ডলে নিয়ে গিয়ে কী অসামান্য বিশ্লেষণ করা যায়। এই দিক থেকে 'চারুলতা'তে সামান্যতমও আলোকপাত ঘটেনি। অথচ রবীন্দ্রনাথের উক্ত মক-সিরিয়াস ঠাট্টার সুরকে সূত্র করে নূতন আলোকপাতের সুযোগ যে ছিল না, তা কে জোর করতে বলতে পারে?

যদি আমরা একবার মূলানুগতার প্রশ্ন মন থেকে দূর করে ছবিটি দেখি, মনে হয় 'চারুলতা' সত্যজিৎ রায়ের অপু... পর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ('জন-অরণ্য'কে বাদ দিয়ে)। এর অঙ্গে অঙ্গে এত শিল্পকর্ম, ক্ষণে ক্ষণে চলচ্চিত্র ভাষায় এমন বিস্ময়, প্রথম দিকের রোম্যান্টিক অংশটুকুতে অমল-চারুর মনোবিশ্লেষণের এমনই অমলিন স্বতোজ্জ্বল প্রকাশ—যে, সত্যজিৎ রায়ের কথাটি বারবার সমর্থন করে বলতে ইচ্ছা করে 'এ ছবিটি সত্যিই মোজার্টীয়'—কিন্তু যোগ করতে হয় আর একটি কথা, "এটি সিনেমার 'চেম্বার মিউজিক' মাত্র।" অপুচিত্রত্রয়ীর কোন একটি ছবিরও সেই বিশাল 'সিম্ফনিক' ব্যাপ্তি 'চারুলতা'য় নেই। এবং প্রশ্ন: মূলানুগতার প্রশ্নটি আপনি কি মন থেকে সরাতে পারেন? আমার উত্তর, তা সম্ভব নয়। এবং এই জন্যেই ছবিটি অদূর ভবিষ্যতে বিস্মৃত হবার সমূহ সম্ভাবনা—যখন মানুষ রবীন্দ্রনাথকে ও তাঁর এই গল্পটিকে আরো গভীরভাবে বারবার পাঠ করবে।

গণদেবতা

চিত্রনাট্য : রাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দৃশ্য—৩১৮

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর উঠোন ও বারান্দা।

সময়—দিন।

পদ্ম বারান্দা থেকে বেরিয়ে উঠোনে নামে। তার হাতে একটা থালা।

পদ্ম : ওরে ও উচ্চিংগে— ! উচ্চিংগে— !

উচ্চিংড়ে : কি ?

উচ্চিংড়ে তখন নতুন কামারশালের ভেতরে অনিরুদ্ধকে কাজে সাহায্য করছে।

পদ্ম : এদিকে আয়।

উচ্চিংড়ে : আমি এখন কাজ করছি।

পদ্ম একটু এগিয়ে আসতেই যতীনকে উঠোনে ঢুকতে দেখে।

পদ্ম : দেখি !

যতীনের কপালে আঙুল দিয়ে চন্দনের ফোঁটা দেয় পদ্ম।

যতীন : কি ব্যাপার ?

পদ্ম : বা !···আজ না চন্দন ষষ্ঠী। তোমার মা-ও আজ ফোঁটা দেবে—তোমার নামে দরজার বাজুতে।

দুর্গা ছুটে এসে উঠোনে ঢোকে।

দুর্গা : শিগ্‌গির চলো !···উদিকে গণ্ডগোল !

পদ্ম : এ্যাঁ !

দুর্গা : হ্যাঁ !···ছিরে পালের পাইক—গাঁ শুদ্ধ সব্বার গাছ কেটে নিচ্ছে !

অনিরুদ্ধ } : সে কি ?
যতীন }

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩১৯

স্থান—গ্রামের বাগান (১)

সময়—দিন।

ক্লোজ শট্। কুড়াল দিয়ে কয়েকটি গাছ কাটা হচ্ছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩২০

স্থান—গ্রামের বাগান (২)

সময়—দিন।

কালুর লোকজন ক্যামেরার দিকে আগুয়ান একদল গ্রামবাসীকে লাঠি দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেয়।

ক্যামেরা জুম্ ব্যাক্ করলে দেখা যায় কালুর লোকজনরা গাছ কেটে ফেলছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩২১

স্থান—সজনেতলার গ্রামের রাস্তা।

সময়—দিন।

ফোর গ্রাউণ্ডে দেখা যায় চিন্তিত চৌধুরীমশাই এগিয়ে আসছেন। উল্টোদিক থেকে একদল গ্রামবাসী যাচ্ছে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩২২

স্থান—দেবু পণ্ডিতের বাগান।

সময়—দিন।

শূন্য ফ্রেমে একটি উদ্যত কুড়াল গাছ কাটতে শুরু করে। দেবু পণ্ডিত চীৎকার করতে করতে ফ্রেমে ঢোকে।

দেবু : খবদ্দার !···এ আমার বাবার লাগানো গাছ !

কালু : আ বে হাট্ ! জমিদারের হুকুম !···সব গাছ কাটা যাবে—

দেবু : না—না—না

দেবু পণ্ডিত এগিয়ে এলে কালু তাকে ঠেলে মাটিতে ফেলে দেয়।

কালু : হা—ট্ !!

দেবু পণ্ডিত মাটিতে পড়ে যেতেই দ্বারকা চৌধুরী ঢোকে ফ্রেমে।

চৌধুরী : পণ্ডিত—

দেবু : দেখেন, দেখেন, কি চলছে—

কাট্ টু।

কুড়াল দিয়ে গাছ কাটা শুরু হয়।

কাট্ টু।

দেবু পণ্ডিত মাটি থেকে উঠে চলতে শুরু করে। চৌধুরীমশাই তাকে অনুসরণ করেন।

চৌধুরী : শোন, বাবারা—

চৌধুরীমশাইকে পেছন পেছন আসতে দেখে দেবু পণ্ডিত দাঁড়িয়ে পড়ে, বাধা দেয় তাঁকে।

দেবু : না—, আপনি যেয়েন না, আপনি—

আউট ফ্রেম থেকে একটা লাঠি এসে দেবু পণ্ডিতের মাথায় আঘাত করে।

চৌধুরীমশাই তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেন।

চৌধুরী : পণ্ডিত— !

আরেকটা লাঠি এবার তারই মাথায় পড়ে। রক্তাপ্লুত মাথায় হাত দিয়ে তিনি বসে পড়লেন।

দেবু : চৌধুরীমশাই— ! চৌধুরীমশাই— !

চোখবোজা চৌধুরীমশাই আতঙ্কিত, ভীত, তিনি কাঁপা কাঁপা হাতটি দেবু পণ্ডিতের কপালে দিয়ে বিড় বিড় করে বলেন—

চৌধুরী : পণ্ডিত ! পণ্ডিত !…"য দা য দো হি ধ র্ম স্য গ্লানির্ভবতি ভয়ারতঃ—"

দেবু পণ্ডিত দূরে গোলমালের শব্দ শুনে সেদিকে তাকায়—

কাট্ টু।

বাউরি ও গাঁয়ের লোকরা ছুটে আসছে। লাঠি হাতে অনিরুদ্ধ সকলকে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে আসছে।

কাট্ টু।

কালু গুণ্ডা ও তার লোকজন।

কাট্ টু।

বাউরি ও গাঁয়ের লোকরা ছুটে আসছে।

কাট্ টু।

কালুর দল একটু ভীত।

কালু : (গলা নামিয়ে, দলের লোকদের) এ্যাই !

চোখের ইঙ্গিতে সে সবাইকে পালিয়ে যেতে বলে।

কালুর লোকজন পালাতে শুরু করলে অনিরুদ্ধর দল ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ওপর। কালু কোনমতে পালিয়ে যায়।

অনিরুদ্ধ কালুর পেছন পেছন দৌড়তে থাকে। এবং কিছুদূর দৌড়ে তাকে ধরে ফেলে। প্রচণ্ড জোরে লাঠির বাড়ি দেয় তার মাথায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩২৩

স্থান—ছিরু পালের বাগান ও বারান্দা।

সময়—দিন।

ক্লোজ শট্। কালু রক্তাক্ত মাথা নিয়ে বসে আছে। আশ-পাশে তার লোকজন।

ক্যামেরা ট্রাক ব্যাক্ করলে দেখা যায় ছিরু পাল গড়াই-এর কানে কানে কিছু বলছে।

ছিরু : শিগ্গির !…ওরা পৌঁছুবার আগেই ওকে নিয়ে থানায় গিয়ে একটা ডায়েরী করে ফেল ! বলবে, অনে—কামার— !…যে কটা মাথা ফেটেছে, —সব অনে—কামার—বুঝলে ?

গড়াই : কিন্তু সে ব্যাটা তো শুনছি ফেরার !

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩২৪

স্থান—জঙ্গলের মধ্যে একটি মন্দির।

সময়—দিন।

ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ক্যামেরা ঘুরতে ঘুরতে টিল্ট-ডাউন করে দেখায় পদ্ম ফ্রেমে ঢুকছে। চারদিকে তাকিয়ে কয়েক পা এগোতেই অনিরুদ্ধ একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে।

অনিরুদ্ধ : কি রে ?

পদ্ম : নজরবন্দী ছেলে বল্লে, ক'টা দিন একটু সামলে। উদিকে আজ রাতে পেজাসমিতির মিটিন !

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩২৫

স্থান—পুলিশ থানা।

সময়—দিন।

ক্যামেরা টেবিলের সামনে বসা দারোগার মুখের ওপর থেকে পিছিয়ে এলে দেখা যায় সামনে বসে আছে গড়াই, কালু ও তার দুই সাকরেদ।

দারোগা : কোথায় ?

গড়াই : শুনছি তো কামারের বাড়ীর সামনেই।

দারোগা রি-অ্যাক্ট করতেই ক্যামেরা তার ওপর চার্জ করে।

দারোগা : I see !

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩২৬

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর সামনে।

সময়—রাত্রি।

মিটিং চলছে। এক জমায়েতের সামনে গিরিশ বক্তৃতা দিচ্ছে। ক্যামেরা জুম্ ফরোয়ার্ড করে গিরিশকে ধরে।

গিরিশ দেবু পণ্ডিত আমাদের নমস্য লোক! সে আমাদের সঙ্গে থাক্‌-না-থাক্‌—সে যা আমাদের জন্যে করেছে, তাতে সব সময় আমরা তাকে মাথায় তুলে রাখব। তার গায়ে যে লাঠি পড়েছে—সে লাঠি আমাদের গায়ে পড়েছে। চৌধুরীমশায়ের মাথায় যে লাঠি পড়েছে,…সে লাঠি আমাদের মাথায় পড়েছে!

কাট্‌ টু

দৃশ্য—৩২৭

স্থান—ছিরু পালের বাগান ও বারান্দা।

সময়—রাত্রি।

দারোগাবাবু আরামে বসে আছেন চেয়ারে। ছিরু পালের পকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে সে রাখালের দিকে তাকায়। রাখাল তখন হাঁপাচ্ছে।

দারোগা : বটে! অনেক লোক জমেছে?

রাখাল : আজ্ঞে হ্যাঁ।…সেই সঙ্গে ঐ নজরবন্দীবাবুও রইছে।

কাট্‌ টু।

দারোগাবাবু সঙ্গে সঙ্গে রি-অ্যাক্ট করেন।

দারোগা : নজরবন্দীবাবু… !

কাট্‌ টু।

দৃশ্য—৩২৮

স্থান—ছিরু পালের বাগানের পেছনের গলি।

সময়—রাত্রি।

দুর্গাকে দেখা যায় ঐ গলি দিয়ে এগিয়ে আসতে। সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে শোনে।

দারোগা : (off) তুই ঠিক দেখেছিস?

রাখাল : (off) আজ্ঞে হ্যাঁ।

ছিরু : (off) উ নজরবন্দী ছোঁড়াই তো সব নষ্টের গোড়া! তলে তলে কলকাঠি নাড়ছে।

দারোগা : (off) বটে?

কাট্‌ টু।

দৃশ্য - ৩২৯

স্থান—ছিরু পালের বাগান ও বারান্দা।

সময়—রাত্রি।

দারোগা : (রাখালকে) তুই আবার যা!…যেই দেখবি নজরবন্দী কিছু বলতে উঠেছে—সঙ্গে সঙ্গে আমায় এসে খবর দিবি, বুঝলি?

রাখাল : আজ্ঞে আচ্ছা—

সে ছুটে ফ্রেমের বাইরে চলে যায়।

কাট্‌ টু।

দৃশ্য—৩৩০

স্থান—ছিরু পালের বাগানের পেছনের গলি।

সময়—রাত্রি।

দুর্গা অন্ধকার গলিতে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছে। রাখাল ছুটে এসে বাগানের মধ্য দিয়ে ক্যামেরার সামনে দিয়ে চলে যায়।

দুর্গা চট্‌ করে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে।

দারোগা : (off) বোঝাচ্ছি মিটিং করার মজা। হাতে-নাতে যদি ধরতে পারি,—চার বছর জেলের ঘানি ঘুরিয়ে ছাড়ব।

ক্যামেরা দুর্গার ওপর জুম্‌ করে। কয়েক মুহূর্ত সে কি করবে ঠিক করতে পারে না। খিল্‌ খিল্‌ ও উচ্চকিত হাসির শব্দ শোনা যায় বাগান থেকে।

হঠাৎ যেন দুর্গা স্থির করে ফেলে কি করবে। শরীর দোলাতে দোলাতে মদির ভঙ্গি করে সে গুন্‌গুন্‌ করে এগিয়ে যায়।

"কাঁচা হাঁড়িতে
রাখিতে নারিলি প্রেমজল—"

কাট্‌ টু।

দৃশ্য—৩৩১

স্থান—ছিরু পালের বাগান ও বারান্দা।

সময়—রাত্রি।

দুর্গার গুন্‌গুন্‌ গান শুনে দারোগা অন্ধকারে বাইরে তাকিয়ে বলেন—

দারোগা : কে?…কে রে?

কাট্‌ টু।

দুর্গা : আমি, দুগ্‌গা দাসী।

কাট্‌ টু।

দারোগা : দুগ্‌গা!…আরে শোন্‌ শোন্‌ শোন্‌ শোন্‌—

কাট্‌ টু।

দুর্গা থেমে দাঁড়িয়ে, কয়েক পা শঙ্কিতভাবে এগিয়ে আসে।

দুর্গা : আ—মরণ! তাই বলি চেনা গলা মনে হচ্ছে! কি ভাগ্যি আমার! আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম গো!

দারোগা : আরে বোস্ না !···নজরবন্দী ছোঁড়ার সঙ্গে··· কি রকম ?

দুর্গা যেন খুব লজ্জা পেয়েছে। সে মুচকি হাসে।

দুর্গা : বক্‌শিসের কথাটা মনে থাকে যেন !

দারোগা : (খোসমেজাজে) আরে বোস্—(তারপর ছিরু পালকে) কি হে,···একটা সিগারেট-টিগারেট ছাড়ো !

ছিরু পাল কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে।

দুর্গা : (আড় চোখে) মিতে আপনার আমার ওপর রাগ করেছে।

দারোগা : তা, রাগ হতেই পারে। পুরনো বন্ধুলোককে ছাড়লি কেন তুই ?

দুর্গা : বন্ধুলোক !···পাড়াকে পাড়া পুড়িয়ে সাফ করে দিলে !

হঠাৎ মুখ ফসকে ভুল কিছু বলে ফেলেছে এমনি ভাব করে জিভ কাটে দুর্গা, কথা বলে না আর।

কাট্ টু।

ছিরু পাল—ক্লোজ-আপ্।

কাট্ টু।

দারোগা—ক্লোজ-আপ্।

কাট্ টু।

দুর্গা—ক্লোজ-আপ্।

কাট্ টু।

দাসজী—ক্লোজ-আপ্।

কাট্ টু।

দারোগা গম্ভীরভাবে ছিরু পালের দিকে তাকায়। রাগী দৃষ্টি।

কাট্ টু।

ছিরু পাল। কাঁপা কাঁপা হাতে সিগারেটে একটা টান দেয় সে।

কাট্ টু।

দুর্গা : (উঠতে উঠতে) আমি যাই—

দারোগা : আরে শোন্ শোন্···কোথায় ?

দুর্গা : জানি গো জানি। "পড়ছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে।"···ঘাট থেকে আসছি ! তবে আজ কিন্তু ভালো খানা খাওয়াতে হবে।··· পাকি মাল !···হুঁ !

দুর্গা অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

কাট্ টু।

দারোগা উঠে দাঁড়ায়। ছিরু পালের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে—

দারোগা : ব্যাপার কি পাল ? দুগ্‌গা কি বলতে বলতে থেমে গেল ?

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫

স্থান—গাঁয়ের বিভিন্ন রাস্তা।

সময়—চন্দ্রালোকিত রাত্রি। আধা-আলো আঁধারিতে গাঁয়ের পথ দিয়ে দুর্গা ছুটে যাচ্ছে অনিরুদ্ধ'র বাড়ীর দিকে।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩৩৬

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর সামনের রাস্তা।

সময়—রাত্রি।

দুর্গা ছুটতে ছুটতে অনিরুদ্ধর বাড়ীর কাছে এসেছে। উল্টোদিক থেকে রাখালকে আসতে দেখে সে একটা ঝোপের পাশে লুকিয়ে পড়ে। রাখাল চলে যায়।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩৩৭

স্থান—অনিরুদ্ধর বাড়ীর সামনে।

সময়—রাত্রি।

যতীন জমায়েতের সামনে বক্তৃতা করছে।

যতীন : এখন কথা হচ্ছে, দেবুবাবু যদি আমাদের সঙ্গে না-ও থাকেন···তবে কি আজ বাদে কাল আমাদের যা লড়াই···ধর্মঘট···সেটা কি থেমে থাকবে ?

দুর্গা ছুটে এসে ফ্রেমে ঢোকে। গিরিশের মুখোমুখি হয়।

দুর্গা : গিরিশদা !

কাট্ টু।

(চলবে)

কার্ল মার্কস্

পরিচালনা : গ্রিগোরি রোশাল, পরিচালক ফটোগ্রাফী : লিওনিদ কসমাতোভ, সঙ্গীত : দিমিত্রি সোস্তাকোভিচ, চরিত্র চিত্রনে : ইগর কাভাশা (মার্কস্) আঁদ্রেই মিরোনোভ (এঙ্গেলস্) রুফিনা নিফোনতোভা (জেনী মার্কস্)।

মুখবন্ধ :

তাঁর প্রিয় প্রবাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে মার্কসের উত্তর : মানবিক যা কিছুই আমি তার পক্ষে।

'কার্ল মার্কস' ছবিটির নির্মাতাগণ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা মার্কস কে ঠিক ঐ মানবিক দৃষ্টিতেই দেখেছেন।

ছবিটির পরিচালক সোভিয়েত রাশিয়ার প্রথিতযশা চলচ্চিত্রকার গ্রিগোরি রোশাল-এর বক্তব্য : আমরা চেষ্টা করেছি যেন একজন মানুষ এবং একজন প্রতিভা হিসেবে কার্ল মার্কস্‌কে তুলে ধরতে পারি, যিনি প্রলেতারিয়েতদের বিপ্লবের পথ নির্দেশ করেছিলেন। তাঁর কর্মকাণ্ড, জীবন সংগ্রাম এবং মানুষের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক সবটাতেই মার্কসের প্রতিভার স্পর্শ পরিলক্ষিত হয়েছে। নির্মাতাদের কাছে ব্যাপারটা বেশ দুরূহ। কার্ল মার্কস্-এর উপর চলচ্চিত্র নির্মাণের এই হল প্রথম প্রচেষ্টা, এবং অন্ততঃ মার্কস সংক্রান্ত এই বিষয়বস্তুর শৈল্পিক উপস্থাপনা বেশ পরিশ্রমশীল কর্ম। এই জন্যেই নির্মাতারা মার্কসের জীবন থেকে ১৮৪৮—৪৯ এই বিশেষ স্বল্প কিন্তু ঘটনাবহুল ঐতিহাসিক সময়টুকু বেছে নিয়েছেন। এই সময়ে সমগ্র ইউরোপ বিপ্লবের জোয়ারে ভেসে চলেছে। তৎকালীন ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করে মার্কস ও এঙ্গেলস্ পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁরা সঠিক পথই অবলম্বন করেছেন। মার্কস ও এঙ্গেলস উভয়েই তখন অল্পবয়সী। বিপ্লবের নিবেদিতপ্রাণ কর্মী হিসেবে তাঁদেরকে যেতে হত ব্রাসেলস, প্যারিস, কলোন ও ভিয়েনাতে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লব সংগঠন করার জন্যে। যেখানেই শ্রমিক শ্রেণীর সরব হয়ে ওঠার সংবাদ পেতেন সেখানেই ছুটে যেতেন তাঁরা। ঠিক এ সময়েই বিপ্লবী ধ্যান ধারনাকে ছড়িয়ে দেয়ার এবং কর্মজীবি মানুষের সংগ্রামকে সুসংবদ্ধ করে তোলার উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁরা প্রকাশ করলেন 'নইয়ে রাইনিশে তসাইটুংগ' পত্রিকাটি।

চিত্রনাট্য

সরকারী সীলমোহর সম্বলিত একটি অফিসিয়াল চিঠির শট। সরকারী নির্দেশনামা—২৪ ঘন্টার ভেতর মার্কসকে ব্রাসেলস্ ছেড়ে যেতে হবে।

ঐ নির্দেশনামাটা মার্কস্‌দের ফ্ল্যাটবাড়িতে জেনির (মার্কসের পত্নী) ডেস্কের ওপর পড়ে রয়েছে। ঘর স্বল্পালোকিত। জেনি চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজ এবং বইপত্র বাঁধছেন।

নার্সারীর খোলা দরজা দিয়ে কতকগুলো বিছানাপত্র দেখা যাচ্ছে। যাতে শুয়ে আছে শিশুরা। লেন্‌চনকে দেখা যাচ্ছে বেতের তৈরী জিনিষপত্র গোছগাছ করতে।

পড়ার ঘরে একটি ডেস্ক ঘিরে বসে আছেন মার্কস, এঙ্গেলস এবং ইউনিয়ন অফ কম্যুনিস্ট-এর কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্যদের মধ্যে গিগাউদ, টেডেসকো এবং হান্‌স্ আবেল। এই হানস্ আবেল দেখতে অনেকটা টিল উলেনস্পিগেল-এর মতো।

একটা সবুজ শেড দেয়া বাতি জ্বলছে। গিগাউদ মিটিং-এর বিবরণী লেখা শেষ করে তাতে সবার সই নিলেন। ভেজা কালি শুকোবার জন্যে গিগাউদ কিছু পাউডার ছড়িয়ে দিলেন।

গিগাউদ : এই তোমার ম্যাণ্ডেট, কার্ল। প্যারিসে গিয়ে তুমি নতুন করে কেন্দ্রীয় কমিটি গড়ে নাও।

টেডেসকো : কার্ল, তুমি চলে যাবার আগে হানস্ তোমাকে একটা কিছু উপহার দিতে চায়।

হানস্ উঠে দাঁড়ায়। দেয়ালের উপর হানসের লম্বাটে কোনাকুনি ছায়া এসে পড়ে।

বিব্রত কণ্ঠে হানস বলতে থাকলো :

ব্রাসেলস-এ আপনার বক্তৃতা শুনেছি। এবং আপনার 'ম্যানিফেস্টো' আমি অনেকবারই পড়েছি। আর, কিছু ড্রয়িং করেছিলাম।

হানস্ মার্কসের দিকে একটা এ্যালবাম এগিয়ে দেয়। মার্কস্ এ্যালবামটি খুললেন। বিশিষ্ট এবং প্রতিভাদীপ্ত ড্রয়িংগুলো 'কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো'-আবেদনটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

হা : আমি ফ্লেমিশ। অনেকেই বলে মুক্তি মানবের সরব যোদ্ধা টিল উলেনস্পিগেলের বংশধর আমরা। আমার ধারণা আমাদের পূর্বপুরুষদের ঠাকুর্দা এই এ্যালবাম (ড্রয়িংগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে) এবং এই জিনিষটা (মার্কসকে হানস্ একটি ছোট বাক্স দেয়) আপনাকে দিতে পারলে অত্যন্ত আনন্দিত হতেন। বাক্সটা আমিই তৈরী করেছি ... ..

মার্কস বাক্সটি খুললেন। 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' শ্লোগান সম্বলিত একটি গোলাকার মেডেল বাক্সটার ভেতর রাখা।

সবাই মেডেলটা দেখার জন্যে ঝুঁকে পড়লেন। বাতির স্বল্পালোকে সবাইকে গুরু-গম্ভীর এবং দৃঢ় চিত্তের দেখাচ্ছে।

অপরিচিত লঘু একটা শব্দের কারণে হঠাৎ নীরবতা ভেঙ্গে পড়লো। জেনি শোনার জন্তে দাঁড়িয়ে পড়েন। অনেকগুলো ভারী পদক্ষেপের শব্দ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসছে। জেনি ছুটে গেলেন মার্কসের কামরায়। দ্রুত ডেস্কের উপর থেকে মিটিং-এর বিবরণী লেখা কাগজপত্র ড্রয়িং ও মেডেল সবকিছু সরিয়ে ফেললেন। সবাই সতর্ক হয়ে উঠলেন। লেনের বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। এঙ্গেলস্ ও অন্যান্যরা উঠে দাঁড়ালেন। মার্কসের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে এঙ্গেলস্ সঙ্গীদের নিয়ে স্নানাঘরের ভেতর দিয়ে পেছনের বেরুবার দরজার দিকে এগুলেন।

দরজায় জোরে কড়া নাড়ার শব্দ।

এঙ্গেলস্, গিগাউদ, টেডেসকো এবং অন্যান্যরা পেছনের প্রায় অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছেন।

দরজায় আঘাত আরো জোরালো হল।

এঙ্গেলস্ সঙ্গী সাথীসহ ছাদের চিলে কোঠা দিয়ে এগুচ্ছেন···

মার্কস্ জ্যাকেট খুলে ফেললেন। জেনি বাড়তি ড্রেসিং গাউন গায়ে দিলেন। লেন্‌চেন দরজা খুলে দিলো।

ডজনখানেক সামরিক পুলিশ সঙ্গে নিয়ে একজন পুলিশ অফিসার ভেতরে প্রবেশ করলেন।

বাচ্চাদের ঘুম ভেঙ্গে গেছে। ওরা ভয়ে ভয়ে জেনিকে জড়িয়ে ধরেছে। লরা কাঁদছে। জেনি পুলিশ অফিসারের দিকে ঝুঁকে বলতে থাকেন :

কতবড় আস্পর্ধা আপনার আইন ভঙ্গ করছেন। সূর্যাস্ত থেকে সূর্য্যোদয় পর্যন্ত এই সময়টুকুতে কাউকে বাসায় বিরক্ত করা যে আইনত নিষিদ্ধ তা নিশ্চয়ই জানেন।

অফিসার : আমরা কেবল আদেশ পালন করেছি।

এঙ্গেলস্, টেডেসকো এবং অন্যান্যরা চিলেকোঠা থেকে বেরিয়ে ধোঁয়ার চিমনি বেয়ে নীচে নামছেন।

সামরিক পুলিশেরা ঘরময় ছড়িয়ে অনুসন্ধান চালাতে থাকল :

অফিসার : (পড়ার ঘর থেকে চিৎকার করে) অন্যান্যরা সব কোথায় ? আমরা জানি, এখানে আপনার সঙ্গে আরো অনেকেই ছিলো।

মার্কস (শান্ত স্বরে) আপনি দেখছি আমার চাইতে অনেক বেশী কিছুই জানেন। আপনি কি জানেন যে আমাকে ব্রাসেলস ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। আমার হাতে সময় নেই। এবং বাকী সময়টুকু আমি আপনার সঙ্গে বক বক করে নষ্ট করতে চাই না . . .

অ : পছন্দ করুন আর নাই করুন, বকবক আপনাকে করতেই হবে !

অন্যান্য কামরাগুলোতে অনুসন্ধান চলতে লাগল। একজন পুলিশ সদ্য গোছগাছ করা একটি ট্রাঙ্ক খুলে ভেতরের বইপত্র সব মেঝেয় ছড়িয়ে দিল। সেক্সপীয়ার, জর্জেস, স্যাণ্ড, হাইনে, মার্কসের নিজের লেখা 'দি পভার্টি অফ ফিলোসফি' প্রমুখ রচনা পুলিশটির পদদলিত হচ্ছে। একের পর এক বই উল্টেপাল্টে দেখছে সে। ড্রয়িং-এর একটা এ্যালবামের ভেতর থেকে সদ্য ভেঙ্গে যাওয়া কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং-এর বিবরণী লেখা কাগজগুলো বেরিয়ে পড়লো। অফিসার তখন মার্কসের পড়ার ঘরে চিঠিপত্র পরীক্ষা করছিলেন। পুলিশটি প্রায় দৌড়ে যেয়ে কমিটির সিদ্ধান্ত লেখা মিটিং-এর বিবরণীটা অফিসারের হাতে দিল।

অফিসার চোখ বুলিয়ে চলেছেন।

অ : (বিজয়োল্লাসের ভঙ্গীতে মার্কসকে) আপনি একাই ছিলেন, তাই না ! তা হলে এটা এলো কোত্থেকে ? কালিতো এখনো শুকোয়নি ! আপনাদের কম্যুনিস্টদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা বসিয়েছিলেন !

মার্কস্ : (তির্যকভাবে) আচ্ছা স্যার, আপনি তাহলে লেখাপড়া জানেন !

অ : (ক্রুদ্ধ) অপমান করবেন না।

মা : (সিদ্ধান্তগুলোর একটি প্যারাগ্রাফ নির্দেশ করে) তাহলে তো আপনি এটা বেশ পড়তে পারবেন, এবং বুঝতেও পারবেন যে ওতে কি লেখা রয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্রাসেলসে কম্যুনিস্টদের বিশেষ করে জার্মান কম্যুনিস্টদের ইউনিয়নের কি ভাবে মিটিং হতে পারে ?—

(সিদ্ধান্তগুলো পড়ছেন) "কেন্দ্রীয় কমিটিকে প্যারিসে স্থানান্তরিত করা হল—ব্রাসেলসের কেন্দ্রীয় কমিটি এই মর্মে নির্দেশ দিচ্ছে যে তিনি স্বাধীনভাবে এবং কার্য ক্ষমতাবলে প্যারিসে একটি নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করবেন।"—এখানটায় লেখা রয়েছে দেখুন, "ব্রাসেলস-এর কেন্দ্রীয় কমিটি এখন থেকে লুপ্ত করে দেয়া হল।" আপনারা এর চাইতে বেশী কি কামনা করেন ?"

অফিসার কিছুটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার সুস্থির হলেন।

অ : আপনি কে তাই আমাদের জানার বিষয়।

মা : (বিস্মিত) কি ?

জেনি : (ক্রুদ্ধ) উনি আমার স্বামী, ডঃ মার্কস্।

অ : ওটা এখনো প্রমাণ হয়নি।

মা : (পাসপোর্ট অফিসারের হাতে দিলেন) এই আমার প্রমাণপত্র। এবং এই হচ্ছে বিপ্লবী ফরাসী সরকারের মাননীয় মন্ত্রী এম, ফ্যালকনের একখানা চিঠি।

অ : (এক সুরে পড়ে যাচ্ছেন) "দুঃসাহসী ও সৎ মার্কস্, স্বাধীনতা ও মুক্তিকামী সকল বন্ধুদের আশ্রয়স্থল ফরাসী প্রজাতন্ত্র, মুক্ত ফ্রান্স, তোমাকে স্বাগতম জানাচ্ছে।"
ঠিক আছে, পুলিশ এসব পরীক্ষা করবে।

মা : কিন্তু, আমি কোথাও যেতে রাজী নই।

কয়েকজন সামরিক পুলিশ মার্কস্‌কে ঘিরে দাঁড়ালো।

অ : বেলজিয়ামের মহামান্য রাজার নামে আমি আপনাকে গ্রেফতার করলাম ...

... টাওয়ারের ঘড়ির ঢং ঢং শব্দ। এর মধ্যে প্রবেশ করলো পাথরের রাস্তার উপর দিয়ে দ্রুত দৌড়ে যাওয়া হাই হিল জুতোর ভারী, অস্থির এবং উদ্বিগ্ন খটখট শব্দ। একজন মহিলা দিক নিশানাহীন ভাবে দ্রুত ছুটে চলেছেন।

মাথার উপর থেকে কালো শাল গড়িয়ে পড়লো। চুল খোলা, বৃষ্টিতে ভিজছে। দুঃশ্চিন্তায় চোখ বড় বড় দেখাচ্ছে, ঠোঁট পরস্পরকে চেপে আছে। ভদ্রমহিলা জেনি।

জেনি একটা সরু পাহাড়ী রাস্তা ধরে প্রাচীন গথিক স্থাপত্যের একটি বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেলেন। দ্বারঘন্টা বাজালেন।

ইউনিফর্ম পরা দ্বাররক্ষী দ্বার খুললো।

রক্ষী : মাদাম, আপনার জন্যে কি করতে পারি?

জে : পুলিশ অধিকর্তার সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে। আমার স্বামীকে ওরা গ্রেফতার করেছে। ওকে এখনই মুক্ত করতে হবে।

র : মাদাম, একটু বিবেচনা করুন। পুলিশ অধিকর্তারও নিশ্চয় বিশ্রামের অধিকার আছে। তাছাড়া, অফিসিয়াল কোন ব্যাপার নিয়ে তিনি বাসায় কাজ করেন না।

রক্ষী দ্বার বন্ধ করে দেয়। জেনি বিফলভাবে পুনরায় দরজা ধাক্কা-দিলেন।

...তিনি টাউন হলের পাশ দিয়ে দৌড়ে গিয়ে একটা বাড়ির দোর গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন। একটা কুকুর ডেকে উঠলো। নিচের তলার একটা জানালা দিয়ে আলো চোখে পড়ছে। বৃষ্টিতে ঐ আলো নিবু নিবু মনে হয়।

জে : আমাকে ভেতরে যেতে দিন। মন্ত্রীমহোদয়ের সঙ্গে দেখা করা আমার বিশেষ প্রয়োজন।

দ্বার-রক্ষী ভেতর থেকে গেটের লৌহদণ্ডের আড়াল দিয়ে জেনিকে পর্যবেক্ষণ করছেন।

জে : আমার সত্যিই দেখা করা দরকার।
দয়া করুন মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গে আমাকে আলাপ করতেই হবে।

তরুণ দ্বাররক্ষী বিমোহিতভাবে জেনির জ্বলন্ত দৃষ্টি পর্যবেক্ষণ করছে। ভেজা পোষাক জড়িয়ে আছে জেনির শরীর। জেনির মুখমণ্ডলে এমন কিছু বিকশিত হয়েছিল যে দ্বাররক্ষী তাঁকে ফিরিয়ে দিতে পারলোনা। সে জেনিকে অঙ্গনে ঢোকার দরজা খুলে দিল। সেণ্ট্রিরা ফায়ার প্লেসের পাশে বসে ঝিমুচ্ছিল। ওরা জেগে ওঠে বিস্মিত নয়নে এই আগন্তুক মহিলার দিকে চেয়ে রইলো।

দ্বাররক্ষী : (এম্পায়ার ক্যাবিনেটের সঙ্গে তারযুক্ত একটি মাউথপিসের ভেতর দিয়ে কথা বলছে) মাননীয় সেক্রেটারী।

নিদ্রাজড়িত অবস্থায় সেক্রেটারী রিসিভার তুলছেন।

জে : ওহ, স্যার, এক্ষুণি আপনার চীফের সঙ্গে আমার কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন! আপনি একটু এদের বলে দিন যেন ওরা আমাকে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে যেতে দেয়।

সেক্রেটারী : আপনার পরিচয় মাদাম?

জে : মার্কস, জেনি মার্কস। আমাদের উপহাসের জন্যেই কি আপনাদের রাষ্ট্রে আমাদের রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছিলেন? আমার বিশ্বাস যে মাননীয় মন্ত্রী···

সেক্রে : (কর্তব্যরত অফিসারের প্রতি) এঁর মতো একজন মহিলা পুরো ব্রাসেলসকে নাড়া দিতে পারেন।
(জেনির প্রতি) ক্ষমা করবেন মাদাম। তিন দিন আগে মাননীয় মন্ত্রী এ শহর ত্যাগ করেছেন।
(কর্তব্যরত অফিসারকে) দেখ, ওনার জন্যে কি করতে পার।

দ্বাররক্ষী সম্মানের সঙ্গে জেনি মার্কসকে দরজা খুলে দিল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ভঙ্গী করলো যেন 'আর কি করার আছে?'

জেনি বেরিয়ে এলেন। তাঁর ছায়া পাশের বৃষ্টিভেজা তরঙ্গের মতো ভেসে চলেছে।

অবসন্ন জেনি ঘরের দিকে ফিরছেন। একজন সামরিক পুলিশ তাঁর ঘরের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে।

পুলিশ : (জেনিকে স্যালুট ঠুকে বিনম্রী কণ্ঠে বলল) মাদাম মার্কস্ আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। আপনার স্বামীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অনুমতি দেয়া হয়েছে। আপনি ইচ্ছে করলে আমি আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবো।

জে : (আনন্দিত) ধন্যবাদ, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি কার কাছে কৃতজ্ঞ থাকলাম।

পু : সে আমি জানি না, আমি আদেশ পালন করছি মাত্র।

জেনি এত দ্রুত হাঁটতে থাকেন যে পুলিশটির পক্ষে তাঁর সঙ্গে সমতালে দ্রুত চলা অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়। তখনো মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে।

সম্মানিত কায়দায় পুলিশটি দ্বার মেলে ধরে। জেনি দ্রুত পুলিশ হেডকোয়ার্টারের একটি কক্ষে প্রবেশ করেন। উজ্জ্বল আলোয় জেনির চোখে ধাঁধাঁ লাগে, তিনি দাঁড়িয়ে পড়েন। একটি ডেস্কের ওপাশ থেকে একজন লম্বা কর্ণেল উঠে দাঁড়ান।

কর্ণেল : (ঝুঁকে অভিবাদন করলেন) আপনিই ব্যারনেস ফন ভেস্টফালেন ?

জে . : (শঙ্কিতচিত্তে পিছিয়ে এলেন) আমি জেনি মার্কস।

ক : (সম্মানের সঙ্গে পুনর্বার) জন্মসূত্রে ব্যারনেস ফন ভেস্টফালেন ?

জেনি নীরবে মাথা নাড়লেন। অকস্মাৎ কর্ণেল ডেস্কের উপর সজোরে মুষ্টাঘাত করে চেঁচিয়ে উঠলেন।

ক : আপনি অবশ্যিই ব্যারনেস ফন ভেস্টফালেন। আপনি একটি সম্মানিত পরিবারের উপাধি এবং কৌলিন্যকে কলঙ্কিত করছেন। আপনি একজন অপরাধীর স্ত্রী, যে কিনা আমাদের প্রিয় ব্রাসেলস নগরীর সকল জঞ্জাল শ্রেণীর লোকদের নেতা, যে কিনা সব বিদ্রোহী এবং দুঃসাহসী লোকদের অধিপতি! এ অসহ্য !

জেনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। অস্থিরভাবে হাতের ভেজা গ্লাভস্ টানতে থাকেন।

জে : আপনি আমাকে এখানে ডেকে এনেছেন……

ক : কোন কোন বেলজিয়ান নাগরিক মার্কসের সঙ্গে দেখা করতে আসতো তাদের নাম বলুন। নইলে এর জন্যে আপনাকে পরে দুঃখ পেতে হবে।

জে : আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে পারবো এরকম একটা প্রতিশ্রুতি আমার কাছে করা হয়েছিল।

ক : (দাঁত চেপে) আর কখনোই আপনি তাকে দেখতে পাবেন না।

(কর্ণেল ঝুঁকে চোখ উপরের দিকে তুলে মোটা ভুরুর পেছন থেকে জেনির দিকে তাকিয়ে থাকেন।)

জে : (অবজ্ঞার সুরে) আপনি আমার কাছে মিথ্যে কথা বলেছিলেন। আমার ফিরে যাওয়াই শ্রেয়। (জেনি দরজার দিকে এগোন।)

ক : দাঁড়ান মাদাম ! আপনি এখন বন্দী !

জে : (ঘুরে দাঁড়িয়ে) বন্দী ! কি অপরাধে ?

ক : আপনি একজন ভবঘুরে। একজন ভবঘুরে হিসেবেই আপনাকে গ্রেফতার করা হোল। আপনি……

কর্ণেলের কণ্ঠ ছাপিয়ে জেনির কণ্ঠ সরব হয়ে ওঠে আদেশসূচক ভঙ্গীতে। কর্ণেল থেমে যান।

জে : ব্যারনেস ফন ভেস্টফালেন সম্বোধন করতে হলে উঠে দাঁড়াতে হয়। উঠে দাঁড়ান। যখনই আপনি……

কর্ণেল সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন।

জে : ……বলুন, মাননীয়া নাগরিক মার্কস্।

বন্দীশালার একটি কক্ষ। দেয়ালের পাশে জেনি দাঁড়িয়ে। ভিজে পোষাকে কাঁপছেন। তাকিয়াগুলোতে শুয়ে আছে যুবতী-বুড়ি, সুন্দরী-কুৎসিত অপরাধীরা। সব গণিকা নয়তো বা চোর। জীর্ণ কাঁথা বা কাপড়-চোপড় দিয়ে ওরা আধ-ঢাকা। কেউ ঘুমুচ্ছে, আবার কেউ কেউ এটা ওটা নিয়ে ঠাট্টা-ফাজলামো করছে। দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস-চুল্লী থেকে অল্প-স্বল্প আলো এসে পড়ছে।

শীর্ণকায়া অর্ধনগ্ন ক্রুর চেহারার একজন গণিকা জেনির দিকে এগিয়ে আসে। জেনির হাত ধরে মেয়েটি তার নিজের তাকিয়ার দিকে জেনিকে নিয়ে যায়।

গণিকা : (খসখসে গলায়) মনে হচ্ছে জেলে তোমার এই প্রথম, তাই না ? পোষাকগুলো খুলে ফেল। ভয় পেয়োনা, আমি তোমাকে কামড়াবোনা।

জেনি তাকিয়ায় বসলেন। চোখে মুখে মনোকষ্ট এবং যন্ত্রণার চিহ্ন। ব্লাউজ, মোজা এবং জুতো খুলে ফেললেন। মেয়েটি জেনির গা থেকে ভেজা স্কার্টটা হাত গলিয়ে বার করে নেয়ার সময় জেনির মুখ থেকে একটা অস্পষ্ট ধ্বনি বেরিয়ে আসে। জল গড়িয়ে পড়ে মেঝেয়।

খোলা জানালা দিয়ে ঊষাকিরণ এসে পড়েছে। জেনি জেগে ওঠেন এবং ভীত চকিত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাতে থাকেন। বন্দীকক্ষে

প্রাণ চাঞ্চল্য জেগে উঠছে। রুটি এবং পানীয় আসলো। গ্যাস শিখা নিভিয়ে দেয়া হল। একজন ক্ষুদ্রাকৃতি গণিকা আয়নায় নিজেকে খুঁটে খুঁটে দেখছে, এবং টুকরো টুকরো রুটি ছিঁড়ে মুখে পুরছে। হাসাহাসি, গান, হৈ চৈ, কদাচার ইত্যাদিতে প্রকোষ্ঠের আবহাওয়া ঝাঁঝাঁলো। জেনির কাছে এসব দুঃস্বপ্নের মতোই লাগছে, যেন গয়ার ধাতব চিত্রকলার সেইসব পৈশাচিক পরিবেশ। অধিকাংশ মেয়েরা তাকিয়ার উপর দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে বাইরে দেখার চেষ্টা করছে। জেনিও উঠে দাঁড়ালেন।

জানালার নোংরা পরকলা কাঁচের ভেতর দিয়ে বিপরীত দিকের বন্দীকক্ষগুলোর দেয়াল দেখা যাচ্ছে। দেয়ালের উপর বিভিন্ন অংশে লৌহদণ্ড বসানো—এগুলোর পেছনে সরু সরু ছিদ্রপথ, ঘুলঘুলি। পুরুষ বন্দীপ্রকোষ্ঠগুলির জানালা এগুলো। জেনি দেখছেন।

এই প্রকোষ্ঠগুলির একটিতে রয়েছেন দু'জন বন্দী। একজন অস্থিরমতি এবং চঞ্চল। ঘরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ছুটাছুটি করছেন এবং ক্রমশঃই উত্তেজিত হয়ে উঠছেন। অপরজন প্রথমজনের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথমজন দ্বিতীয়জনের কাছে ছুটে যাচ্ছেন, এবং চিৎকার করে বলছেন—

পাগল : ম্যাচ. ম্যাচ কোথায়? ম্যাচ আর কেরোসিন?

এবং তাঁর (দ্বিতীয় জনের) কাঁধ খামচে ধরেছেন।

দ্বিতীয়জন মুখ ফেরালেন। ইনি মার্কস্, কার্ল মার্কস্।

পাগল : (উচ্চস্বরে মার্কসের দিকে চেঁচিয়ে) সাগরের নীচে পড়ে আছে কয়েক হাজার ডলার। তিন শ' নিগ্রো ঘুমিয়ে আছে সাগরের তলে! আমার সাহসী নিগ্রোরা! নিউ-অরলিন্সের ঘটনা! শুধুমাত্র একটা নষ্ট তরণীর কারণে। কিন্তু কে ঐ জলযানটা তৈরী করেছিল? এ্যান্টওয়ার্পেরই জাহাজ নির্মাণ কারখানাগুলো! আমি ওদের আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছি! এবং তোমাকেও আমি আগুনে পোড়াবো! হাঁা, পোড়াবোই!

রাগের মাথায় সে একটা টুল হাতে তুলে নিল। মার্কস্ প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে তার হাত ধরে ফেললেন। আর্তনাদ করে পাগল টুলটা তুলে নিয়ে নিজের সামনে এনে ধরে রাখলেন। আগামী কোন আক্রমণের বিরুদ্ধে এই প্রতিরোধ সতর্কতা।

—এ : গথিক স্থাপত্যের বাড়ির ছাদের ওপাশ দিয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

অস্তগামী সূর্যের গোধূলি আভা এসে পড়েছে জানালার ধারে দণ্ডায়মান জেনির মুখে। দেখে মনে হচ্ছে যেন জেনির মুখমণ্ডলও ক্যারাভাগিও চিত্রকলার সেইসব অদ্ভুত মুখাবয়বগুলোরই একটি। জেনি নীচের বন্দীশালার উঠোনের দিকে তাকিয়ে আছেন। আঙুলে ধরা জানালার শলাকাদণ্ড।

জে : (চেঁচিয়ে) কার্ল! (ভেতরে মেয়েরা তাঁর দিকে তাকায়।) কার্ল!

মার্কস্ পাহারাদার পরিবেষ্টিত হয়ে বন্দীশালার উঠোন অতিক্রম করছেন। জেনির কান্না-ভেজানো ডাক মার্কস্ শুনতে পেলেন না। বাতাসে উড়তে থাকা কাপড় চোপড় ঠিক করে নিচ্ছেন মার্কস্। ধীরে ধীরে বিরাট কালো পাথরের প্রশস্ত পথ দিয়ে মার্কস্ অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পুলিশ হেড কোয়ার্টারের সেই কক্ষ। মার্কস্ এবং কর্ণেল। কর্ণেল এখন অনেকটা ভদ্র এবং বিনম্র।

মার্কস্ আরাম চেয়ারে বসে। বিপরীত দিকের আরেকটি আরাম চেয়ারে কর্ণেল।

ক : হাঁা—আমি স্বীকার করছি—যে আমার অধঃস্তনেরা আপনার সঙ্গে মূর্খের মতো ব্যবহার করেছে। আপনার এখন বেলজিয়াম ছেড়ে যাবার কথা, অথচ আপনি এখানে বন্দীশালায়। এ অস্বাভাবিক, তাই না!
(কর্ণেল হেসে ওঠেন। অনেকক্ষণ ধরে হাসতে থাকেন।)
আমার টেবিল আপনার বন্ধুদের এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে পাঠানো প্রতিবাদলিপিতে ছেয়ে আছে। ব্যাপারটা সহজেই অনুমান করতে পারেন। সবাই এও জানে যে বেলজিয়ামের রাজা কত হৃদয়বান মানবিক। কিন্তু এরকম ঘটে যাবে, এ অবিশ্বাস্য! যাকগে, আমি আশা করবো যে আপনি আমার পুলিশদের অতি উৎসাহকে ক্ষমা করবেন। আপনি এবং আপনারা উভয়েই এখন মুক্ত।

মা : (দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে) আমার পত্নী? তাঁকে কি গ্রেফতার করা হয়েছিল?

কর্ণেলও উঠে দাঁড়ান।

মা : (প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ) সেও গ্রেফতার হয়েছিল?

ক : মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যে। এও এক মার্জনীয় ভ্রান্তি। কিন্তু এখন আপনি আপনার পুরো পরিবারকে নিয়ে নির্দ্ধারিত সময়ের ভেতর বেলজিয়াম ত্যাগ করতে পারেন।

মা : (ক্রুদ্ধ স্বরে) নির্দ্ধারিত সময়ের ভেতর?

ক : (অভিবাদন করছেন এবং হাসছেন) আপনার হাতে আর মাত্র দেড় ঘণ্টা সময় রয়েছে। হিজ ম্যাজেস্টি আপনার জন্যে এর চাইতে বেশী সময় বরাদ্দ করতে পারলেন না।

মা : (তির্যক হাসি দিয়ে) রাজার কৃপাদৃষ্টিতে আমি প্রীত হলাম।

ব্রাসেলস-এর একটি রেল স্টেশন। ছেড়ে যাওয়ার ব্যস্ততা। মার্কস্ জেনিকে জড়িয়ে রেখে প্ল্যাটফর্মের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছেন।

(আংশিক)

Regd. No. 13949/67 Rs. 1.25 March 1980 Vol. 13 No. 6

ফিল্ম সোসাইটির পত্রপত্রিকা পড়ুন

সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটার
চিত্রবীক্ষণ

খড়দহ সিনে ক্লাবের
প্রেক্ষণ

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির
চিত্রপট

নৈহাটি সিনে ক্লাবের
দৃশ্য

ক্যালকাটা সিনে ইন্সটিটিউটের
চলচ্চিন্তা ও মুভি মন্তাজ

দমদম সিনে ক্লাবের
দৃশ্যশ্রব্য

চন্দননগর সিনে সেণ্টারের
চিত্রণ

ক্যালকাটা ফিল্ম সার্কেলের
চিত্রকথা

রাণাঘাট সিনে ক্লাবের
চলচ্ছবি

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার
চিত্রকল্প ও কিনো

ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজের
ইণ্ডিয়ান ফিল্ম কালচার

নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির
চিত্রভাষ

Published by Alok Chandra Chandra from Cine Central, Calcutta, 2 Chowringhee Road, Calcutta-13. Phone : 23-7911 & Printed by h m at MUDRANEE, 131B, B. B. Ganguli Street, Calcutta-12.

মাসিক চলচ্চিত্র পত্রিকা
সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র

ত্রয়োদশ বর্ষ
সপ্তম সংখ্যা
এপ্রিল, '৭৮০



চিত্রবীক্ষণ

বিষয়সূচী

প্রচ্ছদচিত্র : বাঁদিক থেকে ওপরে : 'ভারলোরেন সামদাগ' ও 'রাঁদেভু এ ব্রে'
বাঁদিক থেকে নীচে : 'বার্থা' ও 'লে ফিলস ড মর এক্ত মর্ত'

প্রচ্ছদশিল্পী : দীপক দে

সম্পাদক : অনিল সেন

চিত্রবীক্ষণে

লেখা পাঠান।

চিত্রবীক্ষণ

চলচ্চিত্র বিষয়ক যে কোন

ভালো লেখা

প্রকাশ করতে চায়।

* চিত্রবীক্ষণ প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১·২৫ টাকা। লেখকের মতামত নিজস্ব, সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে তা নাও মিলতে পারে।

* লেখা, টাকা ও চিঠিপত্রাদি চিত্রবীক্ষণ, ২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩ (ফোন নং ২৩-৭১১১) এই নামে এবং ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের হার প্রতি কলম লাইন—৩·০০ টাকা। সর্বনিম্ন তিন লাইন আট টাকা। বাৎসরিক চুক্তিতে বিশেষ সুবিধাজনক হার। বক্স নম্বরের জন্য অতিরিক্ত ২·০০ টাকা দেয়। বিস্তৃত বিবরণের জন্য অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

গ্রাহক

* চাঁদার হার বার্ষিক পনেরো টাকা (সডাক), রেজিস্টার্ড ডাকে তিরিশ টাকা। বিশেষ সংখ্যার জন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না।

* বৎসরের যে-কোনো সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা সর্বদাই অগ্রিম দেয়।

* চেকে টাকা পাঠালে ব্যাঙ্কের কলকাতা শাখার ওপর চেক পাঠাতে হবে।

* টাকা পাঠাবার সময় সম্পূর্ণ নাম, ঠিকানা, কতদিনের জন্য চাঁদা তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। মনিঅর্ডারে টাকা পাঠালে কুপনে ওই তথ্যগুলি অবশ্যই দেয়।

লেখক :

* লেখক নয় লেখাই আমাদের বিবেচ্য। পাণ্ডুলিপি রেখে কাগজের একদিকে লিখে নিজের নাম ও ঠিকানাসহ পাঠানো প্রয়োজন। প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন এবং পরিবর্জনের অধিকার সম্পাদকের থাকবে। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়।

সমগ্র কলকাতার একমাত্র এজেন্ট

জগদীশ সিং,

নিউজ পেপার এজেন্ট, ২, চৌরঙ্গী রোড,

কলকাতা-১৩

ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরী খুলতে হবে

দীর্ঘদিন হল ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরী বন্ধ হয়ে রয়েছে। গত বছরের ১লা ডিসেম্বর থেকে এই ল্যাবরেটরীর মালিক শ্রীদীপচাঁদ কান্‌কারিয়া একতরফাভাবে বে-আইনী ক্লোজার ঘোষণা করেছেন।

এই ল্যাবরেটরীতে কাজ করেন মাত্র বাইশ জন শ্রমিক-কর্মচারী। দীর্ঘদিন উপেক্ষা-বঞ্চনার পর এখানকার শ্রমিক-কর্মচারীরা ন্যূনতম বেতনের দাবী জানাচ্ছিলেন সম্প্রতি। অন্যান্য স্টুডিও ল্যাবরেটরীর শ্রমিক-কর্মচারীদের মত তাঁরাও আন্দোলন সংগঠিত করার কথা ভাবছিলেন। মালিকপক্ষ এই দাবী পূরণে এগিয়ে না এসে বেছে নিলেন নিপীড়নের পথ। চারজন শ্রমিককে ছাঁটাই করে আন্দোলন স্তব্ধ করে দিতে চাইলেন। স্বভাবতই শ্রমিক-কর্মচারীরা এই ছাঁটাই-এর আদেশ মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। প্রতিবাদে-প্রতিরোধে আন্দোলন সংগঠিত করে তুললেন। মালিকপক্ষ ঘোষণা করলেন ক্লোজার।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭০ সালে স্টুডিও ল্যাবরেটরীর শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য ন্যূনতম বেতন ঘোষণা করেছিলেন। প্রায় দশবছর বাদে এই বেতনহারের জন্য ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীর শ্রমিক-কর্মচারীরা দাবী জানাচ্ছিলেন। এটাই তাঁদের অপরাধ। এই ল্যাবরেটরীর শ্রমিক-কর্মচারীরা ন্যূনতম বেতন যা পান তার পরিমাণ হল মাত্র ১৩৫ টাকা। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড নেই, গ্রাচুইটি নেই—এই অসহনীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিক-কর্মচারীরা প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন এটাই তাঁদের অপরাধ।

শ্রমিক-কর্মচারীদের এই সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য মালিকপক্ষ এই অন্যায় ক্লোজার চাপিয়ে দিয়েছেন যার ফলে এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বাইশজন শ্রমিক-কর্মচারী তাঁদের পরিবার-পরিজন আর্থিক দিক থেকে প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তাঁদের অর্জিত বেতন পাচ্ছেন না—প্রতিহিংসাপরায়ণ মালিকপক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীদের নির্লজ্জভাবে শয়তানের মত ক্ষুধা-অনাহার ও নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে ঠেলে দিচ্ছেন—মালিকপক্ষের আশা এভাবেই কর্মচারীরা নতজানু হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবেন।

মালিকপক্ষের এই ঘৃণ্য ক্লোজার শুধু এই প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক কর্মচারীদের বা তাঁদের পরিবার-পরিজনদেরই অসহনীয় সঙ্কটের মধ্যে ফেলেনি এই ক্লোজার বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পকেও ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বহু নির্মীয়মান বাংলা ছবি এই ল্যাবরেটরীতে আটকে গেছে ফলে অনেক ছবির কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে এবং এভাবে এসমস্ত ছবির প্রযোজক পরিচালক শিল্পী-কলাকুশলীরা আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক কর্মচারী-শিল্পী-কলাকুশলীদের সমস্ত সংগঠন সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষ ইউ-সি-এল-এর মালিকপক্ষের এই অনমনীয় ঔদ্ধত্যের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। প্রতিবাদ জানিয়েছেন অভিনেতা অভিনেত্রীদের বিভিন্ন সংগঠন ও বিভিন্ন ফিল্ম সোসাইটি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর ও শ্রম দফতরও এই শিল্পবিরোধে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেছেন প্রত্যক্ষভাবে। কিন্তু তবু শ্রীদীপচাঁদ কান্‌কারিয়া অনড়, অপরিসীম ঔদ্ধত্য নিয়ে তিনি এই সম্মিলিত প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করে চলেছেন।

কাজেই ইউ-সি-এল-এর শ্রমিক-কর্মচারীদের এই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। কিন্তু বাইশজন শ্রমিক কর্মচারীর পক্ষে মালিকপক্ষের এই অন্যায় আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব নয়। তাই চলচ্চিত্রশিল্পের সমস্ত অংশের প্রতিনিধি-সংগঠনসমূহের এব্যাপারে মিলিত প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে। ইউ-সি এল-এর শ্রমিক কর্মচারীরা একা নন সংগ্রামের সমর্থনে এগিয়ে এসে সেটা প্রমাণ করার প্রাথমিক দায়িত্ব চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষের।

শ্রীদীপচাঁদ কান্‌কারিয়ার মালিকানা ও পরিচালনাধীন উজ্জ্বলা, শ্রী ও উত্তরা এই তিনটি চিত্রগৃহের স্বাভাবিক প্রদর্শনসূচীকে ব্যাহত করার জন্য যৌথ কার্যক্রম নির্ধারণ করার প্রশ্নটিও আজ অত্যন্ত জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। এছাড়া অন্যভাবে শ্রীকান্‌কারিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি করার অন্য কোনো উপায় নেই। এব্যাপারে বেঙ্গল মোশন পিকচার এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন এবং সিনে টেকনিশিয়ান ওয়ার্কাস ইউনিয়নকে যৌথভাবে উদ্যোগ নিতে হবে।

আমাদের দাবী ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরী খুলতে হবে এবং এখনই।

শিলিগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সুনীল চক্রবর্তী
প্রযত্নে, বেবিজ স্টোর
হিলকার্ট রোড
পোঃ শিলিগুড়ি
জেলা : দার্জিলিং-৭৩৪৪০১

আসানসোলে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সঞ্জীব সোম
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জি. টি. রোড ব্রাঞ্চ
পোঃ আসানসোল
জেলা : বর্ধমান-৭১৩৩০১

বর্ধমানে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
শৈবাল রাউত
টিকারহাট
পোঃ লাকুরদি
বর্ধমান

গিরিডিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এ, কে, চক্রবর্তী
নিউজ পেপার এজেন্ট
চন্দ্রপুরা
গিরিডি
বিহার

দুর্গাপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দুর্গাপুর ফিল্ম সোসাইটি
১/এ/২, তানসেন রোড
দুর্গাপুর-৭১৩২০৫

আগরতলায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অরিন্দ্রজিত ভট্টাচার্য
প্রযত্নে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
হেড অফিস বনমালিপুর
পোঃ অঃ আগরতলা ৭৯৯০০১

গৌহাটিতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
বাণী প্রকাশ
পানবাজার, গৌহাটি
ও
কমল শর্মা
২৫, খারঘুলি রোড
উজান বাজার
গৌহাটি-৭৮১০০৪
এবং
পবিত্র কুমার ডেকা
আসাম ট্রিবিউন
গৌহাটি-৭৮১০০৩
ও
ভূপেন বরুয়া
প্রযত্নে, তপন বরুয়া
এল, আই, সি, আই, ডিভিসনাল
অফিস
ডাটা প্রসেসিং
এস, এস, রোড
গৌহাটি-৭৮১০১৩

বাঁকুড়ায় চিত্রবীক্ষণ পাবেন
প্রবোধ চৌধুরী
মাস মিডিয়া সেন্টার
মাচানতলা
পোঃ ও জেলা : বাঁকুড়া

জোড়হাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অ্যাপোলো বুক হাউস,
কে, বি, রোড
জোড়হাট-১

শিলচরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
এম, জি, কিবরিয়া,
পুঁথিপত্র
সদরহাট রোড
শিলচর

ডিব্রুগড়ে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সন্তোষ ব্যানার্জী,
প্রযত্নে, সুনীল ব্যানার্জী
কে, পি, রোড
ডিব্রুগড়

বালুরঘাটে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
অন্নপূর্ণা বুক হাউস
কাছারী রোড
বালুরঘাট-৭৩৩১০১
পশ্চিম দিনাজপুর

জলপাইগুড়িতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
দিলীপ গাঙ্গুলী
প্রযত্নে, লোক সাহিত্য পরিষদ
ডি. বি. সি. রোড,
জলপাইগুড়ি

বোম্বাইতে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
সার্কল বুক স্টল
জয়েন্দ্র মহল
দাদার টি. টি.
ব্রডওয়ে সিনেমার বিপরীত দিকে
বোম্বাই-৪০০০০৪

মেদিনীপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটি
পোঃ ও জেলা : মেদিনীপুর
৭২১১০১

নাগপুরে চিত্রবীক্ষণ পাবেন
ধুর্জটি গাঙ্গুলী
ছোটি ধানটুলি
নাগপুর-৪৪০০১২

এজেন্সি :

* কমপক্ষে দশ কপি নিতে হবে।
* পঁচিশ পার্সেন্ট কমিশন দেওয়া হবে।
* পত্রিকা ভিঃ পিঃতে পাঠানো হবে, সে বাবদ দশ টাকা জমা (এজেন্সি ডিপোজিট) রাখতে হবে।
* উপযুক্ত কারণ ছাড়া ভিঃ পিঃ ফেরত এলে এজেন্সি বাতিল করা হবে এবং এজেন্সি ডিপোজিটও বাতিল হবে।

পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র পিছু হটছে কেন ?

নন্দন মিত্র

এখানে শিল্প বলতে আমি শব্দটিকে Art ও Industry দুই অর্থেই ব্যবহার করতে চেয়েছি। বস্তুত বাংলা চলচ্চিত্রে যেমন শিল্প গুণসমন্বিত ছবি ক্রমশঃ বিরল হয়ে আসছে তেমনি ব্যবসার বাজারেও বাংলা ছবি বোম্বাই মার্কা হিন্দী ছবিগুলির কাছে ক্রমশঃ কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। তা'হলে দেখা যাচ্ছে বাংলা চলচ্চিত্রে Art ও Industry এই উভয় ক্ষেত্রেই সঙ্কট দেখা দিয়েছে এবং একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে এই উভয়সঙ্কট পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

ফিল্ম সোসাইটি মুখপত্রগুলিতে প্রায় উপরোক্ত শিরোনামা দিয়ে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে কিন্তু বেশীরভাগ সমালোচকই এই সঙ্কটের গভীরে যাননি। এঁদের মধ্যে এক অংশের আলোচনায় মোটামুটিভাবে পরিবেশক প্রযোজক প্রদর্শক এই ত্রাহস্পর্শের হাত থেকে চলচ্চিত্র শিল্পের মুক্তির বিষয়ে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের-ফিল্ম ও চলচ্চিত্রের উপর একের পর এক কর চাপানোর বিরুদ্ধে, দর্শন হিসাবে আদায়কৃত অর্থের সিংহভাগই যে প্রমোদকর হিসাবে রাজকোষে ও হল ভাড়া হিসাবে প্রদর্শকদের পকেটে চলে যায় এবং এই শিল্পে যে পুনর্নিয়োজিত হয় না সেই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখা হয়েছিল। তাঁরা প্রমোদকরের এক অংশ বাংলা ছবিকে ফিরিয়ে দেওয়া, সেন্সর তারিখ অনুযায়ী ছবির মুক্তি, ন্যূনপক্ষে একটা নির্দিষ্ট সময় হলগুলিতে বাংলা ছবির প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা প্রভৃতি দাবী জানিয়েছিলেন মাত্র, আলোচনাগুলিতে অর্থনৈতিক সঙ্কটের দিকটা গভীরভাবে আলোচিত হয়নি।

যদিও একথা ঠিক, যে ঐসব আলোচকরা সঙ্কটের যেসব দিক তুলে ধরেছিলেন তা যথার্থই ছিল তবুও বলতে হয় যে তাঁরা সমস্যার গভীরে যাওয়ার বদলে সমস্যাকে ওপর থেকে দেখেছিলেন কারণ তাঁরা শুধুমাত্র Industryর দিকটা নিয়েই ভাবিত ছিলেন ফলে সরকারি ভরতুকি ও রক্ষা কবচকেই সঙ্কট সুরাহার প্রধান পথ বলে মনে করেছিলেন। তাঁরা বিস্মৃত হয়েছিলেন যে Industry থেকে বেরিয়ে এলেও চলচ্চিত্র একটি Consumer Products (ভোগ্যপণ্য) নয়—ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তা হল একটি শিল্প মাধ্যমজাত পণ্য অতএব বাজারে ঘাটতি থাকলে যেমন নিম্নমানের ভোগ্যপণ্যও বিকিয়ে যায় চলচ্চিত্রের বেলায় তা সম্ভব নয় বরং বলা যায় কোনও চলচ্চিত্রের দর্শক আকর্ষণের ক্ষমতা না থাকলে কোনও প্রকার সাহায্য বা রক্ষাকবচই তাকে রক্ষা করতে পারে না। সত্যি কথা বলতে কি গত কয়েক বছরে বাংলা ছবির বিষয়বস্তু ও পরিচালনার দৈন্য সেই পর্য্যায়ে এসে ঠেকেছে। অতএব দেখা যাচ্ছে বিষয়বস্তু ও পরিচালনার মান উন্নত করাই মৌলিক প্রয়োজন। অবশ্য এ কথাও অনস্বীকার্য যখন বাংলা ছবি তার মৌলিক সঙ্কট দূর করে আবার আগের মত দর্শক আকর্ষণে সক্ষম হবে তখন ঐ পূর্বোল্লিখিত সরকারি ভরতুকি ও রক্ষাকবচ হিন্দী ছবির সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতা এবং হল মালিকদের শায়েস্তা রাখার ক্ষেত্রে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের পক্ষে প্রয়োজন হবে।

ফিল্ম সোসাইটি মুখপত্রগুলিতে আর এক অংশ 'চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্কট' প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রের শৈল্পিক মানের ক্রমাবনতির কথা লিখছিলেন, তাঁরা এই সঙ্কটকে শুধুমাত্র Art এর সঙ্কট হিসাবেই দেখছিলেন—একে Industryর সঙ্কটের কারণ হিসাবে দেখেন নি। তাঁরা বিস্মৃত হয়েছিলেন যে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অন্যান্য শিল্পের মত চলচ্চিত্রও একটি পণ্য সামগ্রীতো বটেই উপরন্তু অন্যান্য শিল্প মাধ্যমের চেয়েও এই ব্যয়বহুল শিল্পমাধ্যমের পক্ষে এটি আরও বেশী করে সত্যি। অর্থাৎ বাংলার Film Industry রক্ষা না পেলে Art film ও পাওয়া যাবে না। আবার শুধু Art film করেও Industry টিকবে না কারণ আমাদের দেশে Art film দেখার দর্শক যে নগণ্য এটি একটি তিক্ত সত্য। যে দেশের শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ নিরক্ষর, যেখানে আঙ্গিক সমৃদ্ধ চলচ্চিত্রের স্বাদ গ্রহণ করবার দর্শকের সংখ্যা খুব সীমিত হওয়াই স্বাভাবিক। অথচ ঐসব মননশীল সমালোচকরা দর্শকদের গাল পেড়ে এবং Art film না দেখার দায়িত্ব তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেদের দায়িত্ব সমাপন করছেন। এইসব সমালোচকরা নিজেদের পাণ্ডিত্য জাহির করার দিকেই বেশী মনোযোগী। এঁদের চিন্তাভাবনা গুটিকয়েক পরিচালকদের ঘরে ঘোরাফেরা করে। দেশের বৃহত্তর সংখ্যক মানুষের শিল্পচেতনার এবং সামগ্রিকভাবে বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পের মানোন্নয়নের ব্যাপারে এঁদের নীরবতার কারণ সাধারণ মানুষ থেকে এঁদের বিচ্ছিন্নতা।

এই আলোচনা থেকে এখানে Art film এর অথবা ভাল পরিচালকদের ছবির বিস্তৃত আলোচনা ও সমালোচনার বিরুদ্ধে কোনও কটাক্ষ করা হচ্ছে না বরং বলা যায় চলচ্চিত্র-শিল্পের মানোন্নয়নে আর্ট ফিল্মের ভূমিকা গাড়ীর স্টিয়ারিং এর মত অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এখানে শুধুমাত্র গুটিকয়েক পরিচালক বাদে অন্যসব পরিচালককে একই ভাবে নস্যাৎ করার যে ধারণা গড়ে তোলা হয়েছে তারই বিরুদ্ধে কটাক্ষ করা হচ্ছে। তাছাড়া সাধারণ দর্শক চলচ্চিত্রের কোন ইতিবাচক দিকটা কতটুকু গ্রহণ করছিলেন,

সেই নিয়ে কোনও গবেষণামূলক আলোচনা প্রকাশের প্রয়োজন ফিল্ম সোসাইটি মুখপত্রগুলি অনুভব করেনি।

তবে সাম্প্রতিককালে কলকাতা '৭৮ চলচ্চিত্রোৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকায় সুধী প্রধান লিখিত 'বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্কট' প্রবন্ধে সঙ্কটের অর্থনৈতিক দিকটি গভীরভাবে আলোচিত। সরাসরি সম্পর্কযুক্ত না করলেও তিনি এক জায়গায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তীকালের সাংস্কৃতিক সঙ্কটের উল্লেখ করেছেন। ঐ পুস্তিকাতেই পরিচালক তরুণ মজুমদার ব্যবসাগত ও শিল্পগত এই উভয়সঙ্কটকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। তবে আলোচনাটি অতি সংক্ষিপ্ত (এক পাতাও নয়) তাই এটি বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। আমি পরবর্তী আলোচনাতে উপরোক্ত দুটি আলোচনা থেকেই উদ্ধৃতি ব্যবহার করব।

সেন কমিশন রিপোর্ট

১৯৬৩ তে প্রদত্ত বহু উল্লেখিত সেন কমিশনের রিপোর্টে শিল্পের অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃত চেহারা পাওয়া গেলেও শিল্পগত সঙ্কটের সঙ্গে তাকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়নি। রিপোর্টের এক জায়গায় বলা হয়েছে যেসব ছবির স্বাভাবিক পথে মুক্তি ঘটবে না সেগুলিকে 'অবশিষ্ট' ছবি হিসাবে গণ্য করতে হবে এবং সেইসব ছবির মুক্তির ব্যাপারটি প্রদর্শকের মর্জির উপর ছেড়ে দিতে হবে। অর্থাৎ নবাগতদের দ্বারা পরিচালিত বা অভিনীত আঙ্গিক সমৃদ্ধ ছবিগুলি মুক্তির ব্যাপারে বর্তমান অবস্থাটাকেই কার্যত সমর্থন করা হয়েছে। ঐ কমিশন যে চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা গঠনের প্রস্তাব দেয় তাতেও ঐ সংস্থায় শুধুমাত্র চলচ্চিত্র প্রযোজনা ও পরিবেশনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাই বলা হয়েছে—ছবিগুলির মান রক্ষা বা উন্নত করার ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি।

পরবর্তী আলোচনায় এটাই পরিষ্কার করার চেষ্টা করব যে বাংলা চলচ্চিত্রে শৈল্পিক মান উন্নত করতে না পারলে, চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্কট মোচন হবে না। যদিও আমার আলোচনাটি শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র-শিল্পের সঙ্কটের বিশ্লেষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তবু এই সঙ্কটের গোড়াটা জানারও প্রয়োজন আছে! এই সঙ্কটের শুরু অবিভক্ত বাংলাতেই এবং সুধী প্রধানের আলোচনা থেকে যার একটা চিত্র পাওয়া যায়।

বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের সংকট

সুধী প্রধানের আলোচনা থেকে জানা যায় যে '৩৫ সালে ৭৭ টি (যার মধ্যে বাংলায় ১৯টি) '৩৬ সালে ৭১টি (বাং—১৯) বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের সবচেয়ে ভাল সময়। '৪১ সাল থেকেই বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্কট শুরু হয়। ঐ সময় থেকেই অন্যান্য ভাষায় ছবির সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে এবং '৪৫এ গিয়ে যা ১৬তে দাঁড়ায়। এর কারণ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে বাইরে থেকে যেসব প্রযোজক কলকাতায় এসে ছবি করতেন তাঁদের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল এবং ঐ সময়ে বোম্বাই ও মাদ্রাজে স্টুডিওর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। অবশ্য যুদ্ধকালে কাঁচা ফিল্মের কোটা প্রথা চালু হওয়াও ছবির সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার একটি কারণ।

৪৭এ ৪১টি (বাং—৩২), '৪৮এ ৪৭টি (বাং—৩৭) ও '৪৯এ ৭৮টি (বাং—৬০) কলকাতায় (বিশেষতঃ বাংলা ছবি) নির্মাণের সংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়াকে তিনি সংকট মোচনের লক্ষণ হিসাবে দেখেন নি (এখানে উল্লেখ্য যে বাজারি পত্রিকাগুলি '৪৯এর পরিসংখ্যানটি হাজির করে তাকে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের সুসময় বলে বর্ণনা করে থাকেন)। তাঁর মতে ছবি নির্মাণের সংখ্যা অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেলেও তা ছিল বিক্রয়ের বাজারের সঙ্গে সম্পর্কহীন, কারণ সেই সময় দেশবিভাগ ঘটে গিয়ে পূর্ব-বাংলার বাজার নষ্ট হয়ে গেছে। যুদ্ধজনিত কালো টাকা চলচ্চিত্র শিল্পে নিয়োজিত হওয়াতেই ছবির সংখ্যা হঠাৎ বৃদ্ধি পায়। "অপরপক্ষে ১৯৪৯ সালে যখন বাংলা ছবির উৎপাদন সর্বাধিক তখন তার সংকট চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছে। তখন থেকেই স্টুডিওগুলি বন্ধ হতে সুরু করেছে। কলা-কুশলী-শ্রমিক কর্মচারীদের বেকারী বৃদ্ধি পেয়েছে—নামকরা পরিচালকরা ১৯৫০ সালেই বোম্বাই মাদ্রাজ যাত্রা সুরু করেছে।"

তবে এই সঙ্কটকে শুধুমাত্র বাজার জনিত অর্থনৈতিক সঙ্কট হিসাবেই তিনি দেখেননি একে যুদ্ধকালীন সাংস্কৃতিক সঙ্কটের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত করেছেন, "কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রধান প্রধান সহরগুলির কাছে সৈন্য সমাবেশ করায় তাদের মনোরঞ্জনের জন্য যে ধরণের ছবি বোম্বাই থেকে তোলা হয়েছিল তা বাংলা স্টুডিওর মালিক যাঁরা 'দেবদাস', 'মুক্তি', 'উদয়ের পথে', 'ভাবীকাল', 'ডাক্তার' প্রভৃতি করেছেন তাঁদের পক্ষে তৈরী করা সহজ ছিল না। লক্ষ্য করার বিষয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সংকটও দেখা দিয়েছিল। উদয়শঙ্করের আলমোড়া কেন্দ্র রক্ষা করা যায়নি। হরেন ঘোষের মত ভারত বিখ্যাত ইমপ্রেসারিও এবং সতু সেনের মত নাট্য পরিচালক তাঁদের নিজস্ব কর্মক্ষেত্র ছেড়ে সৈন্যদের মনোরঞ্জনের জন্য নাচ-গানের দল নিয়ে বিভিন্ন সীমান্তে গিয়েছিলেন রোজগারের আশায়। সুস্থ সংস্কৃতির এই সংকট সূচনাকালের কথা মনে না রাখলে আমরা পরবর্তী অবস্থা বুঝতে পারবো না।"

তা'হলে দেখা যাচ্ছে যে যুদ্ধকালীন সময় থেকে যে নয়া সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ বোম্বাইতে নির্মিত হিন্দী ছবিতে ঘটেছিল তা দর্শকের রুচিকে পাল্টে দিল এবং কলকাতায় নির্মিত ডাবল ভার্সান ছবিগুলির সর্বভারতীয় বাজার-ও সঙ্কুচিত হতে থাকল। ক্রমে সেই বাজার দখল করে নিল বোম্বাইয়ে নির্মিত 'লারেলাপ্পা' মার্কা ছবিগুলি।

মূল আলোচনা

কিন্তু পঞ্চাশ দশকে পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র-শিল্প এই সঙ্কট অনেকটা কাটিয়ে ওঠে কারণ এই সময় পূর্ব বাংলার বিরাট সংখ্যক মধ্যবিত্ত মানুষ এপার বাংলায় চলে আসেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই হয়তো সিনেমা দর্শক ছিলেন না; কিন্তু এখানে শহরাঞ্চলে বাস করবার সময় এঁদের অনেকেই সিনেমা দেখার অভ্যাস গড়ে তোলেন। এইভাবে বাংলা চলচ্চিত্র তার হারানো বাজারের দর্শকদের কিয়দংশকে ফিরে পায়। অন্যদিকে আবার স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবাংলায় মাঝারি ও ভারী শিল্প গড়ে ওঠায় এক বিরাট সংখ্যক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এরাও দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এই নতুন দর্শকদের বাংলা চলচ্চিত্রের প্রতি আকৃষ্ট করে রাখতে যে শিল্পগত ও রুচিগত পরিবর্তন ঘটানোর প্রয়োজন ছিল বাংলার চলচ্চিত্র-নির্মাতারা সেই পরিবর্তন আনেন। এবং তা বাইরের অনুকরণে নয়। এই পরিবর্তন যে একই ধারায় হল তা নয় বরং এই পরিবর্তনকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে।

পশ্চিমবাংলার শিল্পাঞ্চল ও সহরগুলিতে ধনতন্ত্র বিকাশের ফলে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হচ্ছিল তাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে এক শ্রেণীর উন্নত-মনা পরিচালক ও শিল্পীর 'উদয়ের পথে', 'ছিন্নমূল' ও 'নাগরিক'-এর মধ্য দিয়ে সমাজ সচেতন বক্তব্য প্রতিষ্ঠার যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছিল তারই সফল পরিণতি ঘটল সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালি'-তে। যদিও পূর্বোক্ত ছবিগুলির মত এই ছবিটির অত তীব্র সমাজ বিশ্লেষণকারী দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না, তবুও 'পথের পাঁচালি' মাধ্যমে দর্শক ভেঙ্গে পড়া সামন্ত অর্থনীতির এক রূপ প্রত্যক্ষ করল। পরিচালক তাঁর মানবিকতাবাদের উদার দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সহরের শিক্ষিত মানুষকে গ্রামের মানুষের কঠিন দারিদ্রের গল্প বললেন চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষার প্রয়োগে। শুধু তাই নয়, জ্ঞান ও উন্নত দক্ষতার ফলে ঐসব পুরানো যন্ত্রপাতির দ্বারাই অনেক উন্নততর কারিগরি কাজকর্ম বাংলা চলচ্চিত্রে দেখা গেল। ক্যামেরাকে স্টুডিও-র বাইরে নিয়ে গিয়ে খরচ কমানো হল। সৃষ্টি হল নতুন অভিনয়ের ধারা যা নাটকীয় প্রভাব থেকে মুক্ত। এইসব পরিবর্তন এনে 'পথের পাঁচালি' বাংলা চলচ্চিত্রকে তার গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত করল।

'পথের পাঁচালি'-র আন্তর্জাতিক খ্যাতি বাংলা চলচ্চিত্রে আঙ্গিকের জোয়ার এনে দিল। সত্যজিৎ রায় এরপর তৈরী করলেন 'অপরাজিত' যাতে বিধৃত হল গ্রাম থেকে শহরে আসার কাহিনী—যা ধনতন্ত্র বিকাশের সময় সব দেশেই ঘটে থাকে। তার পরের ছবিগুলি 'পরশ পাথর', 'অপুর সংসার', 'দেবী', 'জলসাঘর' প্রভৃতি তাঁকে শুধু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিতই করল না ইউরোপে বিভিন্ন দেশে ও আমেরিকায় তাঁর ছবির সীমিত হলেও একটা বাজার সৃষ্টি করল।

সত্যজিৎ রায়ের পাশাপাশি দেখা গেল ঋত্বিক ঘটকের মত শক্তিশালী একজন পরিচালককে। তাঁর 'অযান্ত্রিক' ও 'বাড়ী থেকে পালিয়ে' বিদেশী সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। মৃণাল সেন তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখলেন 'বাইশে শ্রাবণ' এবং 'নীল আকাশের নীচে' ছবিতে। উপরোক্ত তিন পরিচালকের আঙ্গিকসমৃদ্ধ ছবিগুলি দেশের মননশীল সমাজে প্রচণ্ড বিতর্ক শুরু করল এবং এক নতুন চলচ্চিত্র-সংস্কৃতির সম্ভাবনাকে সুদৃঢ় করল। বাংলা চলচ্চিত্র শুধু দেশেই মর্যাদার আসন গ্রহণ করল না, বিদেশেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বিখ্যাত সমালোচক জর্জ স্যাদুল লিখলেন, "And neo-realism may be dying in Rome or Tokyo but it's flourishing in Calcutta". . . . .

ঐ তিনজনের সমকক্ষ না হলেও ঐ সময় রাজেন তরফদার, বারীন সাহা, হরিসাধন দাশগুপ্ত, অরূপ গুহঠাকুরতা প্রভৃতিদের মত আরও কিছু প্রথম শ্রেণীর পরিচালক পাওয়া গিয়েছিল যাঁরা চলচ্চিত্র-ভাষার ব্যবহার জানতেন এবং ঐ শিল্পটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন।

কিন্তু তখনও একমাত্র সত্যজিৎ রায়ের ছবি ব্যতীত ('অভিযান'-এর সময় কাল থেকে) অন্য কোনও পরিচালকের ছবি উল্লেখযোগ্য বাজার সৃষ্টি করতে পারছিল না। আগেই বলেছি যে দেশের শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ নিরক্ষর যে দেশে এইসব ছবির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আঙ্গিকের কদর বোঝার মানুষের অভাব থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই সব ছবিগুলি বাংলা চলচ্চিত্রের উন্নত মান বজায় রাখতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছিল। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুরস্কার লাভের সুবাদে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজেও এইসব ছবি দেখার ও আলোচনা করার প্রচণ্ড স্পৃহার সৃষ্টি হচ্ছিল।

পূর্বোক্ত এইসব পরিচালকদের সমক্ষমতাসম্পন্ন না হলেও এঁদেরই প্রভাবে তপন সিংহ, তরুণ মজুমদার, অসিত সেন, অজয় কর প্রমুখ কিছু পরিচালক পাওয়া গিয়েছিল যাঁদের আমি আলোচনার সুবিধার্থে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করব। এদের ছবিগুলি পূর্বে সমাদৃত নিউ থিয়েটার্স-এর ছবিগুলির থেকে শুধু কারিগরি দিক থেকেই নয়, শিল্পগতভাবেও উন্নততর মানের ছিল। বিষয়বস্তু নির্বাচনেও এসব ছবিতে অনেক আধুনিকতা পরিলক্ষিত হয়েছিল। এই সবের ফলে এঁদের সাহিত্য-নির্ভর পরিচ্ছন্ন ছবিগুলি সাধারণ রুচিবোধসম্পন্ন ও শিক্ষিত দর্শকদের মধ্যে একটা বাজার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। এঁদের সাহিত্যের মত করে (Verbally) গল্প বলার ভঙ্গী সাধারণ দর্শকদের কাছে প্রথম শ্রেণীর পরিচালকদের অপেক্ষা অনেক সহজবোধ্য ছিল। অর্থাৎ যাঁরা চলচ্চিত্র বা শিল্পের চুলচেরা বিচার না করেও ভাল ছবি দেখতে চান তাঁদের জন্যই এই পরিচালকরা ছবি করতেন। আবার যাঁরা ছবির চুলচেরা বিচার করেন তাঁদেরও বৃহদংশ এই ধরনের ছবিরও দর্শক ছিলেন কারণ এইসব দ্বিতীয় শ্রেণীরূপে উল্লিখিত পরিচালকদের ছবিও মাঝে মধ্যে দেশে বিদেশে প্রশংসিত হচ্ছিল।

প্রথম শ্রেণীর পরিচালকরা তাঁদের উন্নততর ছবির মাধ্যমে যেমন মননশীল দর্শকসমাজ সৃষ্টি করছিলেন তেমনি রুচিবোধসম্পন্ন দর্শক সৃষ্টিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিচালকদের ভূমিকা ছিল একই রকম। আবার এইসব রুচিবোধসম্পন্ন দর্শকের মধ্য থেকেই যে ক্রমে মননশীল দর্শক সমাজ সৃষ্টি হচ্ছিল তা বলাই বাহুল্য। এইভাবে বাংলা চলচ্চিত্রের ও তার দর্শকের উন্নতমুখী মান সৃষ্টিতে প্রথম শ্রেণীর পরিচালকদের সঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিচালকরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিলেন।

ব্যবসায়িক ছবি

উপরোক্ত ছবিগুলি ছিল বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পের একদিক কিন্তু যেসব ছবি বাজার দখল করেছিল সেগুলি ছিল অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের যাঁদের আমি তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করব। এই তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত পরিচালকরাও নিউ থিয়েটার্স'ও ম্যাডান থিয়েটারের রীতিতে পরিবর্তন এনেছিলেন। কিন্তু এইসব পরিবর্তনগুলি ছিল বাহ্যিক যা ছবিতে চটক এনেছিল। কিন্তু তখন যে মধ্যবিত্তশ্রেণী সৃষ্টি হচ্ছিল তাঁরা এতেই আকৃষ্ট হয়ে পড়েন কারণ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ছিলেন অধিকতর আকর্ষণীয়, গায়ক-গায়িকাদের কণ্ঠ ছিল আরও মিষ্টি, প্লে ব্যাকের ব্যবহার যেটাকে সাহায্য করেছিল। কিন্তু বিষয়বস্তু হয়ে পড়ল অনেক দুর্বল, গণিতের ছক অনুযায়ী। এইসব ছবিতে 'সাগরিকা' মার্কা উদাস করা ত্রিকোণ প্রেমের গল্প থাকত; নায়ক ও নায়িকার ভুল বোঝাবুঝির বা স্মৃতিভ্রমের মাধ্যমে গল্পে জট সৃষ্টি করা হত এবং পরিশেষে দ্রুতগতিতে নাটকের জট খুলে মিলনান্তক পরিণতি দেখান হত। আর এই ভাবে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট দ্রুতগতিতে দর্শক আকৃষ্ট হত এবং হাসি, কান্না, প্রতিশোধস্পৃহা প্রভৃতি ভাবাবেগের মধ্য দিয়ে যার প্রকাশ ঘটত। তাছাড়া মধ্যবিত্ত দর্শককুল তাঁদের না পাওয়া-জনিত আশা-আকাঙ্খাকে এইসব সিনেমার মাধ্যমে চরিতার্থ করত (পলায়নী মনোবৃত্তি থেকে) কারণ দর্শকরা অনেক সময়েই চরিত্রগুলির মনে নিজেদের একাত্ম করে ফেলতো। এছাড়াও বেশ কিছু রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা ছবি, বিভীষিকার ছবি এবং হাসির ছবি এখানে তোলা হত। এইসব ছবিতে যেসব তথাকথিত বক্স-অফিস উপকরণের সমাবেশ ঘটত তা এখানকার দর্শকের কথা স্মরণে রেখেই করা হত—বর্তমানের মত বোম্বাই ফর্মুলার অনুকরণে করা হত না তবে বেশিরভাগ ছবিই জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত। পরিচালকরা তাঁদের নিজেদের পরিচালনা ও বিষয়বস্তুর দুর্বলতা ঢাকবার জন্যই হোক অথবা ওঁদের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগাবার জন্যই হোক ঐসব নায়ক-নায়িকার চার-পাশেই ক্যামেরাকে যথাসম্ভব ঘোরাফেরা করাতেন। তবে ঐসব অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও নিজেদের ঢংএই অভিনয় করতেন যেটা ছিল তাঁদের ব্যক্তিগত সৃষ্টি অথবা রঙ্গমঞ্চের প্রভাবপূর্ণ।

সেইসময় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিচালকরা যেসব নবাগতদের সুযোগ দিচ্ছিলেন তাঁদেরও অনেকে ব্যবসায়িক ছবিগুলিতে অভিনয় করার সুযোগ পাচ্ছিলেন। আবার সে সময় ছবি বিশ্বাস ও পাহাড়ি সান্যালের মত বেশ কিছু চরিত্রাভিনেতাও ছিলেন যাঁদের অভিনয় সব ধরণের দর্শকই পছন্দ করতেন। এইসব অভিনেতাদেরও একটা বাজার ছিল।

ভালো গানের প্রতি ভারতীয় সিনেমা দর্শকদের বরাবরই একটা দুর্বলতা আছে, এইসব পরিচালকরা সেটাও কাজে লাগিয়েছিলেন। সেই সময় বেশ কিছু সঙ্গীত পরিচালক পাওয়া গিয়েছিল যাঁরা বাংলার লোকসঙ্গীত ও রাগ রাগিনীর ওপর নির্ভর করে তাদের সুর রচনা করতেন, গীতিকারদের গীত রচনায় প্রেমের উচ্ছ্বাস থাকলেও তাতে সংযম ছিল। আর এইসব গানগুলি জনপ্রিয় হয়ে উঠত।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই ব্যবসায়িক ছবিগুলি বাংলা ছবির বাজারে চল্লিশ দশকে যে ধর্মীয় ও পৌরাণিক ছবির স্রোত বইছিল তা রদ করতে পেরেছিল তার নিজস্ব বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে চল্লিশ দশকের শেষে স্থানীয় চলচ্চিত্র-শিল্পে যে ভয়াবহ সঙ্কট এসেছিল, উপরোক্ত তিন শ্রেণীর পরিচালকরাই পঞ্চাশ দশকেই তার মোকাবিলা করেছিলেন নিজের নিজের পদ্ধতিতে ফলে হিন্দী ছবির আগ্রাসন ব্যাহত হয়েছিল।

বাংলা ছবির চলচ্চিত্র-শিল্পে উপরোক্ত তিনটি ধারায় বিকাশের প্রথম দিকে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত ছবিগুলি অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন অভিনীত ছবিগুলির জনপ্রিয়তা যার প্রমাণ বহন করছে।

সময়ের নিরিখে দেখা গেল যে (পাঁচ দশকের গোড়া থেকেই), তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত পরিচালকদের ছবির জনপ্রিয়তা ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকল। এর কারণ হল দর্শকের রুচি পরিবর্তনশীল। দর্শক যেমন শুধুমাত্র ভালো গানের জন্য একটা ছবি কয়েকবার দেখত অথবা বিষয়বস্তুর দুর্বলতার দিকে না তাকিয়ে শুধুমাত্র অভিনয় দেখার জন্যই একটা ছবি বার বার দেখত—সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে আরম্ভ করল। দর্শক ভালো গল্প ও উন্নততর পরিচালনাও আশা করবে সাফল্যের। দর্শকদের রুচি যেমন পরিবর্তনশীল তেমনি সেই দর্শকদের মানের কথা জেনে পরিবর্তিত রুচি সৃষ্টির দায়িত্বও যে শিল্পীদের, এই সহজ সত্যটি ঐসব পরিচালকরা উপলব্ধি করলেন না। ফলে তাঁদের ছবি কিছুদিনের মধ্যেই দর্শকদের কাছে একঘেঁয়ে হয়ে পড়ল। অথচ এঁদের সামনে অজস্র সুযোগ ছিল। হাসির ছবির কথাই ধরা যাক—আমাদের দেশের পরিচালকরা হাস্যরস সৃষ্টির নামে মেসবাড়ীর একটি দৃশ্যে কয়েকজন কৌতুকাভিনেতাকে জড়ো করে হাসি ঠাট্টা করানো অথবা অন্য কোনও দৃশ্যে দু-একজন কৌতুকাভিনেতাকে ঢুকিয়ে দিয়ে ভাঁড়ামো করানোই বোঝেন। সেই 'সাড়ে চুয়াত্তর' মার্কা ছবির সাফল্য থেকে এঁদের মাথায় এই যে ধারণাটা ঢুকেছিল তা আর কোনও দিনই বার করা যায়নি—এখনও সুযোগ পেলে এঁরা একই জিনিষ চালিয়ে যান।

এঁদের আর একটি দোষ হচ্ছে, এঁরা সবসময় একই কৌতুকাভিনেতাকে একই ধরণের অভিনয় করাতে চান। সেই মান্ধাতার আমল থেকে দেখে আসছি যে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে বহুবার পূর্ববঙ্গীয় টানে কথা বলানো হয়েছে। অথচ এসব জিনিসের ক্রমাগত ব্যবহার দর্শকদের মধ্যে একঘেঁয়েমি আনতে বাধ্য। শুধুমাত্র কৌতুকাভিনেতাদের প্রধান ভূমিকায় রেখেও যে 'ভানু পেলো লটারি' অথবা 'পার্সোনাল এ্যাসিস্ট্যান্ট' অস্বাভাবিক সাফল্য অর্জন করেছিল তার কারণ বাংলায় হাসির ছবির ভালো বাজার ছিল। অথচ এইসব উদাহরণগুলি এঁদের টনক নড়াতে পারেনি। তখন বাংলায় রবি ঘোষের মত শক্তিশালী এবং ভানু-জহর-এর মত জনপ্রিয় কৌতুকাভিনেতা ছিল। তাঁরা ভানু-জহর জুটিকে দিয়ে বেশ কিছু নির্মল হাসির ছবি করতে পারতেন। এটা করতে তাঁরা এখানকার দর্শকের কথা মনে রেখেও লরেল-হার্ডির ছবির মত স্ল্যাপস্টিক অভিনয় ও দ্রুত ক্যামেরা সঞ্চালনের পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারতেন। আসলে এইসব করতে যে বুদ্ধি খরচের প্রয়োজন আছে তারই অভাব এঁদের ঘটেছিল। সেই সময় দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত পরিচালকরা কিন্তু তাঁদের মান অনুযায়ী 'একটুকু বাসা' ও 'বাক্স বদল'-এর মত নির্মল হাসির ছবি অথবা রবি ঘোষকে নাম ভূমিকায় রেখে 'গল্প হলেও সত্যি'-র মত ব্যঙ্গাত্মক ছবি নির্মাণ করেছিলেন।

তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত এইসব পরিচালকেরা যে ধরণের ছবি করছিলেন তার মধ্যে অভিনবত্ব আনতে ব্যর্থ হয়ে তাঁরা নতুন বিষয়বস্তুও বেছে নিতে পারতেন যেমন স্বাধীনতা সংগ্রামের নানা উপাখ্যান অথবা দেশ বিভাগ জনিত গল্প। পঞ্চাশ দশকে হেমেন ঘোষের 'ভুলি নাই' ও 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন', 'বিয়াল্লিশ' অথবা সলিল সেনের 'নতুন ইহুদি'-র মত ছবির উদাহরণ তাঁদের সামনে ছিল। কিন্তু সে সব পথে না গিয়ে ধনতন্ত্রের অমোঘ নিয়মে শিল্প-সংস্কৃতিতে যে অবক্ষয় শুরু হয়েছিল, তাঁরা তাঁদের ছবিকেও সেই পথে নিয়ে গেলেন। তাঁদের ছবিতে নায়ক-নায়িকার বেলেল্লাপনা ও হোটেল নাচের দৃশ্য এবং চড়া সুরের মেলোড্রামা ঢোকাতে আরম্ভ করলেন যা পঞ্চাশ দশকের হিন্দী ছবিগুলিতে লক্ষ্য করা যেত। তবু এটাকে আমি হিন্দী ছবির অনুকরণ বলব না কারণ ঐরকম কয়েকটি দৃশ্য ঢোকানো ছাড়া এক্ষেত্রে মোটামুটি বাংলা ছবির নিজস্ব চরিত্র বহাল থাকত সেন্টিমেন্টের আধিক্যে। তবে এইসব দৃশ্য ঢোকানোয় পঞ্চাশ দশকে হিন্দী ছবির সাফল্য যে তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছিল, তা বলাই বাহুল্য।

অবশ্য সব দোষ পরিচালকদের দিলে ভুল হবে কারণ প্রথমত অদূরদর্শী প্রদর্শক-পরিবেশক-প্রযোজক গোষ্ঠীও এইসব দৃশ্য ঢোকানোয় ইন্ধন জোগাতেন এবং দ্বিতীয়ত যে সামাজিক অবক্ষয় শুরু হয়েছিল তাও এই প্রক্রিয়াটিকে সাহায্য করল। দর্শকদের একাংশ বিশেষতঃ ছাত্র ও যুব শ্রেণী এই ধরণের ছবিগুলির প্রতি তাৎক্ষণিক আকর্ষণ অনুভব করল। এইভাবে যে নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী অপসংস্কৃতি আগেই হিন্দী ছবিতে অনুপ্রবেশ করেছিল বাংলা ছবিতেও তা ঢুকে পড়ল।

এখানে একটা কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন যে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত 'সাগরিকা' মার্কা মোটা দাগের প্রেমের ছবিগুলি যা পঞ্চাশ দশকে সফলতা এনেছিল তা কিন্তু তখন থেকেই বাংলা ছবির দর্শকদের একাংশদের মধ্যে স্থূল রুচি গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। পরবর্তীকালে ঐসব পরিচালকরাই যখন বাংলার সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার পথ বর্জন করে ছবিতে অপসংস্কৃতি আমদানী করতে লাগলেন তখন দর্শকদের সেই রুচি স্থূলতর-রুচিতে পরিণত হল। আর এইভাবে সৃষ্ট স্থূলতর রুচিই দর্শকদের একাংশকে বিকৃত রুচির হিন্দী ছবির দিকে ঠেলে দিল। বিকৃত রুচি বলছি এই কারণে যে ষাট দশকের বোম্বাই থেকে নির্মিত হিন্দী ছবি লারে লাপ্পা মার্কা '৪২০' বা 'আওয়ারা'-র যুগ কাটিয়ে যৌনতা-হিংস্রতা মিশ্রিত 'জংলি'-'জানোয়ার'-এর রাজত্বে প্রবেশ করেছিল। এর ফলে এইসব ছবিগুলি স্থূলতর বাংলা ছবির চেয়ে ছিল অনেক প্রলোভনপূর্ণ তাই স্থূলতর রুচির বাংলা ছবির দর্শক পাশাপাশি হিন্দী ছবি দেখার অভ্যাসও গড়ে তুলল।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিচালকদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি

দর্শকদের অধিকাংশের মধ্যে কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। তাঁরা এইসব শ্রেণীভুক্ত পরিচালকদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ক্রমশঃ দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত পরিচালকদের ছবির প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকল। তপন সিংহ-র ছবির উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তাবৃদ্ধি সেইটাই প্রমাণ করে, 'অঙ্কুশ', 'কালা মাটি'র পথ বেয়ে তিনি করলেন 'কাবুলিওয়ালা', 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', 'ক্ষণিকের অতিথি', 'নির্জন সৈকতে' ইত্যাদি। এঁদের উন্নতমুখী ছবির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ প্রথম শ্রেণীর পরিচালকদের কদরও সাধারণ দর্শকদের কাছে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে (শহরগুলিতে শিক্ষার প্রসারও এইভাবে সাহায্য করেছিল)। সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর' 'চারুলতা' ও ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা', রাজেন তরফদারের 'গঙ্গা' মৃণাল সেনের 'বাইশে শ্রাবণ' এবং অরূপ গুহঠাকুরতার 'বেনারসী' শুধু সংবাদপত্রের পাতাতেই নয় দর্শক কর্তৃকও উচ্চ প্রশংসিত হয়।

উদাহরণ স্বরূপ ১৯৬৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবির তালিকা দেখলেই পূর্বোক্ত উক্তির যথার্থতার বিচার হবে। ঐ বছরে 'আকাশ কুসুম', 'সুবর্ণরেখা', 'কাপুরুষ ও মহাপুরুষ', 'অনুষ্টুপ ছন্দ' ও 'একই অঙ্গে এত রূপ'-এর মত শিল্প গুণসমন্বিত ছবি মুক্তি লাভ করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এইসব ছবি কলকাতা শহরেই সম্মিলিত ১৫ থেকে ২৫ সপ্তাহ পর্যন্ত চলেছিল যা বর্তমানের বাংলা ছবির গড়পড়তা চলাকালীন সময়ের চেয়ে বেশী। ঐ বছরে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত পরিচালকদের যেসব ছবি মুক্তি লাভ করেছিল সেগুলি হল 'অতিথি', 'বাক্স বদল', 'একটুকু বাসা', 'রাজা

রামমোহন', 'আলোর পিপাসা' প্রভৃতি। এই ছবিগুলি তদানীন্তনকালে শুধুমাত্র কলকাতা শহরেই সম্মিলিত ২৫ থেকে ৫০ সপ্তাহ পর্য্যন্ত চলেছিল। এই সময় তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত পরিচালকদের ছবিগুলি বক্স অফিসের অনেক তথাকথিত দাবী মেটানো সত্ত্বেও জনপ্রিয়তায় দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিচালকদের ছবিগুলির পাশে দাঁড়াতে পারেনি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ষাট দশকে বাংলায় যে বেশ কয়েকটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের ছবি উঠত তাই নয়, শিক্ষিত ও রুচিবোধসম্পন্ন দর্শক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এইসব ছবির স্বয়ংনির্ভর বাজারও গড়ে উঠেছিল। আর সেই সময় হিন্দী ছবির মান আগের চেয়ে আরও নেমে যাওয়ায় অবাঙালী রুচিবোধসম্পন্ন ও চলচ্চিত্রবোধসম্পন্ন দর্শকদের কাছেও এইসব প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ছবিগুলি বাজার পেতে থাকল।

কিন্তু এই অবস্থাতে ভাঁটা পড়ল। ষাট দশকের শেষ ভাগ থেকেই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত বাংলা ছবির মানেরও ক্রমাবনতি লক্ষ্য করা গেল এবং ফলশ্রুতি হিসাবে Industryতেও সঙ্কট দেখা দিল। অনেকেই তখন এই সঙ্কটকে রাজনৈতিক অস্থিরতা জনিত বলে মন্তব্য করেছিলেন সেটা আংশিক সত্য হতে পারে কিন্তু মূল কারণ নয়।

ধনতান্ত্রিক সঙ্কটের প্রতিফলন

ভারতে ধনতন্ত্র বিকাশের ফলেই পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র-শিল্প তার দেশ বিভাগজনিত ও অন্যান্য কারণজনিত সঙ্কট যে কিছুটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল তা পূর্বের আলোচনা থেকে বোঝা যায় কিন্তু ভারতবর্ষে সেই ধনতান্ত্রিক বিকাশ শৈশবাবস্থাতেই সঙ্কটে পড়ল এবং ঐ রাজনৈতিক অস্থিরতার এটিও একটি কারণ। গ্রামগুলিকে সামন্তশোষণ থেকে মুক্ত করার ব্যর্থতাই ছিল ধনতান্ত্রিক সঙ্কটের অন্যতম প্রধান কারণ।

চলচ্চিত্র-শিল্পে অর্থনৈতিক সঙ্কটের প্রতিক্রিয়া

অর্থনৈতিক সঙ্কটের ছায়া বাংলার film Industryতেও পরিলক্ষিত হল। যে কোনও পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি (Inflation) একটি সাধারণ নিয়ম। এর ফলে বাংলা ছবির খরচ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সঙ্কটের যুগে এই মুদ্রা-স্ফীতি আরও ব্যাপকহারে দেখা দিল। কয়েক বছরেই ছবি নির্মাণের খরচ দ্বিগুণ বা তিনগুণ বৃদ্ধি পেল। 'অতিথি' নির্মাণ করতে যেখানে লেগেছিল আনুমানিক এক লক্ষ টাকা, কয়েক বছরে ঐ অঙ্কে ছবি করা হয়ে পড়ল কল্পনাতীত। এর সঙ্গে সরকারী কর ও হল মালিকদের ভাড়া বৃদ্ধি যোগ হয়ে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে তাতে ছবির খরচ তোলাই মুস্কিল হয়ে পড়ল। আগে যে কালো টাকার খেলাটা চলছিল গোপনে ক্রমশঃ তা হয়ে পড়ল প্রায় খোলাখুলি (Open Secret)।

ঐ সময়ে অর্থনৈতিক সঙ্কটের মূল কারণ গ্রামীণ শোষণ থেকে যদি গ্রাম বাংলার মুক্তি ঘটত তাহলে আভ্যন্তরীণ বাজার বৃদ্ধির মাধ্যমে চলচ্চিত্র নির্মাণের উচ্চ খরচ মিটিয়ে শিল্পের সঙ্কট হ্রাস করা যেত। যে দেশের গ্রামের মানুষ দু-বেলা দু-মুঠো খেতে পায় না, সে দেশের মানুষ সিনেমা দেখবে এমন আশা দুরাশা। অবশ্য এর সঙ্গে প্রয়োজন হত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ও সুস্থ সংস্কৃতির প্রচার এবং ঐসব অঞ্চলে একটা নির্দিষ্ট সময়ে বাংলা ছবির প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা কারণ সেই সময় গ্রাম বেষ্টিত ছোট ছোট শহরগুলিতেও বোম্বাই মার্কা হিন্দী ছবির দৌরাত্ম বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সেই সময় এর কোনটাই হবার ছিল না কারণ এইসব ব্যবস্থা তদানীন্তনকালের শাসকশ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থের পরিপন্থী ছিল।

আর যে পথ খোলা ছিল তা অন্তত ভাল বাংলা ছবি নির্মাণের পথটি প্রশস্ত করতে পারত। ষাট দশকের গোড়া থেকেই যখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারলাভের সুবাদে বাংলা ছবি সারা ভারতের অন্যান্য প্রদেশেরও সংস্কৃতিবান মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল, তখন প্রয়োজন ছিল ডাবিং ও সাবটাইটেলের মাধ্যমে বাংলা ছবিকে ভারতের বৃহত্তর বাজারে পৌঁছে দেওয়া যে পদ্ধতিতে আজ ইতালি ও ফ্রান্সের ছবিকে ইউরোপের বাজারে জনপ্রিয় করে তোলা হয়েছে।

অবশ্য 'গুপি গাইন বাঘা বাইন' ও 'অতিথি' ইংরাজি সাবটাইটেল সহ ভারতের বেশ কয়েকটি শহরে মুক্তি পেয়েছিল। কিন্তু চিরাচরিত বাজারে অস্বাভাবিক সাফল্যের জন্যই প্রযোজকরা এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং ঐ দুটি বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এই ধরণের প্রয়াসের ইতি ঘটেছিল। এই ব্যাপারটা যেহেতু বাজার সৃষ্টির (Sales Promotion) উদ্যোগ তাই সেটা সময়সাপেক্ষ ও পরিকল্পনামাফিক হওয়া প্রয়োজন কারণ রুচি সৃষ্টির এই প্রয়াসে প্রথম দিকে সফলতা নাও আসতে পারে। অতএব একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে ষাট দশকের থেকেই পরিকল্পনা নিয়ে রাজ্য সরকারের এগিয়ে আসা উচিত ছিল। শুধুমাত্র রাজ্য সরকার কর্তৃক 'পথের পাঁচালী' নির্মাণ বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পে কি প্রচণ্ড জোয়ার এনেছিল তা পূর্বে আলোচিত হয়েছে অতএব সময় মত স্টুডিওগুলির আধুনিকীকরণ, সাবটাইটেলিং মেশিন ক্রয়, উন্নত মানের ছবিগুলি নির্মাণে এবং সুস্থ সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে সরকার তৎপর হলে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের এই দুর্গতি হত না। আর এটা ঘটলে যে বাইরে নতুন বাজারই সৃষ্টি হত তাই নয়, সেই সময় অর্থনৈতিক সঙ্কটের দরুণ সমাজে ও শিল্পে যে অবক্ষয় সুরু হয়েছিল উন্নতমানের ছবিগুলি তার পাশে চ্যালেঞ্জস্বরূপ কাজ করত এবং দর্শকের সচেতন অংশের কাছে সমাদৃত হত; সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক এবং মৃণাল সেনের ছবিগুলির বেলায় যা ঘটেছিল (পরে আলোচিত)।

যাই হোক, উপরোক্ত পন্থাগুলির কোনটাই কার্য্যকরী না হওয়ায় এই সঙ্কট ঘনীভূত হল। ছবি তোলার খরচ বেড়ে যাওয়ায় প্রযোজকরা শিল্পগুণ-

সমন্বিত ছবি করার ঝুঁকি নিলেন না। ফলে একমাত্র সত্যজিৎ রায় ও মৃণাল সেন ব্যতীত অন্য প্রথম শ্রেণীর পরিচালকরা কাজ পেলেন না। সত্যজিৎ রায় তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতির সুবাদে দেশে বিদেশে যে বাজার সৃষ্টি করেছিলেন তার জোরে টিঁকে গেলেন। মৃণাল সেন বাংলায় ছবি করার সুযোগ না পেয়ে অন্য ভাষায় ছবি করে পরিচালক হিসেবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখলেন। 'ভুবন সোম'-এর অস্বাভাবিক সাফল্যই তাঁকে আবার বাংলার চিত্রজগতে ফিরিয়ে আনল। আর ঋত্বিক ঘটক ১৯৬৩-র পর থেকে ('সুবর্ণরেখা'র নির্মাণ কাল) ১২ বছরে মাত্র ২টি ছবি করার সুযোগ পান—একটি এফ, এফ, সি-র পয়সায় অন্যটি বাংলাদেশে। অন্যরা সেই সুযোগও পেলেন না। এইভাবে শিল্পগুণসমন্বিত ছবির সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাওয়ায়, ঐসব ছবি বাংলা চলচ্চিত্রে উন্নত মান বজায় রাখতে এবং দর্শকদের মধ্যে ভাল ছবির প্রতি স্পৃহা সৃষ্টিতে যে অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছিল তা গুরুতররূপে ব্যাহত হল। এটা প্রশংসনীয় যে প্রথম শ্রেণীর কোনও পরিচালক যে (একজন বাদে) যে এই সঙ্কটের মুখেও তাঁদের নিজস্ব মান থেকে নেমে শুধুমাত্র পরিবেশক, প্রদর্শক ও প্রযোজকদের খুশী করার জন্য ছবি করেননি; এজন্য তাঁরা সুস্থ ও সচেতন সংস্কৃতিপ্রেমী প্রতিটি মানুষের ধন্যবাদার্হ।

সাংস্কৃতিক সঙ্কট

কিন্তু অর্থনৈতিক সংকট তো একা আসে না, ভারতে ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশ না ঘটায়, জাতীয় বুর্জোয়াদের সাংস্কৃতিক বিকাশও ক্রমাগত ব্যাহত হচ্ছিল এবং যেটুকু বিকাশ ঘটছিল তাও আবার নয়া সাম্রাজ্যবাদী ইয়াংকি কালচার দ্বারা দূষিত হচ্ছিল। এইভাবে যে সাংস্কৃতিক সঙ্কট ঘনিয়ে উঠছিল তার কিছু পূর্বাভাষ তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত পরিচালকদের দেউলিয়াপনার মধ্যে লক্ষ্য করা গিয়েছিল এবং ধনতান্ত্রিক সঙ্কটের যুগে সেই একই লক্ষণ দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত পরিচালকদের ছবিতেও পরিলক্ষিত হল। সঙ্কটের যুগে প্রথম শ্রেণীর পরিচালকদের যখন করবার কিছুই ছিলনা তখন একমাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিচালকরাই এই সঙ্কটের মোকাবিলা করতে পারতেন কারণ সেই সময় জনপ্রিয়তার নিরিখে তাঁদের ছবিগুলিই ছিল শীর্ষে। কিন্তু দেখা গেল, অসিত সেন-এর মত দুএকজন পরিচালক ভালো সুযোগ পেয়ে বোম্বাই পাড়ি দিলেন। যাঁরা রইলেন তাঁরা বুঝলেন না যে তাঁদের জনপ্রিয়তার মূল কারণ তাঁদের গল্প বলার সহজ ভঙ্গী, পরিচ্ছন্নতাবোধ ইত্যাদি যা হিন্দীছবির বিকল্পরূপে পরিগণিত হচ্ছে এবং উন্নতমানের ছবি নির্মাণের মাধ্যমেই তাঁরা বাজার রক্ষা করতে পারবেন। অর্থনৈতিক সঙ্কটজনিত সাংস্কৃতিক সংকটের ছায়া তাঁদের ভাবনা চিন্তার দেউলিয়াপনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল।

ঐ সময়ে তরুণ মজুমদার 'বালিকা বধূ' নির্মাণ করলেন। ঐ ছবি সফল হওয়াতে আরও কয়েক জন পরিচালক 'বালিকা বধূ' ফর্মুলা প্রয়োগ করে ছবি করলেন। এর পরে 'নতুন পাতা' বা 'মেঘ ও রৌদ্র' ছবিতে যখন আবার সেই একই জিনিষ অর্থাৎ কিশোরের সলজ্জতা, কিশোরীর ডানপিটেমি অথবা বাচ্চাদের মুখে পাকা পাকা কথার পুনরাবৃত্তি ঘটল তখন তা দর্শকদের কাছে একঘেঁয়ে হয়ে পড়ল।

পরবর্তীকালে একদা সফল তরুণ মজুমদারও যখন ঐ একই ধরণের বিষয়বস্তু নিয়ে 'শ্রীমান পৃথ্বিরাজ' করতে গেলেন, তখন তাঁর পেশাদারী যোগ্যতাও বিষয়বস্তুর অভিনত্বহীনতাকে ঢাকা দিতে পারল না। ছবিটি প্রমোদকর মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এবং ছবিটিকে ছোটদের ছবি বলে প্রচার চালিয়েও, 'বালিকা বধূর' অর্দ্ধেক সাফল্যও অর্জন করা গেল না।

তপন সিংহও উচ্চ খরচ মেটাবার জন্য তাঁর নিজস্ব পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে বোম্বাই থেকে চিত্রতারকা আনিয়ে হিন্দী মিশ্রিত বাংলা গঠন ও সংলাপের জগাখিচুড়ি ব্যবহার করে ভারতের হিন্দীভাষি অঞ্চলের বাজার ধরবার প্রয়াস চালালেন। এই ছবি করতে গিয়ে তিনি হিন্দী ছবির বাজারী রুচির প্রলোভনকে পরিপূর্ণরূপে বর্জন করতে পারলেন না। তিনি বিস্মৃত হলেন যে অবাঙালী দর্শকদের রুচিবোধসম্পন্ন মানুষের কাছে বাংলা ছবির কদর উন্নতমানের বিষয়বস্তু, অভিনয় ও পরিচালনার জন্য। অন্যদিকে তিনি হিন্দী ছবির বাজারী রুচির দর্শককেও তুষ্ট করতে পারলেন না কারণ তিনি চিরাচরিত রুচিবোধসম্পন্ন দর্শকের বাজার ও জাতীয় স্তরে তাঁর খ্যাতিকে পুরাপুরি জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত না থাকায় তাঁর ছবিগুলি হিন্দী ছবিগুলির মত পরিপূর্ণভাবে বিকৃত রুচিকে গ্রহণ করতে পারছিল না। তাঁর মনোভাব ছিল শ্যামও রাখি ও কুলও রাখি ফলত তাঁকে দু-কুলই হারাতে হয়েছিল। তা ছাড়া হিন্দী ছবির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ঐভাবে বাংলা ছবি করতে গেলে যে অর্থলগ্নী করার ক্ষমতা ও রিলিজ চেন পাওয়ার প্রতিপত্তির প্রয়োজন হয় তাও তাঁর ছিল না।

এতদ্‌সত্ত্বেও পূর্বভারতে 'হাটে বাজারে' ও 'সাগিনা মাহাতো'-র সাফল্যের মূল কারণ হল যেসব বাঙালী দর্শক হিন্দী ছবি দেখার অভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন তাঁরাও ছবি দুটি দেখেছিলেন। বোম্বাইয়ের চিত্রতারকাদের নাম দেখে বেশ কিছু অবাঙালী দর্শকও যে এই দুটি ছবি দেখেছিলেন তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু পরবর্তীকালে ঐসব তারকাদের উচ্চ অঙ্কের টাকা ও তদুপরি তারিখ দেওয়ার অসুবিধা এই প্রয়াসে বাদ সাধল। লাভের মধ্যে এটাই হল যে ঐ পরিচালক বৃহত্তর হিন্দীভাষী অঞ্চলে বাজারী রুচির কথা মনে রেখে ছবি করার ফলে তাঁর ছবির মানের অবনতি ঘটল। 'কাবুলিওয়ালা', পরবর্তীকালে 'নির্জন সৈকতে'-র পরিচালককে 'রাজা'-র মত নিকৃষ্টমানের ছবি করতে দেখা গেল, এর ফলে রুচিবোধসম্পন্ন দর্শকদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে কমতে থাকল। তাঁর শেষ কটি ছবির ব্যবসায়িক অসাফল্য যে ছবির গুণগত অবনতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তা বাংলা ছবির

দর্শক মাত্রই স্বীকার করবেন, তরুণ মজুমদার দেরীতে হলেও ব্যাপারটা বুঝেছিলেন, তাই 'শ্রীমান পৃথ্বিরাজ'-এর পুনরাবৃত্তি না করে তিনি 'সংসার সীমান্তে' ও 'গণদেবতা'র পথ বেছে নিলেন।

অসৎ উদ্দেশ্যের ছবি

অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকটকালীন ঐ সময়ে পশ্চিমবঙ্গে যে গণজাগরণ দেখা দিয়েছিল তাতে ভীত হয়ে এক ধরণের প্রযোজকদের প্ররোচনায় কিছু দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিচালক এমন সব ছবি নির্মাণ করেন যার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে রাজনীতিগতভাবে বিভ্রান্ত করা। সমসাময়িক ছবি করবার অছিলায় তাঁরা কিছু উপরিবাস্তবতা (কথাবার্তায়, বেশভূষায় ও পারিপার্শ্বিক দৃশ্য সৃষ্টিতে) দেখিয়ে মূল বাস্তবকে বিকৃত করছিলেন যেমন যুব সমাজকে দেখাবার নামে লুম্পেন চরিত্রদের হাজির করছিলেন। এইসব ছবি নির্মাণে সম্ভবত টাকার অভাব হত না কারণ বাস্তবের বিকৃতীকরণ ছাড়াও ছবিগুলিতে প্রতিক্রিয়াশীল বক্তব্যও থাকত। ঐসব পরিচালকদের কাছে তখন বাংলা চলচ্চিত্রের স্বার্থ গৌণ হয়ে পড়েছিল।

সংকটের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি

ইতিমধ্যে সংকটের যুগে তৃতীয় শ্রেণীর পরিচালকদের অযোগ্যতা আরও প্রকট হয়ে উঠল, দুর্বল চিত্রনাট্য ও পরিচালনা এমন স্তরে পৌঁছাল যে সফল সাহিত্যও ব্যর্থ চলচ্চিত্রে পরিণত হল। দু-একজন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে কেন্দ্র করে ছবি তোলার যে অভ্যাস কয়েকজন পরিচালক গড়ে তুলেছিলেন, তা সমস্ত প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করল, এইভাবে গুরুত্ব পেয়ে ঐসব অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তারকায় পরিণত হলেন। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে তারকাদের নির্দেশেই এসব পরিচালকরা কাজ করতে লাগলেন। পরিচালক তরুণ মজুমদার তাঁর আলোচনায় এর উল্লেখ করে বলেছেন, "তারকারা যখন সাধারণ লেভেল থেকে উঠে অসাধারণ হয়ে উঠল, তখন ছবির আর সব অংশীদার নিজেদের অপ্রয়োজনীয় মনে করতে লাগলেন। তাদের দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে ছবিরও সামগ্রিক দাম শিল্পগত উৎকর্ষের দিক থেকে কমে গেল।" তরুণ মজুমদার অবশ্য এই স্টার সিস্টেম গড়ে ওঠার জন্য প্রদর্শকদের দায়ী করেছেন। এটা নিশ্চয়ই সত্য কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর পরিচালকরা নিজেদের অযোগ্যতা ঢাকতেও যে এইসব তারকাদের ব্যবহার করতেন তাও সমানভাবে সত্য কারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর অনেক পরিচালকই তো স্টার সিস্টেমের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি তাই বলে কি তাঁদের ছবি মুক্তি পেত না আসলে প্রদর্শকরা এই দুই শ্রেণীর পরিচালকদের তফাৎটা বুঝত।

সেই সময়ে (সত্তর দশকের গোড়া থেকেই) তৃতীয় শ্রেণীর পরিচালকরা সংকটের কারণ নির্ণয়ে ব্যর্থ হয়ে ভুলের পর ভুল করে যেতে লাগলেন। হিন্দী ছবির সাফল্যে প্রভাবিত হয়ে তাঁরা হিন্দী ছবিকে অনুকরণ করতে বসলেন। এইভাবেই বাংলা ছবিতে মোটা দাগের প্রেমের গল্পের যে ধারা ছিল তার অবসান ঘটল এবং তার জায়গায় এল ষাট দশকের হিন্দী ছবির অনুকরণে যৌনতা সর্বস্ব ও প্রতিহিংসামূলক ছবিগুলি। এই অনুকরণ-ছবিগুলিও বিশেষ সুবিধা করতে পারল না কারণ প্রথমত যেসব স্থূল রুচির দর্শক যারা বাংলা ছবিতে চড়া সুরের মেলোড্রামা, অতিনাটকীয়তা অথবা ভারাক্রান্ত সেন্টিমেন্ট ভালবাসতেন অথচ বিকৃত রুচির নাচ-গান পছন্দ করতেন না সেইসব দর্শক এই ধরণের ছবির পৃষ্ঠপোষকতা করতেননা; অন্যদিকে বাংলা ছবির সেইসব দর্শক যাঁরা আগে থেকেই বিকৃত রুচির হিন্দী ছবি দেখার অভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে পরিপূর্ণভাবে হিন্দী ছবির দর্শকে পরিণত হয়েছিলেন এইসব ছবি তাঁদেরও তুষ্ট করতে পারলনা কারণ সত্তর দশকে হিন্দী ছবিতে বিকৃতির মাত্রা অনেক পরিবর্দ্ধিত হয়েছিল—'সঙ্গম'-এর যুগ পার হয়ে ক্রমে তা 'ববি'-র যুগের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল যখন আর 'বোল রাধা বোল সঙ্গম হোগা কি নেহি' প্রশ্ন করার প্রয়োজন হত না বরং সরাসরি বললেই চলত 'হাম তুম এক কামরা মে বন্ধ হো'। অর্থাৎ যৌনতা ও নগ্নতা প্রদর্শনের ব্যাপারে এবং অশ্লীল গান ও সংলাপ ব্যবহারে তৎকালীন হিন্দী ছবি যেরকম নির্লজ্জতা দেখাতে পারছিল এখানে তৈরী সেই অনুকরণ-ছবিগুলি সেই অনুপাতে ছিল অনেক রক্ষণশীল; ফলে 'প্রেম করেছি বেশ করেছি' গানের মধ্য দিয়েও বিকৃতির চাহিদা মিটছিল না। অবশ্য এই সব চিত্র নির্মাতাদের অন্য পথও খোলা ছিল না কারণ মানের অবনতিও ধাপে ধাপে করতে হয়, হঠাৎ করায় অনেক অসুবিধা ও ঝুঁকি থাকে বিশেষত পশ্চিমবাংলার মত স্থানে যেখানে ঐতিহ্য-শালী সংস্কৃতি বিদ্যমান এবং যেখানে প্রচুর রাজনীতি-সচেতন মধ্যবিত্ত মানুষ আছেন। এই ভুল পথে পা বাড়ানোর আগে ঐ পরিচালকদের এসব চিন্তা করা উচিত ছিল।

ভায়োলেন্স দেখাবার ব্যাপারেও হিন্দী ছবি ছিল বাংলা ছবির চেয়ে অনেক পটু কারণ অনেক দিনের অভ্যাসের ফলে এটার প্রদর্শন হিন্দী ছবির আয়ত্তাধীন হয়ে গিয়েছিল কিন্তু যেখানে 'ফরিয়াদ' মার্কা অনুকরণ-গুলিকে Amatuerish মনে হোত। একজন দর্শক বাংলা ছবির নায়কের অসি চালনাকে ডাব কাটার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

হিন্দী ছবির ক্রমাগত জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি

ষাট দশকে যেখানে উন্নতমানের বাংলা ছবি অন্য ভাষাভাষী অঞ্চলের উন্নতরুচির দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল, সেখানে সত্তর দশকে এসে ঠিক উল্টো এক স্রোত দেখা গেল—হিন্দী ছবি বাংলা ছবির দর্শকের অন্য এক অংশকে টেনে নিচ্ছে আগের চেয়ে অনেক ব্যাপকভাবে। শুধু বাংলা ছবিগুলির নেতিবাচক ভূমিকাই যে দর্শককে হিন্দী ছবিগুলির দিকে ঠেলে দিয়েছিল তাই নয়, হিন্দী ছবির কর্ণধাররাও দর্শককে টেনে নেওয়ার জন্য

যথেষ্ট ব্যবসায়িক তৎপরতা দেখিয়েছিলেন। আর এইভাবে নতুন বাজার সৃষ্টির মাধ্যমেই হিন্দী ছবি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মুদ্রাস্ফীতিজনিত অর্থনৈতিক সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল। অবশ্য এই সঙ্কট থেকে হিন্দী ছবিও রেহাই পেতনা যদি না আগে থেকেই তার অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার চেয়ে বৃহত্তর বাজার থাকত। ভারতে হিন্দীভাষী মানুষের সংখ্যা সর্ববৃহৎ হওয়ায় গোড়া থেকেই হিন্দী ছবির এই প্রাথমিক সুবিধা ছিল। আবার পশ্চিম ও উত্তরের অহিন্দীভাষী অঞ্চলে হিন্দী সহজবোধ্য হওয়ায় তার বাজার বাড়াবার বিশেষ সুবিধা ছিল।

আর এই বৃহত্তর বাজার থাকার ফলে হিন্দী ছবিগুলির আঞ্চলিক ছবিগুলির চেয়ে অর্থলগ্নী করার অনেক বেশী ক্ষমতা ছিল, তাই হিন্দী ছবিকে সারা ভারতব্যাপী সাম্রাজ্যবিস্তারের অঢেল সুযোগ এনে দিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভারত বাদে ভারতের অন্যান্য স্থানে আঞ্চলিক ভাষায় ছবি নির্মিত হতনা বললেই চলে সেইসব স্থানে হিন্দী ছবি প্রায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজেদের বাজার প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল। পরবর্তীকালে যেসব স্থানে আঞ্চলিক ভাষায় ছবির বাজার ছিল, সেইসব স্থানেও হিন্দী ছবি আঞ্চলিক ভাষার ছবিগুলির বিনিময়ে কিভাবে নিজেদের বাজার প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হল তা পরবর্তী আলোচনায় প্রকাশ পাবে।

এঁরা ধর্মীয় ছবি নির্মাণ অব্যাহত রেখেছিলেন কেননা এঁরা জানতেন ভারতের বৃহৎসংখ্যক মানুষ অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত হওয়ায় নানারকম অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও কুসংস্কারে ভুগছে। ফলে ঐসব ধর্মীয় ছবিতে যখন দেব-দেবীর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ ট্রিক শটের মাধ্যমে দর্শকের কাছে উপস্থিত করা হত তা তাদের কাছে খুব বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠত এবং স্বাভাবিক কারণেই এইসব ছবির বাজার ছিল। অবশ্য হিন্দী ছবির কর্ণধাররা এটাও জানতেন যে এইসব ছবির যাঁরা প্রধান পৃষ্ঠপোষক তাঁরা যে শুধু অশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত তাই নয়, তাঁরা অর্থনৈতিক দিক থেকেও পেছিয়ে পড়া শ্রেণী। অন্যদিকে যাঁদের নিয়মিত সিনেমা দেখার সঙ্গতি আছে শহরের সেই মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে এইসব ধর্মীয় ছবি সেরকম আমল পাবেনা কারণ তাঁরা যে শুধু অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত তাই নয়, বড় শহরে বাস করার ফলে তাঁদের মধ্যে এক ভিন্ন মানসিকতা কাজ করছে। তাই ধর্মীয় ছবি করা ছাড়াও এর পাশাপাশি এঁরা মূলত শহরের মানুষদের অন্য ধরণের হিন্দী ছবির প্রতি আকর্ষিত করার ওপর জোর দিয়েছিলেন এবং তা করতে প্রচণ্ড ব্যবসায়িক তৎপরতা দেখিয়েছিলেন।

১) এঁরা ভাষার গোঁড়ামি মুক্ত ছিলেন। এঁরা ভারতের বিভিন্ন স্থানের জনপ্রিয় গানের সুরকে ও সফল আঞ্চলিক ছবির গল্প কিনে নিয়ে হিন্দী ছবিতে ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন ফলে এঁদের অর্থলগ্নী অনেক নিরাপদ হয়ে পড়ে। তাছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলের অভিনেতা-অভিনেত্রী ও ব্যবসায়িকভাবে সফল পরিচালকদের নিয়ে আসার মত আর্থিক ক্ষমতা এঁদের বরাবরই ছিল। এইভাবে বিভিন্ন স্থানের একটা পাঁচমিশেলি কৃত্রিম সংস্কৃতির উদ্ভব এঁরা ঘটিয়েছিলেন যাকে আমি এখানে হিন্দী ফিল্ম কালচার বলে অভিহিত করছি। এই কালচার শহরের ও শিল্পাঞ্চলের পেছিয়ে পড়া শ্রমিক ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রসাদ লাভ করেছিল। এর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার বিবিধ ভারতীর মাধ্যমে হিন্দী ফিল্মের গানের অবাধ প্রচারের যে সুযোগ করে দিলেন তা সমস্ত ব্যাপারটাকে সাহায্য করল।

২) যে কোনও অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখেই পুঁজিবাদীরা কারিগরি উন্নতির মাধ্যমে তাঁদের সঙ্কট কাটায়। এক্ষেত্রে বৃহত্তর বাজার থাকার জন্য রঙিন ছবি করার অধিক খরচ বহন করবার সামর্থ হিন্দী ছবির ছিল। ফলে বেশীরভাগ হিন্দী ছবিই রঙীন হয়ে নির্মিত হতে থাকল। তার সঙ্গে উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ও ব্যয়বহুল সেট-সেটিং ব্যবহারের ফলে হিন্দী ছবি মানুষের কাছে অনেক আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। দর্শক যে পলায়নী মনোবৃত্তি থেকে এইসব মেক-বিলিভ ছবিগুলি দেখতে যেত উপরোক্ত পরিবর্তনগুলি ছিল তারই আবশ্যিক পরিপূরক। এখানে অবশ্য এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উন্নতমানের যন্ত্রপাতি আমদানির ব্যাপারে ও কালার র-স্টক দেওয়ার ব্যাপারে বোম্বাই ও মাদ্রাজের হিন্দী ফিল্মের কর্ণধাররা আঞ্চলিক ছবিগুলির থেকে অনেক বেশী সুযোগ সুবিধা পেত। এমন কি, সত্যজিৎ রায়ের মত পরিচালককে পর্যন্ত 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র জন্য কালার র-স্টক পেতে প্রচণ্ড বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

৩) কোনও শিল্পমাধ্যমে যখন সঙ্কট দেখা দেয়, তখন উচিত সেই শিল্পের মানকে স্থিতাবস্থা থেকে বার করে এনে, তার মানোন্নয়ন ঘটিয়ে দর্শকের রুচির মানোন্নয়ন ঘটানো অন্যথায় মানের অবনতি ঘটে দর্শকের রুচিও বিকৃত হয়ে যায়। বোম্বাই মার্কা ছবিগুলি দ্বিতীয় পথটিই বেছে নিয়েছিল কারণ তারা জানত যে ধনতন্ত্রের অমোঘ নিয়মে সৃষ্টি অবক্ষয় দর্শকদের বৃহদংশকে এই সব বিকৃত রুচির ছবির প্রতিই আকর্ষিত করবে। সেটা করতে গিয়ে হিন্দী ছবির কর্ণধাররা সমস্ত রকম পিছুটান বর্জন করেছিলেন এবং ধীরে ধীরে হিন্দী ছবিতে সেক্স ও ভায়োলেন্সের প্রাধান্য এনেছিলেন যার সম্বন্ধে পূর্বে উদাহরণ সহ কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। দেশের ছাত্র, কিশোর, তরুণ, যুবক ইত্যাদিদের মধ্যে যে অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল, তার ফলে এরা সহজেই হিন্দী ফিল্মের শিকার হয়ে পড়ল, হয়ে পড়ল হিন্দী ফিল্ম কালচারের বশবর্তী। এইভাবে ঐ ধরণের হিন্দী ছবি এক শ্রেণীর 'Ready Made' দর্শক সৃষ্টি করল।

৪) হিন্দী ছবির কর্ণধারদের হাতে (সাদা ও কালোয়) অনেক অর্থ থাকার ফলে তারা দাদন দিয়ে এবং বেশী ভাড়া দিয়ে যেসব হলে শুধুমাত্র আঞ্চলিক ভাষার ছবি প্রদর্শিত হত সেগুলিকে ক্রমে ক্রমে কব্জা করে

ফেলল। যার ফলে আঞ্চলিক ছবিগুলি মুক্তি পেতে বহু বিলম্ব হতে লাগল এবং অর্থ বিনিয়োগ বিরাট ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে গেল। এইভাবে তাঁরা আঞ্চলিক ভাষার ছবিগুলিকে কোণঠাসা করে ফেলল।

৫) এইসব হিন্দী ছবির বাজেটের একটা বড় অংশ ছবির প্রচার ও বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যয়িত হয়। এইসব প্রচারের উদ্দেশ্য ছবির অন্তঃসারশূন্যতা ঢাকা দিয়ে ছবি দেখার আগেই দর্শকদের সামনে গ্ল্যামারের এক কল্পরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা, এমন একটা Craze সৃষ্টি করা যাতে ছবি মুক্তির কয়েকদিনের মধ্যেই একটা মোটা টাকার অংশ তুলে ফেলা যায়।

যাই হোক, এই সঙ্কটের যুগেও হিন্দী ছবির কর্ণধাররা তাদের সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল কারণ এইসব বুর্জোয়াসুলভ ব্যবসায়িক তৎপরতার ফলে আসমুদ্র-হিমাচলে তারা নতুন বাজার সৃষ্টি করতে পেরেছিল। আর বৃহৎ ব্যবসার হিন্দী ছবির সঙ্কটের বোঝা বইতে হল ক্ষুদ্র ব্যবসার আঞ্চলিক ছবিগুলিকে।

বাংলা ছবির মানের চরমাবনতি

বাংলা ছবির কথায় ফিরে আসা যাক। হিন্দী ছবির সফলতার পেছনের সমস্ত কারণগুলি না বুঝে, শুধু সেক্স ও ভায়োলেন্স ঢুকিয়ে অন্ধ অনুকরণের ফল দাঁড়াল যে সেন্সরের তারিখ অনুযায়ী নিয়ম করে যেভাবে বাংলা ছবি মুক্তি পাচ্ছিল দর্শক সমাগম না হওয়ার জন্য ঠিক তেমনি নিয়ম করে দু-এক সপ্তাহের মধ্যেই সেগুলি উঠে যেতে লাগল তখন ঐসব পরিচালকদের উচিত ছিল ঐ আত্মঘাতী পথ থেকে ফিরে আসা কিন্তু তবু এই ধরণের বেশ কিছু ছবি নির্মিত হতে থাকল।

যদিও প্রথমদিকে হিন্দী ছবির সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যই এই ধরণের ছবি নির্মিত হয়েছিল কিন্তু প্রদর্শক-পরিবেশক-প্রযোজকদের প্ররোচনায় অসদুদ্দেশ্যে এই ধরণের ছবি নির্মিত হতে থাকল। দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিচালকদের পরবর্তীকালের এক অংশ যেমন প্রতিক্রিয়াশীল বক্তব্য সমন্বিত বিভ্রান্তিকর ছবি নির্মাণ করছিলেন (পূর্বে যার উল্লেখ করেছি) ঠিক তেমনি তৃতীয় শ্রেণীর পরিচালকদের এক অংশ অপসংস্কৃতিমূলক চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে লাগলেন যার উদ্দেশ্য ছিল যাঁরা হিন্দী ছবি দেখেন না তাঁদের রুচিকেও বিকৃত করে দিয়ে অবক্ষয়কে দ্রুততর করা। এর জন্য কালো টাকার অভাব হতনা। আর এটা ছিল তদানীন্তন কালের (সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়) অসুস্থ সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সেই সময় সামগ্রিকভাবে বাংলা ছবির মান এত নেমে গেল যে জাতীয় স্তরে গৌরবের আসনটি কানাড়ি ও মালয়ালাম ছবি দখল করে নিল। এক বছর তো বাংলা ছবি আঞ্চলিক ভাষার পুরস্কারটি পর্যন্ত পেল না।

সঙ্কটের কারণ নির্ণয়ে ব্যর্থতা

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর পরিচালকরা সঙ্কট নির্ণয়ে ব্যর্থ হয়ে দুটি ভুল করেছিলেন। প্রথমতঃ তাঁরা ভাবেননি যে বুর্জোয়া অবক্ষয়ের চলচ্চিত্র নির্মাণে বৃহৎ ব্যবসার হিন্দী ছবির সঙ্গে পাল্লা দেবার মত অর্থ সংস্থান বা বাজার কোনটাই তাঁদের নেই ; দ্বিতীয়তঃ তাঁরা দেখেননি যে অর্থনৈতিক সামাজিক অবক্ষয়ের দরুণ যদিও এক ধরণের বিকৃত রুচির দর্শক সৃষ্টি হচ্ছিল যাঁরা বাংলা ছবির চেয়ে হিন্দী ছবিকে অনেক আকর্ষণীয় মনে করছিলেন কিন্তু ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াজনিত কারণে এক বিরাট সংখ্যক উন্নত রুচির দর্শকও সৃষ্টি হচ্ছিল যাদের আমি পূর্বে মননশীল ও রুচিবোধ সম্পন্ন বলে অভিহিত করেছি। তাঁরা এটাও বিস্মৃত হয়েছিলেন যে দেশের মানুষ রাবীন্দ্রিক আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছেন ; যাঁরা মাইকেল, নজরুল, সুকান্ত রচিত কাব্যের অথবা বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত সাহিত্যের আস্বাদ গ্রহণ করেছেন, যাঁরা বহু বছর ধরে বাংলার নাট্য আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেছেন এবং সর্বোপরি যাঁরা সত্যজিৎ ঋত্বিক মৃণালের ভিতর দিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রের ক্রম বিকাশ দেখেছেন—তাঁদের সকলেই বিকৃত রুচির কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারেন না। আর পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি সচেতন মানুষের পক্ষে এটা আরও বেশী করে সত্য। ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে এটা দেখা গেছে যে মুহূর্তে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শ্রেণীর পরিচালকরা বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন, যে মুহূর্তেই তাঁদের ছবির জনপ্রিয়তা কমতে শুরু করেছিল। এই বিষয়ে সবচেয়ে নিরাশ করেছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিচালকরা কারণ তাঁদের কোনক্রমেই অযোগ্য বলা চলে না।

উন্নত রুচির দর্শক সৃষ্টি

উন্নত রুচির দর্শক যে সৃষ্টি হচ্ছিল তা সেই সমাজে যে দুজন প্রথম শ্রেণীর পরিচালক কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁদের উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি থেকেই বোঝা যায়। সত্যজিৎ রায় খুবই উন্নতমানের ছবি করার ফলে পঞ্চাশ দশকে সাধারণ দর্শকের কাছে অনেক ক্ষেত্রেই দুর্বোধ্য ছিলেন কিন্তু শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে ষাট দশকেই সত্যজিৎ রায়ের ছবি যে জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল তা পূর্বেই বলেছি। পরবর্তীকালে সামাজিক অবক্ষয়ের কাছে আত্মসমর্পণ না করাতে ঐ গতি অব্যাহত রইল এবং সত্তর দশকে তাঁর সবকটি ছবির ব্যবসায়িক সাফল্য সেই কথাই প্রমাণ করে। মৃণাল সেনও তাঁর ছবির বিষয়বস্তুতে সমসাময়িক ঘটনাবলীকে স্থান দিয়ে ও নতুন আঙ্গিকের মাধ্যমে তা প্রকাশ করে বাংলা চলচ্চিত্রের সামনে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করলেন। মৃণাল সেনের ছবিতে সোচ্চার রাজনৈতিক বক্তব্য থাকার ফলে ক্রমেই তাঁর ছবি রাজনীতি-সচেতন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এইভাবে তিনি নিজের ছবির বাজারই শুধু বাড়ালেন না, তিনি অর্জন করলেন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। এই সময়ে বাজারে ঋত্বিক ঘটকের নতুন কোন ছবি না থাকা সত্ত্বেও দেখা গেল, তাঁর পুরানো ছবিগুলি অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কোনও বক্স অফিসের উপকরণ না থাকা সত্ত্বেও অগ্রদূতের 'স্বাতী' অস্বাভাবিক সাফল্য

অর্জন করল। এই সময়ের ভেতর এক শ্রেণীর দর্শকের রুচি কি পরিমাণ উন্নত হয়েছিল তা ঋত্বিক ঘটকের বক্তব্য থেকে জানা যায়, "দর্শকের ক্ষেত্রেতো নিশ্চয়ই একটা পরিবর্তন এসেছে, ভালো ছবি সম্পর্কে আগ্রহ অনেক বেড়েছে বিশেষ করে কমবয়েসী ছেলেদের মধ্যে·········"(সাক্ষাৎকার/চিত্রবীক্ষণ আগস্ট-সেপ্টে, ৭৩সং)। এই প্রসঙ্গে উন্নত রুচির দর্শক সৃষ্টিতে সত্যজিৎ রায় মৃণাল সেনের প্রশংসনীয় ভূমিকার উল্লেখও তিনি করেন।

ঐ দুই পরিচালকের উন্নত মানের ছবিগুলির জনপ্রিয়তা এটাই প্রমাণ করে যে পশ্চিমবাংলার চলচ্চিত্র-শিল্পের সঙ্কটের মুখে ওটাই ছিল সঠিক পথ। আর এটা শুধু বাংলা ছবির পক্ষেই সত্য নয়, বৃহৎ ব্যবসার হিন্দী ছবির চাপপিষ্ট প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষার ছবির পক্ষেই সত্য।

কানাড়ি ছবি

এই মানোন্নয়নের মাধ্যমে যখন কানাড়া ও মালয়ালম ভাষায় নির্মিত ছবিগুলি শুধু জাতীয় পুরস্কারগুলিই দখল করছিলনা, ঐ দুই ভাষাতে ছবি নির্মাণের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৬৫ সালে মালয়ালাম ছবি 'চেম্মিন' দিয়ে এই ঝোঁকের সূচনা হয়। তবে সবচেয়ে আশ্চর্য করে দিয়েছে কানাড়ি ছবিগুলি। 'বেলমোড্ডা', 'সংস্কারা' 'ঘটশ্রাদ্ধ' 'বংশবৃক্ষ' প্রভৃতি কানাড়া ভাষায় নির্মিত ছবিগুলি চলচ্চিত্র-সচেতন মানুষের কাছে বিশেষভাবে উল্লেখের প্রয়োজন রাখেনা। আর ১৯৫৯ সালে যেখানে মাত্র ৫ খানি কানাড়ি ছবি তৈরী হয়েছিল, ১৯৭১এ তা বেড়ে দাঁড়াল ৪৪ খানায়, '৫২তে স্টুডিও যেখানে ছিল একটি সেখানে '৭১এ স্টুডিও বেড়ে হল চারটি—সবমিলিয়ে ফ্লোরের সংখ্যা ১২টি। আর এখানে পঞ্চাশ দশকে যে কটা স্টুডিও ছিল, সত্তর দশকে এসে তার বেশ কটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং এই সময়ে বাংলা চলচ্চিত্রের মানের অবনতি ঘটেছিল। অতএব পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র-শিল্পের উভয়সঙ্কট যে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, তা বলাই বাহুল্য।

বাংলা চলচ্চিত্রে পরিচালকদের সংকট নির্ণয়ে ব্যর্থতা ও মান অবনমনের অন্যতম আর একটি প্রধান কারণ হল যে বাংলা চলচ্চিত্রে নবাগতদের আগমন প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আজও পশ্চিমবাংলার চলচ্চিত্র-শিল্পের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে শিল্পগুণসমন্বিত ছবি করার দিক থেকেই হোক অথবা ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ছবি করার দিক থেকেই হোক, তা এখনও পঞ্চাশ দশকে কাজ শুরু করা মানুষগুলির মধ্যেই আবদ্ধ।

ছবির খরচ অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় আগে প্রথম শ্রেণীর কয়েকজন পরিচালক খুব অল্প খরচে ছবি করে যে ভাবে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সে সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়েছিল। অন্য দিকে ধনতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশ ব্যাহত হওয়ার ফলে মধ্যবিত্তের সংস্কৃতিতে একটা সঙ্কট দেখা দিয়েছিল ফলে ষাট দশকের শেষ থেকে কোনও প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিচালকের সমাগম ঘটেনি। দু-এক জন সম্ভাবনাময় পরিচালকদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল যাঁরা খুব তাড়াতাড়ি বড় হবার স্বপ্ন দেখে নিজেদের ক্ষমতার বাইরে ছবি করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন অথবা ব্যবসায়িক চাপে আপোষ করেছিলেন। বাজার সঙ্কুচিত হয়ে যাবার ফলে, প্রযোজকরাও তৃতীয় শ্রেণীর পরিচালকদের মধ্যেই পুরোনো মুখ পছন্দ করতেন।

এর সঙ্গে নতুন এক উপসর্গ দেখা গেল। সঙ্কটকালে ছবি নির্মাণের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাওয়ায় স্টুডিওতে নিযুক্ত কর্মীদের কাজ দেওয়াই মুস্কিল হয়ে পড়ল। ফলে ট্রেড ইউনিয়নগুলি অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই কর্মীদের Protection দেওয়ার জন্য নতুন কর্মী নিয়োজনের প্রশ্নে বিধিনিষেধ আরোপ করলেন। এমন কি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন পরিচালকদের নিজেদের সহকারী নিয়োগের ব্যাপারেও স্বাধীনতা খর্ব করা হল। যদিও একথা ঠিক যে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সামনে অন্য কোনও পথ খোলা ছিল না, তবু film industry যেহেতু অন্য industry থেকে আলাদা চরিত্রের তাই প্রতিভাবানদের আসার ব্যাপারে নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম করার প্রয়োজন ছিল। অথচ এর পাশাপাশি নবাগতদের আগমন অব্যাহত থাকার ফলে পশ্চিম বাংলাতে নাট্য আন্দোলন ক্রমাগত শক্তিশালী হচ্ছিল এবং গ্রুপ থিয়েটারগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করছিল।

এই সময়ে চলচ্চিত্রের মত ব্যয়বহুল একটি শিল্প মাধ্যমে নবাগতদের আগমন অব্যাহত ও প্রতিভাধরদের সুযোগ দান করবার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের এগিয়ে আসা উচিত ছিল। তদানীন্তন মহীশূর রাজ্যে সরকারের অর্থ সাহায্যের ফলেই বহু নবাগত পরিচালকের সন্ধান পাওয়া যায় এবং এর ফলেই কর্ণাটকে আজ শুধু ভাল ছবিই নির্মিত হয় না, বেশী সংখ্যক ছবিও নির্মিত হয় যদিও কানাড়ি ভাষায় কথা বলেন এমন মানুষের সংখ্যা বাংলা ভাষাভাষী মানুষের চেয়ে অনেক কম।

ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের দুর্বলতা

এই সময়ে ফিল্ম সোসাইটিগুলির উচিত ছিল রুচিবোধসম্পন্ন ও মননশীল ছবিগুলিকে প্রচারের মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরা কিন্তু কলকাতার অদূরে মফঃস্বল সহরের একটি ফিল্ম সোসাইটি ব্যতীত অন্য কোনও সোসাইটিই এই গুরু দায়িত্ব পালন করেনি। তাঁরা যেভাবে নিজ অঞ্চলে কয়েকটি ভাল ছবি দেখবার জনমত গড়ে তোলেন তা সব সোসাইটির অনুকরণীয় হওয়া উচিত ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, ধনতন্ত্রের ঐ সঙ্কট চলচ্চিত্র আন্দোলনকেও স্পর্শ করেছিল।

পূর্বতন রাজ্য সরকারগুলির নিস্ক্রিয় ভূমিকা

রাজ্য সরকার কর্তৃক 'পথের পাঁচালি' নির্মাণ বাংলা চলচ্চিত্রে যে জোয়ার এনেছিল তাতে ঐ শিল্পের নাব্যতা যে বহুদিন বজায় ছিল তা পূর্বের আলোচনাতেই প্রকাশ পেয়েছে, অথচ এরপরেও রাজ্য সরকারগুলি চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতির জন্য কিছুই করেনি। পূর্বালোচিত ১৯৬২তে

নিয়োজিত সেন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতেও কোনও কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অবশ্য ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার এই ব্যাপারে কিছুটা অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁদের নিয়োজিত চলচ্চিত্র পরামর্শদাতা কমিটি কয়েকটি সুপারিশ করেন কিন্তু সেই সরকারের পক্ষে বিশেষ কাজে আর এগোনো সম্ভব হয়নি।

পূর্বতন রাজ্য সরকারের নৈরাজ্যজনক ভূমিকা

পূর্বতন রাজ্য সরকারের আমলেই বাংলা চলচ্চিত্রের মান সবচেয়ে নেমে যায় এবং সংকট গভীর থেকে গভীরতর পর্যায়ে প্রবেশ করে। বাংলা চলচ্চিত্রের মান নেমে যাওয়ার ব্যাপারে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার সামাজিক অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করতে তদানীন্তন কালের বিষাক্ত রাজনৈতিক আবহাওয়াও একটি উপাদান হিসেবে কাজ করেছিল। সেই রাজনৈতিক আবহাওয়ায় প্রায় বিনা বাধায় অপসংস্কৃতির প্রবেশ ঘটেছিল। একদিকে যখন মাননীয় মন্ত্রী 'ববি'র পার্টিকে গ্র্যাণ্ড হোটেলে আপ্যায়ন করতেন, 'বারবধূ'কে (নাটক) সার্টিফিকেট দিতেন অথবা পুরস্কার বিতরণী সভায় পরিচালকদের আরও 'অমানুষ'-এর মত ছবি করার উপদেশ দিতেন তখন বোঝাই যায় যে তাঁরা দেশে অমানুষের সংখ্যাই বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন, চলচ্চিত্রের উন্নতি নয়।

পূর্বতন রাজ্য সরকার চলচ্চিত্রকে কোন দিনই শিল্প মাধ্যম হিসাবে ভাবেন নি বরং তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে একে পণ্য হিসাবেই ভেবেছিলেন নতুবা বোম্বাই থেকে নায়ক আনিয়ে কলকাতায় বোম্বাই মার্কা হিন্দী ছবি তোলার কথা ভাবতেন না—সৌভাগ্যবশতঃ পরিকল্পনাটি কার্যকরী হয়নি। বাংলা ছবি প্রদর্শনের জন্য অন্ততঃ শতকরা ২০ ভাগ সময় বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব অথবা ছবি নির্মাণের জন্য ২৫ লক্ষ টাকার revolving fund গড়বার প্রতিশ্রুতি, সোনার বাংলা গড়বার আর সব কটা প্রতিশ্রুতির মত বক্তৃতার জালেই নিবদ্ধ থেকে গিয়েছিল। অবশ্য কিছুই করেনি বললে মিথ্যা হবে—সোনার বাংলা গড়তে না পারলেও, 'সোনার কেল্লা' নামে একটি ছবি তাঁরা নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু এক 'পথের পাঁচালি' যে জোয়ার ১৯৫৫র পরবর্তী বাংলা চলচ্চিত্র জগতে এনেছিল, এক 'সোনার কেল্লা'-র সে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ছিল না। সেই সময় প্রয়োজন ছিল চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য অর্থলগ্নীর সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সাংস্কৃতিক মানের উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা চালানো। কিন্তু সেরকম গঠনমূলক ব্যাপার তো দূরের কথা ঐ সরকার মেয়াদের শেষদিনগুলিতে হঠাৎ বাংলা ছবির ভালোবাসায় গদগদ হয়ে ব্যাপকভাবে করমুক্তির আদেশ দিলেন। বাংলা ছবির স্বার্থ নয়—ঐ সরকারের শেষদিনগুলিতে রাজ্যের অর্থকোষকে শূন্য করে দেওয়ার যে বৃহত্তর পোড়া মাটি নীতি অবলম্বিত হয়েছিল, এই বদান্যতা ছিল তারই অংশ বিশেষ।

বর্তমান রাজ্য সরকারের ভূমিকা

বর্তমান সরকার যে চলচ্চিত্র শিল্পের সংকট মোচনে আগ্রহী, সেটা তাঁদের কাজকর্মে লক্ষ্য করা গেছে। তাঁরা এটা উপলব্ধি করেছেন যে এই সংকট শুধুমাত্র Industry-রই নয়, Art এরও বটে এবং এই দ্বিমুখী সংকট পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তাই বর্তমান সরকার নিজস্ব ছবি প্রযোজনার ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীরূপে উল্লেখিত পরিচালকদেরই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সরকারের প্রযোজনায় মৃণাল সেন তাঁর 'পরশুরাম' ছবি শেষ করেছেন এবং উৎপল দত্তের 'ঝড়' সমাপ্তির মুখে, তা ছাড়া সত্যজিৎ রায় ও রাজেন তরফদারও সরকার কর্তৃক প্রযোজিত ছবি পরিচালনা করতে রাজী হয়েছেন। তবে অনেক প্রথম শ্রেণীর পরিচালক যখন অলস দিন কাটাচ্ছেন তখন একজন সফল নাট্যকারকে দিয়ে ছবি করানোর ব্যাপারটায় সঙ্গত কারণেই অনেক সম মত পোষণ করছেন না।

তাছাড়া সরকার শিশুদের জন্য আলাদা ছবি হওয়ার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে এই বছর পাঁচটি শিশুচিত্র নির্মাণ করতে মনস্থ করেছেন। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে শিশুচিত্র করার সময় সরকারকে অবশ্যই নজরে রাখতে হবে যে ঐসব চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিজ্ঞান বিরোধী অথবা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত নয় এমন কোনও ধারণা যেন শিশুদের মগজে প্রবেশ না করে এমন কি সে ছবি খুব বড় কোনো পরিচালক দ্বারা পরিচালিত হয় তবুও যেমন অন্যান্য ছবি প্রযোজনার সময় সরকারের লক্ষ্য রাখা উচিত সেইসব ছবিতে 'শিল্পের জন শিল্প'র কচকচানি না থাকে তাতে যেন মানুষের জীবন ও সংগ্রামের কথা শিল্পসম্মতভাবে প্রতিফলিত হয়।

প্রথম শ্রেণীর ছবি নির্মিত হওয়ার পর মুক্তির ব্যাপারে হল মালিকরা যাতে অসুবিধা সৃষ্টি করতে না পারে সেইজন্য সরকার ইতিমধ্যেই একটি আর্ট থিয়েটার গঠনে উদ্যোগী হয়েছেন।

আবার ভাল ছবি মুক্তি পেলেই তো হবে না তাকে ব্যবসায়িকভাবে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য চাই সত্যিকারের ভালো দর্শক, কেউ যদি শুধুমাত্র সত্যজিৎ রায় ও মৃণাল সেনের ছবির ব্যবসায়িক সাফল্যের মাপকাঠি দিয়ে এঁদের সংখ্যাকে বিচার করেন তবে তিনি ভুল করবেন কারণ এঁদের আন্তর্জাতিক খ্যাতির সুবাদে দর্শকের এমন এক অংশ এঁদের ছবি দেখতে ভীড় করেন, রাজেন তরফদারের ছবি মুক্তি পেলে যাঁদের খুঁজে পাওয়া যায় না অথবা যাঁরা হরিসাধন দাশগুপ্তের নাম পর্যন্ত শোনেননি।

কিন্তু বিগত কয়েক বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের সমাজ সংস্কৃতিতে যে অবক্ষয়ের বীজ রোপিত হয়েছিল, তা ঐ ধরণের দর্শক সৃষ্টি হওয়াকে গুরুতররূপে ব্যাহত করেছিল। সুখের কথা এই যে, রুচিবোধসম্পন্ন দর্শক সৃষ্টি হওয়ার

(শেষ অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়)

গণদেবতা

চিত্রনাট্য : রাজেন তরফদার ও তরুণ মজুমদার



চৌধুরী মশাই ও ছিরু পাল

ছবি : ধীরেন দেব

গণদেবতা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মিক্স।

দৃশ্য—১৬

(গ্রহণ করা হয়নি)

দৃশ্য—১৭

(বিলুর সংস্কৃত বই পড়ায় দৃশ্য দিয়ে বদলানো হয়েছে)

দৃশ্য—১৮, স্থান—ভাঙা কালীমন্দিরের ভেতর।

সময়—রাত্রি।

মন্দিরের মধ্যে কালী মূর্তির ক্লোজ শট্। পুরোহিত আরতি করছেন। ঘণ্টার শব্দ জোরে শোনা যায়।

কাট্ টু

দৃশ্য—১৯, স্থান—পুরোনো চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।

সময়—রাত্রি।

ক্যামেরা ভাঙা কালীমন্দির থেকে প্যান্ করে দেখায় একদল গ্রামবাসী ঠাকুর প্রণাম করছে। দূরে চণ্ডীমণ্ডপ। বিভিন্ন দিক থেকে লোকরা চণ্ডীমণ্ডপের চাতালে জড়ো হচ্ছে। কারো হাতে রয়েছে লণ্ঠন। একটা বড় কেরোসিন ল্যাম্প ঝুলছে মণ্ডপের সিলিং থেকে। মাদুর পাতা হয়েছে চাতালে। অনেকে বসে পড়েছে, কেউ কেউ বসার তোড়জোড় করছে।

নীচু জাতের অচ্ছুৎরা জড়ো হয়েছে নীচে একটু দূরে ষষ্ঠীতলায়। একদল বাউড়ির ছেলে সেখানে ছুটোছুটি চিৎকার করে খেলা করছে। ভূপাল চৌকিদার তাড়া করছে তাদের।

ভূপাল : এ্যাই! এ্যাই ছোঁড়ারা!…যা পালা! যা ঘরকে যা!

হঠাৎ সে দেখতে পায় সত্তর বছরের বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরী আসছেন। খণ্ডগ্রামের সম্ভ্রান্ত মানুষ তিনি। হরিজনরা একটু দূরে দাঁড়িয়েই মাথা নীচু করে নমস্কার জানায়।

ভূপাল : (হাত জোড় করে) আসেন…আসেন এজ্ঞে—

চণ্ডীমণ্ডপ থেকে ঘুরে দাঁড়ায় ভবেশ পাল, হরিশ মণ্ডল, মুকুন্দ, বৃন্দাবন এবং আরও অনেকে। সবাই-ই বলে।

সবাই :—আসেন!

—আসেন চৌধুরী মশায়!

চৌধুরী মশাই চটি ছেড়ে মণ্ডপের সিঁড়িতে উঠে মাটিতে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করেন। এবং উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে বলেন—

চৌধুরী : ব্রাহ্মণদিগে প্রণাম…আপনাদিগে নমস্কার…

ভবেশ : নমস্কার, নমস্কার—

চৌধুরী : ছিরু কোথায়, আমাদের শ্রীহরি?

লোকেরা মাঝখানটা ফাঁকা রেখে বসে পড়েছে। চৌধুরী মশাই এক কোণে গিয়ে বসেন।

কাট্ টু

দৃশ্য—২০

স্থান - ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে গ্রাম্য পথ।

সময় – রাত্রি।

ঘর্মাক্ত ছিরু পাল হাঁপাতে হাঁপাতে ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে হাঁটছে। ক্যামেরা তাকে অনুসরণ করে side track করে। ছিরু পালের হাতে একটা কল্কি মাঝে মাঝে সে ভীত চোখে পেছনে তাকাচ্ছে।

দূরে 'বায়েন পাড়ায়' কার যেন কান্না শোনা যায়, ঝাঁঝাঁনো সুরে একজন অন্যজনকে শাপান্ত করছে।

ছিরু পাল ফ্রেমের বাইরে চলে যায়।

কাট্ টু

দৃশ্য—২০ (ক)

স্থান—বায়েন পাড়া

সময় রাত্রি।

পাতু : (দুর্গার বন্ধ জানালার উদ্দেশ্যে) মর্-মর্-মর্ তু…বুন্ হইচে… সোহাগের বুন্.. গলায় দড়ি দে!

কাট্ টু

দৃশ্য—২১

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাশের গ্রাম্য পথ।

সময়—রাত্রি।

ছিরু পাল ক্যামেরার বাঁ দিক দিয়ে ঢোকে। ঝোপ ছেড়ে এখন সে রাস্তায়, হাঁপাচ্ছে, ঘাম ঝরছে শরীরে। শেষবারের মত বায়েন পাড়ার দিকে তাকিয়ে হাতের কল্কিটা ফেলে দেয়।

ক্যামেরা ট্রলি করে ছিরু পালকে অনুসরণ করে চলে। পুকুর ধার থেকে বাসনের শব্দ পেয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ে, খিড়কি পুকুরের দিকে তাকায়।

কাট্ টু

দৃশ্য—২২

স্থান—অনিরুদ্ধের বাড়ির দিকের খিড়কি পুকুর।

সময়—রাত্রি।

পানা আর শ্যাওলায় ঢাকা খিড়কি পুকুরটা বেশ বড়। পুকুরের অন্য পাড়ে পদ্ম বাসন মাজছে। একটা কুপি জ্বলছে পাশে।

কাট্ টু

দৃশ্য—২৩

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাশের গ্রাম্য পথ।

সময়—রাত্রি।

ছিরু পাল পদ্মর দিকে পশুর দৃষ্টি নিয়ে তাকায়।

কাট্ টু

দৃশ্য—২৪

স্থান অনিরুদ্ধের বাড়ির দিকের খিড়কি পুকুর।

সময়—রাত্রি।

কুপির আলোয় পদ্মর মিড্ ক্লোজ শট্। বাসন মাজার তালে তালে পদ্মর শরীরে ঢেউ উঠছে।

কাট্ টু

দৃশ্য—২৫

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাশের গ্রাম্য পথ।

সময়—রাত্রি।

ছিরু পাল চারদিকে তাকিয়ে একটা পাথর কুড়িয়ে নেয় এবং সেটিকে পুকুরের জলে ছুঁড়ে দেয়।

কাট্ টু

দৃশ্য—২৬

স্থান—অনিরুদ্ধের বাড়ির দিকের খিড়কি পুকুর।

সময় রাত্রি।

পদ্ম বাসন মাজতে মাজতে জলে ঢিল পড়ার শব্দ পেয়ে তাকায়।

কাট্ টু

জলের কতগুলো গোলাকার ঢেউ।

কাট্ টু

বিস্মিত পদ্ম এবার পুকুরের ওপারে তাকায়। তার মুখ শক্ত হয়ে ওঠে।

কাট্ টু

দৃশ্য—২৭

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাশে গ্রাম্য পথ।

সময়—রাত্রি।

পুকুরের ওপারে দাঁড়িয়ে ছিরু পাল।

কাট্ টু

দৃশ্য—২৮

স্থান—অনিরুদ্ধের বাড়ির পাশের খিড়কি পুকুর।

সময়—রাত্রি।

পদ্ম বাসনপত্রগুলো তাড়াতাড়ি হাতে গুছিয়ে নেয়। তারপর কুপিটাকে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে সে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে।

কাট্ টু

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাশের গ্রাম্য পথ।

সময়—রাত্রি।

কাট্ টু

দৃশ্য—২৯

স্থান—খিড়কি পুকুরের পাশের গ্রাম্য পথ।

সময়—রাত্রি।

ছিরু পাল উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে ফ্রেমের বাইরে চলে যায়।

কাট্ টু

দৃশ্য—৩০

স্থান—পুরানো চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দিরতলা।

সময়—রাত্রি।

চণ্ডীমণ্ডপে এখন দলবদ্ধ হয়ে নানা আলোচনা চলছে। হঠাৎ সবাই ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে কথা থামিয়ে দেয়।

কাট্ টু

ছিরু পালকে চণ্ডীমণ্ডপের দিকে আসতে দেখা যায়। ভূপাল হাত জোড় করে নীচু হয়ে তাকে প্রণাম করে।

কাট্ টু

একদল লোক চণ্ডীমণ্ডপের ওপর বসে আছে।

কাট্ টু

ছিরু পাল সিঁড়ির তলায় জুতো জোড়া খুলে রেখে লম্বা লম্বা পা ফেলে' দৃপ্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে আসে। ভিড়ে বসা একজনের গায়ে পা লাগলেও সে ভ্রূক্ষেপ করে না। ক্যামেরা জুম্ করে একটা খুঁটির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দেবু পণ্ডিতের ওপর এগিয়ে যায়।

কাট্ টু

ভবেশ : এসো বাবা...ছিরু এসো—

ছিরু পাল হরেন ঘোষাল ও নিশি মুখার্জির পাশ দিয়ে চলে আসে। ওদের দুজনের গায়েই পা ঠেকে। তাঁরা মুখভঙ্গী করে। ছিরু আরও এগিয়ে এসে সোজা মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটাতে বসে পড়ে। তারপর চারদিক তাকিয়ে পরিবেশটা যেন আঁচ করে নেয়।

কাট্ টু

হরেন : লোয়াইন।

নিশি : মানেটা কি হ'ল ?

হরেন : (চাপা গলায়) শূকর শাবক !
নিশি : তার মানে ?
হরেন : শুয়োরের বাচ্চা।

নিশি সশব্দে হেসে ওঠে।

কাট্ টু

ছিরু পাল নিশির দিকে তাকায়। Close shot

কাট্ টু

নিশি হাসি থামিয়ে ফেলে। Close shot

কাট্ টু

ছিরু পাল Close shot

কাট্ টু

ভীত সন্ত্রস্ত নিশি Close shot

কাট্ টু

ভয় দেখানোর দৃষ্টি নিয়ে চোখ ঘোরায় ছিরু পাল। ভূপালের দিকে তাকায় এবার।

ছিরু : ভূপাল !
ভূপাল : (হাত জোড় করে) এজ্ঞে ?
ছিরু : কি রে ?...তোদের সেই মানিক জোড় কোথা ?

কাট্ টু
দৃশ্য—৩১
স্থান : নদীর পাড়ের বাঁধ।
সময়—রাত্রি।

প্যানিং শটে আমরা দেখতে পাই অনিরুদ্ধ আর গিরিশ বাঁধের ঢাল দিয়ে নেমে আসছে। অনিরুদ্ধ হাতের টর্চ জ্বালায়। দূরে ময়ূরাক্ষীর ওপরে দেখা যায় জংশন স্টেশনের খুদে আলো।

অনিরুদ্ধ আর গিরিশ বালিভর্তি পাড়ের ওপরই জুতো দুটো ফেলে।

অনি : একটা সিগ্রেট দে তো!

গিরিশ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে অনিকে একটা দেয়। অনি সিগারেটটা ধরাতে যাবে হঠাৎ একটা বিকট শব্দ শুনে থমকে যায়।

কাট্ টু

সাইকেলে করে একটা ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে।

কাট্ টু
অনিরুদ্ধ এবং গিরিশ।

কাট্ টু

সাইকেলের সেই ছায়ামূর্তি ক্যামেরার দিকে এগিয়ে আসে।

কাট্ টু

অনিরুদ্ধ তাকে চিনতে পেয়ে সিগারেটটা লুকিয়ে ফেলে।

অনি : ডাক্তারবাবু নাকি গো ?

লোকটি সাইকেল থেকে নামে। নাম জগন ঘোষ, গাঁয়ের ডাক্তার। তাঁর চোখে চশমা, মাথায় টুপি, হাতে একটি স্টেথিস্কোপ,

জগন : এই যে !...জোড়া পাঁঠা !...চল্লি বুঝি ?
গিরিশ : এজ্ঞে ?
জগন : যা। এক কোপে ঘচাং !

জগন ডাক্তার এগিয়ে যান।

অনিরুদ্ধ : আপনি ? আপনি যাবেন না ?
জগন : (চকিতে ফিরে তাকিয়ে) আমি !!...ঐ ছিরে পালের পোঁ ধরতে ? ...হুঃ...কি ভাবিস, এই জগন ঘোষকে ?...যাবো, বুঝলি, যাবো ! যেদিন ঐ চণ্ডীমণ্ডপে বসে ও শালার বিচার হবে—সেদিন যাবো, তার আগে নয়।

জগন ডাক্তার এগিয়ে যান। চোখের আড়ালে যাবার আগে হাত নেড়ে চিৎকার করে বলেন—

জগন : এ শালা দুনিয়াটাই টাকার গোলাম !

কাট্ টু
দৃশ্য—৩২
স্থান—পুরনো চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির।
সময়—রাত্রি।

ক্যামেরা এক পাশ দিয়ে ট্রলি করে দেখায় উপস্থিত লোকদের অনেকেই যেন অধৈর্য, বিরক্ত, চঞ্চল।

ভবেশ পাল ও হরিশ মণ্ডল ফিস্ ফিস্ করে ছিরু পালের সঙ্গে কথা বলছে। ক্যামেরা হরেনের ওপর আসতে দেখা যায় সে ষষ্ঠীতলার দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করে—

হরেন : লুক্...কামিং !

কাট্ টু

অনিরুদ্ধ আর গিরিশ ষষ্ঠীতলা দিয়ে মণ্ডপের দিকে আসছে। অনি শেষ টান দিয়ে ঝোপে সিগারেটটা ফেলে দেয়।

কাট্ টু
ছিরু এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গ।

কাট্ টু

হরেন ঘোষাল এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ।

কাট্ টু

অনিরুদ্ধ আর গিরিশ এগিয়ে আসছে।

কাট্ টু

দেবু ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ।

কাট্ টু

অনিরুদ্ধ আর গিরিশ সোজা মণ্ডপে উঠে আসে। এবং বসে পড়ে।

অনিরুদ্ধ : কৈ-গো, কি বলছেন বলেন। অ.মরা খাটি খুটি খাই—আজ আমাদের এ বেলাটাই মাটি!

বলার স্বরে অতিরিক্ত ধৃষ্টতার আভাস পেয়ে সবাই-ই ভুরু কোঁচকায়।

ছিরু : মাটিই যদি ভাবিস তো আসবার কি'দরকার ছিল? ..না এলেই পারতিস।

হরিশ : আর এসেছিস তো ঘোড়াজুটো বাঁধ!

ভবেশ : অনেক নালিশ আছে তোদের নামে। বিচের হবে।

অনিরুদ্ধ : অ!...তা, বিচেরটা কে কইরবে?...আপনারাই?

ভবেশ : মানে?

অনিরুদ্ধ : নালিশও আপনাদের, বিচেরও আপনাদের—কেমন বিচেরটা হবে?

ছিরু : হারামজাদা! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা –

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে ছুটে এগিয়ে যায় সে অনিরুদ্ধর দিকে।

অনিরুদ্ধ : খবদ্দার!...খবদ্দার বুলছি—

ছিরু পাল অনিরুদ্ধর জামা চেপে ধরে। সবাই হুড়মুড় করে দাঁড়িয়ে যায়।

ছিরু : জুতিয়ে মুখের চামড়া একেবারে—

অনিরুদ্ধ : এ্যঁ—! জুতো দেখাইছে!...জুতো! এই সিদিন অব্দি তো খালি পায়ে মাঠে লাঙল ঠেলতে! নতুন মোড়ল হয়েই বুঝি—

ছিরু : কি বল্লি!

অনিরুদ্ধকে প্রায় মারতে শুরু করে ছিরু পাল। অনিরুদ্ধ বাধা দেয় ভবেশ, হরিশ, মুকুন্দ, গিরিশ, মথুর ও আরও সবাই চিৎকার করে ওঠে।

চৌধুরী : (অসহায়ভাবে) পণ্ডিত? পণ্ডিত কোথা গেলে গো?

কাট্ টু

দেবু কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে এগিয়ে আসে।

দেবু : (সজোরে) থামেন তো! থামেন আপনারা?

সবাই চিৎকার থামিয়ে দেবু পণ্ডিতের দিকে তাকায়।

দেবু : বসেন! বসেন সবাই!...অনি ভাই, গিরিশ—তোমরাও বোসো! —এমনি করলে কোন জিনিষের মীমাংসা হয়? (ছিরুকে) —তুমিও বোসো ভাইপো!

ছিরু : কেনে?...আমি বসব কেনে?...হারামজাদাদের—

দেবু : ছিঃ!...কোথায় দাঁড়িয়ে কথা বলছ, একটু হিসেব করে দেখো!... বোসো!

ছিরু প্রতিবাদের ভঙ্গীতেই বসে পড়ে।

ছিরু : বেশ, তবে তুমিই বলো।

চৌধুরী : হ্যাঁ হ্যাঁ সেই ভালো।

বৃন্দাবন : তুমিই বলো, তুমিই বলো পণ্ডিত—

হরেন : সাইলেন্স! সাইলেন্স!...নো টক্। ওয়ান ম্যান! (দেবুকে) বলো! ওয়ান টাইম টক্।

পরিবেশটা শান্ত হয়। দেবু পণ্ডিত কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে বলতে শুরু করে—

দেবু : ভাখো অনি ভাই, গিরিশ!...তোমরা ভালো করেই জানো... আজ থেকে প্রায় চার পুরুষ আগে...আমাদের এই শিবকালী পুরে কামার, কুমোর, ছুতোর কি তাঁতী এসব বলতে কিছু ছিল না। এটা ছিল আমাদের সদ্গোপদের গাঁ...চাষীদের গাঁ... অবিশ্যি দু-এক ঘর বামুনের কথা আলাদা। আমাদের কত্তারা...গাঁয়ের সব্বার সুবিধের কথা ভেবে ..প্রথম তোমাদের পূর্বপুরুষদের এখানে নিয়ে আসেন—

কাট্ টু

দৃশ্য ৩৩

স্থান—চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির। ফ্ল্যাশব্যাক দৃশ্য

সময়—দিন।

পঞ্চাশ বছর আগের চণ্ডীমণ্ডপ। একদল কামার, ছুতোর, তাঁতী পরিবার পরিজন নিয়ে চণ্ডীমণ্ডপ থেকে একটু দূরে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

গাঁয়ের মাতব্বর বৃদ্ধ রামনিবাস ঘোষ তাঁদের উদ্দেশ্য করে বলছেন—

রামবাবু : ভালো করে ভেবে ভাখ—সমচ্ছর গাঁয়ে থেকে গাঁয়ের লোকের সব কাজ করে দিতে হবে তুদিগে।

হৃদয় : আজ্ঞে আচ্ছা।

রামবাবু : হুট বলতে গাঁয়ের বাইরে যেতে পারবি না কিন্তু—

হৃদয় : আজ্ঞে ঠিক আছে

রামবাবু : মুজুরী হিসাবে ধান পাবি—ধান—যার যার হিসেব মতো—

(শেষ অংশ ২৭ পৃষ্ঠায়)



নীরবতার ছবি ঃ বার্গম্যান

দ্বিতীয় সূত্র : 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরী' (১৯৫৭)

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

"আত্মমগ্ন যে-জন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে"
—রবীন্দ্রনাথ

ইতিপূর্বে ১৯৭৭ সালের শারদ সংখ্যা 'চিত্রবীক্ষণে' আমি উল্লেখ করেছি বার্গম্যানের 'সেভেন্থসীল', 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরী' এবং 'সাইলেন্স'—এই তিনটি শ্রেষ্ঠ ছবির ঐক্যসূত্র হচ্ছে **নীরবতা**। 'সেভেন্থসীল' ছবির ব্যাখা সেই সংখ্যায় করা হয়েছে, খৃস্টীয় তত্ত্বে সামূহিক বিনাশের আগের যে 'নীরবতা'—সেই সময়টুকুর একটি ছবি—সুইডেনের বারোশ শতকের সামাজিক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে—বার্গম্যান দিয়েছেন। এবং তাতে দেখা যাচ্ছে বার্গম্যানের নিজের শিল্পীচরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, দেখা যাচ্ছে যখনই খ্রীস্টীয় ধর্মীয় প্রসংঙ্গ ছেড়ে 'মানবিক' চরিত্র বা প্রসংগে তিনি এসেছেন তখন তাঁর এক অসাধারণ মহিমা—যার প্রকাশ 'সেভেন্থসীলে'র স্কোবার-এর চরিত্রে।

বার্গম্যান 'সেভেন্থসীলে'র মধ্যযুগীয় পরিবেশ থেকে আমাদের 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরী'র আধুনিক যুগে নিয়ে আসেন—প্রথম ছবির মত গুরুত্বপূর্ণ ছবির মাত্র আটমাস পরে রচিত এই দ্বিতীয় ছবিতে—যা এক অসামান্য চলচ্চিত্র প্রতিভার পরিচয়। 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরী' ছবিতে তিনি এক প্রাক্-বৈনাশিক নীরবতাকালীন বৃদ্ধের অবস্থা থেকে আমাদের নিয়ে আসেন আইস্যাক বোর্গ নামক এক প্রবীন বৃদ্ধের মানসলোকের নীরব এক সত্যান্বেষণের স্মৃতি-ভারাক্রান্ত সংগ্রামে।

আইস্যাক বোর্গ (যার চরিত্রে সুইডেনের বিগত কালের একজন শ্রেষ্ঠ পরিচালক ভিক্টর সীস্ট্রম অসামান্য অভিনয় করেছেন) বুদ্ধিজীবী জীবনের সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছেছেন এমন একজন পণ্ডিত ডাক্তার হিসেবে যেদিন দূরবর্তী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিশেষ সম্মানে ভূষিত হবেন, তার আগের রাত্রি থেকে স্মৃতি ও মনের মধ্যে তিনি নিজের সত্যিকার মূল্যায়ন করতে চাইলেন—আত্মানুসন্ধান। চেখভের পাঠক এই থীমটির সংগে 'A Dull Story from a Note Book of an Old Man'—নামে চেখভের গল্পের থীমের মিল খুঁজে পাবেন। এই গল্পের বৃদ্ধ নায়ক প্রোফেসার স্টেপানোভিচ, তিনিও দেশ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এবং আত্মানুসন্ধান রত। যদিও দুজনের আত্মানুসন্ধানের রূপ এক নয়। কিন্তু দুজনেই কর্মজীবনের সফলতার প্রান্তে এসে অনুভব করলেন, তাঁরা এক মৃত আইসবোর্গ বা মৃত প্রোঃ স্টেপানোভিচকে বহন করছেন। বাইরের সাফল্য ও অসংখ্য মানুষের কাছে লব্ধ বুদ্ধিজীবী জীবনের কীর্তির উজ্জ্বলতার আড়ালে তাঁদের আত্মা মৃত বা মৃত প্রায়, কেননা তাঁরা যা কিছু করেছেন তা কীর্তি স্থাপনের লোভে, এক শুষ্ক আত্মতৃপ্তির তাড়নায়, প্রেমহীন বুদ্ধিবাদের ঝোঁকে, মানুষকে ভালোবাসতে পারেন নি। জীবনে একদিকের সাফল্যের চূড়ায় বসে লক্ষ্য করছেন আসল জায়গাটা শূন্য। "আমি ভাবছি আমি কে—কেন এখানে বসে আছি।...আমার খ্যাতি ও সমাজে আমার উচ্চ সিংহাসন টিঁকিয়ে রাখতে? আজ আমার উত্তর হচ্ছে আমারই বিদ্রূপের হাসি!...যৌবনে কী ভাবে নিজের যশ, খ্যাতি, বুদ্ধিজীবীর মধ্যে আমার স্থান ইত্যাদি ব্যাপারকে কত বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখেছি!...আর আজ...অন্য আর কারুর দোষ নেই—কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলছি, আজ আর আমার যশের প্রতিও কোন ভালোবাসা নেই। এই সবই তো আমাকে ঠকিয়েছে।"..."আমি হেরে গেছি।"—এই হচ্ছে চেখভের বৃদ্ধ নায়কের আত্ম উপলব্ধি। চেখভ ইঙ্গিত দিয়েছেন এতবড় বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্টেপানোভিচের জীবনের শেষ কটি দিনের একমাত্র আলোকিত দিক হচ্ছে পালিতা কন্যা কাটিয়ার প্রতি তাঁর মানবিক স্নেহ ও প্রীতি। অর্থাৎ মানুষকে ভালোবাসার ক্ষমতা যদি চলে যায়, সমস্ত কীর্তি, পাণ্ডিত্য নিয়েও মানুষ মৃত।

বার্গম্যানের 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরী' বৃদ্ধ নায়ক বোর্গ সেই একই উপলব্ধির মধ্যে আমাদের নিয়ে চলেন। কিন্তু চিত্রময়তায়, 'মেটাফর'গুলির বিশেষ চয়নে, যুক্তির বিন্যাসের ধারায়, পার্শ্বস্থ চরিত্রগুলির চিত্রায়নে—নাটকীয় পরিস্থিতির বিন্যাসেও চেখভের গল্প এবং বার্গম্যানের ছবির স্বাদ অবশ্যই ভিন্ন। এবং তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, চেখভ যেখানে কাটিয়ার প্রতি বৃদ্ধ-নায়কের মানবিক স্নেহ ও প্রীতির মধ্যে মুক্তির ইশারাটুকু ফুটিয়ে গল্পকে যেন 'ওপেন এণ্ডেড' অবস্থায় শেষ করেছেন, বার্গম্যান সেখানে বোর্গের পরিপূর্ণ মুক্তির চিত্ররূপ উপহার দিয়েছেন।

এই ছবিতে বার্গম্যানের পরিচালক হিসেবে কৃতিত্ব দুটি ক্ষেত্রে—চলচ্চিত্রে এক্সপ্রেশনিস্ট চিত্রকল্প সৃষ্টির জাদু—এবং স্বপ্নের ব্যবহারের মধ্যে যুগান্তকারী প্রথাভঙ্গকারী সৃজনশীলতা। প্রথমেই বোর্গ যে দুঃস্বপ্ন দেখেন, যেখানে কয়েকটি 'প্রতীক'কে চাবির (key) মত আশ্চর্যভাবে ব্যবহার করে বোর্গের অন্তর্লোকের গহন-প্রদেশে বার্গম্যান নিয়ে যান—এক জনশূন্য নগরপথ, মধ্য দুপুর তবু জনশূন্য'—(এবং মধ্যরাত্রি হলে বোর্গের খ্যাতিময় জীবনের প্রতিচ্ছবি হিসেবে এটি এত তীব্র হতনা) একটা ঘড়ি তার কাঁটা নেই (মৃত্যুর ইঙ্গিত), একটা চোখে ঠুলি বাঁধা চলমান ঘোড়া (বোর্গের প্রেমহীন জীবনের কর্মধারা?) এবং সেই ভাঙ্গা ঘোড়ার গাড়ী থেকে পড়ে যাওয়া শবাধার, তার মধ্যে একজন মৃত মানুষের হাত, মৃতের হাতের মধ্যে বন্দী বোর্গের হাত, তীব্র ভীতি ও সেই নাটকীয় চরম উদ্‌ঘাটন—মৃত মানুষটি আসলে বোর্গ নিজে—এ তাঁর আত্মার মৃত দেহ—যা তিনি শরীরে বহন করে চলেছেন। সমস্ত পরিবেশে ছায়াহীন আলো, শব্দ ও ক্যামেরাকে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তা বিশ ত্রিশ দশকের বিখ্যাত জার্মান এক্সপ্রেশনিস্ট পরিচালকের সাধ্য ছিল না। ঘুমন্ত বোর্গ,

যে-কিনা পরের দিন জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার নিতে যাবে, তার এক ভয়ংকর আত্মদর্শন !

এই মৃত আত্মার দর্শনের পর তিনি বুঝতে পারেন, তাঁর আসল স্বরূপ। গাড়ীতে পুত্রবধূর সংগে যাত্রাকালীন, পুত্রবধূর মুখে তাঁর সমালোচনায় রাত্রের দুঃস্বপ্নের মর্ম কিছুটা বুঝতে পারেন। পুত্রবধূ বলে বোর্গ একজন অহংবাদী, শুধু বোর্গ নিজে নয়, বোর্গরা সবাই, তাঁর পুত্রও—যে চায় না তার স্ত্রী পুত্র লাভ করে। তাদের গাড়ী পথপার্শ্বে সেই গ্রামটিতে পৌঁছায়, যেখানে বোর্গ তাঁর কৈশোর ও প্রথম যৌবন কাটিয়েছেন, যেখানে ঘটেছে তাঁর প্রথম প্রেম। গোটা সিকোয়েন্সটি একটি 'মেটাফর' সদৃশ, শুধু দূরবর্তী স্থণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ খেতাব নেবার পথের মধ্যেই নয়, যেন জীবনের চরম প্রান্তে পৌঁছবার পথেও বোর্গ হঠাৎ একবার দেখে নিতে চাইলেন জীবনের যাত্রাপথের আদি দিকচিহ্নগুলি। গাড়ী ঢুকল ঘন গাছ গাছালির মধ্যে। যেখানে বসে দিবা স্বপ্নে দেখলেন সেই লুপ্ত শেষ-কৈশোরকালের বন্ধুদের বান্ধবীদের আত্মীয় স্বজন, সেই কৈশোরের পরিবেশ 'সেদিনের খুঁটিনাটি এবং সারা'কে—তাঁর প্রথম প্রেম। অবিকল সেই পঞ্চদশী বা ষোড়শীর চেহারায়। দেখলেন কেমন করে সারা তখন তরুণ বোর্গকে ভালবাসত, আর বোর্গ তাকে তার শীতল হৃদয়ের ঔদাসীন্য দিয়েছে, কেমনভাবে এই ঔদাসীন্য সারাকে দুঃখ দিয়েছে, এবং ঠেলে দিয়েছে সারাকে বোর্গের অন্য ভাইয়ের কাছে, সারা যাকে ভালবাসেনি। সারা আহত, সারা সমগ্র পরিবারের উপহাসের বস্তু, কাঁদছে দরজার বাইরে। এবং বোর্গ, আজকের বৃদ্ধ বোর্গ যেন দেখছেন তাঁর পাশে সেদিনের সারা কাঁদছে—আজকের প্রাজ্ঞ বোর্গ সমবেদনায় কাতর, চাইছেন সান্ত্বনা দিতে এই দুঃখী মেয়েটিকে, ঝুঁকে পড়ছেন কিছু বলতে……কিন্তু হায় মাঝখানে এক অসীম ব্যবধান, কালের ব্যবধান—প্রায় পঞ্চাশ বছরের ব্যবধান। এই সিকোয়েন্সটি, উক্ত শটটি বিশ্বচলচ্চিত্রের এক-চিহ্নদৃশ্য মাইলস্টোন। ইতিপূর্বে এমন স্মৃতি বা স্বপ্নের দৃশ্যের যুগান্তকারী দিক চলচ্চিত্রগত ব্যবহার কেউ করেন নি (যদিও বিগতকালের একটি সুইডিশ ছবি 'মিস জুলি'তে এই ধরণের একটি ব্যবহার ছিল, কিন্তু সেটি যেন নিতান্তই প্রকরণগত, প্রথম শৈল্পিক ব্যবহার বার্গম্যানের—একথা বলেছেন বেশির ভাগ চলচ্চিত্র ঐতিহাসিক।)

এই ব্যবহার পরম আশ্চর্যের এই জন্যে যে এটাই স্বপ্ন দৃশ্য গঠনের একমাত্র চেহারা হওয়া উচিত ছিল—অথচ এটাই কেউ এতকাল করেন নি। বস্তুতঃ আমরা যখন স্বপ্ন দেখি তখন আমরা আমাদের বর্তমান মানসিকতায় (তা চেতন অবচেতন যাই হোক না) মধ্য দিয়েই দেখি। পঞ্চদশ বছরের প্রথম প্রেমের নায়িকাকে তার ফ্রক পরা চেহারায় দেখলেও, যদি আমার বয়স হয় বর্তমানে পঁয়ত্রিশ, আমি আমার এই পঁয়ত্রিশ বছরের বয়সের অভিজ্ঞতা, মানসিকতা, মূল্যবোধ ও পরিপক্কতা দিয়েই স্বপ্নে তাকে দেখব। অর্থাৎ স্বপ্ন দেখাকালীন 'এই আমি'কে যদি চলচ্চিত্রে 'externalise' করতে হয়, এই স্বপ্ন দেখা আমাকে যদি দৃশ্যগতভাবে উপস্থিত করতে হয় তবে আমাকে আজকের পঁয়ত্রিশ বছরের মানুষ হিসেবেই দেখাতে হবে। যেমন পঁয়ত্রিশ বছরের কোন স্বপ্নে আমার অবচেতনা কিছুতেই আমার সতেরো বছরের অবচেতনায় ফিরে যেতে পারেনা, তেমনি এই বর্তমানের কোন রাত্রির দেখা স্বপ্নে যে-আমি স্বপ্ন দেখছি সে-আমি কিছুতেই আবার কিশোর হয়ে যেতে পারিনা। অথচ এতকাল ধরে চলচ্চিত্রে স্বপ্নদৃশ্যগুলিতে এই অযৌক্তিক কাণ্ডই হয়ে এসেছে—দুজন সুইডিশ চলচ্চিত্রকার (প্রথমে মিস্ জুলি-তে Alf Sjoberg ও পরে যথার্থ শৈল্পিক ভাবে আলোচ্য ছবিতে বার্গম্যান) এতদিনের একটি ভ্রান্তিকে এত সহজে নিরাকরণ করলেন।

আমরা এই ছবিতে আইস্যাক বোর্গ দৃষ্ট স্বপ্ন ও দিবাস্বপ্নের সংগে (যেটি লুপ্ত প্রেম সম্পর্কিত) রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা' গদ্যকাব্যের একটি রচনার গভীর মিল লক্ষ্য করি, শুধু সেখানে যে চিত্রকল্পগুলি আছে তার সংগে মিলই নয়, সেখানেও দেখি কবি বৃদ্ধ বয়সে তাঁর পচিশ বছর বয়সের একটি অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করছেন এবং আমরা দেখছি এখানে কবি নিজে বৃদ্ধই, কিন্তু তাঁর সেই পঁচিশ বছরের 'অভিজ্ঞতা'টি তেমনি তরুণী। বোর্গের দুটি স্বপ্নের দৃশ্যেই দেখি (প্রথমটি দিবাস্বপ্ন) বোর্গ তাঁর কৈশোরের লীলাভূমি যে বাসস্থানের দিকে যাচ্ছে তা আজ গাছ গাছালিতে পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের লিপিকার সেই রচনা—'প্রথম শোক"—এর প্রথম ছবিটি হচ্ছে, 'বনের ছায়াতে যে পথটি ছিল, আজ সে ঘাসে ঢাকা।' স্মৃতির রাজ্যে যাত্রায় এদুটি ছবিই নস্টালজিয়া উদ্রেক করে—যেন ঘাস বা গাছগাছালি নয়, কালের বিস্তৃতিকে মাড়িয়ে চলা। রবীন্দ্রনাথের উক্ত কবিতাটি, রবীন্দ্রপাঠক জানেন, তাঁর বৌঠান কাদম্বরীর অকালমৃত্যুর শোকের স্মরণে লিখিত, যখন বৌঠানের বয়স ছিল পঁচিশ ছাব্বিশ, কবির বয়স পচিশ। কবি যখন কবিতাটি লিখছেন তখন তিনি প্রায় বৃদ্ধ, 'প্রথম শোকের' মূর্তিতে কিন্তু সেই পঁচিশ বছরের যুবতী অসামান্য মহিলাটি মূর্তি হচ্ছেন। কবি লিখছেন, 'আমার তো সব জীর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু তোমার গলায় আমার পঁচিশ বছরের যৌবন তো ম্লান হয়নি।'…সে বলল "আমি সেই অবধি ছায়াতলে গোপনে বসে আছি—আমাকে বরণ করে নাও।" কবিতায় আমরা যে ছবি পাচ্ছি, সেখানে দেখি বৃদ্ধ কবি যেন তাঁর পঁচিশ বছর বয়সের চেনা-জানা সেই তরুণী কাদম্বরী দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে, যার বয়স যেন পঁচিশ ছাব্বিশে এসে থমকে গেছে। কবি কিন্তু বৃদ্ধ।

আমার এই আলোচনার উদ্দেশ্য যে বার্গম্যান স্বপ্নদৃশ্য গঠনে চলচ্চিত্র ভাষায় যে নূতন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন, তা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে নূতন

মাও সে তুং বলেছেন, "মানুষ যখন শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত তখন সে একা, যখন সে তার পরিবারের পাঁচজনকে ভালোবাসে তখন সে একাই পাঁচজন, যখন সে গ্রামের একশ মানুষকে ভালোবাসে তখন সে একাই একশ, যখন সে সমগ্র জনগণকে ভালোবাসে, তাদের জন্য ভাবে— তখন সে একাই অসংখ্য। মানুষের স্বার্থপর না হওয়াই তো স্বাভাবিক।"

কিন্তু তবু দেখা যায় একালে মানুষের স্বার্থপরতাই বরং স্বাভাবিক ঘটনা। কেননা শোষণ ভিত্তিক সমাজে মানুষ বোঝে নিজের কড়ি নিজে বুঝে না নিলেই ঠকবে, এই সমাজ ব্যবস্থা একটা মানুষকে শুধু অন্য মানুষের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। এবং এই প্রতিযোগিতামূলক সমাজের উপরি সৌধে জমে ওঠে স্বার্থপরতা ও আত্মমগ্নতার রূপ চর্চা। ইদানীং দেখা গেল, এমন কি বিপ্লবের পরেও, নূতন উপরি সৌধেও, আগেকার উপরি সৌধের আত্মমগ্ন স্বার্থপরতার ভূতগুলি আবার জেগে উঠতে পারে, সুতরাং অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের বহুকাল পরেও দরকার পড়ে নূতন বিপ্লবের, আত্মিক নৈতিকতার ভিতটিকে বারবার নাড়া দিয়ে বৃহত্তর মানবমুখী করার, যার নাম 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব'।

এবং তখন মনে হয়, 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরী'র আইসাক বোর্গ যে সহজ শিক্ষাগুলি লাভ করেছিলেন তাঁর যন্ত্রণাময় আত্মানুসন্ধানের মধ্যে সেগুলি খুবই প্রাসংগিক। বিনয়, মানুষকে ভালোবাসার ক্ষমতা, মানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়ার মত শক্তি—এগুলি আজো মৌলিক মানবিক নীতি।

অবশ্যই এছবি একটি ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে। কেন আইসক বোর্গের মত এত বড় পণ্ডিত ডাক্তার এত স্বার্থপর হয়, তার সামাজিক প্রেক্ষাপট বার্গম্যান বিশ্লেষণ করেন না।

কিন্তু বার্গম্যানের কাছে কি এতটা আশা করা দুরাশা নয়? এবং তারই মধ্যে যা পাওয়া যায় তাও কি অনেক নয়, যেহেতু যেটুকু বলা হয়েছে তা এমন শৈল্পিক ভাবে সার্থক যে আমাদের মর্মে প্রবেশ করে। এ ছবির কাব্যিক সুষমা ও সাংগীতিক গঠনের কী কোন তুলনা সম্ভব!

'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরী' বার্গম্যানের শ্রেষ্ঠ মানবিক ছবি।

'নীরবতা পর্যায়ের তৃতীয় ছবি 'সাইলেন্স' নিয়ে পরে আলোচনার ইচ্ছা রইল॥

গণদেবতা (চিত্রনাট্য)

(২০ পৃষ্ঠার পর)

হৃদয় : যে আজ্ঞে·········

রামবাবু : না না, ভালো করে ভেবে দ্যাখ্—পরে আবার কথা ওলটাস নি যেন !

হৃদয় : আজ্ঞে ছি ছি, তা কি হয় বলেন !

রামবাবু : তাহলে নে, এইখানে পেন্নাম কর্—আজ থেকে এই নিয়ম বহাল রহিল।

হৃদয় এবং তার দলবল এগিয়ে এসে চণ্ডীমণ্ডপের একটি পাথরের ওপর প্রণাম করে। ক্যামেরা টিল্ট ডাউন করে দেখায় সেই পাথরের ওপর খোদাই করা আছে।

"যা ব চ্চ ন্দ্রা র্ক মে দি নী"

দেবু : (off voice) চণ্ডীমণ্ডপের সেই পাথরটা আজো তেমনি আছে।

কাট্ টু

দৃশ্য—৩৪

স্থান—পুরনো চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির। ফ্ল্যাশ ফরওয়ার্ড।

সময়—রাত্রি।

দেবু—কিন্তু নিয়মটা তোমরা দুজনে মিলে ভেঙে দিলে। কি করলে—নিজেরাই ভেবে দেখো।······আজ তোমরা ভাঙলে······কাল আরেকজন······পরশু আরেকজন······ তারপর আরেকজন······এই কত্তে কত্তে একদিন দেখবে চণ্ডীমণ্ডপের বনেদটা শুদ্ধু ভেঙে চৌচির হয়ে গ্যাছে !··· কিন্তু তাতো আর হতে দেওয়া যায় না ! গাঁয়ে তোমাদের পাট রাখতেই হবে !

হরেন : হিয়ার—হিয়ার !···হিয়ার—হিয়ার !

দেবু বিরক্তির দৃষ্টিতে হরেনের দিকে তাকায় আর হাত তুলে তাকে থামতে বলে।

হরেন থেমে যায়।

দেবু : (বসতে বসতে) এই আমাদের কথা !

হরিশ : ঠিক !

ভবেশ : এই কথা !!

অনিরুদ্ধ : (এক মুহূর্ত থেমে) ও !···তাহলে আমাদের কথাটাও বলি ?

চৌধুরী : বলো !—নিশ্চয়ই বলবে !

অনিরুদ্ধ : দেখেন,—কাজের বদলে ধান—সেকথা আমরাও জানি। কিন্তু ···সে ধান যদি না পাই ?

ছিরু : 'না পাই' !···না পাই মানে ?

অনিরুদ্ধ : পাই না !···বাকি পড়ে থাকে ! শেষবেশ 'বলোহরি হরিবোল' হয়ে যায় !

ছিরু : কে ? কে দেয় না, শুনি ?

অনিরুদ্ধ : কেনে ? নাম বুলতে হবে ?

ছিরু : আলবাৎ হবে ! সভার ভেতর কথাটা তুললি—নাম বলতে হবে না মানে ?

অনিরুদ্ধ : বেশ, তাহলে বুলছি ! (হঠাৎ ছিরুর দিকে আঙুল বাড়িয়ে) এই তুমি দাও নি !

ছিরু : এঁ্যা ?

অনিরুদ্ধ : বলো !···বুকে হাত রেখে বলো—দিয়েছ তুমি গেল দু'সন ?

ছিরু : আর সেবার যে তুই ঘর ছাইবার লেগে তু হ্যাণ্ডনোটে আমার কাছ থেকে টাকা ধার লিলি—তার ক' টাকা উশুল দিয়েছিস শুনি ?

অনিরুদ্ধ : তারও তো একটা হিসেব আছে !···ধানের দাম হ্যাণ্ডনোটের পিঠে উশুল দিতে হবেতো,—না কি ? (সবার দিকে চেয়ে) কি বলেন আপনারা ?···বলেন !

দেবু : ঠিক কথা ! (ছিরুকে) আগেই করা উচিত ছিল !

চৌধুরী : বাবা ছিরু, এ কিন্তু তোমার মেনে নেওয়া উচিত বটে !

ছিরু : (রুষ্ট স্বরে) ঠিক আছে, ঠিক আছে !

দেবু : (অনিরুদ্ধকে) আর কোথায় কি পাবে বলো আমরা নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে আদায় করে দেবো।

ভবেশ : ব্যাস্, আরতো কোনও কথা নাই ?

অনিরুদ্ধ ও গিরিশ কোন উত্তর দেয় না।

হরিশ : কি রে ?

হরেন : স্পীক্······স্পীক্······

অনিরুদ্ধ ও গিরিশ এক মুহূর্ত দুজনের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করে হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়।

অনিরুদ্ধ : আজ্ঞে আমাদের মাপ কত্তে হবে !

এই কথা শেষ হতে না হতেই চিৎকার শুরু হয় চারি দিক থেকে

—কেন ?

—হোয়াই ?

—বোসো ! বসে কথা কও !···

চৌধুরী : আহা আস্তে,······আস্তে······

হরেন : (লাফিয়ে উঠে) দিস্ ইজ ব্যাড ! —অত্যন্ত ব্যাড্ ! কি ভাবিস তোরা আপনাদিগের ?

অনিরুদ্ধ : (হাত তুলে) তাহলে শোনেন !

হরেন : কি ? কি হুজুর ?

মুকুন্দ : শোনবার আছেটা কি ?

অনিরুদ্ধ : (গলা চড়িয়ে) শোনেন শোনেন···বুলছি। ধার নিয়ে কাজ ···আর আমাদের পোষাইচে—নাক !

সভা বিক্ষোভে যেন ফেটে পড়ে।

—হোয়াট ?

—কেনে ?

—হঠাৎ একথা ?

রমেশ : আপনাদের চোদ্দ পুরুষের যা পুষিয়েছে হঠাৎ আপনাদের পোষাইছে না কেনে ?

অনিরুদ্ধ কথা বলতে শুরু করলে ধীরে ধীরে ক্যামেরা চার্জ করে তার ওপর।

অনিরুদ্ধ : দিন কালটা ভাবেন ! জিনিষপত্তর কতো আক্রা হইছে সেটা ভাববেন তো ? আগে আগে গাঁয়ের সব কাজ করতাম— আপনারাও আমাদিগে সব কাজ দিতেন !...... আজকাল দ্যান্ ? যখন যেথানে যেটা সস্তা পান অমনিতো শহর থিকে কিনে নিয়ে আসেন ! কৈ সে বেলাতো অনিরুদ্ধ গিরিশদের কথা মনে পড়ে না ! ইদিকে গাঁয়ের জমি...... দিনকে দিন গিয়ে ঢুকছে কঙ্কনার বাবুদের গভ্ভে !...... আমাদেরও কাজ কমছে !......

(off voice) এই তারিনী দাদা—এই সিদিন অব্দি ছিল চাষা ! আর আজ...... ?

কাট্ টু

ক্যামেরা জুম্ করে এগিয়ে যায় একটু দূরে বসা তারিনীর দিকে। তারিনীর পাশে উচ্চিংড়েও আছে। এতক্ষণ সে সভার কাজ দেখছিল নীরবে।

কাট্ টু

দৃশ্য—৩৫

স্থান—একটি জংশন স্টেশন।

সময়—দিন

ক্যামেরা জুম্ ব্যাক্ করলে দেখা যায় তারিনী স্টেশনের প্ল্যাটফরমে গান করে ভিক্ষে চাইছে।

কাট্ টু

দৃশ্য—৩৬

স্থান—পুরনো চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির

সময়—রাত্রি

অনিরুদ্ধ : (বলে চলে) তাহলে ? তাহলে আমরা কাদের কাজ করব ? পেটে দোবো কি ? বলি। আমাদেরও তো নিজেদের কিছু চাই—না কি ?

ছিরু : (উপহাস করে) হেঁ হেঁ, তাতো চাই-ই ! আজকাল জুতো চাই,......

বাবু কাট্ জামা চাই—

ভবেশ : সিগরেট্ চাই—

ছিরু : তারপর ধর্ পরিবারের লেগে সেমিজ চাই, বডিস চাই—

ভবেশ আর হরিশ বিদ্রূপের সুরে সশব্দে হেসে ওঠে।

কাট্ টু

অনিরুদ্ধ : (গর্জে ওঠে) ছিরু মোড়ল ! ! হিসেব করে কথা কয়ো বলে দিলাম !

ছিরু : হেঁ হেঁ, হিসেব আমার করাই আছেরে বাপ্ ! (পকেট থেকে হ্যাণ্ডনোটের কাগজটা বার করে)—পঁচিশ টাকা ন' আনা তিন পয়সা। আসল দশ, বাকিটা সুদ। বিশ্বেস না হয় তো দেখে নিতে পারিস। বলি, শুভংকরী টুভংকরী জানিস তো ?

ভবেশ আর হরিশ আবার হেসে ওঠে সশব্দে।

হঠাৎ অনিরুদ্ধ উঠে দাঁড়িয়ে চলে যেতে উদ্যত হয়।

ছিরু : (দাঁড়িয়ে) এ কি ? চলে যেচ্ছিস যে !

চৌধুরী : (ছিরুর হাত ধরে) বাবা ছিহরি—

চকিতে ছিরু পাল কুৎসিৎ চিৎকারে ফেটে পড়ে যেন, বৃদ্ধ চৌধুরী মশাইকে বলে—

ছিরু : আপনি থামেন তো ! তখন থেকে খালি 'ছি-হরি' ছি-হরি' 'ছি-হরি' (সামনের দিকে চেয়ে) অনিরুদ্ধ !

কাট্ টু

অনিরুদ্ধ ক্যামেরার দিকে পেছন করে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

কাট্ টু

অনিরুদ্ধর যাবার পথে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে ছিরু পাল। তারপর দ্বারকা চৌধুরীর দিকে ফিরে অবজ্ঞার সুরে বলে ওঠে—

ছিরু : যত্তো সব......বুড়ো হাবড়ার......

বাকি কথাগুলো বিড় বিড় করে বলে।

ছিরু : (বলতে বলতে) কি বলবেন, ...বলেন !

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্, দ্বারকা চৌধুরী স্তম্ভিত।

কাট্ টু

ক্লোজ শট্। ছিরু পাল।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্। দ্বারকা চৌধুরী।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্। দেবু পণ্ডিত।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্। হরেন, শম্ভু ও আরও কয়েকজন।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্। ভবেশ ও আরও কয়েকজন।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—গিরিশ, হীরা ও আরও কয়েকজন।

কাট্ টু।

ক্লোজ শট্—দ্বারকা চৌধুরী স্তম্ভিত, পাথরের মত দাঁড়িয়ে। অপমানটা তিনি সহ্য করতে পারছেন না, কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন, যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। ধীরে ধীরে তিনি লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ান। হাতজোড় করে সভার উদ্দেশ্যে বলেন।

চৌধুরী : ব্রাহ্মণদিগে প্রণাম……আপনাদিগে নমস্কার……

তারপর ধীরে ধীরে চলে যেতে শুরু করেন। এবং একটু এগিয়ে অফ ভয়েসে ডাক শুনে থেমে দাঁড়ান।

দেবু : (off voice) দাঁড়ান!

কাট্ টু।

দেবু ভিড়ের মধ্য দিয়ে চৌধুরী মশাই এর কাছে এগিয়ে আসে। ছিরুর দিকে তাকিয়ে তাকে তিরস্কার করে, বলে—

দেবু : ছি ছি ছি,—কি ভেবেছ তুমি? —যাকে যা খুশি তাই বলছ! (চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে) আপনি যেয়েন না,……আমি হাত জোড় করছি…

চৌধুরী মশাই একটু বিচলিত হয়ে পড়েন যেন। চোখ ভিজে ওঠে, ঠোঁট কাঁপতে থাকে।

চৌধুরী : না বাবা!…এ বুড়ো হাবড়াকে আর……

চৌধুরী মশাই কথা শেষ করতে পারেন না। মাথা নাড়তে নাড়তে মণ্ডপ ছেড়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যান।

দেবু পণ্ডিত অসহায় ভাবে দাঁড়িয়েই থাকে।

এই কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা হঠাৎ ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যায়। বিপরীত দিক থেকে শোনা যায় জোর কান্নার আওয়াজ।

কাট্ টু।

আমরা দেখতে পাই পাতু বায়েন আর তার বৌ দুজনেই বিলাপ করে কাঁদতে কাঁদতে আসছে।

পাতু : শোনেন!…শোনেন বাবুরা! দ্যাখেন…দ্যাখেন আমার কি

পাতু বায়েন ক্যামেরার দিকে পিঠ ফেরালে দেখা যায় তার পিঠ ভর্তি কালশিটে আর ঘা। কেউ বুঝি তাকে প্রচণ্ড মেরেছে।

সভায় ঐ দৃশ্যের মৃদু প্রতিক্রিয়া হয়।

—এ কি!

—কি করে?

—কি করে হল, পাতু?

—এমন করে মারলে কে?

ক্লোজ শট্।

পাতু : দোষের মধ্যে দোষ। শুধু বলেছিলাম—"আপনারা ভদ্দরলোক, আপনারা যদি এমন করে আমাদের ঘরের মেয়াদের দিকে নজর দ্যান—"

পাতুর বৌ : সব ঐ সব্বনাশী কালামুখীর লেগে গো—

পাতু : (ধমকে) এ্যা-ও ও!… চোপ্…যা ঘর যা। এক সাপুটে খুন করে ফেলে ডুবো বল্লাম—

পাতুর বৌ : (নির্ভয়ে) উঁ—খুন করে ডুবা…কৈ, তাকে পারিস না? নিজের বুন? যখন সন্‌জেবেলা পাছাপেড় শাড়ি পরে… ঠোঁটে অং মেখে…ঘরের দোর বন্ধ করে নিত্যিদিন ছম্… ছম্…ছম…

পাতুর বৌ কোমর দুলিয়ে তার ননদকে নকল করতে চায়। ক্যামেরা চার্জ করে ওর ওপর।

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩৭।

স্থান—দুর্গার ঘরের ভেতর।

সময়—রাত্রি।

ফ্ল্যাশ ব্যাক।

এক জোড়া রঙিন মল্ পরা পায়ের ওপর থেকে ক্যামেরা প্যান্ করে দেখায় মেঝেতে ছিরু পাল মাতাল হয়ে বসে। মল পরা পা দুটো হচ্ছে দুর্গার। পাতুর বোন। একটা মনভোলানো গানের কলি শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে যে গাইছে।

ছিরু পালের এক হাতে মদের গ্লাস। কামার্ত চোখে সে তাকিয়ে আছে দুর্গার দিকে, মাঝে মাঝে তার পাটা ধরতে চাইছে ছিরু পাল। দুর্গা পাটা সরিয়ে নেয়। ছিরু পাল যখন পুরো মাতাল হয়ে পড়ে, দুর্গা পা দিয়ে তার কাঁধে ঠেলা দেয় আর হেসে ওঠে।

দু-তিনবার চেষ্টার পর এক সময় দুর্গার পাটা ধরে ফেলে ছিরু পাল। আর ঝুঁকে পড়ে পায়েই চুমু খেতে থাকে। দুর্গা চিৎকার করে হেসে ওঠে।

কাট্ টু

লো অ্যাঙ্গেল ক্লোজ শট্। বুক পর্যন্ত খোলা দুর্গা।

দুর্গা : (খিল্ খিল্ করে) এ্যাই! ……সুড়সুড়ি লাগে! এ্যাই!

কাট্ টু

ছিরু দুর্গার পায়ে চুমু খেতে খেতে ওপরে ওঠে।

কাট্ টু

দুর্গা একটু পিছু হঠে রসিকতা করে বলে

দুর্গা : হ্যাৎ!……জানোয়ার কুথাকার!

দরজার বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ শোনা যায়।

পাতু : (off voice) এ্যাই…এ্যাই দুগ্‌গা…দরজা খুল্—

দুর্গা : কে?

পাতু : হারামজাদী। আবার ঘরে লোক ঢুকায়েছিস।

ছিরু : এ্যাই! ···কোন্ শালা চ্যাঁচায় রে

পাতু : আমি শালা চ্যাঁচাই রে!······ক্যানে?

ছিরু : (টলতে টলতে উঠে) হারামজাদা!······

দুর্গা : শোন...যেয়োনা...শুনছ...

ছিরু : ছেড়ে দে!...রোজ শালা হুমকি বাধাইছে! দেখাইছি মজা!

কাট্ টু।

দৃশ্য—৩৮

স্থান—পুরনো চণ্ডীমণ্ডপ ও মন্দির

সময়—রাত্রি

ফ্ল্যাশ ফরোয়ার্ড।

পাতু : ইখানে সক্কলে রইছেন!...বলেন,...বলেন ইয়ার কি বিচের হবে?

মুহূর্তের জন্য সবাই নীরব হয়ে যায়।

ছিরু পাল যেন অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে।

দেবু : এসব বিচার এখানে হয় না পাতু! নিজের ঘর শাসন করনা কেনে?

পাতু : করব!...লিচ্চই করব!...কিন্তু পণ্ডিত ঠাকুর

পাতু জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ছিরু পালের দিকে তাকায়।

কাট্ টু।

ছিরু পালের ক্লোজ-আপ শট্। ওর মুখের ওপরই পাতু বায়েনের কথা শোনা যায়।

পাতু : (off voice) ভদ্দরলোকের শাসন কইরবে কে?

কাট্ টু।

পাতু : আমার বুন লচ্ছার...বজ্জাত...ঠিক আছে! কিন্তু যখন তখন ছুতোয় নাতায় গরীব গুব্বোদের ঘরে ঢুকে ফষ্টি...নষ্টি...

এই সময় দেখা যায় অনিরুদ্ধ আবার ফিরে আসছে। পাতুর কথায় কান না দিয়ে সে সোজা এসে হাজির হয় ছিরু পালের সামনে এবং একমুঠো টাকা ছুঁড়ে দেয় তার দিকে।

অনিরুদ্ধ : এই নাও!...পঁচিশ টাকা দশ আনা!...এক পয়সা বেশি রয়েচে—পান কিনে খেয়ো! আর দাও আমার হ্যাণ্ডনোট।

এই বলে সে হ্যাণ্ডনোটটা ছোঁ মেরে নেয় এবং গিরিশের দিকে তাকায়—

অনিরুদ্ধ : এসো মিতে

হঠাৎ দেবু পণ্ডিত এসে তার পথ রোধ করে।

দেবু : এ কি? চল্লে নাকি?

অনিরুদ্ধ : হুঁ!...যে মজলিশ (ছিরুকে দেখিয়ে) উয়ার মতন লোককে শাসন কত্তে পারে না—সে মজলিশের সঙ্গে আমার কুনো সম্পক্ক নাই!

সে দেবুকে ঠেলে বেরিয়ে যায়।

দেবু : অনি!

যেখানে মাটিতে বাউড়িরা বসেছিল সেই ষষ্ঠীতলায় গিয়ে অনিরুদ্ধ চিৎকার করে বলে—

অনি : এই, ওঠ্...ওঠ্ সব!...ভদ্দর লোকের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি কইরে ভদ্দরনোক হবার সাধ হইছে—না? ভদ্দরনোক!

পাতু : হ্যাঁ হ্যাঁ! ইখানে কুনো বিচের হবে না! উঠে পড়!

কয়েকজন বাউড়ি সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে। কয়েকজন আবার তাদের শান্ত করতে চেষ্টা করে। একটা গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়।

কাট্ টু

চণ্ডীমণ্ডপের লোকজনের শট্।

কাট্ টু

অনিরুদ্ধ চণ্ডীমণ্ডপের দিকে ফিরে চিৎকার করে, রেগে মুখ ভেঙিয়ে বলে—

অনিরুদ্ধ : হায় হায় মজলিশ রে!...ছিরে পালের গোয়াল! ধুনো দাও...ভালো করে ধুনো দাও—

সে মাটিতে থুতু ফেলে এবং সঙ্গীদের ছেড়েই চলে যায়।

কাট্ টু

সবাই হতচকিত স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অভাবনীয় ধৃষ্টতা দেখে সবাই হতবুদ্ধি যেন! দেবু নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারে না। ক্যামেরা ধীরে ধীরে জুম্ করে এগিয়ে যায় ছিরু পালের ওপর। রাগে জ্বলছে তার চোখ। প্রতিহিংসার দৃষ্টি তার চোখে।

ওর মুখের ওপর একটা শব্দ ভেসে ওঠে।

থাঁশ্-শ্!...থাঁশ্-শ্!...থাঁশ্-শ্!

কাট্ টু।

(চলবে)

পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র পিছু হটছে কেন

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

জন্য যে সাংস্কৃতিক পরিবেশ প্রয়োজন, তা এই সরকারের সুস্থ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার বৃহত্তর কর্মসূচীর সম্পূরক। নগ্ন দৃশ্য ও ক্যাবারে নৃত্য সম্বলিত চলচ্চিত্র ও নাটকের যে জোয়ার কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সমাজ সংস্কৃতিকে কলুষিত করছিল, বর্তমান সরকারের প্রচারাভিযানের ফলেই তাতে এখন ভাঁটা দেখা দিয়েছে।

শুধমাত্র রুচিবোধসম্পন্নই নয় চলচ্চিত্রের সমঝদার দর্শক সৃষ্টিতেও বর্তমান সরকার সচেতন। Calcutta Film Festival '78 সংগঠিত করা, ফিল্ম সোসাইটিগুলির কেন্দ্রীয় সংস্থার ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজকে অর্থ সাহায্য দান এবং ফিল্ম সোসাইটি পত্রিকা ও লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলিতে প্রকাশিত চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধগুলির একটি নির্বাচিত সংকলন প্রকাশনার জন্য অনুদান সরকারের এই প্রচেষ্টার পরিচয় বহন করছে।

পূর্বতন রাজ্য সরকার বছরে ১২টি ছবির জন্য ১·৫ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বর্তমান সরকার তার পরিবর্তে বছরে ৩০টি ছবিকে (সাদা কালোর জন্য ১ থেকে ২ লক্ষ টাকা এবং রঙীনের জন্য ১·৫ থেকে ৩ লক্ষ টাকা অনুদান দেবেন বলে স্থির করেছেন, এই অনুদান তাঁদেরই দেওয়া হবে যাঁরা প্রমাণ করতে পারবেন যে একটি ছবির খরচের শতকরা অন্তত ২৫ ভাগ ব্যয় তাঁরা করে ফেলেছেন।

তাছাড়া দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্য দেওয়া থেকে আরম্ভ করে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে টেকনিশিয়ান ২নং স্টুডিও আধুনিকীকরণের কাজ সুরু হয়েছে। এ ছাড়া বেলেঘাটায় একটি শিশুচিত্র প্রদর্শন-প্রেক্ষাগার নির্মাণের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা করা, কালার ফিল্ম লেবরেটরি নির্মাণ করা এবং টেকনিশিয়ান ১নং স্টুডিও অধিগ্রহণের পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। এই সরকার ইতিমধ্যেই রাজ্য ভিত্তিতে একটি ফিল্মস ডিভিশন গঠনের জন্য যন্ত্রপাতির অর্ডার দিয়েছেন।

তবে সরকারকে সেই সঙ্গে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন পরিচালক ও কলা-কুশলীদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেবার ব্যাপারে নজর রাখতে হবে কারণ নবাগতদের স্রোত অব্যাহত না থাকলে যে কি হয় তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। তবে এব্যাপারেও সরকার উদাসীন নয় বলেই মনে হয় কারণ তাঁরা ইতিমধ্যেই নবাগতদের দ্বারা নির্মিত বেশ কিছু শর্ট ফিল্ম কিনে নিয়েছেন যদিও শর্ট ফিল্ম কেনার ব্যাপারে মতান্তরও আছে। আশা করব যে গঠিতব্য রাজ্য ফিল্মস ডিভিশনকে নবাগতদের জন্যই সাধারণভাবে সংরক্ষিত রাখা হবে। শ্যাম বেনেগাল ও সথ্যুকে এখানে ছবি করার জন্য আমন্ত্রণ একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত কারণ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম শ্রেণীর পরিচালকদের যে অভাব দেখা দিয়েছে এঁরা তা পূরণে সমর্থ হবেন। তবে এইগুলি সাময়িক ব্যবস্থা হওয়া উচিত কারণ নবাগতদের আগমন ঘটলেই স্থানীয়ভাবে বহু প্রতিভার সন্ধান মিলবে যা আবার পশ্চিমবাংলার চলচ্চিত্র শিল্পকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে।

প্রমোদকর অব্যাহতি

বর্তমান সরকারের এই বিষয়ে অবশ্যই কিছু করণীয় আছে। যেসব বাংলা ছবি চেতনা ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা বিকাশে সহায়তা করবে সেইসব ছবিগুলিকে প্রমোদকর থেকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত। কোন ছবি এই অব্যাহতি লাভের উপযুক্ত তা বিবেচনার ভার একটি স্থায়ী কমিটির উপরে ন্যস্ত করা যেতে পারে। ইদানিং কালে কর্ণাটক সরকার যেসব অঞ্চলে কুড়ি হাজারের কম মানুষ বাস করেন সেইসব অঞ্চলে সমস্ত কর্ণাটকী ছবিকে প্রমোদকর থেকে অব্যাহতি দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, অথবা যেভাবে মহারাষ্ট্র সরকার মারাঠি ছবিকে প্রমোদকরের একাংশ ফিরিয়ে দিচ্ছে এখানে তার কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা ভেবে দেখা উচিত। আর সরকার প্রযোজিত সমস্ত ছবিই প্রমোদকর মুক্ত হওয়া উচিত।

চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কর্তব্য

শুধুমাত্র সরকারী অর্থ সাহায্যেই এই শিল্পের সংকট মোচন হবে এরকম আশা করা বিরাট ভুল। চলচ্চিত্র নির্মাতাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উদ্যোগও নিতে হবে। কর্ণাটকে যেভাবে পরিচালকরা সমবায় গঠনের মাধ্যমে তাঁদের আর্থিক সমস্যার সুরাহা করেছেন, সেই দৃষ্টান্ত এখানেও অনুসরণ করা যেতে পারে। এটা বিশেষভাবে নবাগতদের ভেবে দেখা উচিত। তবে সঙ্কটের মূল কারণগুলি উপলব্ধি করে হিন্দী ছবির সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার সমস্ত রকম প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করাই হবে তাদের প্রাথমিক কর্তব্য এবং সেটা করতে বেশ কয়েকটি নতুন ব্যবস্থা নিতে হবে।

রঙীন ছবির নির্মাণ প্রসঙ্গে

ইদানিংকালে বাংলা ছবিতে রঙ ব্যবহারের আধিক্য দেখা যাচ্ছে। এর ফলে ছবির খরচ দ্বিগুণ বা তিনগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই উচ্চতর ব্যয়ভার বাংলা ছবি তার সীমিত বাজারে কতটা বহন করতে পারবে তা নির্মাতাদের ভেবে দেখা উচিত। এক্ষেত্রেও পূর্বের সেই হিন্দী ছবির সঙ্গে পাল্লা দেবার মানসিকতা কাজ করছে বলে মনে হয় যেটা পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র-শিল্পের ভবিষ্যতের পক্ষে বিপজ্জনক।

'স্ট্রাইকার' ছবিটি রঙীন হয়ে নির্মিত হলেও তা ভাল চলেনি। 'দেবদাস' রঙীন হয়ে নির্মিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল কি? এই ছবিটি যাঁরা দেখতে যাবেন তাঁদের বৃহদংশই শরৎচন্দ্রের কাহিনীটির চলচ্চিত্ররূপ অথবা তাঁদের প্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় দেখতে যাবেন। আর শুধুমাত্র রঙীন হবার আকর্ষণে যাঁরা যাবেন তাঁদের সংখ্যা এতই নগণ্য যে তাঁরা ছবির ঐ দ্বিগুণ অথবা তিনগুণ খরচ পুষিয়ে দিতে পারবেন না।

অবশ্য আঙ্গিকের প্রয়োজনে যদি কোনও ছবি রঙীন হয়ে নির্মিত হয় তা ভিন্ন কথা। এটা বুঝি যে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' রঙীন হয়ে নির্মিত হওয়াই উচিত হয়েছে তার সঙ্গে এও বুঝি যে 'পথের পাঁচালি' বা 'কলকাতা ৭১' সাদাকালোয় নির্মিত হওয়াই সঠিক হয়েছে। কিন্তু বর্ত্তমানে অনেক প্রথম শ্রেণীর পরিচালকদেরও রঙীন ছবি করা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

অতএব যান্ত্রিক ভাবনা পরিত্যাগ করে দর্শকদের মধ্যে যে রুচির polarisation ঘটে গেছে (পূর্বে আলোচিত) তা উপলব্ধি করতে হবে, কারণ এই ধরণের ছবি ক্রমাগত নির্মিত হতে থাকলে তা বাংলা ছবির দর্শকদের optical habit এ পরিবর্তন আনবেই এবং তা ভবিষ্যতে কম বাজেটে সাদা কালোয় ছবি নির্মাণের পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। যাঁরা রঙীন ছবি করে সাময়িক সফলও হচ্ছেন তাঁদেরও ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়েও সামগ্রিক স্বার্থের দিকে নজর রাখতে হবে, কারণ অভিজ্ঞতার দ্বারা দেখা গেছে যে শিল্পে সংকট দেখা দিলে তা কাউকেই ছাড় দেয় না, নামী-দামী সকলকেই তা স্পর্শ করে।

বিষয়বস্তু নির্বাচন

বিষয়বস্তু নির্বাচনের ব্যাপারে পরিচালকদের নজরে রাখতে হবে যে সেগুলি যেন মানুষের বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও চেতনা বিকাশের সহায়ক হয় কারণ এইভাবেই বাংলা ছবির মানোন্নয়ন অব্যাহত থাকবে এবং তা হিন্দী ছবির বিকল্প হিসাবে গণ্য হবে।

চলচ্চিত্রের ভাষার সঠিক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা

পরিচালকদের গল্প বলার সময় মনে রাখতে হবে যে শুধুমাত্র একটি জনপ্রিয় সাহিত্যকে শটের পর শট্ সাজিয়ে হুবহু চলচ্চিত্ররূপ দিলেই জনপ্রিয় সিনেমা হয় না। সাহিত্যের মত চলচ্চিত্রেরও একটা নিজস্ব গল্প বলার ভঙ্গী আছে। একটি দৃশ্য কোন angle থেকে নিলে তা দৃশ্যের মুডকে প্রতিফলিত করবে অথবা দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাবার সময় তা কতটা ম্যাচ্ করল—এইসব পরিচালককে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে। সাধারণ দর্শক এসবের খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাবেনা, কিন্তু সমস্ত ছবিটা দেখার পর ভালো লাগা না লাগার অনেকটা এর ওপর নির্ভর করবে। সাহিত্যের পাঠক যেভাবে তাঁর কল্পনার জাল বিস্তার করেন অথবা নাটকে দর্শক যেভাবে সীমাবদ্ধতাকে মেনে নেন সিনেমার দর্শকের সেরকম দায়বোধ থাকে না তাই সমগ্র ব্যাপারটা দর্শকের কাছে বিশ্বাসযোগ্যরূপে উপস্থিত করাই পরিচালকদের মূল দায়িত্ব। আর এই ব্যাপারে আলোকচিত্র শিল্পী, সম্পাদক থেকে শিল্পনির্দেশক, অভিনেতা-অভিনেত্রী প্রত্যেকেরই যৌথ দায়িত্ব আছে।

বিজ্ঞাপন

এই ব্যাপারেও হিন্দী ছবির মত গ্ল্যামারের রাজ্য গড়ে তোলার নীতি পরিহার করে বাংলা ছবির দর্শকের কথা মনে রেখেই প্রচার নীতি ঠিক হওয়া উচিত।

বাংলা চলচ্চিত্রের একজন দর্শক হিসাবে সংকটের কারণ বিশ্লেষণ করলাম। সবশেষে এই আশা করব যে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত আরও অনেকেই এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অগ্রণী হয়ে সংকটের গভীরতর দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করবেন।

কলকাতায় বেলজিয়ান ছবির উৎসব

অতুল লাহিড়ী

এপ্রিল মাসে কলকাতায় বেলজিয়ান ছবির এক উৎসব হয়ে গেল। এই উৎসবের উদ্যোক্তা ছিলেন কলকাতার কর্মচঞ্চল ফিল্ম সোসাইটি সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটা, সহযোগিতায় ছিলেন নয়াদিল্লীর বেলজিয়ান দূতাবাস।

এই উৎসবকে উপলক্ষ করে সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটা এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। এই সম্মেলনে বেলজিয়ান দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী মাদাম ক্রিস্টিনা ফুনেস-নোপেন বক্তব্য রাখলেন। প্রশ্ন এবং উত্তরের মধ্য দিয়ে জানা গেল মোটামুটি বেলজিয়ান চলচ্চিত্রের অগ্রগতির সূচনা ১৯৫২ সাল থেকে যখন বেলজিয়ান সরকার চলচ্চিত্র-শিল্পকে উদার অনুদান দিতে এগিয়ে এলেন সক্রিয়ভাবে। এই কার্যক্রম আরো বিস্তৃতি লাভ করল ১৯৬৪ সাল থেকে যখন ফরাসী এবং ফ্লেমিস সাংস্কৃতিক মন্ত্রক আরো সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এলেন চলচ্চিত্রশিল্পকে সহায়তা করতে। বছরে কাহিনীচিত্রের সংখ্যা এক থেকে বেড়ে দাঁড়াল ছ-সাতটিতে। বেলজিয়ান চলচ্চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যৌথ প্রযোজনা এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, এ তথ্যটিও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

উৎসবের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত, কারা ও সমষ্টি-উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীদেবব্রত বন্দোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদাম ক্রিস্টিনা ফুনেস-নোপেন। তিনি ভাষণ দিলেন বাংলা ভাষায় এবং বললেন বেলজিয়ান দূতাবাস সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটা আয়োজিত এই উৎসবের জন্য ব্রাসেলস্ থেকে ছবিগুলি বিশেষভাবে আনিয়েছেন।

উৎসবে ছটি ছবি দেখানো হয় 'বার্থা,' 'রাঁদেভু এ'ব্রে', 'ভারলোরেন মানদাগ', 'লে ফিলস্ দ্য মর এস্ত মর্ত', 'ভক্তি' ও 'মালপারতুস'।

'বার্থা' ছবিটি গী দ্য মোপাসাঁর কাহিনী অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। কুড়ি বছরের তরুণী বার্থা শৈশব থেকেই মেনেনজাইটিস রোগে আক্রান্ত। চিকিৎসার সূত্রে এক ডাক্তারের সঙ্গে তার পরিচয়। বার্থার অবশ মানসিকতা ও বিচিত্র আবেগ ডাক্তারের পরীক্ষা নিরীক্ষার বিষয় হয়ে ওঠে। বার্থার মার উপরোধে তাদের বিবাহ—পরবর্তীকালে তাদের বিবাহিত জীবন বিচিত্র জটিলতার শিকার। বার্থার ডাক্তার স্বামী ক্লান্ত জীবনের সন্ধানে বাইরের জগতে সময় কাটায়। অসহায় বার্থা অসহায় প্রতীক্ষায় রাত কাটায়। স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসা তীব্র বিচিত্র আবেগে ভরপুর অথচ স্বামী তার প্রতি কোনো আকর্ষণই অনুভব করেনা। এবং একদিন ডাক্তার বার্থাকে ছেড়ে চলে যায়। বার্থার প্রতীক্ষার শেষ নেই, অর্থহীন ...ীন প্রতীক্ষা। এ প্রতীক্ষা যেন মৃত্যুর প্রতীক্ষা যা আত্মহননের মতো।

পরিচালক পি, লেদ্যুক্স অদ্ভুত কুশলতার সঙ্গে বার্থার যন্ত্রণাময় জীবন তুলে ধরেছেন। ধুসর কাব্যের মত এ ছবি তুলে ধরেছে বার্থার তরুণী জীবনের জটিল ব্যর্থতা।

আন্দ্রে দেলভ্যু বেলজিয়ামের সবচেয়ে নামী পরিচালক। তাঁর রাঁদেভু এ 'ব্রে' ছবিটি এর আগে কলকাতায় দেখানো হয়েছে। এক কল্পকাহিনীর আবরণে ছবিটি তুলে ধরেছে ছায়াঘেরা রহস্যময়তা যা পরিচালনার আশ্চর্য কুশলতায় দর্শককে ধরে রাখে সহজেই।

১৯১৭ সালের ঘটনা। লুক্সেমবার্গের জুলিয়েন প্যারিসে বিভিন্ন বাদ্য-যন্ত্র বাজনা শিখছেন। একদিন তার পুরানো বন্ধু জ্যাক তাকে আমন্ত্রণ জানায় ব্রে নামক এক ছোট্ট জায়গায় নতুন বছর কাটানোর জন্য।

জুলিয়েন উপস্থিত হয় ব্রে-তে। সেখানে তার বন্ধু জ্যাকের দেখা নেই। তাকে আমন্ত্রণ জানায় এক মহিলা। তারা দুজনে একসঙ্গে রাত কাটায়। পরের দিন সকালে মহিলারও দেখা মেলেনা। জুলিয়েন তার বন্ধুকেও খুঁজে পায়না। জিনিষপত্র গুছিয়ে জুলিয়েন ব্রে-র বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। এই হলো ছবির কাহিনী।

'ভারলোরেন মানদাগ' ছবিটির পরিচালক এল, মনহেইম। পোল্যাণ্ডের এক তরুণ টমাস দেশ ছেড়ে সীমান্ত অতিক্রম করে চলে আসে বেলজিয়ামে। সে খুঁজে বেড়ায় এক মহিলাকে যে মহিলা তাকে এবং তার মাকে সীমান্ত অতিক্রম করতে সাহায্য করেছে। এই অনুসন্ধানের পথ বেয়ে সে হাজির হয় আন্টওয়ার্প শহরে সেখানে তার সাথে এক মহিলার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং পরিচয় হয় কিছু বিচিত্র মানুষের সঙ্গে যাদের মধ্যে রয়েছে খুচরো চোর, ভাড়াটে সৈন্য এবং মাতাল লোকজন। ওদের সঙ্গে পরিচয়ই তাকে বাঁচিয়ে রাখে। অবশেষে টমাস দেখা পায় সেই মহিলার যার খোঁজ সে এতদিন করে চলেছে। কিন্তু তখন টমাসের বেরোবার জায়গা নেই।

'লে ফিলস দ্য মর এস্ত মর্ত' পরিচালনা করেছেন আন্দ্রিয়েন। সালা বেন আহমদ এরবাই দক্ষিণ তিউনিশিয়া থেকে এসেছিলেন ব্রাসেলসে। ব্রাসেলসে একমাত্র তাকে চেনে তার বন্ধু পিয়ের। এরবাই বিচিত্র পরিস্থিতিতে আত্মহত্যা করে। পিয়ের এই ঘটনায় অত্যন্ত বিচলিত।

পিয়ের বুঝতে পারে যে সে তাকে চেনার চেষ্টা করেনি। তাঁর টিউনিশীয় বন্ধু সম্পর্কে কিছুই জানেনা। পিয়ের তার বন্ধুর মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন করার জন্য হাজির হয় দক্ষিণ টিউনিশিয়ার সেই গ্রামে। পিয়ের সম্ভবত তাঁর বন্ধুর অভিজ্ঞতাকে বুঝতে চায়, যেন বিনিময় করে নিতে চায় পারস্পরিক অস্তিত্ব।

এইচ, কুমেল নির্দেশিত 'মালপারতুস' ছবিটিও এর আগে কলকাতায় দেখানো হয়েছে। এছবিটিও বিচিত্র রহস্যময়তা তুলে ধরেছে কাহিনীর বিস্তারে। এছবির নায়ক জন, তার মাথায় আঘাত করে তাকে পতিতালয় থেকে তুলে আনা হয়েছে তার বাড়ীতে। তার পুরানো ঘরে ঘুম থেকে উঠে সে দেখে যে তার ঐ পুরানো ঘর অবিকল রূপান্তরিত হয়েছে তার কাকার প্রাসাদে। এই প্রাসাদের নাম মালপারতুস। জন ভাবে সে পালিয়ে যাবে কিন্তু তার বোন তাকে বোঝায় যে তার কাকা মৃত্যুশয্যায় এবং তাদের উপস্থিতি সম্পত্তি পাবার পক্ষে অত্যন্ত জরুরী।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক মারা যায়; জন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় কিন্তু অন্য সকলেই এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের উইল অনুযায়ী এই প্রাসাদে বসবাস করার অধিকারী সম্পত্তি ভোগের জন্য। এরপর বিচিত্র সমস্ত ঘটনা ঘটতে থাকে এবং একজন ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। জনের বোন প্রাসাদ ছেড়ে চলে যায়। জন মালপারতুসের রহস্য উন্মোচন করতে চেষ্টা করে—জন এদিকে আবার প্রেমে পড়ে যায় ইউরেলিয়া নামে একটি মেয়ের। যখন তারা দুজনে দুজনকে সোহাগে চুম্বন করতে থাকে তখনই আমরা দেখি জন একজন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছে যিনি বলছেন জন হাসপাতালে যে ডায়েরী লিখেছে তার প্রশংসার কথা। জনের স্ত্রী তাকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে যায় বাড়ীতে। জন বাড়ীতে আসে, ঘরে প্রবেশ করে, ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়—তখন জন দেখে সে সেই মালপারতুস প্রাসাদের পুরানো বারান্দায়—তার সামনে মুখোমুখি হেঁটে আসছে জন স্বয়ং নিজে।

মরিস বেজার্তের ছবি 'ভক্তি' ১৯৬৯ সালে ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত। পূর্ণাঙ্গ এই ব্যালে-ছবিতে বেজার্ত ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ এবং পশ্চিমে দুনিয়ায় বাজারী সভ্যতার দ্বন্দ্ব তুলে ধরেছেন। তিনটি কাহিনীর সূত্র ধরে ছবিটি এগিয়েছে—রাম-সীতা, শিব-শক্তি এবং কৃষ্ণ-রাধা। একজন পশ্চিমী শিল্পীর চোখে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ—বিষয়টি ভারতীয় দর্শকের কাছে যথেষ্ট আকর্ষণপূর্ণ। এবং এব্যাপারে কৃতিত্ব পরিচালক সহজেই দাবী করতে পারেন।

Regd. No. 13949/67 Rs. 1.25 April 1979 Vol. 13 No